শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

ত্রয়োদশ সম্ভার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পথের দাবী

পথের দাবী

১

অপূর্ব্বর সঙ্গে তাহার বন্ধুদের নিম্নলিখিত প্রথায় প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক হইত।

বন্ধুরা কহিতেন, অপু, তোমার দাদারা প্রায় কিছুই মানেন না; আর তুমি মানো না শোনো না সংসারে এমন ব্যাপারই নেই।

অপূর্ব্ব কহিত, আছে বই কি। এই যেমন দাদাদের দৃষ্টান্ত মানিনে এবং তোমাদের পরামর্শ শুনিনে।

বন্ধুরা পুরানো রসিকতার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেন, তুমি কলেজে পড়িয়া এম. এসসি. পাশ করিলে, কিন্তু তবু এখনও টিকি রাখিতেছ। তোমার টিকির মিডিয়ম দিয়া মগজে বিদ্যুৎ চলাচল হয় নাকি?

অপূর্ব্ব জবাব দিত এম. এসসি-র পাঠ্যপুস্তকে টিকির বিরুদ্ধে কোথাও কোন আন্দোলন নেই। সুতরাং টিকি রাখা অন্যায় এ ধারণা জন্মাতে পারেনি। আর বিদ্যুৎ চলাচলের সমস্ত ইতিহাসটা আজও আবিষ্কৃত হয়নি। বিশ্বাস না হয়, এম এসসি. যারা পড়ান তাঁদের বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।

তাঁহারা বিরক্ত হইয়া কহিতেন, তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিত, তোমাদের এই কথাটি অভ্রান্ত সত্য, কিন্তু তবু ত তোমাদের চৈতন্য হয় না।

আসল কথা, অপূর্ব্ব, ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট পিতার বাক্যে ও ব্যবহারে উৎসাহ পাইয়া তাহার বড় ও মেজদাদারা যখন প্রকাশ্যেই মুর্গি ও হোটেলের রুটী খাইতে লাগিল এবং স্নানের পূর্ব্বে গলার পৈতাটাকে পেরেকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া প্রায়ই ভুলিয়া যাইতে লাগিল, এমন কি ধোপার বাড়ি দিয়া কাচাইয়া ইস্ত্রী করিয়া আনিলে সুবিধা হয় কি-না আলোচনা করিয়া হাসি-তামাসা করিতে লাগিল, তখনও অপূর্ব্বর নিজের পৈতা হয় নাই। কিন্তু ছোট হইলেও সে মায়ের গভীর বেদনা ও নিঃশব্দ অশ্রুপাত বহুদিন লক্ষ্য করিয়াছিল। মা কিছুই বলিতেন না। একে ত বলিলে ছেলেরাও শুনিত না, অধিকন্তু স্বামীর সহিত নিরর্থক কলহ হইয়া যাইত। তিনি শ্বশুরকুলের পৌরোহিত্য ব্যবসাকে নিষ্ঠুর ইঙ্গিত করিয়া কহিতেন,

ছেলেরা যদি তাদের মামাদের মত না হয়ে বাপের মতই হয়ে উঠে ত কি করা যাবে! মাথায় টিকির বদলে টুপী পরে বলেই যে মাথাটা কেটে নেওয়া উচিত, আমার তা মনে হয় না।

সেই অবধি করুণাময়ী ছেলেদের সম্বন্ধে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। কেবল নিজের আচার বিচার নিজেই নীরবে ও অনাড়ম্বরে পালন করিয়া চলিতেন। তাহার পরে স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা হইয়া তিনি গৃহে বাস করিয়াও একপ্রকার গৃহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছিলেন। উপরের যে ঘরটায় তিনি থাকিতেন, তাহারই পার্শ্বের বারান্দায় খানিকটা ঘিরিয়া লইয়া তাঁহার ভাঁড়ার ও স্বহস্তে রান্নার কাজ চলিত। বধূদের হাতেও তিনি খাইতে চাহিতেন না। এমনিভাবেই দিন চলিতেছিল।

এদিকে অপূর্ব্ব মাথায় টিকি রাখিয়াছিল, কলেজে জলপানি ও মেডেল লইয়া যেমন সে পাশও করিত, ঘরে একাদশী-পূর্ণিমা-সন্ধ্যাহ্নিকও তেমনি বাদ দিত না। মাঠে ফুটবল-ক্রিকেট-হকি খেলাতেও তাহার যত উৎসাহ ছিল, সকালে মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইতেও তাহার কোনদিন সময়াভাব ঘটিত না। বাড়াবাড়ি ভাবিয়া বধূরা মাঝে মাঝে তামাসা করিয়া বলিত, ঠাকুরপো, পড়াশুনা ত সাঙ্গ হলো, এবার ডোর-কোপনি নিয়ে একটা রীতিমত গোঁসাই-টোসাই হয়ে পড়। এযে দেখচি বামুনের বিধবাকেও ছাড়িয়ে গেলে।

অপূর্ব্ব সহাস্যে জবাব দিত, ছাড়িয়ে যেতে কি আর সাধে হয় বৌদি? মায়ের একটা মেয়ে-টেয়ে নেই, বয়স হয়েচে, হঠাৎ অসমর্থ হয়ে পড়লে এক মুঠো হবিষ্যি রেঁধেও ত দিতে পারব? আর ডোর-কোপনি যাবে কোথা? তোমাদের সংসারে যখন আছি, তখন একদিন তা সম্বল করতেই হবে।

বড়বধূ মুখখানি ম্লান করিয়া কহিত, কি করব ঠাকুরপো, সে আমাদের কপাল!

তা বটে! বলিয়া অপূর্ব্ব চলিয়া যাইত, কিন্তু মাকে গিয়া কহিত, মা, এ তোমার বড় অন্যায়। দাদারা যাই কেন-না করুন, বৌদিরা কিছু আর মুর্গিও খান না, হোটেলেও ডিনার করেন না, চিরকালটা কি তুমি রেঁধেই খাবে?

মা কহিতেন, একবেলা একমুঠো চাল ফুটিয়ে নিতে ত আমার কোন কষ্টই হয় না বাবা। আর নিতান্তই যখন অপারগ হব, ততদিনে তোর বৌও ঘরে এসে পড়বে।

অপূর্ব্ব বলিত, তাই কেন না একটা বামুন-পণ্ডিতের ঘর থেকে আনিয়ে নাও না মা? খেতে দেবার সামর্থ্য আমার নেই, কিন্তু তোমার কষ্ট দেখলে মনে হয় দাদাদের গলগ্রহ হয়েই না হয় থাকব।

মা মাতৃগর্ব্বে দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া কহিতেন, অমন কথা তুই মুখেও আনিসনে

অপু! তোর সামর্থ্য নেই একটা বৌকে খেতে দেবার? তুই ইচ্ছে করলে যে বাড়ির সবাইকে বসে খাওয়াতে পারিস।

তোমার যেমন কথা মা। তুমি মনে কর ভূ-ভারতে তোমার ছেলের মত এমন ছেলে আর কারও নেই। এই বলিয়া সে উদ্গত অশ্রু গোপন করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িত।

কিন্তু নিজের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে অপূর্ব্ব যাহাই বলুক, তাই বলিয়া কন্যাভার-গ্রস্তের দল নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা দলে দলে আসিয়া বিনোদবাবুকে স্থানে-অস্থানে আক্রমণ করিয়া জীবন তাঁহার দুর্ভর করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিনোদ আসিয়া মাকে ধরিতেন, মা, কোথায় কোন নিষ্ঠে-কিষ্ঠে জপ-তপের মেয়ে আছে তোমার ছেলের বিয়ে দিয়ে চুকিয়ে ফেল, না হয় আমাকে দেখচি বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়। বাপের বড়ছেলে,—বাইরে থেকে লোকে ভাবে আমিই বুঝি-বা বাড়ির কর্ত্তা।

ছেলের কঠিন বাক্যে করুণাময়ী মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু এইখানে তিনি আপনাকে কিছুতেই বিচলিত হইতে দিতেন না। মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিতেন, লোকে ত মিথ্যে ভাবে না বাবা, তাঁর অবর্ত্তমানে তুমিই বাড়ির কর্ত্তা, কিন্তু অপুর সম্বন্ধে তুমি কাউকে কোন কথা দিয়ো না। আমি রূপ চাইনে, টাকাকড়ি চাইনে,—না বিনু, সে আমি আপনি দেখে-শুনে [illegible] দেব।

বেশ ত মা, তাই দিয়ো। [illegible] যা করবে দয়া করে একটু শীঘ্র করে কর। রাঙা মাকাল-ফল সামনে ঝুলিয়ে রেখে লোকগুলোকে আর দগ্ধে মেরো না। এই বলিয়া বিনোদ রাগ করিয়া যাইতেন।

করুণাময়ীর মনে মনে একটা সঙ্কল্প ছিল। স্নানের ঘাটে ভারি একটি সুলক্ষণা মেয়ে কিছুদিন হইতে তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল। মেয়েটি মায়ের সহিত প্রায়ই গঙ্গাস্নানে আসিত। ইহারা যে তাহাদের স্ব-ঘর এ সংবাদ তিনি গোপনে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। স্নানান্তে মেয়েটি শিবপূজা করিত, কোথাও কিছু ভুল হয় কি না, করুণাময়ী অলক্ষ্যে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন। তাঁহার আর কিছু কিছু জানিবার ছিল, এবং সে পক্ষে তিনি নিশ্চেষ্টও ছিলেন না। তাঁহার বাসনা ছিল, সমস্ত তথ্য যদি অনুকূল হয় ত আগামী বৈশাখেই ছেলের বিবাহ দিবেন।

এমন সময়ে অপূর্ব্ব আসিয়া অকস্মাৎ সংবাদ দিল, মা, আমি বেশ একটি চাকরি পেয়ে গেছি।

মা খুশী হইয়া কহিলেন, বলিস কি রে? এই ত সেদিন পাশ করলি, এরই মধ্যে তোকে চাকরি দিল কে?

অপূর্ব্ব হাসিমুখে কহিল, যার গরজ। এই বলিয়া সে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া

কহিল, তাহাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবই ইহা যোগাড় করিয়া দিয়াছেন! বোথা কোম্পানি বর্ম্মার রেঙ্গুন শহরে একটা নূতন অফিস খুলিয়াছে, তাহারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র কোন বাঙালী যুবককে সমস্ত কর্তৃত্ব-ভার দিয়া পাঠাইতে চায়। বাসা-ভাড়া ছাড়া মাহিনা আপাততঃ চারিশত টাকা, এবং চেষ্টা করিয়াও কোম্পানীকে যদি লাল-বাতি জ্বালাইতে না পারা যায় ত ছয় মাস পরে আরও তুইশত। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কিন্তু বর্ম্মা মুল্লুকের নাম শুনিয়া মায়ের মুখ মলিন হইয়া গেল, তিনি নিরুৎসুক-কণ্ঠে কহিলেন, তুই কি ক্ষেপেচিস অপু, সে-দেশে কি মানুষ যায়! যেখানে জাত, জন্ম, আচার-বিচার কিছুই নেই শুনেচি, সেখানে তোকে দেব আমি পাঠিয়ে? এমন টাকায় আমার কাজ নেই।

জননীর বিরুদ্ধতায় অপূর্ব্ব ভীত হইয়া কহিল, তোমার কাজ নেই, কিন্তু আমার ত আছে মা। তবে তোমার হুকুমে আমি ভিখিরি হয়ে থাকতে পারি, কিন্তু সারাজীবনে কি এমন সুযোগ আর জুটবে? তোমার ছেলের মত বিদ্যে-বুদ্ধি আজকাল শহরের ঘরে ঘরে আছে, অতএব বোথা কোম্পানীর আটকাবে না, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল সাহেব যে আমার হয়ে একেবারে কথা দিয়ে দিয়েচেন, তাঁর লজ্জার অবধি থাকবে না। তা ছাড়া বাড়ির সত্যকার অবস্থাও ত তোমার অজানা নয় মা।

মা বলিলেন, কিন্তু সেটা যে শুনেছি একেবারে ম্লেচ্ছ দেশ!

অপূর্ব্ব কহিল, কে তোমাকে বাড়িয়ে বলেচে। কিন্তু এটা ত তোমার ম্লেচ্ছ দেশ নয়, অথচ যারা হতে চায় তাদের ত বাধে না মা।

মা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু এই বৈশাখে যে তোর বিয়ে দেব আমি স্থির করেচি।

অপূর্ব্ব কহিল, একেবারে স্থির করে বসে আছ মা? বেশ ত, তু-একমাস পেছিয়ে দিয়ে যেদিন তুমি ডেকে পাঠাবে সেই দিনই ফিরে এসে তোমার আজ্ঞা পালন করব।

করুণাময়ী বাহিরের চক্ষে সেকেলে হইলেও অতিশয় বুদ্ধিমতী। তিনি অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, যখন যেতেই হবে তখন আর উপায় কি। কিন্তু তোমার দাদাদের মত নিয়ো।

এই বর্ম্মাযাত্রা সম্পর্কে তাঁহার আর তুটি সন্তানের উল্লেখ করিতে করুণাময়ীর অতীত ও বর্ত্তমানের সমস্ত প্রচ্ছন্ন বেদনা যেন এককালে আলোড়িত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে তুঃখ আর তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না। তাঁহার পিতৃকুল গোকুল-দীঘির সুবিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ এবং বংশ-পরম্পরায় তাঁহারা অতিশয় আচার-

পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান হিন্দু। শিশুকাল হইতে যে সংস্কার তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, উত্তরকালে তাহা স্বামী ও পুত্রদের হস্তে যতদূর আহত ও লাঞ্ছিত হইবার হইয়াছে, কেবল এই অপূর্ব্বকে লইয়াই তিনি কোনমতে সহ্য করিয়া আজও গৃহে বাস করিতেছিলেন, সে ছেলেও আজ তাঁহার চোখের আড়ালে কোন অজানা দেশে চলিয়াছে। এ কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার ভয় ও ভাবনার সীমা রহিল না; শুধু মুখে বলিলেন, যে ক'টা দিন বেঁচে আছি অপু, তুই কিন্তু আর আমাকে দুঃখ দিসনে বাবা। এই বলিয়া তিনি আঁচল দিয়া চোখ দুটি মুছিয়া ফেলিলেন।

অপূর্ব্বর নিজের চোখ সজল হইয়া উঠিল; সে প্রত্যুত্তরে কেবল কহিল, মা, আজ তুমি ইহালোকে আছ, কিন্তু একদিন স্বর্গ-বাসের ডাক এসে পৌঁছবে, সেদিন তোমার অপুকে ফেলে যেতে হবে জানি, কিন্তু, একটাদিনের জন্যেও যদি তোমাকে চিনতে পেরে থাকি মা, তা হলে সেখানে বসেও কখনো এ ছেলের জন্যে তোমাকে চোখের জল ফেলতে হবে না। এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে অন্যত্র প্রস্থান করিল।

সেদিন সন্ধ্যাকালে করুণাময়ী তাঁহার নিয়মিত আহ্নিক ও মালায় মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না, উদ্বেগ ও বেদনার ভারে তাঁহার দুই চক্ষু পুনঃ পুনঃ অশ্রু-আবিল হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং কি করিলে যে কি হয় তাহা কোনমতেই ভাবিয়া না পাইয়া অবশেষে তাঁহার বড়ছেলের ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইলেন। বিনোদকুমার কাছারি হইতে ফিরিয়া জলযোগান্তে এইবার সান্ধ্য পোষাকে ক্লাবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতেছিলেন, হঠাৎ মাকে দেখিয়া একেবারে চমকিয়া গেলেন। বস্তুতঃ এ ঘটনা এমনি অপ্রত্যাশিত যে সহসা তাঁহার মুখে কথা যোগাইল না।

করুণাময়ী কহিলেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেচি বিনু।

কি মা?

মা তাঁহার চোখের জল এখানে আসিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়াই মুছিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর্দ্রকণ্ঠ গোপন রহিল না। তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া শেষে অপূর্ব্বর মাসিক বেতনের পরিমাণ উল্লেখ করিয়াও যখন নিরানন্দমুখে কহিলেন, তাই ভাবচি বাবা, এই ক'টা টাকার লোভে তাকে সেখানে পাঠাব কি না, তখন বিনোদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে রুক্ষ-স্বরে কহিল, মা, তোমার অপূর্ব্বর মত ছেলে ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয় নেই সে আমরা সবাই মানি, কিন্তু পৃথিবীতে বাস করে এ-কথাটাও ত না মেনে নিতে পারিনে যে, প্রথমে চার-শ' এবং ছ'মাসে ছ'শ টাকা সে ছেলের চেয়েও অনেক বড়।

মা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, কিন্তু, সে যে শুনেচি একবারে ম্লেচ্ছ দেশ।

বিনোদ কহিল, মা, জগতে তোমার শোনা এবং জানাটাই কেবল অভ্রান্ত না হতে পারে।

ছেলের শেষ কথায় মা অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিয়া কহিলেন, বাবা বিনু, এই একই কথা তোমাদের জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত শুনে শুনেও যখন আমার চৈতন্য হ'লো না, তখন শেষ দশায় আর ও-শিক্ষা দিয়ো না। অপূর্ব্বর দাম কত টাকা সে আমি জানতে আসিনি, আমি শুধু জানতে এসেছিলাম অতদূরে তাকে পাঠান উচিত কি-না।

বিনোদ হেঁট হইয়া ডান হাতে তাড়াতাড়ি মায়ের দুই পা স্পর্শ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মা, তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য এ-কথা আমি বলিনি। বাবার সঙ্গেই আমাদের মিলত সে সত্যি, এবং টাকা জিনিসটা যে সংসারে দামী ও দয়কারী এ তাঁর কাছেই শেখা। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে লোভ তোমাকে আমি দেখাচ্চিনে। তোমার ম্লেচ্ছ বিনুর এই হ্যাট-কোটের ভেতরটা হয়ত আজও ততবড় সাহেব হয়ে ওঠেনি যে, ছোট ভাইকে খেতে দেবার আগে স্থান-অস্থানের বিচার করে না। কিন্তু তবুও বলি ও যাক। দেশে আবহাওয়া যা বইতে শুরু করেচে মা, তাতে ও যদি দিন কতক দেশ ছেড়ে কোথাও গিয়ে কাজে লেগে যেতে পারে ত ওর নিজেরও ভাল হবে, আর আমরাও সগোষ্ঠী হয়ত বেঁচে যাব। তুমি ত জানো মা, সেই স্বদেশী আমলে ওর গাল টিপলে দুধ বেরোত, তবু তারই বিক্রমে বাবার চাকরি যাবার জো হয়েছিল।

করুণাময়ী শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, না না, সে সব অপু আর করে না! সাত-আট বছর আগে তার কি বা বয়স ছিল, কেবল দলে মিশেই যা—

বিনোদ মাথা নাড়িয়া একটু হাসিয়া কহিল, হয়ত তোমার কথাই ঠিক, অপূর্ব্ব এখন আর কিছু করে না; কিন্তু সকল দেশেই জনকতক লোক থাকে মা, যাদের জাতই আলাদা,—তোমার ছোট ছেলেটি সেই জাতের। দেশের মাটি এদের গায়ের মাংস, দেশের জল এদের শিরার রক্ত; শুধু কি কেবল দেশের হাওয়া-আলো এর পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল, চন্দ্র-সূর্য্য, নদী-নালা যেখানে যা কিছু আছে সব যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে এরা শুষে নিতে চায়। বোধ হয় এদেরই কেউ কোন সত্যকালে জননী-জন্মভূমি কথাটা প্রথম আবিষ্কার করেছিল। দেশের সম্পর্কে এদের কখনো বিশ্বাস করো না মা, ঠকবে। এদের বেঁচে থাকা আর প্রাণ দেওয়ার মধ্যে এই এতটুকু মাত্র প্রভেদ! এই বলিয়া সে তাহার তর্জ্জনীর প্রান্ত-ভাগটুকু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেখাইয়া কহিল, বরঞ্চ তোমার এই ম্লেচ্ছাচারী বিনুটিকে তোমার ওই টিকিধারী গীতা পড়া এম. এসসি. পাশ করা অপূর্ব্বকুমারের চেয়ে ঢের বেশী আপনার বলে জেনো।

ছেলের কথাগুলি মা ঠিক যে বিশ্বাস করিলেন তাহা নয়, কিন্তু একসময়ে নাকি এই লইয়া তাঁহাকে অনেক উদ্বেগ ভোগ করিতে হইয়াছে, তাই মনে মনে চিন্তিত হইলেন। দেশের পশ্চিম দিগন্তে যে একটা মেঘের লক্ষণ দেখা দিয়াছে এ সংবাদ তিনি জানিতেন। তাঁহার প্রথমেই মনে হইল তখন অপূর্ব্বর পিতা জীবিত ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি পরলোকগত।

বিনোদ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল, কিন্তু তাহার বাহিরে যাইবার ত্বরা ছিল, কহিল, বেশ ত মা, সে তো আর কালই যাচ্ছে না, সবাই একসঙ্গে বসে যা হোক একটা স্থির করা যাবে। এই বলিয়া সে একটু দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেল।

২

জাহাজের কয়টা দিন অপূর্ব্ব চিঁড়া চিবাইয়া সন্দেশ ও ডাবের জল খাইয়া সর্ব্বাঙ্গীণ-ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিয়া অর্দ্ধমৃতবৎ কোনমতে গিয়া রেঙ্গুনের ঘাটে পৌছিল। নবপ্রতিষ্ঠিত বোথা কোম্পানীর জন-দুই দরওয়ান ও একজন মাদ্রাজী কর্ম্মচারী জেটিতে উপস্থিত ছিলেন, ম্যানেজারকে তাঁহারা সাদর সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তিনি ত্রিশ টাকা দিয়া বাসা ভাড়া করিয়া আফিসের খরচায় যথাযোগ্য আসবাব-পত্রে ঘর সাজাইয়া রাখিয়াছেন এ-সংবাদ দিতেও বিলম্ব করিলেন না।

ফাল্গুন মাস শেষ হইতে চলিয়াছে, গরম মন্দ পড়ে নাই। সমুদ্র-পথের এই প্রাণান্ত বিড়ম্বনা-ভোগের পর নিরালা গৃহের সজ্জিত শয্যার উপরে হাত-পা ছড়াইয়া একটুখানি শুইতে পাইবে কল্পনা করিয়া সে যথেষ্ট তৃপ্তি অনুভব করিল। পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে আসিয়াছিল, হালদার-পরিবারে বহুদিনের চাকরিতে তাহার নিখুঁত শুদ্ধাচারিতা করুণাময়ীর কাছে সপ্রমাণ হইয়া গেছে। তাই বাড়ির বহু অসুবিধা সত্ত্বেও এই বিশ্বস্ত লোকটিকে সঙ্গে দিয়া মা অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। আবার শুধু কেবল পাচকই নয়, পাক করিবার মত কিছু কিছু চাল ডাল ঘি-তেল গুঁড়া মশলা মায় আলু-পটল পর্য্যন্ত সঙ্গে দিতে তিনি বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং ঈষদুষ্ণ অন্ন-ব্যঞ্জনে মুখের শুকনা চিঁড়ার স্বাদটাও যে সে অবিলম্বে ফিরাইতে পারিবে এ ভরসাও তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের ন্যায় চমকিয়া গেল। গাড়ি ভাড়া হইয়া আসিলে কর্ম্মচারী বিদায় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মোট-ঘাট জিনিস-পত্র লইয়া আফিসের দরওয়ানজী পথ দেখাইয়া সঙ্গে চলিল, এবং একটানা জলযাত্রা

ছাড়িয়া শক্ত ডাঙার উপরে গাড়ির মধ্যে বসিতে পাইয়া অপূর্ব্ব আরাম বোধ করিল। কিন্তু মিনিট-দশেকের মধ্যে গাড়ি যখন বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিল, এবং দরওয়ানজী হাঁক-ডাকে প্রায় ডজনখানেক কোরঙ্গদেশীয় কুলি যোগাড় করিয়া মোট-ঘাট উপরে তুলিবার আয়োজন করিল, তখন, সেই তাহার ত্রিশ টাকা ভাড়ার বাটীর চেহারা দেখিয়া অপূর্ব্ব হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। বাড়ির শ্রী নাই, ছাঁদ নাই, সদর নাই, অন্দর নাই, প্রাঙ্গণ বলিতে এই চলাচলের পথটা ছাড়া আর কোথাও কোন স্থান নাই। একটা অপ্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি রাস্তা হইতে সোজা তেতালা পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে, সেটা যেমন খাড়া তেমনি অন্ধকার। ইহা কাহারও নিজস্ব নহে, অন্ততঃ ছয়জন ভাড়াটিয়ার ইহাই চলাচলের সাধারণ পথ। এই উঠা-নামার কার্য্যে দৈবাৎ পা ফস্‌কাইলে প্রথমে পথের বাঁধানো রাস্তায় রাজপথ, পরে তাঁহারই হাঁস-পাতাল, এবং তৃতীয় গতিটা না ভাবাই ভালো। এই দুরারোহ দারুময় সোপান-শ্রেণীর সহিত পরিচিত হইয়া উঠিতে কিছু দীর্ঘকাল লাগে। অপূর্ব্ব নূতন লোক, তাই সে প্রতিপদক্ষেপে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া দরওয়ানের অনুবর্ত্তী হইয়া উঠিতে লাগিল। দরওয়ান কতকটা উঠিয়া ডান দিকে দোতলার একটা দরজা খুলিয়া দিয়া জানাইল, সাহেব, ইহাই আপনার গৃহ।

ইহার মুখোমুখি বামদিকের রুদ্ধ দ্বারটা দেখাইয়া অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, এটাতে কে থাকে ?

দরওয়ান কহিল, কোই এক চীনা সাহেব রহতেঁ হে শুনা।

অপূর্ব্ব ঠিক তাহার মাথার উপরে তেতালায় কে থাকে প্রশ্ন করায় সে কহিল, এক কালা সাহেব ত রহতেঁ হে দেখা। কোই মান্দ্রাজ-বালে হোয়েঙ্গে জরুর !

অপূর্ব্ব চুপ করিয়া রহিল। এই একমাত্র আনাগোনার পথে উপরে এবং পার্শ্বে এই দুটি একান্ত ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর পরিচয়ে তাহার মুখ দিয়া কেবল দীর্ঘশ্বাস পড়িল। নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার আরও মন খারাপ হইয়া গেল। কাঠের বেড়া দেওয়া পাশাপাশি ছোট বড় তিনটি কুঠরী। একটিতে কল, স্নানের ঘর, রান্নার জায়গা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় যাহা কিছু সমস্তই, মাঝেরটি এই অন্ধকার সিঁড়ির ঘর, গৌরবে বৈঠকখানা বলা চলে, এবং সর্ব্বশেষে রাস্তার ধারের কক্ষটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং আলোকিত,—এইটি শয়ন-মন্দির। আফিসের খরচায় এই ঘরটিকেই খাট, টেবিল এবং গুটিকয়েক চেয়ার দিয়া সাজানো হইয়াছে। পথের উপর ছোট একটু-খানি বারান্দা আছে, সময় কাটানো অসম্ভব হইলে এখানে দাঁড়াইয়া লোক-চলাচল দেখা যায়। ঘরে হাওয়া নাই, আলো নাই, একটার মধ্যে দিয়া আর একটায় যাইতে হয়,—ইহার সমস্তই কাঠের,—দেয়াল কাঠের, মেঝে কাঠের, ছাত কাঠের,

সিঁড়ি কাঠের, আগুনের কথা মনে হইলে সন্দেহ হয় এতবড় সর্বাঙ্গ-সুন্দর জতুগৃহ বোধ করি রাজা দুর্য্যোধনও তাঁর পাণ্ডব ভায়াদের জন্য তৈরী করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহারই অভ্যন্তরে এই সুদূর প্রবাসে ঘর-বাড়ি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া, বৌদিদিদের ছাড়িয়া, মাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে স্মরণ করিয়া মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল। সামলাইয়া লইয়া সে খানিকক্ষণ এঘর-ওঘর করিয়া একটা জিনিস দেখিয়া কিছু আশ্বস্ত হইল যে কলে তখনও জল আছে। স্নান ও রান্না দুইই হইতে পারে। দরওয়ান সাহস দিয়া জানাইল, অপব্যয় না করিলে এ সহরে জলের অভাব হয় না, যেহেতু প্রত্যেক দুই ঘর ভাড়াটিয়ার জন্য এ বাড়িতে একটা করিয়া বড় রকমের জলের চৌবাচ্চা উপরে আছে তাহা হইতে দিবারাত্রিই জল সরবরাহ হয়। ভরসা পাইয়া অপূর্ব্ব পাচককে কহিল, ঠাকুর, মা ত সমস্তই সঙ্গে দিয়েচেন, তুমি স্নান করে দুটি রাঁধবার উদ্যোগ কর, আমি ততক্ষণ দরওয়ানজীকে নিয়ে জিনিস-পত্র কিছু কিছু গুছিয়ে ফেলি।

রন্নই-ঘরে কয়লা মজুত ছিল, কিন্তু বাঁধানো চুল্লী। নিকানো-মুছানো তেমন হয় নাই, পরীক্ষা করিয়া কিছু কিছু কালীর দাগ প্রকাশ পাইল। কে জানে এখানে কে ছিল, সে কোন জাত, কি রাঁধিয়াছে মনে করিয়া তাহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইল, ঠাকুরকে কহিল, এতে তো রাঁধা চলবে না তেওয়ারী, অন্য বন্দোবস্ত করতে হবে। একটা তোলা-উনুন হলে বাইরের ঘরে বসে আজকের মতো দুটো চাল-ডাল ফুটিয়ে নেওয়া যেত, কিন্তু এ পোড়া দেশে কি তা মিলবে?

দরওয়ান জানাইল কোন অভাব নাই, মূল্য পাইলে সে দশ মিনিটের মধ্যে আনিয়া হাজির করিতে পারে। অতএব সে টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। ইতিমধ্যে তেওয়ারী রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিল এবং অপূর্ব্ব নিজে যথাযোগ্য স্থান মনোনীত করিয়া তোরঙ্গ বাক্স প্রভৃতি টানাটানি করিয়া ঘর সাজাইতে নিযুক্ত হইল। কাঠের আলনায় জামা-কাপড় সুট প্রভৃতি গুছাইয়া ফেলিল, বিছানা খুলিয়া খাটের উপর তাহা পরিপাটি করিয়া বিছাইয়া লইল, তোরঙ্গ হইতে একটা নূতন টেবিল-ক্লথ বাহির করিয়া টেবিলে পাতিয়া কিছু কিছু বই ও লিখিবার সরঞ্জাম সাজাইয়া রাখিল, এবং উত্তরে খোলা জানালার পাল্লা দুইটা আপ্রান্ত প্রসারিত করিয়া তাহার দুই কোণে দুইটা কাগজ গুঁজিয়া দিয়া শোবার ঘরটাকে অধিকতর আলোকিত এবং নয়নরঞ্জন জ্ঞান করিয়া সম্ভরচিত শয্যায় চিত হইয়া পড়িয়া একটা নিশ্বাস মোচন করিল। ক্ষণেক পরেই দরওয়ান লোহার চুল্লী কিনিয়া উপস্থিত করিলে তাহাতে আগুন দিয়া খিচুড়ী এবং যাহা কিছু একটা ভাজা-ভুজি যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত করিয়া ফেলিতে আদেশ দিয়া অপূর্ব্ব আর এক দফা বিছানায় গড়াইয়া লইতে

যাইতেছিল, হঠাৎ মনে পড়িল মা মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন নামিয়াই একটা টেলিগ্রাফ করিয়া দিতে। অতএব, অবিলম্বে জামাটা গায়ে দিয়া প্রবাসের একমাত্র কর্ণধার দরওয়ানজীকে সঙ্গে করিয়া সে পোস্ট আফিসের উদ্দেশ্যে আর একবার বাহির হইয়া পড়িল, এবং তাহারই কথামত তেওয়ারী ঠাকুরকে আশ্বাস দিয়া গেল, ফিরিয়া আসিতে তাহার একঘণ্টার বেশী লাগিবে না, কিন্তু ইতিমধ্যে সমস্ত যেন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আজ কি একটা খ্রীষ্টান পর্ব্বোপলক্ষে ছুটি ছিল। অপূর্ব্ব পথের দুইধারে চাহিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই বুঝিল এই গলিটা দেশী ও বিদেশী মেমসাহেবদের পাড়া এবং প্রত্যেক বাটীতে বিলাতী উৎসবের কিছু কিছু চিহ্ন দেখা দিয়াছে। অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দরওয়ানজী, এখানে আমাদের বাঙালী লোকও ত অনেক আছে শুনেচি, তাঁরা সব কোন্ পাড়ায় থাকেন?

প্রত্যুত্তরে সে জানাইল যে এখানে পাড়া বলিয়া কিছু নাই, যে যেখানে খুশি থাকে। তবে 'অপসর লোগ্' এই গলিটাকেই বেশী পছন্দ করে। অপূর্ব্ব নিজেও একজন 'অপসর্ লোগ্' কারণ সেও বড় চাকরি করিতেই এ দেশে আসিয়াছে, এবং আপনি গোড়া হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও কোন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাহার বিদ্বেষ ছিল না। তথাপি এইভাবে আপনাকে উপরে নীচে দক্ষিণে বামে বাসায় ও বাসার বাইরে চারিদিকেই খ্রীষ্টান প্রতিবেশী পরিবৃত দেখিয়া অত্যন্ত বিতৃষ্ণা বোধ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, আর কি কোথাও বাসা পাওয়া যায় না দরওয়ান?

দরওয়ানজী এ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নহে, সে চিন্তা করিয়া যাহা সঙ্গত বোধ করিল, তাহাই জবাব দিল, কহিল, খোঁজ করিলে পাওয়া যাইতেও পারে, কিন্তু এ ভাড়ায় এমন বাড়ি পাওয়া কঠিন।

অপূর্ব্ব আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহারই নির্দ্দেশ মত অনেকখানি পথ হাঁটিয়া একটা ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন মাদ্রাজী তার-বাবু টিফিন করিতে গিয়াছেন, ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিয়া যখন তাঁহার দেখা মিলিল, তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, আজ ছুটির দিন, বেলা দুইটার পরে অফিস বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু এখন দু'টা বাজিয়া পনর মিনিট হইয়াছে।

অপূর্ব্ব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, সে দোষ তোমার, আমার নয়। আমি একঘণ্টা অপেক্ষা করিতেছি।

লোকটা অপূর্ব্বর মুখের প্রতি চাহিয়া নিঃসঙ্কোচে কহিল, না, আমি মাত্র মিনিট-দশেক ছিলাম না।

অপূর্ব্ব তাহার সহিত বিস্তর ঝগড়া করিল, মিথ্যাবাদী বলিয়া তিরস্কার করিল,

রিপোর্ট করিবে বলিয়া ভয় দেখাইল, কিন্তু কিছুই হইল না। সে নির্ব্বিকার চিত্তে নিজের খাতাপত্র দুরস্ত করিতে লাগিল, জবাবও দিল না। আর সময় নষ্ট করা নিষ্ফল বুঝিয়া অপূর্ব্ব ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে বড় টেলিগ্রাফ আফিসে আসিয়া অনেক ভিড় ঠেলিয়া অনেক বিলম্বে নিজের নির্ব্বিঘ্নে পৌছান সংবাদ যখন মাকে পাঠাইতে পারিল, তখন বেলা আর বড় নাই!

দুঃখের সাথী দরওয়ানজী সবিনয়ে নিবেদন করিল, সাহেব, হাম্‌কো ভি বহুত দূর যানা হ্যায়।

অপূর্ব্ব একান্ত পরিশ্রান্ত ও অন্যমনস্ক হইয়াছিল, ছুটি দিতে আপত্তি করিল না। তাহার ভরসা ছিল নম্বর দেওয়া রাস্তাগুলা সোজা ও সমান্তরাল থাকায় গন্তব্যস্থান খুঁজিয়া লওয়া কঠিন হইবে না। দরওয়ান অন্যত্র চলিয়া গেল, সেও হাঁটিতে হাঁটিতে এবং গলির হিসাব করিতে করিতে অবশেষে বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সিঁড়িতে পা দিয়াই দেখিল দ্বিতলে তাহার দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তেওয়ারী ঠাকুর মস্ত একটা লাঠি ঠুকিতেছে এবং অনর্গল বকিতেছে, এবং প্রতিপক্ষ একব্যক্তি খালি গায়ে পেন্টুলুন পরিয়া তেতালার কোঠায় নিজের খোলা দরজার সুমুখে দাঁড়াইয়া হিন্দী ও ইংরেজীতে ইহার জবাব দিতেছে এবং একটা ঘোড়ার চাবুক লইয়া মাঝে মাঝে সাঁই সাঁই শব্দ করিতেছে। তেওয়ারী তাহাকে নীচে ডাকিতেছে, সে তাহাকে উপরে আহ্বান করিতেছে,—এবং এই সৌজন্যের আদান-প্রদান যে ভাষায় চলিতেছে তাহা না বলাই ভাল।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়া অপূর্ব্ব তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। এইটুকু সময়ের মধ্যে ব্যাপারটা যে কি ঘটিল, কি উপায়ে তেওয়ারীজী এইটুকু অবসরেই প্রতিবেশী সাহেবের সহিত এতখানি ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইল, সে তাহার কিছুই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু অকস্মাৎ বোধ হয় দুই পক্ষের দৃষ্টিই তাহার উপর নিপতিত হইল। তেওয়ারী মনিবকে দেখিয়া আর একবার সজোরে লাঠি ঠুকিয়া কি একটা মধুর সম্ভাষণ করিল, সাহেব তাহার জবাব দিয়া প্রচণ্ডশব্দে চাবুক আস্ফালন করিলেন, কিন্তু পুনশ্চ যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বেই অপূর্ব্ব দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া লাঠিসুদ্ধ তেওয়ারীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তুই কি খেপে গেছিস? এই বলিয়া তাহাকে প্রতিবাদের অবসর না দিয়াই জোর করিয়া ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। ভিতরে গিয়া সে রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল, এই দেখুন, হারামজাদা সাহেব কি কাণ্ড করেচে।

বাস্তবিক, কাণ্ড দেখিয়া অপূর্ব্বর শ্রান্তি এবং ঘুম, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা একই কালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সুসিদ্ধ খেচারান্নের হাঁড়ি হইতে তখন পর্য্যন্ত উত্তাপ ও

মশলার গন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে, কিন্তু তাহার উপরে, নীচে, আসে-পাশে চতুর্দ্দিকে জল থৈ থৈ করিতেছে। এ-ঘরে আসিয়া দেখিল, তাহার সদ্যরচিত ধপধপে বিছানাটি ময়লা কালো কালো জলে ভাসিতেছে। চেয়ারে জল, টেবিলে জল, বইগুলো জলে ভিজিয়াছে, বাক্স-তোরঙ্গের উপরে জল জমা হইয়াছে, এমনকি এক কোণে রাখা কাপড়ের আলনাটি অবধি বাদ যায় নাই। তাহার দামী নূতন সুটটির গায়ে পর্য্যন্ত ময়লা জলের দাগ লাগিয়াছে।

অপূর্ব্ব নিশ্বাস রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ক'রে হ'ল?

তেওয়ারী আঙ্গুল দিয়া উপরের ছাদ দেখাইয়া কহিল, ও শালা সাহেবের কাজ। ঐ দেখুন—

বস্তুতঃ কাঠের ছাদের ফাঁক দিয়া তখন পর্য্যন্ত ময়লা জলের ফোঁটা স্থানে স্থানে চুয়াইয়া পড়িতেছিল। তেওয়ারী দুর্ঘটনা যাহা বিবৃত করিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

অপূর্ব্ব যাইবার মিনিট কয়েক পরেই সাহেব বাড়ি আসেন। আজ খ্রীষ্টানদের পর্ব্বদিন। এবং খুব সম্ভব উৎসব ঘোরালো করিবার উদ্দেশেই তিনি বাহির হইতেই একেবারে ঘোর হইয়া আসেন। প্রথমে গীত ও পরে নৃত্য শুরু হয়। এবং অচিরেই উভয় সংযোগে শাস্ত্রোক্ত 'সংগীত' এরূপ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে যে তেওয়ারীর আশঙ্কা হয় কাঠের ছাদ হয়ত বা সাহেবের এত বড় আনন্দ বহন করিতে পারিবে না, সবসুদ্ধ তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ইহাও সহিয়াছিল, কিন্তু রান্নার অদূরেই যখন উপর হইতে জল পড়িতে লাগিল, তখন সমস্ত নষ্ট হইবার ভয়ে তেওয়ারী বাহির হইয়া প্রতিবাদ করে। কিন্তু সাহেব,—তা কালাই হৌন বা ধলাই হৌন, দেশী লোকের এই স্পর্দ্ধা সহ্য করিতে পারেন না, উত্তেজিত হইয়া উঠেন, এবং মুহূর্ত্তকালেই এই উত্তেজনা এরূপ প্রচণ্ড ক্রোধে পরিণত হয় যে, তিনি ঘরের মধ্যে গিয়া বাল্‌তি বাল্‌তি জল ঢালিয়া দেন। ইহার পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য—অপূর্ব্ব নিজেও কিছু কিছু স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

অপূর্ব্ব কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, সাহেবের ঘরে কি আর কেউ নেই?

তেওয়ারী কহিল, কি জানি আছে হয়ত! কে একজন মাতাল ব্যাটার সঙ্গে ঝুটোপুটি লড়াই করছিল। এই বলিয়া সে খিচুড়ির হাঁড়িটার প্রতি করুণ-চক্ষে চাহিয়া রহিল। অপূর্ব্ব ইহার অর্থ বুঝিল। অর্থাৎ কে একজন প্রাণপণে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য একতিল কমাইতে পারে নাই।

অপূর্ব্ব নীরবে বসিয়া রহিল। যাহা হইবার হইয়াছে, কিন্তু নূতন উপদ্রব আর ছিল না। উৎসবে-আনন্দবিহ্বল সাহেবের নব উদ্যমের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল.

না। বোধ করি এখন তিনি জমি লইয়াছিলেন,—কেবল নিগার তেওয়ারীকে যে এখনও ক্ষমা করেন নাই, তাহারই অস্ফুট উচ্ছ্বাস মাঝে মাঝে শোনা যাইতে লাগিল।

অপূর্ব্ব হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিল, তেওয়ারী, ভগবান না মাপালে এমনি মুখের গ্রাস নষ্ট হয়ে যায়। আয় আমরা মনে করি আজও জাহাজে আছি। চিঁড়ে-মুড়কি-সন্দেশ এখনো কিছু আছে—রাতটা চলে যাবে। কি বলিস।

তেওয়ারী মাথা নাড়িয়া সায় দিল, এবং ওই হাঁড়িটার প্রতি একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া চিঁড়া-মুড়কির উদ্দেশে গাত্রোত্থান করিল। সৌভাগ্য এই যে খাবারের বাক্সটা সেই যে ঢুকিয়াই রান্নাঘরের কোণে রাখা হইয়াছিল, আর স্থানান্তরিত করা হয় নাই,—খ্রীষ্টানের জল অন্ততঃ এই বস্তুটার জাত মারিতে পারে নাই।

ফলারের যোগাড় করিতে করিতে তেওয়ারী রান্নাঘর হইতে কহিল, বাবু, এখানে ত থাকা চলবে না।

অপূর্ব্ব অন্যমনস্কভাবে বলিল, বোধ হয় না।

তেওয়ারী হালদার পরিবারের পুরাতন ভৃত্য, আসিবার কালে মা তাহার হাত ধরিয়া যে কথাগুলি বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই সকল স্মরণ করিয়া সে উদ্বিগ্নকণ্ঠে কহিল, না বাবু, এ-ঘরে আর একদিনও না। রাগের মাথায় ভাল কাজ করিনি, সাহেবকে আমি অনেক গাল দিয়েচি।

অপূর্ব্ব কহিল, হাঁ, গাল না দিয়ে তোর মারা উচিত ছিল।

তেওয়ারীর মাথায় ক্রোধের পরিবর্ত্তে সুবুদ্ধির উদয় হইতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, না বাবু, না। ওরা হাজার হোক সাহেব। আমরা বাঙালী।

অপূর্ব্ব চুপ করিয়া রহিল। তেওয়ারী সাহস পাইয়া প্রশ্ন করিল, আফিসের দরওয়ানজীকে বলে কাল সকালেই উঠে যাওয়া যায় না? আমার ত মনে হয় যাওয়াই ভাল।

অপূর্ব্ব কহিল, বেশ ত, বলে দেখিস। সে মনে মনে বুঝিল সাহেবের প্রতি দেশী লোকের কর্ত্তব্যবুদ্ধি ইতিমধ্যেই তেওয়ারীর সুতীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। দুর্জ্জনের প্রতি আর তাহার নালিশ নাই, বরঞ্চ, কালব্যয় না করিয়া নিঃশব্দে স্থান ত্যাগই অবশ্য-কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছে। কহিল, তাই হবে, তুই খাবার যোগাড় কর।

এই যে করি বাবু, বলিয়া সে কতকটা নিশ্চিন্তচিত্তে স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিল, কিন্তু তাহারই কথার সূত্র ধরিয়া ওই ওপরওয়ালা ফিরিঙ্গিটার দুর্ব্যবহার স্মরণ করিয়া অকস্মাৎ অপূর্ব্বর সমস্ত চিত্ত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এ তো কেবল আমি এবং ওই মাতালটা শুধু নয়। সবাই মিলিয়া লাঞ্ছনা এমন নিত্যনিয়ত সহিয়া যাই বলিয়াই ত ইহাদের স্পর্দ্ধা দিনের পর দিন পুষ্ট ও পুঞ্জীভূত

হইয়া আজ এমন অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের প্রতি অন্যায়ের ধিক্কার সে উচ্চ শিখরে আর পৌঁছিতে পর্য্যন্ত পারে না। নিঃশব্দে ও নির্ব্বিচারে সহ্য করাকেই কেবল নিজেদের কর্ত্তব্য করিয়া তুলিয়াছি বলিয়া অপরের আঘাত করিবার অধিকার এমন স্বতঃই সুদৃঢ় ও উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ আমার চাকরটা পর্য্যন্ত আমাকে অবিলম্বে পলাইয়া আত্মরক্ষার উপদেশ দিতে পারিল, লজ্জা-সম্রমের প্রশ্ন পর্য্যন্ত তাহার মনে উদয় হইল না! কিন্তু সে বেচারা রান্নাঘরে বসিয়া চিঁড়া-মুড়কির ফলাহার প্রভুর জন্য সযত্নে প্রস্তুত করিতে লাগিল, জানিতেও পারিল না তাহারি পরিত্যক্ত মোটা বাঁশের লাঠিটা হাতে করিয়া অপূর্ব্ব নিঃশব্দ পদে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

দ্বিতলে সাহেবের দরজা বন্ধ ছিল, সেই রুদ্ধ দ্বারে গিয়া সে বারংবার আঘাত করিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ভীত নারীকণ্ঠে ইংরাজীতে সাড়া আসিল, কে?

অপূর্ব্ব কহিল, আমি নীচে থাকি। সেই লোকটাকে একবার চাই।

কেন?

তাকে দেখাতে চাই সে আমার কত ক্ষতি করেচে। তার ভাগ্য ভাল যে আমি ছিলাম না।

তিনি শুয়েচেন।

অপূর্ব্ব অত্যন্ত পুরুষকণ্ঠে কহিল, তুলে দিন, এ শোবার সময় নয়। রাত্রে শুলে আমি বিরক্ত করতে আসব না। কিন্তু এখন তার মুখের জবাব না নিয়ে আমি এক পা নড়ব না। এবং ইচ্ছা না করিলেও তাহার হাতের মোটা লাঠিটা কাঠের সিঁড়ির উপরে ঠকাস্ করিয়া একটা মস্ত শব্দ করিয়া বসিল।

কিন্তু দ্বারও খুলিল না কোন জবাবও আসিল না। মিনিট-দুই অপেক্ষা করিয়া অপূর্ব্ব পুনশ্চ চীৎকার করিল, আমি কিছুতেই যাব না,—বলুন তাকে বাইরে আসতে।

ভিতরে যে কথা কহিতেছিল এবার সে রুদ্ধদ্বারের একান্ত সন্নিকটে আসিয়া নম্র ও অতিশয় মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমি তাঁর মেয়ে। বাবার হয়ে আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইচি। তিনি যা কিছু করেচেন সজ্ঞানে করেননি। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আপনার যত ক্ষতি হয়েচে কাল আমরা তার যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণ কোরব।

মেয়েটির কোমল স্বরে অপূর্ব্ব নরম হইল, কিন্তু তাহার রাগ পড়িল না। কহিল, তিনি বর্ব্বরের মত আমার যথেষ্ট লোকসান এবং ততোধিক উৎপাত করেচেন। আমি বিদেশী লোক বটে, কিন্তু আশা করি কাল সকালে নিজে দেখা করে আমার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করবার চেষ্টা করবেন।

মেয়েটি কহিল, আচ্ছা। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আপনার মত আমরাও এখানে সম্পূর্ণ নূতন। মাত্র কাল বৈকালে আমরা মৌলমিন থেকে এসেচি।

অপূর্ব্ব আর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গেল। ঘরে গিয়া দেখিল তখন পর্য্যন্ত তেওয়ারী ভোজনের উদ্যোগেই ব্যাপৃত আছে, এত কাণ্ড সে টেরও পায় নাই।

দু'টি খাইয়া লইয়া অপূর্ব্ব তাহার শোবার ঘরে আসিয়া ভিজা তোষক বালিশ প্রভৃতি নীচে ফেলিয়া দিয়া রাত্রিটার মত কোনমতে একটা শয্যা পাতিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। প্রবাসের মাটিতে পা দিয়া পর্য্যন্ত তাহার ক্ষতি, বিরক্তি, ও হয়রানির অবধি নাই; কি জানি এ যাত্রা তাহার কি ভাবে কাটিবে, কোথায় গিয়া ইহার কি পরিণাম ঘটিবে,—এই স্বস্তি-শান্তিহীন উদ্বিগ্ন চিন্তার সহিত মিশিয়া আরও একটা কথা তাহার মনে হইতেছিল, ওই অপরিচিত খ্রীষ্টান মেয়েটিকে। সে সম্মুখে বাহির হয় নাই, কেমন দেখিতে, কত বয়স, কিরূপ স্বভাব কিছুই অনুমান করিতে পারে নাই—শুধু এইটুকু মাত্র জানা গিয়াছে তাহার ইংরাজী উচ্চারণ ইংরাজের মত নয়। হয়ত, মাদ্রাজী হইবে, না হয়ত গোয়ানীজ কিম্বা আর কিছু হইবে,—কিন্তু আর যাহাই হোক, সে যে আপনাকে উদ্ধত খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী রাজার জাতি মনে করিয়া তাহার পিতার মত অত্যন্ত দর্পিত নয়, সে যে তাঁহার অত্যাচারের জন্য লজ্জা অনুভব করিয়াছে,—তাহার সেই ভীত, বিনীত কণ্ঠের ক্ষমাভিক্ষা নিজের পরুষ-তীব্র অভিযোগের সহিত এখন যেন বেসুরা বাজিতে লাগিল। স্বভাবতঃ সে উগ্র প্রকৃতির নহে, কাহাকেও কঠিন কথা বলিতে তাহার বাধে, বিশেষতঃ তেওয়ারীর বর্ণনার সহিত মিলাইয়া যখন মনে হইল, হয়ত, এই মেয়েটিই তাহার মাতাল ও দুর্ব্বৃত্ত পিতাকে নিবারণ করিতে নীরবে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে, তখন তাহার অনুতাপের সহিত মনে হইতে লাগিল, আজিকার মত চুপ করিয়া গেলেই ভাল হইত। যাহা ঘটিবার তাহা ত ঘটিয়াই ছিল, ক্রোধের উপর উপরে গিয়া কথাগুলা না বলিয়া আসিলেই চলিত।

ও ঘরে তেওয়ারীর ঘষা-মাজার কর্কশ শব্দ অবিরাম শুনা যাইতেছিল, হঠাৎ সেটা থামিল। এবং পরক্ষণেই তাহার গলা শোনা গেল, কে?

অপূর্ব্ব চকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু জবাব শুনিতে পাইল না। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তেওয়ারীর প্রবল কণ্ঠস্বরই তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। সে তাহার হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিল, না না, মেমসাহেব, ও-সব তুমি নিয়ে যাও। বাবুর খাওয়া হয়ে গেছে—ও-সব আমরা ছুঁইনে।

অপূর্ব্ব উঠিয়া বসিয়া কান খাড়া করিয়া সেই খ্রীষ্টান মেয়েটির কণ্ঠস্বর চিনিতে

পারিল, কিন্তু কথা বুঝিতে পারিল না, বুঝাইয়া দিল তেওয়ারী। কহিল, কে বললে আমাদের খাওয়া হয়নি? হয়ে গেছে, ও-সব ডুনি নিয়ে যাও, বাবু শুনলে ভারি রাগ করবেন বলচি।

অপূর্ব্ব নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কি হয়েচে তেওয়ারী?

মেয়েটি চৌকাঠের এদিকে ছিল, তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল! তখন সেইমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে, আলো জ্বালা হয় নাই, সিঁড়ির দিক হইতে একটা অন্ধকার ছায়া ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মেয়েটিকে বেশ স্পষ্ট দেখা না গেলেও বুঝা গেল। তাহার রঙ ইংরাজদের মত সাদা নয়, কিন্তু খুব ফর্সা। বয়স উনিশ-কুড়ি কিম্বা কিছু বেশীও হইতে পারে, এবং একটু লম্বা বলিয়াই বোধ হয় কিছু রোগা দেখাইল। উপরের ঠোঁটের নীচে সুমুখের দাঁত দুটি একটু উঁচু মনে না হইলে মুখখানি বোধকরি ভালই। পায়ে চটি জুতা, পরণে চমৎকার একখানি মাদ্রাজী শাড়ি,—সম্ভবতঃ উৎসব বলিয়া,—কিন্তু ধরণটা কতক বাঙালী, কতক পার্শিদের মত। একটি জাপানী সাজিতে করিয়া কয়েকটি আপেল, নাসপাতি, গুটি-দুই বেদানা এবং একগোছা আঙ্গুর সুমুখে মেজের উপর রহিয়াছে।

অপূর্ব্ব কহিল, এ সব কেন?

মেয়েটি বাহির হইতে ইংরাজিতে আস্তে আস্তে জবাব দিল, আজ আমাদের পর্ব্বদিন, মা পাঠিয়ে দিলেন। তা ছাড়া, আজ ত আপনাদের খাওয়া হয়নি।

অপূর্ব্ব কহিল, আপনার মাকে ধন্যবাদ জানাবেন, কিন্তু আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে।

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের খাওয়া হয়নি তাঁকে কে বললে?

মেয়েটি লজ্জিতস্বরে কহিল, ওই নিয়েই প্রথমে ঝগড়া হয়। তা ছাড়া আমরা জানি।

অপূর্ব্ব মাথা নাড়িয়া কহিল, তাঁকে সহস্র ধন্যবাদ, কিন্তু সত্যই আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে।

মেয়েটি এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, তা বটে, কিন্তু সে ভাল হয়নি। আর এসব ত বাজারের ফল—এতে ত কোন দোষ নেই।

অপূর্ব্ব বুঝিল তাহাকে কোনমতে শান্ত করিবার জন্য অপরিচিত দুই রমণীর উদ্বেগের অবধি নাই। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে সে লাঠি ও গলার শব্দে তাহার মেজাজের যে পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, তাহাতে কাল সকালে যে কি হইবে এই ভাবিয়াই তাহাকে প্রসন্ন করিতেই ইহারা এই ভেট লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাই সদয়কণ্ঠে

কহিল, না কোন দোষ নেই। তেওয়ারীকে কহিল, বাজারের ফল, এ নিতে আর দোষ কি ঠাকুর?

তেওয়ারী ঠাকুর খুশী হইল না, কহিল, বাজারের ফল ত বাজার থেকে আনলেই চলবে। আজ রাত্রে আমাদের দরকারও নেই, আর মা আমাকে এ-সব করতে বার বার নিষেধ করেছেন। মেমসাহেব, এসব তুমি নিয়ে যাও,—আমাদের চাইনে।

মা যে নিষেধ করিয়াছেন, বা করিতে পারেন ইহাতে অসম্ভব কিছু নাই, এবং বহুদিনের পুরাতন ও বিশ্বাসী তেওয়ারী ঠাকুরকে যে এ সকল ব্যাপারে প্রবাসে তাহার অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিতেও পারেন তাহাও সম্ভব। এই সেদিন সে জননীর কাছে কি প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিল, শুধু ত কেবল মাতৃআজ্ঞা নয়, আমি সত্য দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তথাপি, ওই সঙ্কুচিত, লজ্জিত, অপরিচিত মেয়েটি—যে তাহাকে প্রসন্ন করিতে ভয়ে ভয়ে তাহার দ্বারে আসিয়াছে—তার উপহারের সামান্য দ্রব্যগুলিকে অস্পৃশ্য বলিয়া অপমান করাকেও তাহার সত্য বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু এ কথা সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না, মৌন হইয়া রহিল। তেওয়ারী বলিল, ও সব আমরা ছোঁব না মেমসাহেব, তুমি তুলে নিয়ে যাও, আমি জায়গাটা ধুয়ে ফেলি।

মেয়েটি চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হাত বাড়াইয়া ডালাটি তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

অপূর্ব্ব চাপা রুক্ষস্বরে কহিল, না হয় না-ই খেতিস, নিয়ে চুপি চুপি ফেলে দিতেও ত পারতিস্!

তেওয়ারী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, নিয়ে ফেলে দেব? মিছামিছি নষ্ট করে লাভ কি বাবু!

লাভ কি বাবু! মুখ্যু, গোঁয়ার কোথাকার! এই বলিয়া অপূর্ব্ব শুইতে চলিয়া গেল। বিছানায় শুইয়া প্রথমটা তাহার তেওয়ারীর প্রতি ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু যতই সে ব্যাপারটা তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে লাগিল ততই মনে হইতে লাগিল, এ আমি পারিতাম না, কিন্তু হয়ত এ ভালই হইয়াছে, সে স্পষ্ট করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। হঠাৎ তাহার বড় মাতুলকে মনে পড়িল। সেই সদাচারী, নিষ্ঠাবান, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ একদিন তাহাদের বাটীতে অন্নাহার করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। স্বীকার করিবার জো নাই করুণাময়ী তাহা জানিতেন, তথাপি স্বামীর সহিত ভ্রাতার মনোমালিন্য বাঁচাইতে কি একটা কৌশল অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাহাতে মৃদু হাসিয়া কহিয়াছিলেন, না দিদি, সে হতে পারে না। হালদার মহাশয় রাগী লোক, এ অপমান তিনি সইবেন না;

হয়ত বা তোমাকেও কিছু ভাগ নিতে হবে ;—কিন্তু আমার স্বর্গীয় গুরুদেব বলতেন, মুরারী, সত্য-পালনের দুঃখ আছে, তাকে আঘাতের মধ্যে দিয়ে বরঞ্চ একদিন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বঞ্চনা-প্রতারণার মিষ্ট পথ দিয়ে সে কোনদিন আনাগোনা করে না। এই ভাল, যে আমি না খেয়েই চলে গেলাম বোন।

এই লইয়া করুণাময়ীর অনেকদিন অনেক দুঃখ গিয়াছে; কিন্তু কোনদিন দাদাকে তিনি দোষ দেন নাই! সেই কথা স্মরণ করিয়া অপূর্ব্ব মনে মনে বার বার কহিতে লাগিল,—এ ভালই হয়েচে,—তেওয়ারী ঠিক কাজই করেচে।

৩

অপূর্ব্বর ইচ্ছা ছিল সকালে বাজারটা একবার ঘুরিয়া আসে। ইহার ম্লেচ্ছাচারের দুর্নাম ত সমুদ্র পার হইয়া তাহার কানে পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে; অতএব তাহাকে অস্বীকার করা চলে না,—মানিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু হিন্দুত্বের ধ্বজা বহিয়া সেই ত প্রথম কালাপানি পার হইয়া আসে নাই!—সত্যকার হিন্দু আরও ত থাকিতে পারেন যাঁহারা চাকরির প্রয়োজন ও শাস্ত্রের অনুশাসন দুয়ের মাঝামাঝি একটা পথ ইতিপূর্ব্বেই আবিষ্কার করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থের বিরোধ ভঞ্জন করতঃ সুখে বসবাস করিতেছেন। সেই সুগম পথের সন্ধান লইতে ইঁহাদের সহিত পরিচিত হওয়া অত্যাবশ্যক, এবং বিদেশে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার এত বড় সুযোগ বাজার ছাড়া আর কোথায় মিলিবে? বস্তুতঃ নিজের কানে শুনিয়া ও চোখে দেখিয়া এই জিনিসটাই তাহার স্থির করা প্রয়োজন যে, জননীর বিরুদ্ধাচারী না হইয়া এ দেশে বাস্তবিক বাস করা চলে কি না। কিন্তু বাহির হইতে পারিল না, কারণ, উপরের সাহেবটা যে কখন ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে আসিবে তাহার ঠিকানা নাই। সে যে আসিবেই তাহাতে সন্দেহ ছিল না। একে ত, উৎপাত সে সজ্ঞানে করে নাই, এবং আজ যখন তাহার নেশা ছুটিবে, তখন স্ত্রী ও কন্যা তাহাকে কিছুতেই অব্যাহতি দিবে না, তাহাদের মুখের এই অনুচ্চারিত ইঙ্গিত সে গত-কল্যই আদায় করিয়া আসিয়াছে। মেয়েটিকে আজ ঘুম ভাঙিয়া পর্য্যন্ত অনেকবার মনে পড়িয়াছে। ঘুমের মধ্যেও যেন তাহার ভদ্রতা, তাহার সৌজন্য, তাহার বিনয়নম্র কণ্ঠস্বর কানে কানে একটা জানা-সুখের রেশের মত আনাগোনা করিয়া গেছে। মাতাল পিতার দুরাচারে ওই মেয়েটিরও যেমন লজ্জার অবধি ছিল না, মূর্খ

তেওয়ারীর রূঢ়তায় অপূর্ব্ব নিজেও তেমনি লজ্জা বোধ না করিয়া পারে নাই। পরের অপরাধে অপরাধী হইয়া এই দুটি অপরিচিত মনের মাঝখানে বোধ করি এইখানেই একটি সমবেদনার সূক্ষ্ম সূত্র ছিল, যাহাকে না বলিয়া অস্বীকার করিতে অপূর্ব্বর মন সরিতে ছিল না। হঠাৎ মাথার উপরে প্রতিবেশীদের জাগিয়া উঠার সাড়া নীচে আসিয়া পৌঁছিল, এবং প্রত্যেক সবুট পদক্ষেপেই সে আশা করিতে লাগিল, এইবার সাহেব তাহার দরজায় নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইবেন। ক্ষমা সে করিবে তাহা স্থির, কিন্তু বিগত দিনের বীভৎসতা কি করিলে যে সহজ এবং সামান্য হইয়া বিবাদের দাগ মুছাইয়া দিবে ইহাই হইল তাহার চিন্তা। কিন্তু মার্জ্জনা চাহিবার সময় বহিয়া যাইতে লাগিল। উপরে ছোটখাটো পদক্ষেপের সঙ্গে মিশিয়া সাহেবের জুতার শব্দ ক্রমশঃ সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে তাহার পায়ের বহর ও দেহের ভারের পরিচয় দিল, কিন্তু দীনতার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। এইরূপে আশায় ও উদ্বেগে প্রতীক্ষা করিয়া ঘড়িতে যখন নয়টা বাজিল এবং নিজের নূতন আফিসের জন্য প্রস্তুত হইবার সময় তাহার আসন্ন হইয়া উঠিল তখন শোনা গেল সাহেব নীচে নামিতে শুরু করিয়াছেন। তাহার পিছনে আরও দুটি পায়ের শব্দ অপূর্ব কান পাতিয়া শুনিল। অনতিবিলম্বে তাহার কপাটের লোহার কড়ার ভীষণ ঝনঝনা উঠিল, এবং রান্নাঘর হইতে তেওয়ারী ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, বাবু, কালকের সাহেব ব্যাটা এসে কড়া নাড়চে। তাহার উত্তেজনা কণ্ঠস্বরে গোপন রহিল না।

অপূর্ব্ব কহিল, দোর খুলে দিয়ে তাকে আসতে বল্।

তেওয়ারী দ্বার খুলিয়া দিতেই অপূর্ব্ব অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠের ডাক শুনিতে পাইল,—এই, তুম্‌হারা সাব কিধর্?

উত্তরে তেওয়ারী কি কহিল, ভাল শুনা গেল না, খুব সম্ভব সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে সাহেবের আওয়াজ সিঁড়ির কাঠের ছাদে ধাক্কা খাইয়া যেন হুঙ্কার দিয়া উঠিল, বোলাও!

ঘরের মধ্যে অপূর্ব্ব চমকিয়া উঠিল। বাপ্‌রে! একি অনুতাপের গলা! একবার মনে করিল সাহেব সকালেই মদ খাইয়াছে, অতএব এ সময়ে যাওয়া উচিত কি-না ভাবিবার পূর্ব্বেই পুনশ্চ হুকুম আসিল, বোলাও জল্‌দি।

অপূর্ব্ব আস্তে আস্তে কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সাহেব এক মুহূর্ত্ত তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ইংরাজী জান?

জানি।

আমি ঘুমিয়ে পড়ার পরে কাল তুমি আমার উপরে গিয়েছিলে?

হাঁ।

সাহেব কহিলেন, ঠিক। লাঠি ঠুকেছিলে? অনধিকার-প্রবেশের জন্য দোর ভাঙতে চেষ্টা করেছিলে?

অপূর্ব্ব বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। সাহেব বলিলেন, দৈবাৎ ঘর খোলা থাকলে ঘরে ঢুকে তুমি আমার স্ত্রীকে কিংবা মেয়েকে আক্রমণ করতে। তাই আমি জেগে থাকতে যাওনি?

অপূর্ব্ব ধীরে ধীরে কহিল, তুমি ত ঘুমিয়েছিলে, এ-সব জানলে কি করে?

সাহেব কহিলেন, সমস্ত আমার মেয়ের কাছে শুনেচি। তাকে তুমি গালিগালাজ করে এসেচ। এই বলিয়া সে তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনী কন্যাকে অঙ্গুলি-সংকেত করিল। এ সেই মেয়েটি, কিন্তু কালও ইহাকে ভাল করিয়া অপূর্ব্ব দেখিতে পায় নাই, আজও সাহেবের বিপুলায়তনের অন্তরালে তাহার কাপড়ের পাড়টুকু ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইল না। সে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল কিনা তাহাও বুঝা গেল না, কিন্তু এটুকু বুঝা গেল ইহারা সহজ মানুষ নয়। সমস্ত ব্যাপারটাকে ইচ্ছা করিয়া বিকৃত ও উল্টা করিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব, অত্যন্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

সাহেব কহিলেন, আমি জেগে থাকলে তোমাকে লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে দিতাম, এবং একটা দাঁতও তোমার মুখে আস্ত রাখতাম না, কিন্তু সে সুযোগ যখন হারিয়েচি, তখন পুলিশের হাতে যেটুকু বিচার পাওয়া যায় সেইটুকু নিয়েই এখন সন্তুষ্ট হতে হবে। আমরা যাচ্ছি, তুমি এ জন্য প্রস্তুত থাক গে।

অপূর্ব্ব মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান হইয়া গেল।

সাহেব মেয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, এসো। এবং নামিতে নামিতে বলিলেন, কাওয়ার্ড! অরক্ষিত স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেবার চেষ্টা। আমি তোমাকে এমন শিক্ষা দেব যা তুমি জীবনে ভুলবে না।

তেওয়ারী পাশে দাড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিল, তাঁহারা অন্তর্হিত হইতেই কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, কি হবে ছোটবাবু?

অপূর্ব্ব তাচ্ছিল্যভাবে কহিল, হবে আবার কি!

কিন্তু তাহার মুখের চেহারা যে অন্য কথা কহিল, তেওয়ারী তাহা বুঝিল। কহিল, তখন ত বলেছিলুম বাবু, যা হবার হয়ে গেছে, আর ওদের ঘেঁটিয়ে কাজ নেই। ওরা হ'ল সাহেব-মেম।

অপূর্ব্ব কহিল, সাহেব-মেম তা কি?

তেওয়ারী কহিল, ওরা যে পুলিশে গেল!

অপূর্ব্ব বলিল, গেল তা কি ?

তেওয়ারী ব্যাকুল হইয়া কহিল, বড়বাবুকে একটা তার করে দিই ছোটবাবু, তিনি না হয় এসে পড়ুন।

তুই ক্ষেপলি তেওয়ারী! যা দেখ গে ওদিকে বুঝি সব পুড়ে-ঝুড়ে গেল। সাড়ে দশটায় আমাকে বেরোতে হবে। এই বলিয়া সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। তেওয়ারী রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিল, রাঁধা-বাড়ার কাজ হইতে বাবুর অফিসে যাওয়া পর্য্যন্ত যা কিছু সমস্তই তাহার কাছে একেবারে অর্থহীন হইয়া গেল। এবং যতই সে মনে মনে আপনাকে সমস্ত আপদের হেতু বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল, ততই তাহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত এদেশের ম্লেচ্ছতার উপরে, গ্রহ নক্ষত্রের মন্দ দৃষ্টির উপরে, পুরোহিতের গণনার ভ্রমের উপরে এবং সর্ব্বোপরি করুণাময়ীর অর্থলিপ্সার উপরে দোষ চাপাইয়া কোনমতে একটু সান্ত্বনা খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

এমনিধারা মন লইয়াই তাহাকে রান্নার কাজ শেষ করিতে হইল। করুণাময়ীর হাতে-গড়া মানুষ সে, অতএব মন তাহার যতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাক, হাতের কাজে কোথাও ভুলচুক হইল না। যথাসময়ে আহারে বসিয়া অপূর্ব্ব তাহাকে সাহস দিবার অভিপ্রায়ে রন্ধনের কিছু বাড়াবাড়ি প্রশংসা করিল। একদফা অন্নব্যঞ্জনের চেহারার যশোকীর্ত্তন করিল, এবং দুই এক গ্রাস মুখে পুরিয়াই কহিল, আজ রেঁধেচিস যেন অমৃত তেওয়ারী। ক'দিন খাইনি, ভেবেছিলাম বুঝি বা সব পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে ফেলবি! যে ভীতু লোক তুই—আচ্ছা মানুষটিকে মা বেছে বেছে সঙ্গে দিয়েছিলেন।

তেওয়ারী কহিল, হুঁ।

অপূর্ব্ব তাহার প্রতি চাহিয়া সহাস্যে কহিল, মুখখানা যে একেবারে তেলো হাঁড়ি করে রেখেছিস রে? এবং শুধু কেবল তেওয়ারীর নয়, নিজের মন হইতেও ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিবার চেষ্টায় কৌতুক করিয়া বলিল, হারামজাদা ফিরিঙ্গির শাসানোর ঘটাটা একবার দেখলি? পুলিশে যাচ্চেন!—আরে, যা না তাই। গিয়ে করবি কি শুনি? তোর সাক্ষী আছে?

তেওয়ারী শুধু কহিল, সাহেব-মেমদের কি সাক্ষী-সাবুদ লাগে বাবু, ওরা বললেই হয়।

অপূর্ব্ব কহিল, হাঁ বললেই হয়! আইন-কানুন যেন নেই! তাছাড়া, ওরা আবার কিসের সাহেব-মেম? রংটি তো একেবারে আমার বার্নিস করা জুতো! ব্যাটা কচি ছেলেকে যেন জুজুর ভয় দেখিয়ে গেল! নচ্ছার পাজি হারামজাদা!

তেওয়ারী চুপ করিয়া রহিল। আড়ালে গালি-গালাজ করিবার মত তেজও আর তাহার ছিল না।

অপূর্ব্ব কিছুক্ষণ নিঃশব্দে আহার করার পরে হঠাৎ মুখ তুলিয়া কহিল, আর ঐ মেয়েটা কি বজ্জাত, তেওয়ারী? কাল এলো যেন ভিজে বেড়ালটি, আর ওপরে গিয়েই যত সব মিছে কথা লাগিয়েচে! চেনা ভার!

তেওয়ারী কহিল, খিষ্টান যে!

তা বটে! অপূর্ব্বর তৎক্ষণাৎ মনে হইল, ইহাদের খাদ্যাখাদ্যের জ্ঞান নাই, এঁটো-কাঁটা মানে না, সামাজিক ভাল-মন্দের কোন বোধ নাই,—কহিল, হতভাগা, নচ্ছার ব্যাটারা। জানিস তেওয়ারী, আসল সাহেবরা এদের কি রকম ঘেন্না করে—এক টেবিলে বসে কখনো খায় না পর্য্যন্ত—যতই হ্যাটকোট পরুন, আর যতই কেননা গির্জ্জেয় আনাগোনা করুন। যারা জাত দেয়, তারা কি কখ্খনো ভাল হতে পারে তুই মনে করিস?

তেওয়ারী তাহা কোন দিনই মনে করে না, কিন্তু নিজেদের এই আসন্ন সর্ব্বনাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অপরে কে ভাল আর কে মন্দ, এ আলোচনায় তাহার প্রবৃত্তি হইল না। ছোটবাবুর আফিসে যাইবার সময় হইয়া আসিতেছে, তখন একাকী ঘরের মধ্যে যে কি করিয়া তাহার সময় কাটিবে সে জানে না। সাহেব থানায় খবর দিতে গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়া হয়ত দোর ভাঙিয়া ফেলিবে, হয়ত পুলিশের দল সঙ্গে করিয়া আনিবে,—হয়ত তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে,—কি যে হইবে, আর কি যে হইবে না সমস্ত অনিশ্চিত। এ অবস্থায় আসল ও নকল সাহেবের প্রভেদ কতখানি, একের টেবিলে অপরে খায় কি না, এবং না খাইলে অন্যপক্ষের লাঞ্ছনা ও মনস্তাপ কতদূর বৃদ্ধি পায়, এ-সকল সংবাদের প্রতি সে লেশমাত্র কৌতূহল অনুভব করিল না। আহারাদি শেষ করিয়া অপূর্ব্ব কাপড় পরিতেছিল, তেওয়ারী ঘরের পর্দ্দাটা একটুখানি সরাইয়া মুখ বাহির করিয়া কহিল, একটু দেখে গেলে হ'ত না?

কি দেখে গেলে?

ওদের ফিরে আসা পর্য্যন্ত—

অপূর্ব্ব কহিল, তা কি হয়! আজ আমার চাকরির প্রথম দিন,—কি তারা ভাববে বল্ ত?

তেওয়ারী চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব্ব কহিল, তুই দোর দিয়ে নির্ভয়ে বসে থাক্ না,—আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আসবো—দোর ত আর ভাঙতে পারবে না, কি করবে ব্যাটা!

তেওয়ারী কহিল, আচ্ছা। কিন্তু সে যে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিবার চেষ্টা করিল অপূর্ব্ব তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। বাহির হইবার সময়ে দ্বারে খিল দেবার পূর্ব্বে

তেওয়ারী গলাটা খাটো করিয়া বলিল, আজ আর হেঁটে যাবেন না ছোটবাবু, রাস্তায় একটা গাড়ি ডেকে নেবেন।

আচ্ছা, সে দেখা যাবে, এই বলিয়া অপূর্ব্ব সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। তাহার চলার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল না যে তাহার মনের মধ্যে নূতন চাকরির আনন্দ আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে।

বোথা কোম্পানির অংশীদার, পূর্ব্ব অঞ্চলের ম্যানেজার রোজেন সাহেব সম্প্রতি বর্ম্মায় ছিলেন, রেঙ্গুনের আফিস তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অপূর্ব্বকে যথেষ্ট সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার চেহারা কথাবার্ত্তা ও ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী প্রভৃতি দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। সমস্ত কর্ম্মচারীদের ডাকিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন, এবং যে মাস-দুই-তিন কাল তিনি এখানে আছেন তাহার মধ্যে ব্যবসায়ের সমস্ত রহস্য শিখাইয়া দিবেন আশা দিলেন। কথায় বার্ত্তায় আলাপে পরিচয়ে ও নূতন উৎসাহে ভিতরের গ্লানিটা তাহার এক সময়ে কাটিয়া গেল। একটি লোক তাহাকে বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট করিল, সে আফিসের এ্যাকাউণ্টেণ্ট। মারাঠি ব্রাহ্মণ, নাম রামদাস তলওয়ারকর। বয়স বোধ হয় তারই মত,—হয়ত বা কিছু বেশি। দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ,—সুপুরুষ বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না। পরণে পায়জামা ও লম্বা কোট, মাথায় পাগড়ী, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা,—ইংরাজী কথাবার্ত্তা চমৎকার শুদ্ধ, কিন্তু অপূর্ব্বর সহিত সে প্রথম হইতে হিন্দীতে কথাবার্ত্তা শুরু করিল। অপূর্ব্ব হিন্দী ভাল জানিত না, কিন্তু যখন দেখিল সে হিন্দী ছাড়া আর কিছুতেই জবাব দেয় না, তখন সেও হিন্দী বলিতে আরম্ভ করিল। অপূর্ব্ব কহিল, এ-ভাষা আমি ভাল জানিনে, অনেক ভুল হবে।

রামদাস কহিল, ভুল আমারও হয়, আমাদের কারও এটা মাতৃভাষা নয়।

অপূর্ব্ব বলিল, যদি পরের ভাষাতেই বলতে হয় ত, ইংরিজি দোষ করলে কি?

রামদাস কহিল, ইংরিজি আমার আরও ঢের বেশি ভুল হয়। একটু হাসিয়া কহিল, আপনি না হয় ইংরিজিতেই বলবেন, কিন্তু আমি হিন্দীতে জবাব দিলে আমাকে মাপ করতে হবে।

এই আলাপের মধ্যে রোজেন সাহেব নিজেই ম্যানেজারের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, হল্যাণ্ডের লোক, বেশ-ভূষার পারিপাট্য নাই; মুখে প্রচুর দাড়ি-গোঁফ, ইংরাজি উচ্চারণ ভাঙা-ভাঙা, পাকা ব্যবসায়ী—ইতিমধ্যেই বর্ম্মার নানাস্থানে ঘুরিয়া, নানা লোকের কাছে তথ্য সংগ্রহ করিয়া কাজ-কর্ম্মের একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন, সেই কাগজখানা অপূর্ব্বর টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, এ সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য একটা জানতে চাই।

তলওয়ারকরকে কহিলেন, আপনার ঘরেও এক কপি পাঠিয়ে দিয়েচি। না না, এখন থাক্—আজ ম্যানেজারের সম্মানে দু'টোর সময় আফিসের ছুটি। দেখুন, আমি ত শীঘ্রই চলে যাবো তখন আপনাদের দুজনের 'পরেই সমস্ত কাজ-কর্ম্ম নির্ভর করবে। আমি ইংলিশম্যান নই,—যদিচ, এ রাজ্য একদিন আমাদেরই হ'তে পারত, —তবুও তাদের মত আমরা ইণ্ডিয়ানদের ছোট মনে করিনে, নিজেদের সমকক্ষই ভাবি,—কেবল ফার্ম্মের নয়, আপনাদের নিজেদের উন্নতিও আপনাদের নিজেদের কর্ত্তব্য জ্ঞানের উপরে—আচ্ছা, গুড্‌ডে—আফিস দু'টার সময় বন্ধ হওয়া চাই—ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি যেমন ক্ষিপ্রপদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তেমনি ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেলেন। এবং ইহার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মোটরের শব্দ বাহিরের দ্বারের কাছে শুনিতে পাওয়া গেল।

বেলা দুইটার সময় উভয়ে একত্রে পথে বাহির হইল। তলওয়ারকর সহরে থাকে না, প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে ইন্‌সিন্ নামক স্থানে তাহার বাসা। বাসায় তাহার স্ত্রী ও একটি ছোট মেয়ে থাকে, সঙ্গে খানিকটা জমি আছে, সেখানে তরি-তরকারী অনায়াসে জন্মাইতে পারা যায়, চমৎকার খোলা জায়গা, সহরের গণ্ডগোল নাই,—যথেষ্ট ট্রেন, যাতায়াতের কোন অসুবিধা হয় না।—হালদার বাবুজী, কাল আফিসের পরে আমার ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ রইল।

অপূর্ব্ব কহিল, আমি চা খাইনে বাবুজী!

খান না? আমিও পূর্ব্বে খেতাম না, আমার স্ত্রী এখনও রাগ করেন,—আচ্ছা, না হয় ফলমূল—সরবৎ—কিংবা—আমরা ত আপনার মতই ব্রাহ্মণ—

অপূর্ব্ব হাসিয়া কহিল, ব্রাহ্মণ ত বটেই। কিন্তু আপনারা যদি আমাদের হাতে খান, তবেই আমি শুধু আপনার স্ত্রীর হাতে খেতে পারি।

রামদাস কহিল, আমি ত খেতে পারিই, কিন্তু আমার স্ত্রীর কথা—আচ্ছা সে তাঁকে জিজ্ঞেস করে বলব। আমাদের মেয়েরা বড়,—আচ্ছা, আপনার বাসা ত কাছেই, চলুন না আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার ট্রেন ত সেই পাঁচটায়।

অপূর্ব্ব প্রমাদ গনিল। এতক্ষণ সে সমস্ত ভুলিয়াছিল, বাসার কথায় চক্ষের নিমিষে তাহার সমস্ত হাঙ্গামা, সমস্ত কদর্য্যতা বিদ্যুৎ-স্ফুরণের ন্যায় চমকিয়া মুখের সরসশ্রী মুছিয়া দিয়া গেল। এখানে পা দিয়াই সে এমন একটা কদর্য্য নোঙরা ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, এ-কথা জানিতে দিতে তাহার মাথা কাটা গেল। এতক্ষণ সেখানে যে কি হইয়াছে সে কিছুই জানে না। হয়ত, কত কি হইয়াছে। একাকী তাহারই মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এমন একজন পরিচিত মানুষকে সঙ্গে পাইলে কত সুবিধা, কত সাহস। কিন্তু সদ্য পরিচয়ের এই আরম্ভ-

কালেই সে যে হঠাৎ কি ভাবিয়া বসিবে এই কথা মনে করিয়া অপূর্ব্ব একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কহিল, দেখুন, সমস্ত বিশৃঙ্খল—মুখের কথাটা সে শেষ করিতেও পারিল না। তাহার সঙ্কোচ ও লজ্জা অনুভব করিয়া রামদাস সহাস্যে কহিল, এক রাত্রে শৃঙ্খলা আমি ত আশা করিনে বাবুজী। আমাকেও একদিন নূতন বাসা পাততে হয়েছিল, তবু ত আমার স্ত্রী ছিলেন, আপনার তাও সঙ্গে নেই। আপনি লজ্জা পাচ্ছেন, কিন্তু তাঁকে না নিয়ে এলে এক বচ্ছর পরেও এই লজ্জা আপনার ঘুচবে না তা বলে রাখচি। চলুন, দেখি কি করতে পারি,—বিশৃঙ্খলার মাঝখানেই ত বন্ধুর দরকার।

অপূর্ব্ব চুপ করিয়া রহিল। সে স্বভাবতঃ রহস্যপ্রিয় লোক, তাহার স্ত্রীর একান্ত-অসদ্ভাবের কথাটা সে অন্য সময়ে কৌতুক করিয়া বলিতেও পারিত, কিন্তু এখন হাসি-তামাসার কথা তাহার মনেও আসিল না। এই নির্ব্বান্ধব দেশে আজ তাহার বন্ধুর একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু সদ্য পরিচিত এই বিদেশী বন্ধুটিকে সেই প্রয়োজনে আহ্বান করিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। তাহার কথায় সে যে ঠিক সায় দিল তাহা নহে, কিন্তু উভয়ে চলিতে চলিতে যখন তাহার বাসার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তলওয়ারকরকে গৃহে আমন্ত্রণ না করিয়া পারিল না। উপরে উঠিতে গিয়া দেখিতে পাইল সেই ক্রীশ্চান মেয়েটিও ঠিক সেই সময়ে অবতরণ করিতেছে। বাপ তাহার সঙ্গে নাই, সে একা। দুজনে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটি কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না, ধীরে ধীরে নামিয়া কিছু দূরে রাস্তায় গিয়া যখন পড়িল রামদাস জিজ্ঞাসা করিল, এঁরা তেতলায় থাকেন বুঝি?

অপূর্ব্ব কহিল, হাঁ!

আপনাদেরই বাঙালী?

অপূর্ব্ব মাথা নাড়িয়া কহিল, না, দেশীয় ক্রীশ্চান। খুব সম্ভব, মাদ্রাজী, কিম্বা গোয়ানিজ কিংবা আর কিছু—কিন্তু বাঙালী নয়।

রামদাস কহিল, কিন্তু কাপড় পরার ধরণ ত ঠিক আপনাদের মত?

অপূর্ব্ব কিছু আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, আমাদের ধরণ আপনি জানলেন কি করে?

রামদাস বলিল, আমি? বোম্বায়ে, পুনায়, সিমলায় অনেক বাঙালী মহিলাকে আমি দেখেচি, এমন সুন্দর কাপড়-পরা ভারতবর্ষের আর কোন জাতের নেই।

তা হবে,—এই বলিয়া অন্যমনস্ক অপূর্ব্ব তাহার বাসার রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। খানিক পরে ভিতর হইতে সতর্ক কণ্ঠের সাড়া আসিল, কে?

আমি যে, আমি, দোর খোল, তোর ভয় নেই, বলিয়া অপূর্ব্ব হাসিল। কারণ ইতি-মধ্যে ভয়ানক কিছু ঘটে নাই, তেওয়ারী নিরাপদে ঘরের মধ্যেই আছে অনুভব করিয়া তাহার মস্ত যেন একটা ভার নামিয়া গেল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া রামদাস এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া খুশী হইল, কহিল, আমি যা ভয় করেছিলাম তা নয়। আপনার চাকরটি ভাল, সমস্তই একপ্রকার গুছিয়ে ফেলেচে। আসবাবগুলি আমিই পছন্দ করে কিনেছিলাম। আপনার আরও কি-কি দরকার আমাকে জানালেই কিনে পাঠিয়ে দেব,—রোজেন সাহেবের হুকুম আছে।

তেওয়ারী মৃদুস্বরে কহিল, আর আসবাবে কাজ নেই বাবু, ভালয় ভালয় বেরুতে পারলে বাঁচি।

তাহার মন্তব্যে কেহ মনোযোগ করিল না, কিন্তু অপূর্ব্বর কানে গেল। সে একসময়ে আড়ালে জিজ্ঞাসা করিল, আর কিছু হয়েছিল রে?

না।

তবে যে ও-কথা বললি?

তেওয়ারী জবাব দিল, বললুম সাধে? সারা দুপুরবেলাটা সাহেব যা খোড়দৌড় করে বেড়িয়েচে তাতে মানুষ টিকতে পারে?

অপূর্ব্ব ভাবিল, ব্যাপারটা সত্যই হয়ত গুরুতর নয়, অন্ততঃ একটা ইতরের ছোটখাটো সমস্ত তুচ্ছ উপদ্রবকেই বড় করিয়া তুলিয়া অনুক্ষণ তেওয়ারীর সহিত একযোগে অশান্তির জের টানিয়া চলাও অত্যন্ত দুঃখের, তাই সে কতকটা তাচ্ছিল্যভরে কহিল, তা সে কি চলবে না তুই বলতে চাস? কাঠের ছাদে একটু বেশি শব্দ হয়ই।

তেওয়ারী রাগ করিয়া কহিল, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘোড়ার মত পা ঠোকা কি চলা?

অপূর্ব্ব বলিল, তা হলে হয়ত আবার মদ খেয়েছিল—

তেওয়ারী উত্তর দিল, তা হবে। মুখ শুঁকে তাঁর দেখিনি। এই বলিয়া সে বিরক্ত-মুখে রান্নাঘরে চলিয়া গেল, এবং বলিতে বলিতে গেল, তা সে যাই হোক, এ ঘরে বাস করা আর পোষাবে না।

তেওয়ারীর অভিযোগ অন্যায়ও নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়; দুর্জ্জনের অসমাপ্ত অত্যাচার যে একটা দিনেই সমাপ্ত হইবে এ ভরসা সে করে নাই, তথাপি অনিশ্চিত আশঙ্কায় মন তাহার অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। প্রবাসের প্রথম প্রভাতটা তাহার কুয়াসার মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছিল, মাঝে কেবল আফিসের সম্পর্কে একটুখানি আলোর আভাস দেখা দিয়াছিল, কিন্তু দিনান্তের কাছাকাছি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আবার তাহার চোখে পড়িল।

ট্রেনের সময় হইতে রামদাস বিদায় গ্রহণ করিল। কি জানি তেওয়ারীর নালিশ ও তাহার মনিবের মুখের চেহারায় সে কিছু অনুমান করিয়া ছিল কি-না, যাইবার সময় সহসা প্রশ্ন করিল, বাবুজী, এ বাসায় কি আপনার সুবিধা হচ্ছে না?

অপূর্ব্ব ঈষৎ হাসিয়া কহিল, না। এবং রামদাস জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া আছে দেখিয়া কহিল, উপরে যাঁরা আছেন আমার সঙ্গে বড় সদয় ব্যবহার করছেন না।

রামদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, ওই মহিলাটি?

হাঁ, ওর বাপ ত বটেই। এই বলিয়া অপূর্ব্ব কাল বিকালের ও আজ সকালের ঘটনা বিবৃত করিল। রামদাস কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি হলে এর ইতিহাস আর এক রকম হোতো। ক্ষমা প্রার্থনা না কোরে এই দরজা থেকে সে এক পা নীচে নামতে পারত না।

অপূর্ব্ব কহিল, ক্ষমা না চাইলে কি করতেন।

রামদাস কহিল, এই যে বললুম, নামতে দিতাম না।

অপূর্ব্ব কথাটা যে তাহার বিশ্বাস করিল তাহা নয়, তবুও সাহসের কথায় একটু সাহস পাইল। সহাস্যে কহিল, কিন্তু এখন আমরা ত নামি চলুন, আপনার গাড়ির সময় হয়ে যাচ্ছে। এই বলিয়া সে বন্ধুর হাত ধরিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আসিবার সময় যেমন, যাইবার সময়েও ঠিক তেমনি সিঁড়ির মুখেই সেই মেয়েটির সহিত দেখা হইল। হাতে তাহার ছোট একটি কাগজের মোড়ক, বোধ করি কিছু কিনিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাকে পথ দিবার জন্য অপূর্ব্ব একধারে সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু হঠাৎ হতবুদ্ধি হইয়া দেখিল, রামদাস পথ না ছাড়িয়া একেবারে সেটা সম্পূর্ণ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজি করিয়া কহিল, আমাকে এক মিনিট মাপ করতে হবে, আমি এই বাবুজির বন্ধু। এদের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য আপনাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

মেয়েটি চোখ তুলিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, ইচ্ছা হয় এ সব কথা আমার বাবাকে বলতে পারেন।

আপনার বাবা বাড়ি আছেন?

না।

তাহলে অপেক্ষা করবার আমার সময় নেই। আমার হয়ে তাঁকে বলবেন যে, তাঁর উপদ্রবে ইনি থাকতে পারচেন না।

মেয়েটি তেমনি তিক্তকণ্ঠে কহিল, তাঁর হয়ে আমিই জবাব দিচ্ছি যে ইচ্ছে করলে ইনি চলে যেতে পারেন।

রামদাস একটু হাসিল, কহিল, ভারতবর্ষীয় ক্রীশ্চান 'বুলি'দের আমি চিনি।

এর চেয়ে বড় জবাব তাদের মুখে আমি আশা করিনি। কিন্তু তাতে তাঁর সুবিধে হবে না, কারণ এঁর জায়গায় আমি আসবো। আমার নাম রামদাস তলওয়ারকর—আমি মারাঠি ব্রাহ্মণ। তলওয়ার শব্দটার একটা অর্থ আছে, আপনার বাবাকে সেটা জেনে নিতে বলবেন। গুড ইভনিং। চলুন বাবুজি,—এই বলিয়া সে অপূর্ব্বর হাত ধরিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

মেয়েটির মুখের চেহারা অপূর্ব্ব ঃ টাক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল, শেষ দিকটায় সে যে কিরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল মনে করিয়া কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সে কথা কহিতেই পারিল না, তারপর আস্তে আস্তে বলিল, এটা কি হ'ল তলওয়ারকর?

তলওয়ারকর উত্তরে কহিল, এই হ'ল যে আপনি উঠে গেলেই আমাকে আসতে হবে। শুধু খবরটা যেন পাই।

অপূর্ব্ব কহিল, অর্থাৎ দুপুরবেলা আপনার স্ত্রী এখানে একাকী থাকবেন।

রামদাস কহিল, না একাকী নয়, আমার দু'বছরের একটি মেয়ে আছে।

অর্থাৎ আপনি পরিহাস করচেন?

না, আমি সত্যি বলচি। পরিহাস করতে আমি জানিইনে।

অপূর্ব্ব তাহার সঙ্গীর মুখের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল, তারপরে ধীরে ধীরে কহিল, তাহলে এ বাসা আমার ছাড়া চলবে না। তাহার মুখের কথা শেষ না হইতেই রামদাস অকস্মাৎ তাহার দুই হাত নিজের বলিষ্ঠ দুই হাতে ধরিয়া ফেলিয়া প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিয়া উঠিল, এই আমি চাই বাবুজি, এই ত আমি চাই। অত্যাচারের ভয়ে আমরা অনেক পালিয়েচি, কিন্তু—ব্যস্!

একটা হাত সে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু একটা হাত সে শেষ পর্য্যন্ত ধরিয়াই রহিল। কেবল ট্রেন ছাড়িলে সেই হাতে আর একবার মস্ত নাড়া দিয়া নিজের দুই হাত এক করিয়া নমস্কার করিল।

সন্ধ্যা হইতে তখনও বিলম্ব ছিল, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ট্রেনেরও আর সময় ছিল না বলিয়া স্টেশনের এই দিকের প্লাটফর্ম্মে যাত্রীর ভিড় ছিল না। এইখানে অপূর্ব্ব পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই একটা দিনের ব্যবধানে জীবনটা যেন কোথা দিয়া কেমন করিয়া একেবারে বহুবৎসর দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। খেলা-ধূলা ও এমনি সব তুচ্ছ কাজের মধ্যে সে কখন যেন ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, অকস্মাৎ যেখানে ঘুম ভাঙ্গিল. সেখানে সমস্ত দুনিয়ার কর্ম্মস্রোত কেবলমাত্র কাজের বেগেই যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। বিশ্রাম নাই, বিরতি নাই, আনন্দ নাই, অবসর নাই, মানুষে মানুষে সংঘর্ষের মধ্যাহ্ন সূর্য্য দুই হাতে কেবল মুঠা মুঠা করিয়া অহরহ আগুন ছড়াইয়া চলিয়াছে।

এখানে মা নাই, দাদারা নাই, বৌদিদিরা নাই—স্নেহছায়া কোথাও কিছু নাই,—কর্ম্মশালার অসংখ্য চক্র দক্ষিণে, বামে, মাথার উপরে, পায়ের নীচে, সর্ব্বত্র অন্ধবেগে ঘুরিয়া চলিয়াছে, এতটুকু অসতর্ক হইলে রক্ষা পাইবার কোন পথ নাই,—সমস্ত একেবারে নিষ্ঠুরভাবে অবরুদ্ধ। চোখের দুই কোণ জলে ভরিয়া গেল, অদূরে একটা কাঠের বেঞ্চ ছিল, সে তাহারই উপরে বসিয়া পড়িয়া চোখ মুছিতেছে, হঠাৎ পিছন হইতে একটা প্রবল ধাক্কায় উপুড় হইয়া একেবারে মাটির উপর পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি কোনমতে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিল জন পাঁচ-ছয় ফিরিঙ্গি ছোঁড়া,—কাহারও মুখে সিগারেট, কাহারও মুখে পাইপ,—দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। সম্ভবতঃ যে ধাক্কা মারিয়াছিল সে বেঞ্চের গায়ে একটা লেখা দেখাইয়া কহিল, শালা, ইহ্ সাহেব লোকগা বাস্তে, তুম্‌হারা নেহি—

লজ্জায় ক্রোধে ও অপমানে অপূর্ব্বর সজল চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল, ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, সে প্রত্যুত্তরে কি যে বলিল, বুঝা গেল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া ফিরিঙ্গীর দল অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিল, একজন কহিল, শালা দুধবালা, আখি গরম করতা—ফাটক মে যায়গা? সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল,—একজন মুখের সামনে একটা অশ্লীল ভঙ্গী করিয়া শিস দিল।

অপূর্ব্বর হিতাহিত জ্ঞান প্রায় লোপ হইয়া আসিতেছিল, হয়ত মুহূর্ত্ত পরে সে ইহাদের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িত, কিন্তু কতকগুলি হিন্দুস্থানী কর্ম্মচারী অনতিদূরে বসিয়া বাতি পরিষ্কার করিতেছিল, তাহারা মাঝখানে পড়িয়া তাহাকে টানিয়া প্লাটফর্ম্মের বাহির করিয়া দিল, একটা ফিরিঙ্গী ছোঁড়া ছুটিয়া আসিয়া ভিড়ের মধ্যে পা গলাইয়া অপূর্ব্বর শাদা পিরাণের উপর বুটের পদচিহ্ন আঁকিয়া দিল। এই হিন্দুস্থানী দলের হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য সে টানা-টানি করিতেছিল, একজন তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বিদ্রুপ করিয়া বলিল, আরে বাঙালী বাবু, সাহেব লোক্‌কা বদন ছুয়েগা ত ইঁহা এক বরস্ জেল খাটেগা—যাও—ভাগো—একজন কহিল, আরে বাবু হ্যায়, ধাক্কা মাৎ দেও—এই বলিয়া সে তারের গেটটা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিল। বাহিরে তাহাকে ঘিরিয়া ভিড় জমিবার উপক্রম করিতেছিল, যাহারা দেখিতে পায় নাই তাহারা কারণ জিজ্ঞাসা করিল, যাহারা দেখিয়াছে তাহারা নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিল, একজন হিন্দুস্থানী চানা-ভাজা বিক্রী করে, সে কলিকাতায় থাকিয়া বাঙলা শিখিয়াছিল, সেই ভাষায় বুঝাইয়া দিল যে, এদেশে চট্টগ্রামের অনেক লোক দুধের ব্যবসা করে, তাহারা পিরাণ গায়ে দেয়, জুতা পরে,—অপূর্ব্ব আফিসের পোষাক ছাড়িয়া সাধারণ বাঙালীর পোষাকে স্টেশনে আসিয়াছিল, সুতরাং,—সাহেবরা সেই দুধবালা মনে করিয়া মারিয়াছে, কেরাণীবাবু

বলিয়া চিনিতে পারে নাই। তাহার কৈফিয়ৎ, সঙ্গ ও সহানুভূতির দায় এড়াইয়া অপূর্ব্ব স্টেশনে খোঁজ করিয়া সোজা স্টেশন মাস্টারের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তিনিও সাহেব,—কাজ করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অপূর্ব্ব জুতার দাগ দেখাইয়া ঘটনা বিবৃত করিল। তিনি বিরক্তি ও অবজ্ঞা ভরে মিনিট খানেক শুনিয়া কহিলেন, ইউরোপীয়ানদের বেঞ্চে তুমি বসিতে গেলে কেন?

অপূর্ব্ব উত্তেজনার সহিত কহিল, আমি জানতাম না—

তোমার জানা উচিত ছিল।

কিন্তু তাই বলে থামকা গায়ে হাত দেবে?

সাহেব দ্বারের দিকে হাত বাড়াইয়া কহিলেন—গো—গো—গো—চাপ্‌রাশি ইস্‌কো বহর্‌ কর্‌ দেও—বলিয়া কাজে মন দিলেন।

তাহার পরে অপূর্ব্ব কি করিয়া যে বাসায় আসিল সে ঠিক জানে না। ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে রামদাসের সহিত এই পথে একত্রে আসিবার কালে সব চেয়ে যে দুর্ভাবনা তাহার মনে বেশী বাজিতেছিল সে তাহার অকারণ মধ্যস্থতা। একে ত উৎপাত ও অশান্তির মাত্রা তাহাতে কমিবে না, বরঞ্চ বাড়িবে, তাছাড়া, সে ক্রীশ্চান মেয়েটির যত অপরাধই কেননা থাক্‌, কেবলমাত্র মেয়েমানুষ বলিয়াই ত পুরুষের মুখ হইতে ওরূপ কঠিন কথা বাহির হওয়া সঙ্গত হয় নাই,—তাহাতে আবার সে তখন একাকী ছিল। তাহার শিক্ষিত ভদ্র অন্তঃকরণ রামদাসের কথায় ক্ষুণ্ণই হইয়াছিল,—কিন্তু এখন ফিরিবার পথে তাহার সে ক্ষোভ কোথায় যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল তাহার ঠিকানা ছিল না। তাহাকে মনে যখন হইল, তখন মেয়েমানুষ বলিয়া আর মনে হইল না,—মনে হইল ক্রীশ্চানের মেয়ে, সাহেবের মেয়ে বলিয়া,—যে ছোঁড়াগুলো তাহাকে এইমাত্র অকারণ অপমানের একশেষ করিয়াছে—যাহাদের কুশিক্ষা ইতরতা ও বর্ব্বরতার অবধি নাই—তাহাদেরই ভগিনী বলিয়া—যে-সাহেবটা একান্ত অবিচারে তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল—মানুষের সামান্য অধিকারটুকুও দিল না—তাহারই পরম আত্মীয় বলিয়া।

তেওয়ারী আসিয়া কহিল, ছোটবাবু, আপনার খাবার তৈরী হয়েছে। অপূর্ব্ব কহিল, যাই—

মিনিট দশ-পনেরো পরে সে পুনরায় আসিয়া জানাইল, খাবার যে সব জুড়িয়ে গেল বাবু—

অপূর্ব্ব রাগ করিয়া বলিল, কেন বিরক্ত করিস তেওয়ারী, আমি খাব না—আমার ক্ষিদে নেই।

চোখে তাহার ঘুম আসিল না, রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, সমস্ত বিছানাটা

যেন তাহার কাছে শয্যাকণ্টক হইয়া উঠিল। একটা মর্ম্মান্তিক বেদনা তাহার সকল অঙ্গে ফুটিতে লাগিল, এবং তাহারই মাঝে মাঝে মনে পড়িতে লাগিল স্টেশনের সেই হিন্দুস্থানী লোকগুলোকে, যাহারা সদলবলে উপস্থিত থাকিয়া তাহার লাঞ্ছনার কোন অংশ লয় নাই, বরঞ্চ, তাহার অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। দেশের লোকের বিরুদ্ধে দেশের এত বড় লজ্জা, এত বড় গ্লানি জগতের আর কোন দেশে আছে? কেন এমন হইল? কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল?

৪

দুই-তিন দিন নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল, উপরতলা হইতে সাহেবের অত্যাচার আর যখন নব-রূপে প্রকাশিত হইল না, তখন অপূর্ব্ব বুঝিল ক্রীশ্চান মেয়েটা সে দিনের কথা তাহার পিতাকে জানায় নাই। এবং তাহার সেই ফল-মূল দিতে আসার ঘটনার সঙ্গে মিলাইয়া এই না-বলার ব্যাপারটা শুধু সম্ভব নয়, সত্য বলিয়াই মনে হইল। অনেক প্রকার কালো ফর্সা সাহেবের দল যায় আসে, মেয়েটির সহিতও বার দুই সিঁড়ির পথে সাক্ষাৎ হইয়াছে, সে মুখ ফিরাইয়া নামিয়া যায়, কিন্তু সেই দুঃশাসন গৃহকর্ত্তার সহিত একদিনও মুখোমুখি ঘটে নাই। কেবল, সে যে ঘরে আছে সেটা বুঝা যায় তাহার ভারি বুটের শব্দে। সেদিন সকালে ছোটবাবুকে ভাত বাড়িয়া দিয়া তেওয়ারী হাসিমুখে কহিল, সাহেব দেখছি নালিশ ফরিদ আর কিছু করলে না।

অপূর্ব্ব কহিল, না। যতটা গর্জ্জায় ততটা বর্ষায় না।

তেওয়ারী বলিল, আমাদেরও কিন্তু বেশিদিন এ বাসায় থাকা চলবে না। ব্যাটা মাতাল হলেই আবার কোন্ দিন ফ্যাসাদ বাধাবে।

অপূর্ব্ব কহিল, নাঃ—সে ভয় বড় নেই।

তেওয়ারী কহিল, তা হোক, তবু মাথার ওপরে মেলেচ্ছ ক্রীশ্চান, যা সব খায়-দায়, মনে হলেই—

আঃ তুই থাম তেওয়ারী। সে নিজে তখন খাইতেছিল, ক্রীশ্চানের খাদ্যদ্রব্যের ইঙ্গিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল। কহিল, এ মাসটা গেলে উঠে ত যেতেই হবে। কিন্তু একটা ভাল বাসাও ত খুঁজে পাওয়া চাই।

এ সময়ে ও উল্লেখ ভাল হয় নাই, তেওয়ারী মনে মনে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

সেইদিন বৈকালে আফিস হইতে ফিরিয়া অপূর্ব্ব তেওয়ারীর প্রতি চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। সে যেন এই একটা বেলার মধ্যে শুকাইয়া অর্দ্ধেক হইয়া গেছে। কিন্তু তেওয়ারী?

প্রত্যুত্তরে সে আলপিনে গাঁথা কয়েকখণ্ড ছাপানো হলদে রঙের কাগজ অপূর্ব্বর হাতে দিল। ফৌজদারী আদালতের সমন, বাদী জে ডি জোসেফ, প্রতিবাদী তিন নম্বর ঘরের অপূর্ব্ব বাঙ্গালী ও তাহার চাকর। ধারা একটা নয়, গোটা চারেক। দুপুরবেলা কোর্টের পিয়াদা জারি করিয়া গেছে, এবং কাল সকালে আর একটা জারি করিতে আসিবে। সঙ্গে সেই সাহেব ব্যাটা। হাজির হইবার দিন পরশু। অপূর্ব্ব নিঃশব্দে কাগজগুলো আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়া কহিল, তা আর হবে কি। কোর্টে হাজির হলেই হবে।

তেওয়ারী কাঁদ কাঁদ গলায় কহিল, কখনও যে কাঠগড়ায় উঠিনি বাবু।

অপূর্ব্ব বিরক্ত হইয়া বলিল, আমি কি উঠেচি না কি? সব তাতেই কাঁদবি ত বিদেশে আসতে গেলি কেন?

আমি যে কিছু জানিনে ছোটবাবু!

জানিসনে ত লাঠি নিয়ে বেরুতে গেলি কেন? ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকলেই ত হোতো! এই বলিয়া অপূর্ব্ব কাপড় ছাড়িতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। পরদিন তাহার নিজের পরওয়ানা আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহার পরদিন তেওয়ারীকে সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হইল। নালিশ মকদ্দমার কোন অভিজ্ঞতাই তাহার ছিল না, বিদেশ, কোন লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় নাই, কাহার সাহায্য লইতে হয়, কি করিয়া তদ্বির করিতে হয় কিছুই জানে না, তবুও কোন ভয়ই হইল না। হঠাৎ কি করিয়া যে তাহার মন এমন শক্ত হইয়া গেল সে নিজেই ভাবিয়া পাইল না। এ বিষয়ে রামদাসকে কোন কথা বলিতে, কোন সাহায্য চাহিতে তাহার লজ্জা বোধ হইল। শুধু কাজের অজুহাতে সাহেবের কাছে সে একটা দিনের ছুটি লইয়া আসিয়াছিল।

যথা সময়ে ডাক পড়িল। ডেপুটি কমিশনার নিজের ফাইলেই মকদ্দমা রাখিয়াছিলেন। বাদী জোসেফ সাহেব সত্য মিথ্যা যা খুশি এজাহার দিয়া গেল, প্রতিবাদীর উকিল ছিল না, অপূর্ব্ব নিজের জবাবে একটি কথাও গোপন করিল না, একটা কথাও বাড়াইয়া বলিল না। বাদীর সাক্ষী তার মেয়ে, আদালতের মাঝখানে এই মেয়েটির নাম এবং বিবরণ শুনিয়া অপূর্ব্ব স্তব্ধ হইয়া রহিল। ইনি কোন এক স্বর্গীয় রাজকুমার ভট্টাচার্য্যের কন্যা, বাটী পূর্ব্বে ছিল বরিশাল, এখন বাঙ্গালোর। নিজের নাম মেরি-ভারতী; ভট্টাচার্য্য মহাশয়, নিজেই স্বেচ্ছায় অন্ধকার হইতে

আলোকে আসেন। তাঁহার স্বর্গীয় হওয়ার পরে মা কোন এক মিশনরি তুহিতার দাসী হইয়া বাঙ্গালোরে আসেন, সেখানে জোসেফ সাহেবের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। ভারতী পৈতৃক ভট্টাচার্য্য নামটা কদর্য্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া জোসেফ নাম গ্রহণ করিয়াছে, সেই অবধি সে মিস মেরি-ভারতী জোসেফ নামে পরিচিত। হাকিমের প্রশ্নে সে ফল-মূল উপহার দিতে যাওয়া অস্বীকার করিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর হইতে মুখের চেহারায় মিথ্যা বলার বিড়ম্বনা এমনি ফুটিয়া উঠিল যে শুধু হাকিম নয়, তাঁহার পিয়াদাটার চক্ষুকে পর্য্যন্ত তাহা ফাঁকি দিতে পারিল না। কোন পক্ষেই উকিল ছিল না, সুতরাং জেরার পাঁচে পাঁচে পাক খাইয়া তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বস্তু সুবৃহৎ হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইল না। বিচার একদিনেই শেষ হইল, তেওয়ারী রেহাই পাইল, কিন্তু বিচারক অপূর্ব্বর কুড়ি টাকা অর্থদণ্ড করিলেন! জীবনের এই প্রভাতকালে রাজদ্বারে বিনা অপরাধে দণ্ডিত হইয়া তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। টাকা কয়টি গনিয়া দিয়া বাহির হইতেছে, দেখিল, দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রামদাস। অপূর্ব্বর মুখ দিয়া প্রথমেই বাহির হইয়া গেল—কুড়ি টাকা ফাইন হ'ল রামদাস, কি করা যাবে? আপিল?

আবেগ ও উত্তেজনায় তাহার কণ্ঠস্বরের শেষ দিকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। রামদাস তাহার ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আসিয়া কহিল, অর্থাৎ কুড়ি টাকার বদলে তুহাজার টাকা আপনি লোকসান করতে চান।

তা হোক—কিন্তু এ যে ফাইন! শাস্তি! রাজদণ্ড!

রামদাস হাসিয়া কহিল, কিসের দণ্ড? যে মিথ্যে মামলা আনলে, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ালে,—আর যে তাকে প্রশ্রয় দিলে তাহাদের দণ্ড ত? কিন্তু এর উপরেও একটা আদালত আছে যার বিচারক ভুল করেন না,—সেখানে আপনি বেকসুর খালাস পেয়েচেন বলে দিচ্চি।

অপূর্ব্ব বলিল, কিন্তু লোকে ত বুঝবে না রামদাস। তাদের কাছে এ তুর্নাম যে আমার চিরকালের সঙ্গী হয়ে রইল।

রামদাস সস্নেহে তাহার হাতের উপর একটা চাপ দিয়া বলিল, চলুন, আমরা নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসিগে।

পথে চলিতে চলিতে কহিল, অপূর্ব্ববাবু, আমি অফিসের কাজে আপনার ছোট হলেও বয়সে বড়। যদি তুটো কথা বলি কিছু মনে করবেন না। অপূর্ব্ব চুপ করিয়া রহিল। রামদাস বলিতে লাগিল, এ মকদ্দমার কথা আমি আগেই জানতাম, কি হবে তাতেও আমার সন্দেহ ছিল না। লোকের কথা আপনি বলছিলেন, যে

লোক, সে জানবে হালদারের সঙ্গে জোসেফের মামলা বাধলে ইংরাজের আদালতে কি হয়! আর কুড়ি টাকার জরিমানার দুর্নাম—

কিন্তু বিনা দোষে যে রামদাস?

রামদাস কহিল, হাঁ হাঁ, বিনা দোষেই বটে। এমনি বিনা দোষেই আমি দু'বৎসর জেল খেটেছি।

জেল খেটেচ? দু'বৎসর?

হাঁ, দু'বৎসর, এবং—এই, বলিয়া সে পুনশ্চ একটু হাসিয়া অপূর্ব্বর হাতখানা তাহার পিঠের নীচে টানিয়া লইয়া কহিল, এই জামাটা যদি সরাতে পারতাম ত দেখতে পেতেন এখানে বেতের দাগে দাগে আর জায়গা নেই।

বেত খেয়েচ রামদাস?

রামদাস সহাস্যে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ, এবং এমনই বিনা দোষে। তবু এত নির্লজ্জ আমি যে আজও লোকের কাছে মুখ দেখাচ্ছি। আর আপনি কুড়ি টাকার আঘাত সইতে পারবেন না বাবুজি?

অপূর্ব্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। যে ল্যাম্প পোস্ট আশ্রয় করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে আলো জ্বালিতে আসিল। সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া রামদাস চকিত হইয়া কহিল, আর না, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ি যাই।

অপূর্ব্ব আবেগের সহিত বলিল, এখনি চলে যাবে? অনেক কথা যে আমার জানবার রইল?

রামদাস হাসিমুখে কহিল, সব আজই জেনে নেবেন? সে হবে না। হয়ত অনেক দিন ধরে আমাকে বলতে হবে। এই অনেকদিন কথাটার উপর সে এমনি কি একটা জোর দিল যে অপূর্ব্ব সবিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি না চাহিয়া পারিল না। কিন্তু সেই সহাস্য প্রশান্ত মুখে কোন রহস্য প্রকাশ পাইল না। রামদাস গলির ভিতরে আর প্রবেশ করিল না, বড় রাস্তা হইতেই বিদায় লইয়া সোজা স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল।

অপূর্ব্ব তাহার বাসার দরজায় আসিয়া রুদ্ধ দ্বারে ঘা দিতেই তেওয়ারী প্রভুর সাড়া পাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল। সে পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া গৃহকর্ম্মে রত হইয়াছে, মুখ তাহার যেমন গম্ভীর তেমনি বিষণ্ণ। কহিল, তখন তাড়াতাড়িতে দু'খানা নোট ফেলে গিয়েছিলেন?

অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ফেলে গিয়েছিলাম রে?

এই যে এখানে, বলিয়া সে পা দিয়া দ্বারের কাছে মেঝের উপর একটা জায়গা

নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। কহিল, আপনার বালিশের তলায় রেখে দিয়েচি। পকেট থেকে বাইরে পড়ে যায়নি এই ভাগ্যি।

কি করিয়া যে পড়িয়া গিয়াছিল এই কথা ভাবিতে ভাবিতে অপূর্ব্ব তাহার ঘরে চলিয়া গেল।

৫

রাত্রে আহারাদির পরে তেওয়ারী করজোড়ে সাশ্রুনয়নে কহিল, আর না ছোটবাবু, এইবার বুড়োমানুষের কথাটা রাখুন। চলুন, কাল সকালেই আমরা যেখানে হোক চলে যাই।

অপূর্ব্ব কহিল, কাল সকালেই, কোথায় শুনি? তুই কি ধর্ম্মশালায় গিয়ে থাকতে বলিস নাকি?

তেওয়ারী বলিল, এর চেয়ে সেও ভাল। মকদ্দমা জিতেচে, এইবার কোনদিন ঘরে ঢুকে আমাদের দু'জনকে মেরে যাবে?

অপূর্ব্ব আর সহিতে পারিল না, রাগ করিয়া কহিল, তোকে কি আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতেই মা সঙ্গে দিয়েছিলেন? তোকে আর আমার দরকার নেই; কাল জাহাজ আছে, তুই বাড়ি চলে যা, আমার কপালে যা আছে তা হবে।

তেওয়ারী আর তর্ক করিল না, আস্তে আস্তে শুইতে চলিয়া গেল। তাহার কথাগুলা অপূর্ব্বকে অপমানের একশেষ করিল বলিয়াই সে এরূপ কঠোর জবাব দিল, না হইলে সে যে বিশেষ অসঙ্গত কিছু কহে নাই অপূর্ব্ব মনে মনে তাহা অস্বীকার করিতে পারিল না। যাহা হোক পরদিন সকাল হইতে একটা নূতন বাসার খোঁজ চলিতে লাগিল এবং শুধু তলওয়ারকর ছাড়া আফিসের প্রায় সকলকেই সে এই মর্ম্মে অনুরোধ করিয়া রাখিল। অতঃপর তেওয়ারীও অনুযোগ করিল না, অপূর্ব্বও মনের কথা প্রকাশ করিল না, কিন্তু প্রভু ও ভৃত্য উভয়েরই এক প্রকার সশঙ্কিত ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। আফিস হইতে ফিরিবার পথে অপূর্ব্ব প্রত্যহই ভয় করিত, আজ না জানি কি গিয়া শুনিতে হয়! কিন্তু কোনদিন কিছুই শুনিতে হইল না। মকদ্দমাবিজয়ী জোসেফ পরিবারের নানাবিধ ও বিচিত্র উপদ্রব নব নব রূপে নিত্য প্রকাশ পাইবে ইহাই স্বাভাবিক, কিন্তু উৎপাত ত দূরের কথা, উপরে কেহ আছে কি-না অনেক সময় তাহাই সন্দেহ হইতে লাগিল। কিন্তু

এ সম্বন্ধে কেহই কাহাকে কোন কথা কহিত না। নিরুপদ্রবেই দিন কাটিতেছিল—এই ভাল। সপ্তাহখানেক পরে একদিন অফিস হইতে ফিরিবার পরে তেওয়ারী প্রফুল্লমুখে মনের আনন্দ যথাসাধ্য সংযত করিয়া কহিল, আর শুনেচেন ছোটবাবু?

অপূর্ব্ব কহিল, কি?

সাহেব যে ঠ্যাঙ-ভেঙে একেবারে হাসপাতালে। বাঁচে কি না বাঁচে! আজ ছ'দিন হ'ল—ঠিক তার পরের দিনই!

অপূর্ব্ব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,- তুই কি করে জানলি?

তেওয়ারী বলিল, বাড়িয়ালার সরকার আমাদের জেলার লোক কিনা, তার সঙ্গে আজ পরিচয় হ'ল। ভাড়া আদায় করতে এসেছিল। কে বা ভাড়া দেবে,—মদ খেয়ে মারামারি করে জেটি থেকে নীচে পড়ে সাহেব ত গিয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছেন।

তা হবে, বলিয়া অপূর্ব্ব কাপড় ছাড়িতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কলিকাতা ত্যাগ করার পরে এই প্রথম তেওয়ারীর মন সত্যকার প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার একান্ত অভিলাষ ছিল এই লইয়া সে আজ বেশ একটুখানি আলোচনা করে, কিন্তু মনিব তাহাতে উৎসাহ দিলেন না। নাই দিন, তবুও সে বাহির হইতে নানা উপায়ে শুনাইয়া দিল যে এরূপ একদিন ঘটিবেই তাহা সে জানিত। তেওয়ারী সন্ধ্যা-আহ্নিক শিখিতে পারে নাই, কিন্তু গায়ত্রীটা তাহার মুখস্থ হইয়াছিল, সেই গায়ত্রী সে জরিমানার দিন হইতে সকাল-সন্ধ্যা একশত আট করিয়া দুইশত ষোল বার প্রত্যহ জপ করিয়াছে। সাহেবের পা ভাঙার যথার্থ হেতু কি, ছেলেমানুষ মনিব তাহা অনুধাবন করিল কি-না সন্দেহ, কিন্তু এই মন্ত্রের অসাধারণ শক্তির প্রতি তেওয়ারীর বিশ্বাস সহস্রগুণে বাড়িয়া গেল। ম্লেচ্ছ হইয়া ব্রাহ্মণের মাথার উপরে যে ঘোড়ার মত পা ঠুকিয়াছে পা তাহার ভাঙ্গিবে না ত কি!

পরদিন সকালে তাহার আফিসের আরদালির কাছে খবর পাইয়া অপূর্ব্ব তেওয়ারীকে ডাকিয়া কহিল, একটা বাসার সন্ধান পাওয়া গেছে তেওয়ারী, গিয়ে দেখে আয় দেখি পোষাবে কি না।

তেওয়ারী একটু হাসিয়া কহিল, আর বোধ হয় দরকার হবে না বাবু, সে-সব আমি ঠিক করে নিয়েচি। আসচে পয়লা তারিখে যারা যাবার তারাই যাবে। বাসা বদলানো ত সোজা ঝঞ্ঝাট নয় ছোটবাবু!

ঝঞ্ঝাট যে সোজা নয় অপূর্ব্ব নিজেও তাহা জানিত, সাহেবের অবর্ত্তমানে উৎপাত বন্ধ হইয়াছে, তাঁহার প্রত্যাগমনের পরেও যে তাহা বজায় থাকিবে এ ভরসা তাহার ছিল না। বাসা তাহাকে বদল করিতেই হইবে, কিন্তু আফিস যাইবার

পূর্ব্বে তেওয়ারী যখন ছুটি চাহিয়া জানাইল যে আজ দুপুরবেলা সে বর্ম্মাদের ফয়ার মন্দিরে তামাসা দেখিতে যাইবে, তখন অপূর্ব্ব না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, তোর যে আবার তামাসা দেখতে সখ হল তেওয়ারী?

তেওয়ারী কহিল, বিদেশের যা কিছু সব দেখা ভাল ছোটবাবু।

অপূর্ব্ব বলিল, তা বটে। খোঁড়া সাহেব হাসপাতালে, এখন আর রাস্তায় বেরোতে ভয় নাই। তা যাস, কিন্তু একটু সকাল সকাল ফিরে আসিস। কেউ সঙ্গে থাকবে ত?

তাহার স্বদেশবাসী যে লোকটির সহিত কাল তেওয়ারীর আলাপ হইয়াছে সেই আসিয়া আজ তাহাকে তামাসা দেখাইয়া আনিবে স্থির হইয়াছিল। সাহেবের দুর্ঘটনার সংবাদে সে এতই খুশী হইয়াছিল যে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে তাহার মুহূর্ত্ত বিলম্ব ঘটে নাই।

তাহাকে বাহিরে যাইবার হুকুম দিয়া অপূর্ব্ব যথাসময়ে আফিস চলিয়া গেল, এবং ইহার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তেওয়ারীর দেশের লোক আসিয়া তাহাকে বর্ম্মা তামাসা দেখাইয়া আনিতে সঙ্গে লইয়া গেল। তালার একটা চাবি অপূর্ব্বর নিজের কাছেই থাকিত, সুতরাং ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব ঘটিলেও ছোটবাবুর যে বিশেষ অসুবিধা হইবে না তেওয়ারীর তাহা জানা ছিল। নিষ্কণ্টক হইয়া আজ আর তাহার স্ফূর্ত্তির অবধি ছিল না।

অপরাহ্ণ বেলায় ঘরে ফিরিয়া অপূর্ব্ব দেখিল দরজায় তালা বন্ধ, তেওয়ারী তখন পর্য্যন্ত তামাসা দেখিয়া ফিরে নাই। পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া খুলিতে গিয়া দেখিল চাবি লাগে না, এ কোন্ এক অপরিচিত তালা, এ ত তাহাদের নয়! তেওয়ারী এ কোথায় পাইল, কেনই বা সে তাহাদের পুরাতন ভাল তালার বদলে এই একটা নূতন তালা দিতে গেল, ইহার চাবিই বা কোথায়, কেমন করিয়াই বা সে ঘরে ঢুকিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। বোধ হয় মিনিট দুই সে এই ভাবে দাঁড়াইয়া, ত্রিতলের দ্বার খুলিয়া সেই ক্রীশ্চান মেয়েটি মুখ বাহির করিয়া কহিল, দাঁড়ান, আমি খুলে দিচ্চি, এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া আসিয়া অসঙ্কোচে অপূর্ব্বর পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে সে বিস্ময়ে ও লজ্জায় যেন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তেওয়ারী নাই, কি তার হইল, এবং কি জন্য কেমন করিয়া ঘরের চাবি সাহেবের মেয়ের হাতে গিয়া পড়িল তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। স্বল্প আলোকিত এই সংকীর্ণ সিঁড়িটায় দুইজনের দাঁড়াইবার মত যথেষ্ট স্থান ছিল না, অপূর্ব্ব এক ধাপ নীচে নামিয়া আর এক দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। অনাত্মীয় যুবতী রমণীর সহিত নির্জ্জনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কথা কহা তাহার অভ্যাসই ছিল না, তাই মেয়েটি যখন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, মা বলছিলেন চাবি বন্ধ করে আমি ভাল কাজ

করিনি, হয়ত বিপদে পড়তেও পারি, তখন অপূর্ব্বর মুখ দিয়া সহসা কোন উত্তরই বাহির হইল না। ভারতী কপাট খুলিয়া ফেলিয়া কহিল, আমার মা ভয়ানক ভীতু মানুষ, তিনি আমাকে তখন থেকে বক্‌চেন যে আপনি বিশ্বাস না করলে আমাকেই চুরির দায়ে জেল খাটতে হবে। আমার কিন্তু সে ভয় একটুও নেই।

অপূর্ব্ব বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে?

ভারতী কহিল, ঘরে গিয়ে দেখুন না কি হয়েচে। এই বলিয়া সে পথ ছাড়িয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। অপূর্ব্ব ঘরে ঢুকিয়া যাহা দেখিল তাহাতে দুই চক্ষু তাহার কপালে উঠিল। তোরঙ্গ দুটার ডালা ভাঙ্গা, বই, কাগজ, বিছানা, বালিশ, কাপড়-চোপড় সমস্ত মেঝের উপর ছড়ান, তাহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল, কি কোরে এমন হ'ল? কে করলে?

ভারতী একটু হাসিয়া কহিল, আর যেই করুক কিন্তু আমি নয়, তা শক্র হলেও আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। এই বলিয়া সে ঘটনাটা যাহা বিবৃত করিল তাহা এই—দুপুরবেলা তাহার সদ্য পরিচিত দেশওয়ালী বন্ধুর সহিত তেওয়ারী যখন তামাশা দেখিতে বাহির হইয়া যায়, ভারতীর মা বারান্দায় বসিয়া তাহাদের দেখিতে পান। অল্পক্ষণ পরেই নীচের ঘর হইতে একপ্রকার সন্দেহজনক শব্দ শুনিতে পাইয়া ভারতীকে দেখিতে বলেন। তাহাদের মেঝের একধারে একটা ফুটো আছে, চোখ পাতিয়া দেখিলে অপূর্ব্বর ঘরের সমস্তই দেখা যায়। সেই ফুটা দিয়া দেখিয়াই সে চিৎকার করিতে থাকে। যাহারা বাক্স ভাঙ্গিতেছিল তাহারা সবেগে পলায়ন করে, তখন নীচে নামিয়া সে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া পাহারা দিতে থাকে পুনরায় না তাহারা ফিরিয়া আসে। এখন অপূর্ব্বকে দেখিতে পাইয়া সে ঘর খুলিয়া দিতে আসিয়াছে!

বিবর্ণ, পাংশুমুখে অপূর্ব্ব তাহার খাটের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। ভারতী দরজা হইতে মুখ বাড়াইয়া কহিল, এঘরে আপনার কোন খাবার জিনিস আছে কি? আমি ঘরে এসে একবার দেখতে পারি?

অপূর্ব্ব ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, আসুন।

সে ঘরে আসিলে তাহার মুখপানে চাহিয়া অপূর্ব্ব বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করিল, এখন কি করা যায়?

ভারতী কহিল, করা ত অনেক কিছু যায়, কিন্তু সকলের আগে দেখতে হবে কি কি চুরি গেছে।

অপূর্ব্ব বলিল, বেশ ত তাই দেখুন না কি কি চুরি গেল।

ভারতী হাসিয়া কহিল, আসবার সময় আপনার তোরঙ্গ গুছিয়েও আমি দিইনি, চুরিও করিনি,—সুতরাং কি ছিল আর কি নেই আমি জানাব কি করে?

অপূর্ব্ব লজ্জা পাইয়া কহিল, সে তো ঠিক কথা। তাহলে তেওয়ারী আসুক, সে হয় ত সমস্ত জানে। এই বলিয়া সে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলোর প্রতি করুণচক্ষে চাহিল।

তাহার নিরুপায়ের মত মুখের চেহারায় ভারতী আমোদ বোধ করিল। হাসিমুখে কহিল, সে জানতে পারে আর আপনি পারেন না? আচ্ছা, কি করে জানতে হয় আপনাকে আমি শিখিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া সুমুখের ভাঙ্গা তোরঙ্গটা হাতের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, আচ্ছা, জামা-কাপড়গুলো আগে সব গুছিয়ে তুলি। এসব নিয়ে যাবার বোধ হয় তারা সময় পায়নি। এই বলিয়া সে এলোমেলো ধুতি, চাদর, পিরাণ, কোট প্রভৃতি একটির পরে একটি ভাঁজ করিয়া সাজাইয়া তুলিতে লাগিল। তাহার শিক্ষিত হস্তের নিপুণতা কয়েক মুহূর্ত্তেই অপূর্ব্বর চোখে পড়িল। এটা কি? মুর্শিদাবাদ সিল্কের সুট বুঝি? এরকম ক' জোড়া আছে বলুন ত?

অপূর্ব্ব কহিল, দুজোড়া।

ঠিক মিলেচে। এই এখানে আর এক জোড়া, এই বলিয়া সে সুট দুটি সাজাইয়া বাক্সে তুলিল। ঢাকাই ধুতি—একটা, দুটো, তিনটে;—চাদর—এক, দুই, তিন,—ঠিক মিলেচে। বোধ হয় তিন জোড়াই ছিল, না?

অপূর্ব্ব কহিল, হাঁ, আমার মনে আছে, তিন জোড়াই বটে।

এটা কি আলপাকার কোট? কই ওয়েস্ট-কোট, প্যাণ্ট দেখচি না যে? ও—না, এ যে গলা-বন্ধ দেখচি। এর সুট ছিল না, না?

অপূর্ব্ব বলিল, না, ওটা আলাদাই বটে। ওর সুট ছিল না।

তাহাদের গুছাইয়া তুলিয়া ভারতী আর একটা হাতে তুলিয়া কহিল, এটা দেখচি ফ্লানেল সুট,—আপনি সেখানে টেনিস খেলতেন বুঝি? তাহলে একটা, দুটো, তিনটে, ওই আলনায় একটা, আপনার গায়ে একটা,—সুট তাহলে পাঁচ জোড়া না?

অপূর্ব্ব খুশী হইয়া কহিল, ঠিক তাই। পাঁচ জোড়াই বটে।

কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে উজ্জ্বল কি একটা পদার্থ চোখে পড়িতে টানিয়া বাহির করিয়া কহিল, এ যে সোনার চেন, ঘড়ি গেল কোথায়?

অপূর্ব্ব খুশী হইয়া কহিল, বাঁচা গেছে—চেনটা তারা দেখতে পায়নি। এটি আমার পিতৃদত্ত, তাঁরই স্মৃতিচিহ্ন—

কিন্তু ঘড়িটা?

এই যে, বলিয়া অপূর্ব্ব তাহার কোটের পকেট হইতে সোনার ঘড়ি বাহির করিয়া দেখাইল।

ভারতী কহিল, চেন, ঘড়ি পাওয়া গেল, বলুন ত আঙটি আপনার কটা? হাতে একটিও নেই দেখচি।

অপূর্ব্ব বলিল, হাতে নেই, বাক্সেও ছিল না। আঙটিই আমার কখনো হয়নি।

তা ভাল। সোনার বোতাম? সে বোধ হয় আপনার গায়ে সার্টে লাগানো আছে?

অপূর্ব্ব ব্যস্ত হইয়া বলিল, কই না। সে যে একটা গরদের পাঞ্জাবির সঙ্গে তোরঙ্গের মধ্যে সুমুখেই ছিল।

ভারতী আলনার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিল, যে-সকল বস্ত্র তখনও তোলা হয় নাই একপাশে ছিল, তাহার মধ্যে অনুসন্ধান করিল, তার পরে একটু হাঁসিয়া কহিল, জামাসুদ্ধ এটা গেছে দেখচি। অন্য বোতাম ছিল না ত?

অপূর্ব্ব মাথা নাড়াইয়া জানাইল, ছিল না। ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, ট্রাঙ্কে টাকা ছিল ত? অপূর্ব্ব 'ছিল' বলিয়া সায় দিলে ভারতী উদ্বিগ্নমুখে কহিল, তাহলে তাও গেছে। কত ছিল জানেন না? তা আমি আগেই বুঝেচি। আপনার মনিব্যাগ আছে জানি। বার করে আমাকে দিন ত দেখি—

অপূর্ব্ব পকেট হইতে তাহার ছোট চামড়ার থলেটি বাহির করিয়া ভারতীর হাত দিতে সে মেঝের উপর ঢালিয়া ফেলিয়া সমস্ত গণনা করিয়া বলিল, দু'শ পঞ্চাশ টাকা আট আনা। বাড়ি থেকে কত টাকা নিয়ে বার হয়েছিলেন মনে আছে?

অপূর্ব্ব কহিল, আছে বৈ কি। ছ'শ টাকা।

ভারতী টেবিলের উপর হইতে এক টুকরা কাগজ ও পেন্সিল লইয়া লিখিতে লাগিল, জাহাজ ভাড়া, ঘোড়ারগাড়ি ভাড়া, কুলিভাড়া,—পৌঁছে বাড়িতে টেলিগ্রাম করেছিলেন ত? আচ্ছা তারও এক টাকা, তারপরে এই দশ দিনের খরচ—

অপূর্ব্ব বাধা দিয়া কহিল, সে ত তেওয়ারীকে জিজ্ঞাসা না করলে জানা যাবে না।

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা যাবে, দু'এক টাকার তফাৎ হতে পারে, বেশি হবে না। যে ফুটা দিয়া আজ সে চুরি করা দেখিয়াছিল, সেই পথে চোখ পাতিয়া সে যে এই ঘরের যাবতীয় ব্যাপার নিরীক্ষণ করিত, তেওয়ারীর বাজার করা হইতে আরম্ভ করিয়া খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যাইত না, এ কথা বলিল না, কাগজে ইচ্ছামত একটা অঙ্ক লিখিয়া সহসা মুখ তুলিয়া কহিল, এ ছাড়া আর বাজে খরচ নেই ত?

না।

ভারতী কাগজের উপর হিসাব করিয়া কহিল, তাহলে দু'শ আশি টাকা চুরি গেছে।

অপূর্ব্ব চমকিয়া কহিল, এত টাকা? রোস রোস, আরো কুড়ি টাকা বাদ দাও,—জরিমানার টাকাটা ধরা হয়নি।

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না সে তো অন্যায়, মিথ্যে জরিমানা, এ টাকা আমি বাদ দেব না।

অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কি বিপদ! জরিমানা করাটা মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু আমার টাকা দেওয়াটা ত মিথ্যে নয়।

ভারতী কহিল, দিলেন কেন? ও টাকা আমি বাদ দেব না। দু'শ আশি টাকা চুরি গেছে।

অপূর্ব্ব বলিল, না দু'শ ষাট টাকা।

ভারতী বলিল, না, দু'শ আশি টাকা।

অপূর্ব্ব আর তর্ক করিল না। এই মেয়েটির প্রখর বুদ্ধি ও সকল দিকে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল; অথচ, এই সোজা বিষয়টা না বুঝিবার দিকে তাহার জিদ দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। বিচারের ন্যায় অন্যায় যাহাই হৌক, টাকা ব্যয় হইলে সে যে আর হাতে থাকে না এ কথা যে বুঝিতে চাহে না তাহাকে সে আর কি বলিবে?

ভারতী অবশিষ্ট কাপড়গুলি গোছ করিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, পুলিশে খবর দেওয়া কি আপনি উচিত মনে করেন?

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, তা বটে। উচিত শুধু এই দিক থেকে হতে পারে যে তাতে আমার টানাটানির আর অন্ত থাকবে না। নইলে, তারা এসে আপনার টাকার কিনারা করে দিয়ে যাবে এ আশা বোধ হয় করেন না?

অপূর্ব্ব চুপ করিয়া রহিল। ভারতী বলিল, ক্ষতি যা হবার হয়েচে, এর পরে আবার তারা এলে অপমান শুরু হবে।

কিন্তু আইন আছে—

অপূর্ব্বর কথা শেষ হইল না, ভারতী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল; বলিল, আইন থাকে থাক; এ আপনাকে আমি কিছুতে করতে দিতে পারবো না। আইন সেদিনও ছিল আপনি যেদিন জরিমানা দিয়ে এসেছিলেন। এর মধ্যেই তা ভুলে গেছেন?

অপূর্ব্ব কহিল, লোকে যদি মিথ্যে বলে, মিথ্যে মামলা সাজায়, সে কি আইনের দোষ?

ভারতীর মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে কিছুমাত্র লজ্জা পাইল। বলিল, লোকে মিথ্যে বলবে না, মিথ্যে মামলা সাজাবে না, তবেই আইন নির্দ্দোষ হয়ে উঠবে, এই আপনার মত না কি? এ হলে ত ভালই হয়, কিন্তু সংসারে তা হয় না এবং হবার বোধ করি বিস্তর বিলম্ব আছে। এই বলিয়া সে একটু হাসিল, কিন্তু অপূর্ব্ব চুপ করিয়া রহিল, তর্কে যোগ দিল না। সেই প্রথম দিনে এই মেয়েটির কণ্ঠস্বরে,

তাহার সুমিষ্ট সলজ্জ ব্যবহারে, বিশেষ করিয়া তাহার সেই সকরুণ সহানুভূতিতে অপূর্ব্বর মনের মধ্যে যে একটুখানি মোহের মত জন্মিয়াছিল, তাহার পরবর্ত্তী আচরণে সে ভাব আর তাহার ছিল না। ভারতীর এই চুরি গোপন করিবার আগ্রহ এখন হঠাৎ কেমন তাহার ভারি খারাপ লাগিল। এই সকল অযাচিত সাহায্যকেও আর যেন সে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিল না এবং কি একপ্রকার অজানা শঠতার সংশয়ে সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার দেখিতে দেখিতে কালো হইয়া উঠিল। সে দিনের সেই সভয়ে, সঙ্কোচে, গোপনে ফল-মূল দিতে আসা, পরক্ষণেই আবার ঘরে গিয়া সমস্ত ঘটনা বিকৃত করিয়া মিথ্যা করিয়া বলা, তারপরে সেই আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া,—নিমিষে সমস্ত ইতিহাস মনের মধ্যে তড়িত রেখায় খেলিয়া গিয়া মুখ তাহার গম্ভীর ও কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। এ সমস্তই অভিনয়, সমস্তই ছলনা! তাহার মুখের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন ভারতী লক্ষ্য করিল, কিন্তু কারণ বুঝিতে পারিল না, বলিল, আমার কথার জবাব দিলেন না যে বড় ?

অপূর্ব্ব কহিল, এর আর জবাব কি ? চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না,—পুলিশে একটা খবর দিতেই হবে।

ভারতী ভয় পাইয়া কহিল, সে কি কথা! চোরও ধরা পড়বে না, টাকাও আদায় হবে না ; মাঝে থেকে আমাকে নিয়ে যে টানাটানি করবে। আমি দেখেচি, তালাবন্ধ করেচি, সমস্ত গুছিয়ে তুলে রেখেচি,—আমি যে বিপদে পড়ে যাবো।

অপূর্ব্ব কহিল, যা ঘটেচে তাই বলবেন।

ভারতী ব্যাকুল হইয়া জবাব দিল, বললে কি হবে ? এই সেদিন আপনার সঙ্গে তুমুল কাণ্ড হয়ে গেল, মুখ দেখা-দেখি নেই, কথাবার্ত্তা বন্ধ, হঠাৎ আপনার জন্যে আমার এত মাথাব্যথা পুলিশ বিশ্বাস করবে কেন ?

অপূর্ব্বর মন সন্দেহে অধিকতর কঠোর হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার আগা-গোড়া মিছে কথা তারা বিশ্বাস করতে পারলে আর সত্য কথা পারবে না ? টাকা সামান্যই গেছে, কিন্তু চোরকে আমি শাস্তি না দিয়ে ছাড়ব না।

তাহার মুখের পানে ভারতী হতবুদ্ধির ন্যায় চাহিয়া রহিল ; কহিল, আপনি বলেন কি অপূর্ব্ববাবু ? বাবা ভাল লোক নন, তিনি অকারণে আপনার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করেচেন, আমি যে সাহায্য করেচি তাও আমি জানি, কিন্তু তাই বলে ঘর ভেঙে বাক্স ভেঙে আপনার টাকা চুরি করবো আমি ? একথা আপনি ভাবতে পারলেন, কিন্তু আমি ত পারিনি। এ দুর্নাম রটলে আমি বাঁচব কি করে! বলিতে বলিতে তাহার ওষ্ঠাধর ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং দাঁত দিয়া জোর করিয়া ঠোঁট চাপিতে চাপিতে সে যেন ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল।

৬

পরদিন সকালে কি ভাবিয়া যে অপূর্ব্ব পুলিশ-থানার দিকে পা বাড়াইয়া দিল তাহা বলা শক্ত। চুরির ব্যাপার পুলিশের গোচর করিয়া যে কোন ফল নাই তাহা সে জানিত। টাকা আদায় হইবে না, সম্ভবতঃ চোর ধরা পড়িবে না,—এ বিশ্বাসটুকু পুলিশের উপরে তাহার ছিল। কিন্তু ওই ক্রীশ্চান ম্লেচ্ছ মেয়েটার প্রতি তাহার ক্রোধ ও বিদ্বেষের আর সীমা ছিল না। ভারতী নিজে চুরি করিয়াছে, কিংবা চুরিতে সাহায্য করিয়াছে এ বিষয়ে তেওয়ারীর মত নিঃসংশয় হইতে সে এখনও পারে নাই, কিন্তু তাহার শঠতা ও ছলনা তাহাকে একেবারে ক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল। জোসেফ সাহেবকে আর যে-কোন দোষই দেওয়া যাক, আপনাকে সুস্পষ্ট করিবার পক্ষে শুরু হইতে কোন ত্রুটি তাঁহার ঘটিয়াছে এ অপবাদ দেওয়া চলে না। তাঁহার শয়তানী নিরতিশয় ব্যক্ত, তাঁহার চাবুকের আস্ফালন দ্বিধাহীন, জড়িমাবর্জ্জিত, প্রতিবেশীর প্রতি তাঁহার মনোভাবে কোথাও কোন হেঁয়ালী নাই, তাঁহার কণ্ঠ নিঃসঙ্কোচ, বক্তব্য সরল ও প্রাঞ্জল, তাঁহার মদমত্ত পদক্ষেপ অনুভব করিতে কান খাড়া করিয়া রাখিতে হয় না,—এক কথায়, তাঁহাকে বুঝা যায়। কিন্তু এই মেয়েটির কথার ও কাজের যেন কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া মিলে না। ক্ষতি সে যত করিয়াছে সেজন্যও তত নয়, কিন্তু গোড়া হইতে তাহার বিচিত্র আচরণ যেন অনুক্ষণ কেবল অপূর্ব্বর বুদ্ধিকেই উপহাস করিয়া আসিয়াছে। রাগের মাথায় থানায় ঢুকিয়া শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কাহিনী পুলিশের কাছে বিবৃত করিতে পারিত কি না সন্দেহ, কিন্তু ততদূর গড়াইল না। পিছন হইতে ডাক শুনিল, এ কি অপূর্ব্ব নাকি? এখানে!

অপূর্ব্ব ফিরিয়া দেখিল, সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পোষাকে দাঁড়াইয়া তাহাদের পরিচিত নিমাইবাবু। ইনি বাঙলা দেশের একজন বড় পুলিশ কর্ম্মচারী। অপূর্ব্বর পিতা ইহার চাকরি করিয়া দেন, তিনিই ছিলেন ইহার মুরুব্বি। নিমাইবাবু তাঁহাকে দাদা বলিতেন এবং সেই সূত্রে অপূর্ব্বরা সকলেই ইহাকে নিমাইকাকা বলিয়া ডাকিত। স্বদেশী যুগে অপূর্ব্ব যে ধরা পড়িয়া শাস্তি ভোগ করে নাই, সে অনেকটা ইহার প্রসাদে। পথের মধ্যেই অপূর্ব্ব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের চাকরির সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি যে এদেশে?

নিমাইবাবু আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, বাবা, কাঁচা ছেলে তুমি, তোমাকে এতটা দূরে ঘর-দোর মা-বোন্ ছেড়ে আসতে হয়েচে আর আমাকে হ'তে পারে না? পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন, আমার সময় নেই, কিন্তু

তোমার ত আফিসে যাবার এখনও ঢের দেরি আছে। চল না বাবা, পথে যেতে যেতে দুটো কথা শুনি। কতকাল যে তোমাদের খবর নিতে পারিনি তার ঠিক নেই। মা ভাল আছেন? দাদারা?

সকলেই ভাল আছেন জানাইয়া অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কোথায় যাবেন?

জাহাজ ঘাটে। চল না আমার সঙ্গে।

চলুন। আপনাকে কি আর কোথাও যেতে হবে?

নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, হতেও পারে। যে মহাপুরুষকে সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে যাবার জন্যে দেশ ছেড়ে এতোদূরে আসতে হয়েচে; তাঁর মর্জ্জির উপরেই এখন সমস্ত নির্ভর করচে। তাঁর ফটোগ্রাফও আছে, বিবরণও দেওয়া আছে, কিন্তু এখানের পুলিসের বাবার সাধ্য নেই যে তাঁর গায়ে হাত দেয়। আমিই পারব কি না তাই ভাবচি।

অপূর্ব্ব মহাপুরুষের ইঙ্গিত বুঝিল। কৌতূহলী হইয়া কহিল, মহাপুরুষটি কে কাকাবাবু? যখন আপনি এসেচেন, তখন বাঙালী সন্দেহ নেই,—খুনী আসামী, না?

নিমাইবাবু কহিলেন, ঐটি বলতে পারব না বাবা। তিনি যে কি, এবং কি নয় একথা কেউ ঠিক জানে না! এঁর বিরুদ্ধে নির্দ্দিষ্ট কোন চার্জ্জও নেই, অথচ যে চার্জ্জ আছে তা আমাদের পিনাল কোডের কোহিনুর। এঁকে চোখে চোখে রাখতে এত বড় গভর্ণমেণ্ট যেন হিমসিম খেয়ে গেল।

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, পোলিটিক্যাল আসামী বুঝি?

নিমাইবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ওরে বাবা, পোলিটিক্যাল আসামী ত লোকে তোদেরও এক সময় বলত। কিন্তু সে বললে এঁর কিছুই বুঝা যায় না। ইনি হচ্ছেন রাজবিদ্রোহী! রাজার শত্রু! হাঁ শত্রু বলবার লোক বটে! বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি এই ছেলেটির নাম রেখেছিলেন সব্যসাচী। মহাভারতের মতে নাকি তাঁর দুটো হাতই সমানে চলত, কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত সরকার বাহাদুরের সুগুপ্ত ইতিহাসের মতে এই মানুষটির দশ ইন্দ্রিয়ই নাকি বাবা সমান বেগে চলে। বন্দুক-পিস্তলে এঁর অভ্রান্ত লক্ষ্য, পদ্মানদী সাঁতার কেটে পার হয়ে যান, বাধে না—সম্প্রতি অনুমান এই যে চট্টগ্রামের পথে পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি বার্ম্মা মুলুকে পদার্পণ করেচেন। এখন ম্যাণ্ডালে থেকে নদীপথে জাহাজে চড়ে রেঙ্গুনে আসবেন, কিংবা রেলপথে ট্রেনে সওয়ার হয়ে শুভাগমন করচেন, সঠিক সংবাদ নেই,—তবে তিনি যে রওনা হয়েছেন সেকথা ঠিক। তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে কোন সন্দেহ, কোন তর্ক নেই,—শত্রু মিত্র সকলের মনেই তাই স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে আছে এবং নশ্বর দেহটি তাঁর পঞ্চভূতের জিম্মায় না দিতে পারা পর্য্যন্ত এজন্মে যে এর আর পরিবর্ত্তন নেই তাও সকলে

জানি, শুধু এ দেশে এসে কোন্ পথে যে তিনি পা বাড়াবেন সেইটি কেবল আমরা জানিনে। কিন্তু দেখো বাবা, এসব কথা যেন কোথাও প্রকাশ ক'রো না। তাহলে এই বৃদ্ধ বয়সে সাতাশ বছরের পেন্সনটি ত মারা যাবেই, হয়ত বা কিছু উপরি পাওনাও ভাগ্যে ঘটতে পারে।

অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া কহিল, এতদিন কোথায় এবং কি করছিলেন ইনি? সব্যসাচী নাম ত কখন শুনেচি মনে হচ্চে না!

নিমাইবাবু সহাস্যে কহিলেন, ওরে বাবা, এই সব বড় লোকদের কি আর কেবল একটা নামে কাজ চলে? অর্জ্জুনের মত দেশে দেশে কত নামই এর প্রচলিত আছে। সেকালে হয়ত শুনেও থাকবে এখন চিনতে পারচো না। আর কি যে ইতিমধ্যে করছিলেন সম্যক্ ওয়াকিফহাল নই। রাজ-শক্ররা ত তাঁদের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম ঢাকপিটে করতে পছন্দ করেন না, তবে পুণায় এক দফা তিন মাস এবং সিঙ্গাপুরে আর এক দফা তিন বচ্চর জেল খেটেচেন জানি। ছেলেটি দশ-বারোটা ভাষা এমন বলতে পারে যে বিদেশী লোকের পক্ষে চেনা ভার ইনি কোথাকার। জারমেনির জেনা না কোথায় ডাক্তারি পাশ করেচে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেচে, বিলেতে আইন পাশ করেচে, আমেরিকায় কি পাশ করেচে জানিনে, তবে সেখানে ছিল যখন, তখন কিছু একটা করেই থাকবে,—এসব বোধ করি এর তাস-পাশা খেলার সামিল, রিক্রিয়েশান, কিন্তু কিছুই কোন কাজে এলো না বাবা, এর সর্ব্বাঙ্গের শিরা দিয়ে ভগবান এমনি আগুন জেলে দিয়েচেন যে ওকে জেলেই দাও আর শূলেই দাও ঐ যে বললুম পঞ্চভূত ছাড়া আর আমাদের শান্তি স্বস্তি নেই! এদের না আছে দয়া-মায়া, না আছে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, না আছে কোন ঘর-দোর,—বাপরে বাপ! আমরাও ত এদেশেরই মানুষ, কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাঙ্গলা মুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না!

অপূর্ব্ব সহসা কথা বলিতে পারিল না,—শিরার মধ্য দিয়া তাহারও যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে আস্তে আস্তে কহিল, এঁকে কি আজ আপনি অ্যারেস্ট করবেন?

নিমাইবাবু হাসিয়া বলিলেন, আগে ত পাই!

অপূর্ব্ব কহিল, ধরুন, পেলেন।

না বাবা, অত সহজ বস্তু নয়। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সে শেষ মুহূর্ত্তে আর কোন পথ দিয়ে আর কোথাও সরে গেছে।

আর যদি তিনি এসেই পড়েন তাহলে?

নিমাইবাবু একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, তাঁকে চোখে চোখে রাখবার হুকুম

আছে। দু'দিন দেখি। ধরার চেয়ে ওয়াচ করায় মূল্য বেশি,—এই ত সম্প্রতি গভর্ণমেন্টের ধারণা।

কথাটা অপূর্ব্ব ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ তিনি যাই হোন তবুও পুলিশ। তথাপি, তাহার মুখ দিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল। কহিল, এর বয়স কত?

নিমাইবাবু কহিলেন, বেশি নয়। বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যেই।

কি রকম দেখতে?

এইটিই ভারি আশ্চর্য্য বাবা। এত বড় একটা ভয়ঙ্কর লোকের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই, নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত। আমাদের রিপোর্টের মধ্যে এই কথাটাই বিশেষ করে উল্লেখ করা আছে।

অপূর্ব্ব কহিল, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়েই ত এঁর হাঁটা-পথে পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙিয়ে আসা?

নিমাইবাবু বলিলেন, নাও হতে পারে। হয়ত কি একটা মতলব আছে, হয়ত পথটা একবার চিনে রাখতে চায়—কিছুই বলা যায় না অপূর্ব্ব। এঁরা যে পথের পথিক, তাতে সহজ মানুষের সোজা হিসেবের সঙ্গে এদের হিসেব মেলে না,—আজ এঁরই ভুল কি আমাদের ভুল তার একটা পরীক্ষা হবে। এমনও হতে পারে সমস্ত ছুটোছুটিই আমাদের বৃথা।

অপূর্ব্ব এবার হাসিয়া কহিল, তাই যেন হয় আমি ভগবানের কাছে সর্ব্বান্তঃ-করণে প্রার্থনা করি কাকাবাবু।

নিমাইবাবু নিজেও হাসিলেন, বলিলেন, বোকা ছেলে, পুলিশের কাছে একথা কি বলতে আছে? তোমার বাসার নম্বরটা কত বললে? তিরিশ? কাল সকালে পারি ত একবার গিয়ে দেখে আসবো। এই সমানের জেটিতেই বোধহয় এদের স্টীমার লাগে,—আচ্ছা তোমার আবার অফিসের সময় হয়ে এল, নতুন চাকরি, দেরি হওয়া ভাল নয়। এই বলিয়া তিনি পাশ কাটাইয়া একটু দ্রুতপদে চলিবার উপক্রম করিতেই অপূর্ব্ব কহিল, শুধু দেরি কেন, আজ অফিস কামাই হয়ে গেলেও আপনাকে ছাড়চিনে। আমি চাইনে যে তিনি এসে আপনার হাতে পড়েন, কিন্তু সে দুর্ঘটনা যদি ঘটেই তবুও ত একবার চোখে দেখতে পাবো। চলুন।

ইচ্ছা না থাকিলেও নিমাইবাবু বিশেষ আপত্তি করিলেন না, শুধু একটু সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন, দেখবার লোভ যে হয় তা অস্বীকার করিনে, কিন্তু এ সকল লোকের সঙ্গে কোন রকম আলাপ-পরিচয়ের ইচ্ছে করাও বিপজ্জনক তা তোমাকে

বলে রাখি অপূর্ব্ব। এখন আর তুমি ছেলেমানুষ নও, বাবাও বেঁচে নেই,—ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করার দায়িত্ব এখন একা তোমারই।

অপূর্ব্ব হাসিয়া কহিল, আলাপ-পরিচয়ের সুযোগই কি আপনারা কাউকে কখনো দেন কাকাবাবু? দোষ করেননি, কোন অভিযোগও নেই, তবুও তাঁকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় এতদূরে ছুটে এসেচেন।

ইহার উত্তরে নিমাইবাবু শুধু একটু মুচকিয়া হাসিলেন। তাহার অর্থ অতীব গভীর। মুখে কহিলেন, কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্য! এই ছোট্ট একটি কথার আড়ালে পৃথিবীর কত ভাল এবং কত মন্দই না সঞ্চিত হইয়া আছে। এই মনে করিয়া অপূর্ব্ব আর কোন প্রশ্ন করিল না। উভয়ে জেটিতে যখন প্রবেশ করিলেন তখন সেইমাত্র ইরাবতী নদীর প্রকাণ্ড স্টীমার তীরে ভিড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। পাঁচ-সাতজন পুলিশ-কর্ম্মচারী সাদা পোষাকে পূর্ব্ব হইতেই দাঁড়াইয়াছিল, নিমাইবাবুর প্রতি তাহাদের একপ্রকার চোখের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব্ব তাহাদের স্বরূপ চিনিতে পারিল। ইহারা সকলেই ভারতবর্ষীয় —ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত সুদূর বর্ম্মায় বিদ্রোহী শিকারে বাহির হইয়াছেন। সেই শিকারের বস্তু তাঁহাদের করতলগতপ্রায়। সফলতার আনন্দ ও উত্তেজনার প্রচ্ছন্ন দীপ্তি তাঁহাদের মুখে-চোখে প্রকাশ পাইয়াছে অপূর্ব্ব স্পষ্ট দেখিতে পাইল। লজ্জায় ও দুঃখে সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইতেই অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত ব্যথিত চিত্ত গিয়া যেন কোন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত দুর্ভাগার পদপ্রান্তে উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। জাহাজের খালাসীরা তখন জেটির উপরে দড়ি ছুড়িয়া ফেলিতেছিল, কত লোক রেলিং ধরিয়া তাহাই উদ্গ্রীব হইয়া দেখিতেছে,—ডেকের উপরে ব্যগ্রতা, কলরব ও ছুটাছুটির অবধি নাই, হয়ত ইহাদেরই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একজন এমনি উৎসুক-চক্ষে তীরের প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু অপূর্ব্বর চোখে সমস্ত দৃশ্যই চোখের জলে একেবারে ঝাপ্সা একাকার হইয়া গেল। উপরে, নীচে, জলে, স্থলে, এত নর-নারী দাঁড়াইয়া, কাহারও কোন শঙ্কা নাই, কোন অপরাধ নাই, শুধু যে লোক তাহার তরুণ হৃদয়ের সকল সুখ, সকল স্বার্থ, সকল আশা স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়াছে, কারাগার ও মৃত্যুর পথ কি কেবল তাহারই জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে। জাহাজ জেটির গায়ে আসিয়া ভিড়িল, কাঠের সিঁড়ি নীচে আসিয়া লাগিল, নিমাইবাবু তাঁহার দলবল লইয়া পথের দু'ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু অপূর্ব্ব নড়িল না। সে সেখানে নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া একান্তমনে বলিতে লাগিল, মুহূর্ত্ত পরে তোমার হাতে শৃঙ্খল পড়িবে, কৌতূহলী নর-নারী তোমার লাঞ্ছনা ও অপমান চোখ মেলিয়া দেখিবে, তাহারা

জানিতেও পারিবে না তাহাদের জন্য তুমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা চলিবে না। তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং যাহাকে সে কোনদিন দেখে নাই, তাহাকেই সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও—তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়া-তরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়, তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্ব্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়; কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শত কোটী নমস্কার! এত লোকের ভিড়, এত লোকের আনাগোনা, এত লোকের চোখের দৃষ্টি কিছুতেই তাহার খেয়াল ছিল না —নিজের মনের উচ্ছ্বসিত আবেগে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারে তাহার গণ্ড, তাহার চিবুক, তাহার কণ্ঠ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সময় যে কত কাটিল সেদিকেও তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ নিমাইবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার তদ্গত বিহ্বল ভাব তিনি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিলেন না, বলিলেন, যা ভয় করেছিলাম তাই! পালিয়েছে।

কি করে পালালো?

নিমাইবাবু কহিলেন, তাই যদি জানব ত সে কি পালায়? প্রায় শ তিনেক যাত্রী, বিশ-পঁচিশটা সাহেব ফিরিঙ্গী, উড়ে, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী তাও শ-দেড়েক হবে, বাকী বর্ম্মী—সে যে কার পোষাক আর কার ভাষা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল তা দেবা না জানন্তি—বুঝলে না বাবাজি—আমরা ত পুলিশ! চেনবার জো নেই তিনি বিলেতের কি বাঙলার! কেবল জগদীশবাবু সন্দেহ করে জন-কয়েক বাঙালীকে থানায় টেনে নিয়ে গেছেন, একটা লোকের সঙ্গে চেহারার মিলও আছে মনে হয়, কিন্তু ওই মনে হওয়া পর্য্যন্ত,—সে নয়। যাবে না কি বাবা, একবার লোকটাকে চোখে দেখবে?

অপূর্ব্বর বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল, কহিল, তাদের যদি মারধর করেন ত আমি যেতে চাইনে।

নিমাইবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, এতগুলো লোককে নিঃশব্দে ছেড়ে দিলাম,

আর এ বেচারারা বাঙালী বলেই শুধু বাঙালী হয়ে এদের প্রতি অত্যাচার করব? ওরে বাবা, বাইরে থেকে তোরা পুলিশকে যত মন্দ মনে করিস, সবাই তা নয়। ভাল মন্দ সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু মুখ বুঁজে যত দুঃখ আমাদের পোহাতে হয় তা যদি জানতে ত তোমার এই দারোগা কাকাবাবুটিকে অত ঘৃণা করতে পারতে না অপূর্ব্ব।

অপূর্ব্ব লজ্জিত হইয়া কহিল, আপনি কর্ত্তব্য করতে এসেচেন, তাই বলে আপনাকে ঘৃণা কেন করব কাকাবাবু! এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া কপালে ঠেকাইল। নিমাইবাবু খুশী হইয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, হয়েচে, হয়েচে। চল, একটু শীঘ্র যাওয়া যাক, লোকগুলো ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সারা হচ্চে, একটু পরীক্ষা করে ছেড়ে দেওয়া যাক। এই বলিয়া তিনি হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির করিয়া আনিলেন।

পুলিশ-স্টেশনে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, সুমুখের হল-ঘরে জন-ছয়েক বাঙালী মোটঘাট লইয়া বসিয়া আছে, জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই তাহাদের টিনের তোরঙ্গ ও ছোট বড় পুঁটুলি খুলিয়া তদারক শুরু করিয়া দিয়াছেন। শুধু যে-লোকটির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে তাহাকে আর একটা ঘরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহারা সকলেই উত্তর-ব্রহ্মে বর্ম্মা-অয়েল কোম্পানীর তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করিতেছিল, সেখানে জলহাওয়া সহ্য না হওয়ায় চাকরির উদ্দেশে রেঙ্গুনে চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের নাম ধাম ও বিবরণ লইয়া সঙ্গের জিনিসপত্রের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল।

লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু যেমন রোগা তেমনি দুর্ব্বল। এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল। মনে হয় না যে সংসারের মিয়াদ আর তাহার দীর্ঘদিন আছে, ভিতরের কি একটা দুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন দ্রুতবেগে ক্ষয়ের দিকে ছুটিয়াছে। কেবল আশ্চর্য্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি। সে চোখ ছোট কি বড়, টানা কি গোল, দীপ্ত কি প্রভাহীন, এ সকল বিবরণ দিতে যাওয়াই বৃথা—অত্যন্ত গভীর জলাশয়ের মত কি যে তাহাতে আছে, ভয় হয় এখানে খেলা চলিবে না, সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই প্রয়োজন। ইহার কোন্ অতল তলে তাহার ক্ষীণ প্রাণশক্তিটুকু লুকানো আছে, মৃত্যুও সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করে না—কেবল এই জন্যেই যেন সে আজও বাঁচিয়া আছে। অপূর্ব্ব মুগ্ধ হইয়া সেইদিকে চাহিয়াছিল, সহসা নিমাইবাবু তাহার বেশ-ভূষায় বাহার ও পারিপাট্যের প্রতি অপূর্ব্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সহাস্যে কহিলেন,

বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু সখ ষোল আনাই বজায় আছে তা স্বীকার করতে হবে। কি বল অপূর্ব্ব?

এতক্ষণে অপূর্ব্ব তাহার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল। তাহার মাথার সম্মুখদিকে বড় বড় চুল, কিন্তু ঘাড় ও কানের দিকে নাই বলিলেই চলে,—এমনি ছোট করিয়া ছাঁটা। মাথায় চেরা সিঁথি—অপর্য্যাপ্ত তৈলনিষিক্ত কঠিন রুগ্ন কেশ হইতে নিদারুণ নেবুর তেলের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে। গায়ে জাপানী সিল্কের রামধনু-রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি, তাহার বুকপকেট হইতে বাঘ-আঁকা একটা রুমালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে, উত্তরীয়ের কোন বালাই নাই। পরণে বিলাতি মিলের কালো মকমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ি, পায়ে সবুজ-রঙের ফুল-মোজা হাঁটুর উপরে লাল ফিতা দিয়া বাঁধা, বার্নিশ করা পাম্প-শু, তলাটা মজবুত ও টিকসই করতে আগাগোড়া লোহার নাল বাঁধানো, হাতে একগাছি হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া বেতের ছড়ি,—কয়দিনের জাহাজের ধকলে সমস্তই নোংরা হইয়া উঠিয়াছে—ইহার আপাদমস্তক অপূর্ব্ব বারবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, কাকাবাবু, এ লোকটিকে আপনি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই ছেড়ে দিন—যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয়, তার আমি জামিন হতে পারি।

নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্ব্ব কহিল, আর যাই হোক, যাকে খুঁজচেন তাঁর কালচারের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।

নিমাইবাবু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, কহিলেন, তোমার নাম কি হে?

আজ্ঞে, গিরীশ মহাপাত্র।

একদম মহাপাত্র! তুমিও তেলের খনিতেই কাজ করছিলে, না? এখন রেঙ্গুনেই থাকবে? তোমার বাক্স-বিছানা ত খানাতল্লাসী হয়ে গেছে, দেখি তোমার ট্যাঁক এবং পকেটে কি আছে?

তাহার ট্যাক হইতে একটি টাকা ও গণ্ডা-ছয়েক পয়সা বাহির হইল, পকেট হইতে একটা লোহার কম্পাস, মাপ করিবার কাঠের একটা ফুটরুল, কয়েকটা বিড়ি, একটা দেশলাই ও একটা গাঁজার কলিকা বাহির হইয়া পড়িল।

নিমাইবাবু কহিলেন, তুমি গাঁজা খাও?

লোকটি অসঙ্কোচে জবাব দিল, আজ্ঞে না।

তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন?

আজ্ঞে, পথে কুড়িয়ে পেলাম, যদি কারও কাজে লাগে তাই তুলে রেখেছি।

জগদীশবাবু এইসময়ে ঘরে ঢুকিতে নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, দেখ জগদীশ, কিরূপ সদাশয় ব্যক্তি ইনি। যদি কারও কাজে লাগে তাই গাঁজার কলকেটি

কুড়িয়ে পকেটে রেখেচেন। দেখি বাবা তোমার হাতটি? এই বলিয়া সেই প্রবীণ, সুদক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারী মহাপাত্রের ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠটি তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সহাস্যে কহিলেন, অনেক গাঁজা তৈরির চিহ্ন এইখানে বিদ্যমান বাবা, বললেই পারতে খাই। কিন্তু ক'দিনই বা বাঁচবে,- এই ত তোমার দেহ,—আর খেয়ো না। বুড়োমানুষের কথাটা শুনো।

মহাপাত্র মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল, আজ্ঞে না মাইরি খাইনে। তবে ইয়ার বন্ধু কেউ তৈরি করে দিতে বললেই দিই,—এই মাত্র। নইলে নিজে খাইনে।

জগদীশবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, দয়ার সাগর! পরকে সেজে দিই, নিজে খাইনে! মিথ্যেবাদী কোথাকার!

অপূর্ব্ব কহিল, বেলা হয়ে গেল, আমি তবে চললুম কাকাবাবু।

নিমাইবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো মহাপাত্র। কি বল জগদীশ, পারে ত? জগদীশ সম্মতি জানাইলে কহিলেন, কিন্তু নিশ্চয় কিছুই বলা যায় না ভায়া, আমার মনে হয় এ শহরে আরও কিছুদিন নজর রাখা দরকার। রাত্রের মেল-ট্রেনটার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো, সে যে বর্ম্মায় এসেচে এ খবর সত্য।

জগদীশ কহিলেন, তা হতে পারে, কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ করবার দরকার নেই বড়বাবু। নেবুর তেলের গন্ধে ব্যাটা থানাসুদ্ধ লোকের মাথা ধরিয়ে দিলে!

বড়বাবু হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব পুলিশ-স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং প্রায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই মহাপাত্র তাহার ভাঙা টিনের তোরঙ্গ ও চাটাই-জড়ানো ময়লা বিছানার বাণ্ডিল বগলে চাপিয়া ধীর মন্থর পদে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া সোজা প্রস্থান করিল।

৭

আশ্চর্য্য এই যে, এত বড় সব্যসাচী ধরা পড়িল না। কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না, এমন সৌভাগ্যকেও অপূর্ব্বর মন যেন গ্রাহ্যই করিল না। বাসায় ফিরিয়া দাড়ি গোঁফ কামানো হইতে শুরু করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক, স্নানাহার, পোষাকপরা, আফিস যাওয়া প্রভৃতি নিত্য কাজগুলায় বাধা পাইল না সত্য, কিন্তু ঠিক কি যে সে ভাবিতে লাগিল তাহার নির্দ্দেশ নাই, অথচ চোখ কান ও বুদ্ধি তাহার সাংসারিক সকল ব্যাপার হইতে একেবারে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন্ এক অদৃষ্ট অপরিজ্ঞাত রাজবিদ্রোহীর চিন্তাতেই ধ্যানস্থ হইয়া রহিল। এই অত্যন্ত অন্যমনস্কতা তলওয়ারকর লক্ষ্য করিয়া চিন্তিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, আজ বাড়ি থেকে কোন চিঠি পেয়েচেন না কি?

কই না।

বাড়ির খবর সব ভাল ত?

অপূর্ব্ব কিছু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, যতদূর জানি সবাই ভালই ত আছেন।

রামদাস আর কোন প্রশ্ন করিল না। টিফিনের সময় উভয়ে একত্রে বসিয়া জলযোগ করিত। রামদাসের স্ত্রী অপূর্ব্বকে একদিন সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন, যতদিন তাঁহার মা কিংবা বাটীর আর কোন আত্মীয়া নারী এদেশে আসিয়া বাসার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি না করেন, ততদিন এই ছোট বহিনের হাতের তৈরি যৎসামান্য মিষ্টান্ন প্রত্যহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। অপূর্ব্ব রাজি হইয়াছিল। আফিসের একজন ব্রাহ্মণ পিয়াদা এই সকল বহিয়া আনিত। আজও সে নিরালা পাশের ঘরটায় ভোজ্যবস্তুগুলি যখন সাজাইয়া দিয়া গেল, তখন আহারে বসিয়া অপূর্ব্ব নিজেই কথা পাড়িল। কাল তাহার ঘরে চুরি হইয়া গেছে; সমস্তই যাইতে পারিত কেবল উপরের সেই ক্রীশ্চান মেয়েটির কৃপায় টাকাকড়ি ছাড়া আর সমস্ত বাঁচিয়াছে। সে চোর তাড়াইয়া দরজায় নিজের তালা বন্ধ করিয়াছে, আমি বাসায় পৌঁছিলে চাবি খুলিয়া দিয়া অনাহূত আমার ঘরে ঢুকিয়া ছড়ানো জিনিসপত্র গুছাইয়া দিয়াছে- সমস্ত ফর্দ্দ করিয়া কি আছে আর কি গেছে তার এমন নিখুঁত হিসাব করিয়া দিয়াচে যে, বোধ হয় তোমার মত পাশ করা একাউন্টেন্টের পক্ষেও তা বিস্ময়কর,—বাস্তবিক এমন তৎপর, এতবড় কার্য্যকুশলা মেয়ে আর যে কেহ আছে মনে হয় না হে, তলওয়ারকর। তা ছাড়া এত-বড় বন্ধু!

রামদাস কহিল, তারপর?

অপূর্ব্ব কহিল, তেওয়ারী ঘরে ছিল না, বর্ম্মা-নাচ দেখতে ফয়ায় গিয়েছিল,

ইত্যবসরে এই ব্যাপার। তার বিশ্বাস এ-কাজ ও-ছাড়া আর কেউ করেনি। আমারও অনুমান কতকটা তাই। চুরি না করুক সাহায্য করেচে।

তারপর ?

তারপর সকালে গেলাম পুলিশে খবর দিতে। কিন্তু পুলিশের দল এমন কাণ্ড করলে, এমন তামাসা দেখালে যে ও-কথা আর মনেই হল না। এখন ভাবচি, যা গেছে তা যাক, তাদের চোর ধরে দিয়ে আর কাজ নেই, তারা বরঞ্চ এমনিধারা বিদ্রোহী ধরে ধরেই বেড়াক। এই বলিয়া তাহার গিরীশ মহাপাত্র ও তাহার পোষাক-পরিচ্ছদের বাহার মনে পড়িয়া হঠাৎ হাসির ছটায় যেন দম আটকাইবার উপক্রম হইল। হাসি থামিলে সে বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী বিলাতের ডাক্তার উপাধিধারী রাজশত্রু মহাপাত্রের স্বাস্থ্য, তাহার শিক্ষা ও রুচি, তাহার বলবীর্য্য, তাহার রামধনু-রঙের জামা, সবুজ রঙের মোজা ও লোহার নাল-ঠোকা পাম্প-শু, তাহার লেবুর তেলের গন্ধবিলাস, সর্ব্বোপরি তাহার পরহিতায় গাঁজার কলিকাটির আবিষ্কারের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করিতে করিতে তাহার উৎকট হাসির বেগ কোন মতে আর একবার সংবরণ করিয়া শেষে কহিল, তলওয়ারকর, মহা হুঁসিয়ারি পুলিশের দলকে আজকের মত নির্ব্বোধ আহম্মক হতে বোধকরি কেউ কখনো দেখেনি। অথচ, গভর্ণমেণ্টের কত টাকাই না এরা বুনো হাঁসের পিছনে ছুটোছুটি করে অপব্যয় করলে !

রামদাস হাসিয়া কহিল, কিন্তু বুনো হাঁস ধরাই যে এদের কাজ ; আপনার চোর ধরে দেবার জন্যে এরা নেই। আচ্ছা, এরা কি আপনাদের বাঙলা দেশের পুলিশ ?

অপূর্ব্ব কহিল, হ্যাঁ। তা' ছাড়া আমার বড় লজ্জা এই যে, এঁদের যিনি কর্ত্তা তিনি আমার আত্মীয়, আমার পিতার বন্ধু। বাবাই একদিন এর চাকরি করে দিয়েছিলেন।

রামদাস কহিল, তাহলে আপনাকেই হয়ত আর একদিন তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হবে। কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে-ই একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিল—আত্মীয়ের সম্বন্ধে এরূপ একটা মন্তব্য প্রকাশ করা হয়ত শোভন হয় নাই।

অপূর্ব্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অর্থ বুঝিল, কিন্তু এ ধারণা যে সত্য নয়, ইহাই সতেজে ব্যক্ত করিতে সে জোর করিয়া বলিল, আমি তাঁকে কাকা বলি, আমাদের তিনি আত্মীয়, শুভাকাঙ্খী, কিন্তু তাই বলে আমার দেশের চেয়ে ত তিনি আপনার নন। বরঞ্চ, যাঁকে তিনি দেশের টাকায়, দেশের লোক দিয়ে শিকারের মত তাড়া করে বেড়াচ্চেন, তিনি ঢের বেশি আমার আপনার।

রামদাস মুচকিয়া একটু হাসিয়া কহিল, বাবুজী, এ-সব কথা বলায় দুঃখ আছে।

অপূর্ব্ব কহিল, থাকে, তাই নেব। কিন্তু তাই বলে তলওয়ারকর,—শুধু কেবল

আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর যে-কোন দেশে, যে-কোন যুগে যে-কেউ জন্মভূমিকে তার স্বাধীন করবার চেষ্টা করেচে, তাকে আপনার নয় বলবার সাধ্য আর যার থাক্ আমার নেই। বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তার তীক্ষ্ণ এবং চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল; মনে মনে বুঝিল কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সামলাইতে পারিল না, বলিল, তোমার মত সাহস আমার নেই, আমি ভীরু, কিন্তু তাই বলে অবিচারে দণ্ডভোগ করার অপমান আমাকে কম বাজে না রামদাস! বিনা দোষে ফিরিঙ্গী ছোঁড়ারা আমাকে যখন লাথি মেরে প্ল্যাটফর্ম্ম থেকে বার করে দিলে, এবং এই অন্যায়ের প্রতিবাদ যখন করতে গেলাম, তখন সাহেব স্টেশন-মাস্টার কেবলমাত্র আমাকে দেশী লোক বলেই দেশের স্টেশন থেকে কুকুরের মত দূর করে দিলে,—তার লাঞ্ছনা এই কালো চামড়ার নীচে কম জ্বলে না, তলওয়ারকর! এমন ত নিত্য নিয়তই ঘটচে,—আমার মা, আমার ভাই-বোনকে যারা এইসব সহস্র-কোটী অত্যাচার থেকে উদ্ধার করতে চায়, তাদের আপনার বলে ডাকবার যে দুঃখই থাক্, আমি আজ থেকে মাথায় তুলে নিলাম।

রামদাসের সুশ্রী গৌরবর্ণ মুখ ক্ষণকালের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, কই এ ঘটনা ত আমাকে বলেননি।

অপূর্ব্ব কহিল, বলা কি সহজ রামদাস? হিন্দুস্থানের লোক সেখানে কম ছিল না, কিন্তু আমার অপমান কারও গায়েই ঠেকল না, এমনি তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। লাথির চোটে আমার যে হাড়পাঁজরা ভেঙ্গে যায়নি এই সুখবরে তারা সব খুশী হয়ে গেল। তোমাকে জানাবো কি মনে হলে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় নিজেই যেন মাটির সঙ্গের মিশিয়ে যাই।

রামদাস চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার দুই চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল। সুমুখের ঘড়িতে তিনটা বাজিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বোধহয় কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু কিছুই না বলিয়া হঠাৎ হাত বাড়াইয়া অপূর্ব্বর ডান হাতটা টানিয়া লইয়া একটা চাপ দিয়া নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সেইদিন বিকালে আফিসের ছুটি হইবার পূর্ব্বে বড়-সাহেব একখানা লম্বা টেলিগ্রাম হাতে অপূর্ব্বর ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, আমাদের ভামোর অফিসে কোন শৃঙ্খলাই হচ্ছে না। ম্যানডালে, শোএবো, মিক্‌থিলা এবং এদিকে প্রোম, সব ক'টা অফিসেই গোলযোগ ঘটচে। আমার ইচ্ছা তুমি একবার সবগুলো দেখে এসো। আমার অবর্ত্তমানে সমস্ত ভারই ত তোমার,—একটা পরিচয় থাকা চাই,—সুতরাং বেশি দেরি না করে কাল-পরশু যদি একবার—

অপূর্ব্ব তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, আমি কালই বার হয়ে যেতে পারি।

বস্তুতঃ, নানা কারণে রেঙ্গুনে তাহার আর এক মুহূর্ত্ত মন টিকিতেছিল না। উপরন্তু এই সূত্রে দেশটাও একবার দেখা হইবে। অতএব যাওয়াই স্থির হইল, এবং পর-দিনই অপরাহ্ণ বেলায় সুদূর ভামো নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া সে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। সঙ্গে রহিল আরদালি এবং আফিসের একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ পিয়াদা। তেওয়ারী খবরদারীর জন্যই বাসাতেই রহিল। পা-ভাঙ্গা সাহেব হাসপাতালে পড়িয়া, সুতরাং তেমন আর ভয় নাই। বিশেষতঃ এই ম্লেচ্ছদেশের রেঙ্গুন সহরটা বরং সহিয়াছিল, কিন্তু আরও অজানা স্থানে পা বাড়াইবার তাহার প্রবৃত্তিই ছিল না। তলওয়ারকর তেওয়ারীর পিঠ ঠুকিয়া দিয়া সাহস দিয়া কহিল, তোমার চিন্তা নেই ঠাকুর, কোন কিছু হলেই আফিসে গিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

গাড়ি ছাড়িতে বোধ করি তখনও মিনিট পাঁচেক বিলম্ব ছিল, অপূর্ব্ব হঠাৎ চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, ওই যে!

তলওয়ারকর ঘাড় ফিরাইতে বুঝিল, এই সেই গিরীশ মহাপাত্র। সেই বাহারে জামা, সেই সবুজ রঙের ফুল-মোজা, সেই পাম্প-শু এবং ছড়ি, প্রভেদের মধ্যে এখন কেবল সেই বাঘ-আঁকা রুমালখানি বুক-পকেট ছাড়িয়া তাঁহার কণ্ঠে জড়ানো। মহাপাত্র এইদিকেই আসিতেছিল, সুমুখে আসিতেই অপূর্ব্ব ডাকিয়া কহিল, কি হে গিরীশ, আমাকে চিনতে পারো? কোথায় চলেচ?

গিরীশ শশব্যস্তে একটা নমস্কার করিয়া কহিল, আজ্ঞে চিনতে পারি বই কি বাবু-মশায়। কোথায় আগমন হচ্ছেন?

অপূর্ব্ব সহাস্যে কহিল, আপাততঃ ভামো যাচ্চি। তুমি কোথায়?

গিরীশ কহিল, আজ্ঞে, এনাঙ্গাং থেকে দুজন বন্ধু লোক আসার কথা ছিল,—আমাকে কিন্তু বাবু ঝুটমুট হয়রাণ করা। হ্যাঁ আনে বটে কেউ কেউ আফিং সিদ্ধি লুকিয়ে, কিন্তু আমি বাবু ধর্ম্মভীরু মানুষ। বলি কাজ কি বাপু জুচ্চুরিতে—কথায় বলে পরোধর্ম্ম ভয়াবহ। ললাটের লেখা ত খণ্ডাবে না!

অপূর্ব্ব হাসিয়া কহিল, আমারও ত তাই বিশ্বাস। কিন্তু তোমার বাপু একটা ভুল হয়েচে, আমি পুলিশের লোক নই, আফিম সিদ্ধির কোন ধার ধারিনে,—সেদিন কেবল তামাসা দেখতে গিয়েছিলাম।

তলওয়ারকর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিল, কহিল, বাবুজী, ম্যায় নে আপ্‌কো তো জরুর কঁহা দেখা—

গিরীশ কহিল, আশ্চর্য্য নেহি হ্যায়, বাবু-সাহেব, নোকরির বাস্তে কেত্তা জায়গায় তো ঘুমতা হ্যায়,—

অপূর্ব্বকে বলিল, কিন্তু আমার ওপর মিথ্যে সন্দেহ রাখবেন না বাবু-মশায়,

আপনাদের নজর পড়লে চাকরিও একটা জুটবে না। বামুনের ছেলে, বাঙলা লেখাপড়া, শাস্তর-টাস্তর সবই কিছু কিছু শিখেছিলাম, কিন্তু এমন অদেষ্ট যে—বাবু-মশায় আপনারা—

অপূর্ব্ব কহিল, আমি ব্রাহ্মণ!

আজ্ঞে, তাহলে নমস্কার। এখন তবে আসি বাবুসাহেব। রাম রাম—বলিতে বলিতে গিরীশ মহাপাত্র একটা উদ্গত কাশির বেগ সামলাইয়া লইয়া ব্যগ্রপদে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

অপূর্ব্ব কহিল, এই সব্যসাচীটির পিছনেই কাকাবাবু সদলবলে এদেশ-ওদেশ করে বেড়াচ্চেন তলওয়ারকর! বলিয়া সে হাসিল।

কিন্তু এই হাসিতে তলওয়ারকর যোগ দিল না। পরক্ষণে বাঁশী বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলে সে হাত বাড়াইয়া বন্ধুর করমর্দ্দন করিল, কিন্তু তখনও মুখ দিয়া তাহার কথাই বাহির হইল না। নানা কারণে অপূর্ব্ব লক্ষ্য করিল না, কিন্তু করিলে দেখিতে পাইত মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে রামদাসের প্রশস্ত উজ্জ্বল ললাটের উপর যেন কোন এক অদৃশ্য মেঘের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, এবং সেই সুদূর দুর্নিরীক্ষ-লোকেই তাহার সমস্ত মনশ্চক্ষু একেবারে উধাও হইয়া গিয়াছে।

অপূর্ব্ব প্রথম শ্রেণীর যাত্রী, তাহার কামরায় আর কেহ লোক ছিল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে সে পিরাণের মধ্যে হইতে পৈতা বাহির করিয়া বিনা জলেই সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিল এবং যে সকল ভোজ্যবস্তু শাস্ত্রমতে স্পর্শদুষ্ট হয় না জানিয়া সে সঙ্গে আনিয়াছিল, পিতলের পাত্র হইতে বাহির করিয়া আহার করিল, জল ও পান তাহার ব্রাহ্মণ আরদালি পূর্ব্বাহ্নে রাখিয়া গিয়াছিল, এবং শয্যাও সে প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছিল, অতএব রাত্রির মত অপূর্ব্ব ভোজনাদি শেষ করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া পরিতৃপ্ত স্বচ্ছচিত্তে শয্যা আশ্রয় করিল। তাহার ভরসা ছিল প্রভাতকাল পর্য্যন্ত আর তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিবে না। কিন্তু ইহা যে কতবড় ভ্রম তাহা কয়েকটা স্টেশন পরেই সে অনুভব করিল। সেই রাত্রির মধ্যে বার-তিনেক তাহার ঘুম ভাঙাইয়া পুলিশের লোক তাহার নাম-ধাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইয়াছে। একবার সে বিরক্ত হইয়া প্রতিবাদ করায় বর্ম্মা সব-ইনস্পেক্টর সাহেব কটুকণ্ঠে জবাব দেয়, তুমি ত ইউরোপীয়ান নও।

অপূর্ব্ব কহে, না। কিন্তু আমি ফার্স্টক্লাস প্যাসেঞ্জার,—রাত্রে ত আমার তুমি ঘুমের বিঘ্ন করতে পার না।

সে হাসিয়া বলে, ও নিয়ম রেলওয়ে কর্ম্মচারীর জন্য,—আমি পুলিশ, ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে টানিয়া নীচে নামাইতে পারি।

ইহার পরে আর অপূর্ব্ব প্রত্যুত্তর করে নাই। কিন্তু শেষের দিকে ঘণ্টা তিন-চারেক নিরুপদ্রবে কাটার পরে সকালে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বিগত রাত্রির গ্লানির কথা আর তাহার মনে ছিল না। একটা বড় পাহাড়ের অনতিদূর দিয়া গাড়ি মন্থর গতিতে চলিয়াছিল, খুব সম্ভব চড়াইয়ের পথ। এইখানে জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া সে অকস্মাৎ বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। চক্ষের পলকে বুঝিল, পৃথিবীর এতবড় সৌন্দর্য্য-সম্পদ সে আর কখনও দেখে নাই। গিরি-শ্রেণী অর্দ্ধবৃত্তাকারে বিস্তৃত হইয়া যেন পিছন ও সুমুখের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার বিরাট দেহ ব্যাপিয়া কি গভীর বন এবং গগনস্পর্শী কি বিপুলকায় বৃক্ষরাজীই না তাহার সুবিস্তীর্ণ পাদমূল ঘেরিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে! বোধহয় সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে, বামদিকের শিখর ডিঙাইয়া রথ তাঁহার আকাশে এখনও দেখা দেয় নাই, কিন্তু অগ্রবর্ত্তী কিরণচ্ছটায় উপরের নীল অরণ্যে সোনা মাখাইয়া সেই তাঁহার আসার সংবাদ দিকে দিকে প্রচারিত হইতে আর বাকী নাই। খাদের মধ্যে শিখরনিঃসৃত জলের ধারা বহিয়াছে, বনের ছায়ার নীচে তাহার শান্ত প্রবাহ অশ্রু-রেখার মতই সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে। অপূর্ব্ব মুগ্ধ হইয়া গেল। একি আশ্চর্য্য সুন্দর দেশ! এখানে যাহারা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বাসা বাঁধিতে পাইয়াছে তাহাদের সৌভাগ্যের কি সীমা আছে? কিন্তু কেবলমাত্র সীমা নাই বলিয়া, শুধু একটা অনির্দ্দিষ্ট আনন্দের আভাসমাত্র লইয়াই মানবের হৃদয় পূর্ণ তৃপ্তি মানিতে চাহে না,—তাই সে ইহাকে মূর্ত্তি দিয়া, রূপ দিয়া মনে মনে সহস্রবিধ রসে ও রঙে পল্লবিত করিয়া ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। এমনি করিয়া তাহার ভাবুক চিত্ত যখন অন্তরে-বাহিরে আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া আসিতেছিল, তখন হঠাৎ যেন কঠিন ধাক্কায় চমকিয়া দেখিল তাহার কল্পনার রথচক্র মেদিনী গ্রাস করিতেছে। রামদাস তলওয়ারকরের কথাগুলো মনে পড়িল। আসিয়া পর্য্যন্ত এই ব্রহ্মদেশের অনেক গুপ্ত ও ব্যক্ত কাহিনী সে সংগ্রহ করিতেছিল। সেই প্রসঙ্গে একদিন সে বলিয়াছিল, বাবুজী, শুধু কেবল শোভা সৌন্দর্য্যই নয় প্রকৃতি-মাতার দেওয়া এত সম্পদও কম দেশে আছে। ইহার বন ও অরণ্য অপরিমেয়, মাটির মধ্যে ইহার অফুরন্ত তেলের প্রস্রবণ, ইহার মহামূল্য রত্নখনির মূল্য নিরূপিত হয় না, আর ওই যে আকাশচুম্বি মহাদ্রুমের সারি, জগতে ইহার তুলনা কোথায়? সে বেশি-দিনের কথা নয়, সংবাদ পাইয়া একদিন ইংরাজ বণিকের লুব্ধদৃষ্টি ইহারই প্রতি একেবারে একান্ত হইয়া পড়িল। তাহার অনিবার্য্য পরিণাম অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সোজা। বিবাদ বাধিল, মানোয়ারি জাহাজ আসিল, বন্দুক-কামান আসিল, সৈন্য-সামন্ত আসিল, লড়াই বাধিল, যুদ্ধে হারিয়া দুর্ব্বল অক্ষম রাজা নির্ব্বাসিত হইলেন,

এবং তাঁহার রাণীদের গায়ের গহনা বেচিয়া লড়াইয়ের খরচ আদায় হইল। অতঃপর, দেশের ও দশের কল্যাণে, মানবতার কল্যাণে, সভ্যতা ও ন্যায়-ধর্ম্মের কল্যাণে ইংরাজ রাজশক্তি বিজিত দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া তাহাদের অশেষবিধ ভাল করিতে কায়মনে লাগিয়া গেলেন। তাই ত আজ তথায় সতর্কতার অবধি নাই, তাই ত সেই বিজিত দেশের পুলিশ কর্ম্মচারী তাহারই মত আর এক পরাধীন দেশের নিরীহ ব্যক্তিকে বারংবার ঘুম ভাঙাইয়া নিঃসংকোচে বলিতে পারিল, তুমি ত সাহেব নও যে, তোমাকে অপমান করিতে আমায় বাধিবে? অপূর্ব্ব মনে মনে কহিল, বটেই ত! বটেই ত! ইহার অধিক আমাকে সে কি দিবে? ইহার বড় আমিই বা কোন্ মুখে তাহার কাছে দাবী করিব?

অরণ্যশিরে প্রভাত-সূর্য্যের কনক আভা তখনও রঙ হারায় নাই, কিন্তু তাহার চোখে অত্যন্ত ম্লান ও ক্লান্তিহীন ঠেকিল—সমুন্নত পর্ব্বতমালা তাহার কাছে সামান্য এবং বৃক্ষশ্রেণীর যে বিপুলতা দেখিয়া সে ক্ষণেক পূর্ব্বে বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহারাই তাহার দৃষ্টিতে সাধারণ ও নিতান্ত বিশেষত্ববর্জ্জিত বলিয়া বোধ হইল। তাহার নদীমাতৃক সমতল শস্যশ্যামল বঙ্গভূমিকে মনে পড়িয়া দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল— প্রবাসী পীড়িত চিত্ত তাহার বুকের মধ্যে আর্ত্তনাদ করিয়া যেন বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, ওরে দুর্ভাগা দেশের শক্তিহীন নর-নারী! ওই অশেষ ঐশ্বর্য্যময়ী জন্মভূমির প্রতি তোদের অধিকার কিসের? যে ভার, যে গৌরব তোরা বহিতে পারিবি না, তাহার প্রতি এই ব্যর্থ লোভ তোদের কিসের জন্য? স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার আছে কেবল মনুষ্যত্বের, শুধু মানুষ বলিয়াই থাকে না; এ কথা আজ কে অস্বীকার করিবে? ভগবানও যে ইহা হরণ করিতে পারেন না! তোদের ওই সব ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, পঙ্গু, হাত-পাগুলোকেই কি তোরা মানুষ বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছিস্? ভুল ভুল; ইহার বড় আত্মঘাতী ভুল ত আর হইতেই পারে না! এমনি কত কি যে আপনাকে আপনি বলিতে বলিতে তাহার সময় কাটিতে লাগিল তাহার হিসাব ছিল না, অকস্মাৎ, ট্রেনের গতি মন্দীভূত হওয়ায় তাহার চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল গাড়ি স্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

৮

ছেলেবেলা হইতেই মেয়েদের প্রতি অপূর্ব্বর শ্রদ্ধা ছিল না। বরঞ্চ কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। বৌদিদিরা ঠাট্টা-তামাসা করিলে সে মনে মনে রাগ করিত, ঘনিষ্ঠতা করিতে আসিলে দূরে সরিয়া যাইত। মা ভিন্ন আর কাহারও সেবা-যত্ন তাহার ভালই লাগিত না। কোন মেয়ে কলেজে পড়িয়া একজামিন পাশ করিয়াছে, শুনিলে সে খুব খুশী হইত না, এবং সেদিন যখন বিলাতে ইহারা কোমর বাঁধিয়া রাজনৈতিক অধিকারের জন্য লড়াই করিতেছিল, খবরের কাগজে সেই সকল কাহিনী পড়িয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে থাকিত। তবে একটা জিনিস ছিল তাহার স্বভাবতঃ কোমল ভদ্র হৃদয়। এইখানে সে নর-নারী নির্ব্বিশেষে প্রাণীমাত্রকেই অত্যন্ত ভালবাসিত, কাহাকেও কোন কারণেই ব্যথা দিতে তাহার বাধিত। তাহার এই একটি দুর্ব্বলতাই যে ভারতীকে অপরাধী জানিয়াও শেষ পর্য্যন্ত শাস্তি দিতে দেয় নাই এ সংবাদ তাহার অগোচর ছিল না। কিন্তু পুরুষের যৌবন-চিত্ততলে আরও যে অনেক প্রকারের দুর্ব্বলতা একান্ত সংগোপনে বাস করে, সেই খবরটাই আজও তাহার কাছে পৌঁছে নাই। এই ক্রীশ্চান মেয়েটিকে কোনদিন কঠিন দণ্ড দেওয়া যে তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ইহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু নারীর প্রতি তাহার বিমুখতা সত্য বলিয়াই যে মন তাহার ভারতীকেও অনায়াসে চিরদিন দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিবে তাহাও তেমনিই সত্য না হইতে পারে। অথচ আজ যে সেই নিষ্ঠুর মিথ্যাচারিণী রমণীর প্রতি তাহার বিরাগ ও বিদ্বেষের অবধি ছিল না, এ কথাও ত তাহার অন্তর্যামী দেখিতেছিলেন।

দিন পনর হইল সে ভামোয় আসিয়াছে। এখানকার কাজ তাহার একপ্রকার সমাধা হইয়াছে, কাল-পরশু তাহার মিক্‌থিলা রওনা হইবার কথা। সন্ধ্যার পরে আজ আফিস হইতে ফিরিয়া নিজের ঘরের বারান্দায় বসিয়া সে মনে মনে একটা অত্যন্ত জটিল সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত ছিল। নারীর স্বাধীনতার প্রসঙ্গে মন তাহার কোনকালেই সায় দিতে চাহিত না। ইহাতে মঙ্গল নাই, ইহা ভাল নয়—তাহার রুচি ও আজন্ম সংস্কার এ কথা অনুক্ষণ তাহার কানে কানে বলিত। অথচ, শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলার মধ্যেও যে ইহাদের প্রতি গভীর অবিচার নিহিত আছে এ সত্য তাহার ন্যায়নিষ্ঠ চিত্ত কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিত না। ইহাতে সে দুঃখ পাইত, কিন্তু পথ পাইত না। অকস্মাৎ, আজ এই দ্বিধা তাহার যে কারণে একেবারে কাটিয়া গেল তাহা এইরূপ—

যে দ্বিতল ঘরটিতে সে বাসা লইয়াছে তাহার নীচের তলায় একটি ব্রহ্মদেশীয় ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। সকালে আফিসে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার সংসারে এক বিষম অনর্থ ঘটে। তাঁহার চার কন্যা, সকলেই বিবাহিতা। কি একটা উৎসব উপলক্ষ্যে জামাতারা সকলেই আজ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভোজের সময় সম্ভ্রম ও ইজ্জত লইয়া প্রথমে মেয়েদের মধ্যে এবং অনতিকাল পরেই বাবা-জীবনদের মধ্যে লাঠালাঠি রক্তারক্তি বাধিয়া যায়; অপূর্ব্ব খবর লইতে গিয়া হতবুদ্ধি হইয়া শুনিল যে, ইঁহাদের একজন মাদ্রাজের চুলিয়া মুসলমান, একজন চট্টগ্রামের বাঙালী-পর্ত্তুগীজ, একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেব এবং ছোট জামাতাটি চীনা, কয়েক পুরুষ হইতে এই সহরেই বাস করিয়া চামড়ার কারবার করিতেছেন। এইরূপ পৃথিবীসুদ্ধ জাতির শ্বশুর হইবার গৌরব অন্যত্র দুর্ল্লভ হইলেও এখানে অতিশয় সুলভ। তত্রাচ, প্রতিবারেই নাকি ভদ্রলোক সভয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু মেয়েদের অপ্রতিহত স্বাধীনতা তাহাতে কান পর্য্যন্ত দেয় নাই। এক-একদিন এক-একটি কন্যাকে বাটীর মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, আবার এক-একদিন করিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল এবং সঙ্গে আসিল এই বিচিত্র জামাইয়ের দল। তাহাদের ভাষা আলাদা, ভাব আলাদা, ধর্ম্ম আলাদা, মেজাজ আলাদা,—শিক্ষা, সংস্কার কাহারও সহিত কাহারও এক নয়,—এই যে দেশের মধ্যে ভারতের হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের মত ধীরে ধীরে এক অতি কঠিন সমস্যার উদ্ভব হইতেছে ইহার মীমাংসা হইবে কি করিয়া? ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে, বিরক্তিতে সে মনে মনে লাফাইতে লাগিল, এবং মেয়েদের এই সামাজিক স্বাধীনতাকেই একশবার করিয়া বলিতে লাগিল, এ হইতেই পারে না, এমন কিছুতেই চলিবে না। বর্ম্মা নষ্ট হইতেছে, ইউরোপ উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে—সেই ধার করা সভ্যতা আমাদের দেশেও আমদানী করিলে আমরা সমূলে মরিব। আমাদের সমাজ যাঁহারা গড়িয়াছিলেন, নারীকে তাঁহারা চিনিয়াছিলেন, তাই ত এই সতর্ক বিধি-নিষেধ! ইহা কঠোর হউক, কিন্তু কল্যাণে পরিপূর্ণ। এ দুর্দ্দিনে যদি না তাঁহাদের অসংশয়ে ধরিয়া থাকিতে পারি ত মৃত্যু হইতে কেহই আমাদের বাঁচাইতে পারিবে না। এমনি ধারা কত কি সে সেই অন্ধকারে একাকী বসিয়া আপন মনে বলিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু হায় রে! সোজা কথাটা তাহার মনে একবারও উদয় হইল না যে, যে মুক্তিমন্ত্রকে সে এ-জীবনে একমাত্র ব্রত বলিয়া কায়-মনে গ্রহণ করিতে চাহিতেছে, তাহারই আর এক মূর্ত্তিকে সে দুই হাতে ঠেলিয়া মুক্তির সত্যকার দেবতাকেই সসম্মানে দূর করিয়া দিতেছে! মুক্তি কি তোমার এমনই ছোট্ট একটুখানি জিনিস? তাহাকে কি তোমার আরামে চোখ বুজিয়া স্নান করিবার চৌবাচ্চা স্থির করিয়া বসিয়া আছ? সে সমুদ্র—আছেই ত

তাহাতে ভয়, আছেই ত তাহাতে উত্তাল তরঙ্গ, আছেই ত তাহাতে কুমীর হাঙর! তরী সেইখানেই ডোবে,- তবু সেইখানেই আছে জগতের প্রাণ,—তারই মধ্যে আছে সকল শক্তি, সকল সম্পদ, সকল সার্থকতা! নিরাপদ পুকুর লইয়া কেবলমাত্র প্রাণ ধারণ করাটুকুই চলে, বাঁচা চলে না!

বাবুজী, আপনার খাবার তৈরি!

অপূর্ব্ব চকিত হইয়া কহিল, রামশরণ, একটা আলো নিয়ে আয়। কাল সকালের গাড়িতেই আমরা মিক্‌থিলা যাবো। ম্যানেজারকে একটা খবর দে।

আরদালি কহিল, কিন্তু আপনার যে পরশু যাবার কথা ছিল?

না, আর পরশু নয়, কালই,—একটা আলো দিয়ে যা, এই বলিয়া অপূর্ব্ব এ সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিল। সমাজের মধ্যে মেয়েদের স্বাধীনতার একটা নূতন দিক দেখিয়া মন তাহার উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু আরও যে দিক আছে যাহার বর্ণ ও আলো সমস্ত গগন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারে, এ দৃশ্য আজ তাহার মনে স্বপ্নেও উদয় হইল না।

পরদিন যথাসময়ে সে মিক্‌থিলার উদ্দেশে যাত্রা করিল। কিন্তু এখানে আসিয়া তাহার মন টিকিল না। দেশী ও বিলাতি পল্টনের ছাউনি আছে, বাঙালী অনেকগুলি সপরিবারে বাস করিতেছেন—খাসা সহর, নূতন লোকের পক্ষে দেখিয়া বেড়াইবার অনেক বস্তু আছে, কিন্তু এ-সকল তাহার ভাল লাগিল না। মনটা রেঙ্গুনের জন্য কেবলই ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ভামোয় থাকিতে রিডাইরেক্ট করা মায়ের একখানা পত্র সে পাইয়াছিল, রামদাসেরও গোটা-দুই চিঠি তাহার আসিয়াছিল, কিন্তু সেও প্রায় দশ-বারো দিন পূর্ব্বে। রামদাস জানাইয়াছিল তাহার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত বাসা বদল করিবার প্রয়োজন নাই এবং সে নিজে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছে তেওয়ারীজী সুখে এবং শান্তিতে বাস করিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে সে কেমন আছে, তাহার সুখ-শান্তি বজায় আছে, কিংবা দুইই অন্তর্হিত হইয়াছে— কোন খবরই তাহাকে দেওয়া হয় নাই। খুব সম্ভব সমস্তই ঠিক আছে, ব্যাঘাত কিছুই হয় নাই, কিন্তু তবু একদিন সে ভামোর মতই হঠাৎ জিনিসপত্র বাঁধিয়া স্টেশনের জন্য গাড়ি ডাকিতে হুকুম করিয়া দিল। এই স্থানটাকে মনে রাখিবার মত কিছুই তাহার ঘটে নাই, যৎসামান্য কাজ-কর্ম্মের মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই ছিল না, কিন্তু ছাড়িয়া যাইবার মিনিট পনর পূর্ব্বে স্টেশনে আসিয়া এমন একটা ব্যাপার ঘটিল যাহা আপাততঃ সামান্য ও সাধারণ বোধ হইলেও ভবিষ্যতে বহুদিন তাহাকে স্মরণ করিতে হইয়াছে। একজন মাতাল বাঙালীর ছেলেকে রেলের লোক ট্রেন হইতে নামাইয়াছে। পরণে তাহার মলিন ও ছিন্ন হ্যাটকোট প্রভৃতি বিলাতি পোষাক। সঙ্গে কেবল একটা ভাঙা

বেহালায় বাক্স, না আছে বিছানা, না আছে কিছু। টিকিটের পয়সায় সে মদ কিনিয়া খাইয়াছে এইমাত্র তাহার অপরাধ। বাঙালীর ছেলে, পুলিশে লইয়া যায়, —অপূর্ব্ব তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিল, আরও গোটা-পাঁচেক টাকা তাহার হাতে দিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতেছিল, হঠাৎ সে হাতজোড় করিয়া কহিল, মশাই, আমার এই বেহালাখানা আপনি নিয়ে যান, বিক্রী করে টাকাটা আপনার কেটে নিয়ে বাকী আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। তাহার কণ্ঠস্বরের জড়িমা সত্ত্বেও ইহা বুঝা গেল সে সজ্ঞানেই কথা কহিতেছে।

অপূর্ব্ব কহিল, কোথায় ফিরিয়ে দেবো?

সে কহিল, আপনার ঠিকানা বলে দিন, আপনাকে চিঠি লিখে জানাব।

অপূর্ব্ব কহিল, তোমার বেহালা তোমার থাক বাপু, ও আমি বিক্রী করতে পারবো না। আমার নাম অপূর্ব্ব হালদার, রেঙ্গুনের বোথা কোম্পানীতে চাকরি করি, যদি কখনো তোমার সুবিধে হয় টাকা পাঠিয়ে দিয়ো।

সে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা মশাই নমস্কার—আমি নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেব। বার হবার পথ বুঝি ওই দিকে? বেশ বড় সহর, না? বোধ হয় সব জিনিসই পাওয়া যায়। বাস্তবিক মশায়, আপনার দয়া আমি কখনো ভুলব না। এই বলিয়া সে আর একটা নমস্কার করিয়া বেহালার বাক্স বগলে চাপিয়া চলিয়া গেল। তাহার চেহারাটা এইবার অপূর্ব্ব লক্ষ্য করিয়া দেখিল। বয়স বেশি নয়, কিন্তু ঠিক কত বলা শক্ত। বোধ হয় সর্ব্বপ্রকার নেশার মাহাত্ম্যে বছর-দশেকের ব্যবধান ঘুচিয়া গেছে। বর্ণ গৌর, কিন্তু রৌদ্রে পুড়িয়া তামাটে হইয়াছে; মাথায় রুক্ষ লম্বা চুল কপালের নীচে ঝুলিতেছে, চোখের দৃষ্টি ভাসা ভাসা, নাক খাঁড়ার মত সোজা এবং তীব্র। দেহ শীর্ণ, হাতের আঙুলগুলো দীর্ঘ এবং সরু—সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া উপবাস ও অত্যাচারের চিহ্ন আঁকা। সে চলিয়া গেলে অপূর্ব্বর কেমন যেন একটা কষ্ট হইতে লাগিল। তাহাকে আর অধিক টাকা দেওয়া বৃথা এমন কি অন্যায় একথা সে বুঝিয়াছিল, কিন্তু আর কোন কিছু একটা উপকার করা যদি সম্ভব হইত! কিন্তু এ লইয়া চিন্তা করিবার আর সময় ছিল না, তাহাকে টিকিট কিনিয়া গাড়ির জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

পরদিন রেঙ্গুনে যখন সে পৌঁছিল তখন বেলা বারোটা। যেমন কড়া রৌদ্র তেমনি গুমোট গরম। তাহার উপর বিপদ এই হইয়াছিল যে, তাড়াতাড়ি ও অসাবধানে তাহার খাবারের পাত্রটা মুসলমান কুলি ছুঁইয়া ফেলিয়াছিল। স্নান নাই, আহার নাই—ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে তাহার দেহ যেন টলিতে লাগিল। কোন মতে বাসায় পৌঁছিয়া স্নান করিয়া এইবার শুইতে পাইলে যেন বাঁচে। ঘোড়ার গাড়ি

ভাড়া হইয়া আসিলে জিনিসপত্র বোঝাই দিয়া বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে মিনিট-দশেক মাত্র লাগিল। কিন্তু উপরের দিকে চাহিয়া তাহার ক্রোধের অবধি রহিল না। তেওয়ারীর কোন উৎকণ্ঠাই নাই, রাস্তার দিকে বারান্দার কবাটটা পর্য্যন্ত খোলে নাই, গাড়ির শব্দে একবার নামিয়াও আসিল না। দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া দ্বারের উপরে সজোরে করাঘাত করিয়া ডাকিল, তেওয়ারী! ওরে ও তেওয়ারী! ক্ষণকাল পরে আস্তে, অত্যন্ত সাবধানে কবাট খুলিয়া গেল। ক্রুদ্ধ অপূর্ব্ব ঘরের মধ্যে পা বাড়াইবে কি, বিস্ময়ে অবাক ও হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সুমুখে দাঁড়াইয়া ভারতী। তাহার এ কি মূর্ত্তি! পায়ে জুতা নাই, পরণে একখানি কালো রঙের শাড়ি, চুল শুক্‌নো এলো-মেলো, মুখের উপর শান্ত গভীর বিষাদের ছায়া,—এ যেন কোন বহুদূরের তীর্থযাত্রী, রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় রাত্রি-দিবা পথ চলিয়াছে—যে কোন মুহূর্ত্তেই পথের 'পরে পড়িয়া মরিতে পারে। ইহার প্রতি কেহ যে কোনদিন রাগ করিতে পারে অপূর্ব্ব মনে করিতেই পারিল না। ভারতী মাথা নোয়াইয়া একটু নমস্কার করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আপনি এসেচেন, এবার তেওয়ারী বাঁচবে।

ভয়ে অপূর্ব্বর স্বর জড়াইয়া গেল, কহিল, কি হয়েচে তার?

ভারতী তেমনি মৃদুকণ্ঠে বলিল, এদিকে অনেকের বসন্ত হচ্চে, তারও হয়েচে। কিন্তু আপনি ত এখন এত পরিশ্রমের পরে এঘরে ঢুকতে পাবেন না। উপরের ঘরে চলুন, ঐখানে বরঞ্চ স্নান করে একটু জিরিয়ে নীচে আসবেন। তাছাড়া ও ঘুমোচ্ছে জাগলে আপনাকে খবর দেব।

অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, উপরের ঘরে?

ভারতী বলিল, হাঁ। ঘরটা এখনো আমাদের আছে, কিন্তু আমি চলে গেছি। বেশ পরিষ্কার করা আছে, কলে জল আছে, কেউ নেই, আপনার কষ্ট হবে না, চলুন। কিন্তু আপনার লোকজন কই? সঙ্গের জিনিসপত্রগুলো তারা ওইখানেই নিয়ে আসুক।

কিন্তু তাদের ত আমি স্টেশন থেকে ছেড়ে দিয়েছি। তারাও ত আমারি মত ক্লান্ত হয়েছিল।

ভারতী কহিল, তা বটে, কিন্তু এখন কি কুলি পাওয়া যাবে? আচ্ছা, দেখি।

আপনাকে দেখতে হবে না, আমিই দেখচি। ওই কটা জিনিস আমি নিজেই আনতে পারবো, বলিয়া অপূর্ব্ব নীচে যাইতেছিল, গাড়োয়ান মুখ বাড়াইয়া ভাড়া চাহিল। ভারতী তাহাকে ইসারায় উপরে ডাকিয়া কহিল, এখন ত লোক পাওয়া যাবে

না, তুমি যদি একটু কষ্ট করে জিনিসগুলো তুলে দিয়ে যাও তোমাকে তার দাম দেব। তাহার স্নিগ্ধ কথায় খুশী হইয়া গাড়োয়ান জিনিস আনিতে গেল।

সমস্ত আসিয়া পড়িলে ভারতী পথের দিকের ঘরটায় মেঝের উপর পরিপাটি করিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া দিয়া কহিল, এইবার স্নান করে আসুন।

অপূর্ব্ব কহিল, সমস্ত ব্যাপারটা আগে আমাকে খুলে বলুন।

ভারতী কলের ঘরটা দেখাইয়া দিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আগে স্নান করে আপনার সন্ধ্যে-আহ্নিকগুলো সেরে আসুন।

অপূর্ব্ব জিদ্ করিল না। খানিক পরে সে স্নান প্রভৃতি সারিয়া আসিলে ভারতী একটু হাসিয়া বলিল, আপনার এই গেলাসটা নিন, জানলার উপরে কাগজে মোড়া ওই চিনি আছে নিয়ে আমার সঙ্গে কলের কাছে আসুন, কি করে সরবৎ তৈরি করিতে হয় আমি শিখিয়ে দিই। চলুন।

অধিক বলার প্রয়োজন ছিল না, তৃষ্ণায় তাহার বুক ফাটিতেছিল, সে নির্দ্দেশ মত সরবৎ তৈরি করিয়া পান করিল এবং একটু নেবুর রস হইলে আরও ভাল হইত তাহা নিজেই কহিল।

ভারতী বলিল, আপনাকে যে আরও একটা দুঃখ আমাকে দিতে হবে, বলিয়া সে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অপূর্ব্বর সেই ছুটির দিনের কথাবার্ত্তা, কাজ-কর্ম্মের ধরণ-ধারণ মনে পড়িয়া নিজেরও কথা কহা যেন সহজ হইয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম দুঃখ?

ভারতী কহিল, নীচে থেকে আমি কয়লা এনে রেখেচি, টেলিগ্রাম পেয়ে সুমুখের বাড়ির উড়ে ছেলেটিকে দিয়ে আপনার সেই লোহার উনুনটি মাজিয়ে ধুইয়ে নিয়েচি, চাল আছে, ডাল আছে, আলু, পটল, ঘি, তেল, নুন, সমস্ত মজুত আছে,—পেতলের হাঁড়িটা এনে দিচ্চি। আপনি শুধু একটু জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে চড়িয়ে দেবেন। এই বলিয়া সে অপূর্ব্বর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব আন্দাজ করিয়া বলিল, সত্যি বলচি কিছু শক্ত কাজ নয়। আমি সমস্ত দেখিয়ে দেব, আপনি শুধু চড়াবেন আর নামাবেন। আজকের মত এই কষ্টটি করুন, কাল অন্য ব্যবস্থা হবে।

তাহার কণ্ঠস্বরের ঐকান্তিক ব্যাকুলতা অপূর্ব্বকে হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা মারিল। সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনার খাবার ব্যবস্থা কি রকম হয়? কখন বাসায় যান?

ভারতী কহিল, বাসায় নাই গেলাম, কিন্তু আমাদের খাবার ভাবনা আছে নাকি? এই বলিয়া সে কথাটা উড়াইয়া দিয়া প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আনিতে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

ঘণ্টাখানের পরে অপূর্ব্ব রাঁধিতে বসিলে সে ঘরের চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিল, এখানে দাঁড়ালে দোষ হয় না তা' জানেন ত?

অপূর্ব্ব কহিল, জানি, কারণ, হলে আপনি দাঁড়াতেন না। জীবনে সে এই প্রথম রাঁধিতে বসিয়াছে, অপটু হস্তের সহস্র ত্রুটিতে মাঝে মাঝে ভারতীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে লাগিল, কিন্তু রাঁধা ডাল বাটিতে ঢালিতে গিয়া যখন বাটি ছাড়া আর সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িল তখন সে আর সহিতে পারিল না। রাগ করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা, আপনাদের মত অকর্ম্মা লোকগুলোকে কি ভগবান সৃষ্টি করেন শুধু আমাদের জব্দ করতে? খাবেন কি করে বলুন ত?

অপূর্ব্ব নিজেই অপ্রতিভ হইয়াছিল, কহিল, এ যে হাঁড়ির ওদিক দিয়ে না পড়ে এদিক দিয়ে গড়িয়ে পড়বে কি করে জানব বলুন? আচ্ছা, ওপর থেকে একটু তুলে নেব?

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, নেবেন বই কি! নইলে আর বিচার থাকবে কি করে! নিন উঠুন, জল দিয়ে ওসব ধুয়ে ফেলে দিয়ে এই আলু-পটলগুলো তেল আর জল দিয়ে সেদ্ধ করে ফেলুন। গুড়ো মশলা ওই শিশিটাতে আছে, নুন দেবার সময়ে আমি না হয় দেখিয়ে দেব—তরকারী বলে ওই দিয়ে আজ আপনাকে খেতে হবে। ভাতের ফ্যান ত সব ভাতের মধ্যেই আছে, নেহাৎ মন্দ হবে না। আঃ—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার রান্না দেখার চেয়ে বরং নরক ভোগ ভাল।

ইহার ঘণ্টা-দেড়েক পরে অপূর্ব্বর আহার শেষ হইলে সে কৃতজ্ঞতার আবেগ দমন করিয়া শান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনাকে আমি যে কি বলব ভেবে পাইনে, কিন্তু এবার আপনি বাসায় যান। এখন থেকে আমিই দেখতে পারবো, আর আপনাকে বোধ হয় এত দুঃখ ভোগ করতে হবে না।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব্ব নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিল, কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন। এদিকে আরও দশজনের বসন্ত হচ্চে তেওয়ারীরও হয়েচে—এ পর্য্যন্ত খুব সোজা। কিন্তু এ বাসা থেকে আপনাদের সবাই চলে গেলে এই নির্ব্বান্ধব দেশে এবং ততোধিক বন্ধুহীন পুরীতে আপনি কি করে যে তার প্রাণ দিতে রয়ে গেলেন এইটেই আমি কোনমতে ভেবে পাইনে। জোসেফ সাহেবও কি আপত্তি করেননি?

ভারতী কহিল, বাবা বেঁচে নেই, তিনি হাসপাতালেই মারা গেছেন।

মারা গেছেন? অপূর্ব্ব অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, আপনার কালো কাপড় দেখে এমনি কোন একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা আমার পূর্ব্বেই অনুমান করা উচিত ছিল।

ভারতী কহিল, তার চেয়েও বড় দুর্ঘটনা হঠাৎ মা যখন মারা গেলেন—

মা মারা গেছেন? অপূর্ব্ব স্তব্ধ অসাড় হইয়া বসিয়া রহিল। নিজের মায়ের কথা মনে পড়িয়া তাহার বুকের মধ্যে কি একরকম করিতে লাগিল যা কখনো সে পূর্ব্বে অনুভব করে নাই। ভারতী নিজেও জানালার বাহিরে মিনিট-দুই নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া অশ্রু সংবরণ করিল। মুখ ঘুরাইতে গিয়া দেখিল অপূর্ব্ব সজলচক্ষে তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। আবার তাহাকে জানালার বাহিরে চোখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল। কাহারো কাছেই অশ্রুপাত করিতে তাহার অত্যন্ত লজ্জা করিত। কিন্তু আপনাকে শান্ত করিয়া লইতেও তাহার বিলম্ব হইত না, মিনিট দুই-তিন পরে ধীরে ধীরে বলিল, তেওয়ারী বড় ভাল লোক। আমার মা অনেকদিন থেকেই শয্যাগত ছিলেন, যে কোন সময়েই তাঁর মৃত্যু হতে পারে আমরা সবাই জানতুম। তেওয়ারী আমাদের অনেক করেচে। আমরা চলে যাবার সময় সে কাঁদতে লাগলো, কিন্তু এত ভাড়া আমি কোথা থেকে দেব?

অপূর্ব্ব নীরবে শুনিতে লাগিল। ভারতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আপনার সেই চুরি ধরা পড়েচে, টাকা, বোতাম পুলিশে জমা আছে আপনি খবর পেয়েচেন?

কই না!

হাঁ, ধরা পড়েচে। ওকে যারা সেদিন তামাসা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরই দল। আরও কার কার চুরি করার পরে, বোধ হয় ভাগাভাগি নিয়ে বনিবনা না হওয়াতেই একজন সমস্ত বলে দিয়েচে। এক চেঠির দোকানে যা কিছু জমা রেখেছিল পুলিশ সমস্ত উদ্ধার করেচে। আমি একজন সাক্ষী, এইখানে সন্ধান নিয়ে তারা একদিন আমার কাছে উপস্থিত—সেই খবরটা দিতে এসেই ত দেখি এই ব্যাপার। কবে মকদ্দমা ঠিক জানি নে, কিন্তু সমস্ত ফিরে পাওয়া যাবে শুনেচি।

এই শেষ কথাটা হয়ত সে না বলিলেই পারিত, কারণ লজ্জায় অপূর্ব্বর মুখ শুধু আরক্তই হইল না, এই ব্যাপারে নিজের সেই সকল ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইঙ্গিতগুলা মনে করিয়া তাহার গায়ে কাঁটা দিল। কিন্তু ভারতী এ সব লক্ষ্য করিল না, বলিতে লাগিল, ভেতর থেকে দোর বন্ধ, কিন্তু হাজার ডাকাডাকিতেও কেউ সাড়া দিলে না। আমাদের উপরের ঘরের চাবিটা আমার কাছে ছিল, খুলে ভিতরে গেলাম। মেঝেতে আমার একটা প্রসিদ্ধ ফুটো আছে—বলিয়া সে একটুখানি লজ্জার মৃদু হাসি গোপন করিয়া কহিল, তার মধ্যে দিয়ে আপনার ঘরের সমস্ত দেখা যায়, দেখি সমস্ত জানালা বন্ধ, অন্ধকারে কে একজন আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে,—তেওয়ারী বলেই বোধ হ'ল। সেই ফুটো দিয়ে চেঁচিয়ে একশ'বার বললাম, তেওয়ারী, আমি, আমি ভারতী, কি হয়েচে? দোর খোল। নিচে এসে আবার

তেমনি ডাকাডাকি করতে লাগলাম, মিনিট-কুড়ি পরে তেওয়ারী হামাগুড়ি দিয়ে এসে কোনমতে দোর খুলে দিলে। তার চেহারা দেখে আমার বলবার কিছু আর রইল না। দিন-চারেক পূর্ব্বে সুমুখের বাড়ির নীচের ঘর থেকে বসন্তরুগী জন-দুই তেলেগু কুলিকে পুলিশের লোকে হাসপাতালে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কান্না আর অনুনয়-বিনয় তেওয়ারী নিজের চোখেই দেখেচে,—আমার পা দুটো সে দুহাতে চেপে ধরে একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললে, মাইজী! আমাকে পেলেগ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ো না, তাহলে আমি আর বাঁচব না। কথাটা মিথ্যে নেহাৎ নয়, ফিরতে কাউকে বড় শোনা যায় না। সেই ভয়ে সে দোর জানালা দিবারাত্রি বন্ধ করে পড়ে আছে—পাড়ার কেউ ঘুণাক্ষরে জানলে আর রক্ষে নেই।

অপূর্ব্ব অভিভূতের ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, কহিল, আর সেই থেকে আপনি একলা দিনরাত আছেন—আমাকে একটা খবর পাঠালেন না কেন? আমাদের আফিসের তলওয়ারকরবাবুকে ত জানেন। তাঁকে বলে পাঠালেন না কেন? ভারতী কহিল, কে যাবে? লোক কই? ভেবেছিলাম, হয়ত খবর নিতে একদিন তিনি আসবেন, কিন্তু এলেন না। এ বিপদ যে ঘটেচে তিনিই বা কি করে ভাববেন? তা ছাড়া জানাজানি হয়ে যাবার ভয় আছে।

তা বটে। বলিয়া অপূর্ব্ব একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে কহিল, আপনার নিজের চেহারা কি হয়ে গেছে দেখেচেন?

ভারতী একটু হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ এর চেয়ে আগে ঢের ভাল ছিল?

অপূর্ব্বর মুখে সহসা এ কথার উত্তর যোগাইল না, কিন্তু তাহার দুই চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার গঙ্গাজল দিয়া যেন এই তরুণীর সর্ব্বাঙ্গের সকল গ্লানি, সকল ক্লান্তি ধুইয়া মুছিয়া দিতে চাহিল। অনেকক্ষণ পরে কহিল, মানুষে যা করে না, তা আপনি করেচেন, কিন্তু এবার আপনার ছুটি। তেওয়ারী শুধু আমার চাকর নয়, সে আমার বন্ধু, আমার আত্মীয়—তার কোলে-পিঠে চড়ে আমি বড় হয়েচি। এখন থেকে তার রোগে আমিই সেবা করব—কিন্তু তার জন্যে আপনাকে আমি পীড়িত হতে দিতে পারব না। এখনো আপনার স্নানাহার হয়নি, আপনি বাসায় যান। সে কি এখান থেকে বেশি দূরে?

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। বাসা আমার তেলের কারখানার পাশে, নদীর ধারে। আমি কাল আবার আসবো। দুইজনে নীচে নামিয়া আসিল; তালা খুলিয়া উভয়ে ঘরে প্রবেশ করিল। তেওয়ারীর সাড়া নাই, ঘুম ভাঙ্গিলেও সে অধিকাংশ সময় অজ্ঞান আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকে। অপূর্ব্ব গিয়া তাহার বিছানার পাশে বসিল এবং যে দুই-চারিটি অপরিষ্কার পাত্র তখনও মাজিয়া ধুইয়া

রাখা হয় নাই, সেইগুলি হাতে লইয়া ভারতী স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল যাইবার পূর্ব্বে রোগীর সম্বন্ধে গোটা-কয়েক প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া এই দুর্দ্দান্ত ভয়ানক রোগের মধ্যে আপনাকে সাবধানে রাখিবার অত্যাবশ্যকতা বারবার স্মরণ করাইয়া দিয়া যায়। হাতের কাজ শেষ করিয়া সে এই কথাগুলিই মনে মনে আবৃত্তি করিয়া এ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল অপূর্ব্ব অচেতন তেওয়ারীর অতি বিকৃত মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া যেন পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া আছে, তাহার নিজের মুখ একেবারে ছাইয়ের মত সাদা। বসন্ত রোগ সে জীবনে দেখে নাই, ইহার ভীষণতা তাহার কল্পনার অগম্য। ভারতী কাছে গিয়া দাঁড়াইতে সে মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার দুই চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল এবং সেই চক্ষে পলক না পড়িতেই ঠিক ছেলেমানুষের মতই ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি পারব না।

৯

ভারতী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া শুধু কহিল, পারবেন না? তাই ত!

তাহার কণ্ঠস্বরে একটুখানি বিস্ময়ের আভাস ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, কিন্তু এই কি জবাব? এই কি সে তাহার কাছে আশা করিয়াছিল? হঠাৎ যেন মার খাইয়া অপূর্ব্বর তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

ভারতী কহিল, তাহলে একটা খবর দিয়ে ত ওকে হাসপাতালেই পাঠাতে হয়। তাহার কথার মধ্যে শ্লেষও ছিল না, ঝাঁজও ছিল না, কিন্তু লজ্জায় অপূর্ব্বর মাথা হেঁট হইল। লজ্জা শুধু তাহার না পারার জন্য নয়, যে পারে তাহাকেই পারিতে বলার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের মধ্যে লুকাইয়া আরও প্রচ্ছন্ন যে দাবী ছিল, ভারতীর শান্ত প্রত্যাখানে সে যখন কঠিন তিরস্কারের আকারে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বাজিল, তখন আনতমুখে বসিয়া অত্যন্ত অনুশোচনার সহিত তাহাকে আর একবার মনে করিতে হইল, এই মেয়েটিকে সে যথার্থই চিনে নাই। দুঃখ দুশ্চিন্তা কোথাও কিছু ছিল না,—ছিল যেন কেবল কত দীপ, কত আলো জ্বালা;—হঠাৎ কে যেন সমস্ত একফুঁয়ে নিবাইয়া দিয়া অসমাপ্ত নাটকের মাঝখানে যবনিকা টানিয়া দিল। ভয়ানক অন্ধকারে রহিল শুধু সে আর তার অপরিত্যজ্য মরণোন্মুখ অচেতন তেওয়ারী।

ভারতী বলিল, বেলা থাকতে থাকতেই কিছু করা চাই। বলেন ত আমি যাবার পথে হাসপাতালে একটা টেলিফোন করে দিয়ে যেতে পারি। তারা গাড়ি এনে তুলে নিয়ে যাবে।

অপূর্ব্ব তাহার আচ্ছন্ন ভাব জোর করিয়া কাটাইয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি যে বললেন সেখানে গেলে কেউ বাঁচে না?

ভারতী কহিল, কেউ বাঁচে না এ কথা ত বলিনি।

অপূর্ব্ব অত্যন্ত মলিনমুখে বলিল, তাহলে বেশি লোকেই ত মরে যায়?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, তা যায়। এই জন্যই জ্ঞান থাকতে কেউ সেখানে কিছুতে যেতে চায় না।

অপূর্ব্ব চুপ করিয়া ক্ষণকাল বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তেওয়ারীর কি কিছু জ্ঞান নেই?

ভারতী কহিল, কিছু আছে বই কি। সব সময়ে না থাকলেও মাঝে মাঝে সমস্তই টের পায়।

এই সময়ে তেওয়ারী সহসা কি এক প্রকার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতে অপূর্ব্ব এমন চমকিয়া উঠিল যে, ভারতী তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সে কাছে আসিয়া রোগীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, কি চাই তেওয়ারী?

তেওয়ারী ঠোঁট নাড়িয়া যাহা বলিল অপূর্ব্ব তাহার কিছুই বুঝিল না, কিন্তু ভারতী সাবধানে তাহাকে পাশ ফিরাইয়া দিয়া ঘটি হইতে একটুখানি জল তাহার মুখে দিয় কানে কানে কহিল, তোমার বাবু এসেছেন যে।

প্রত্যুত্তরে তেওয়ারী অব্যক্ত ধ্বনি করিল, ডান হাতটা একবার তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু নাড়িতে পারিল না। পরক্ষণেই দেখা গেল তাহার নিমীলিত চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। অপূর্ব্বর নিজের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁট দিয়া তাহা সে মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু থামাইতে পারিল না—বারে বারে সেই দুটি আর্দ্র চক্ষু প্লাবিত করিয়া অজস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মিনিট দুই-তিন কেহ কোন কথা কহিল না। সমস্ত ঘরখানি দুঃখ ও শোকের ঘন-মেঘে যেন থম্ থম্ করিতে লাগিল। কথা কহিল প্রথমে ভারতী। সে একটুখানি সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল, কি আর করা যাবে, হাসপাতালেই পাঠিয়ে দিন।

অপূর্ব্ব চোখের উপর হইতে তখনও আবরণ সরাইতে পারিল না, কিন্তু মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

ভারতী তেমনি আস্তে আস্তে কহিল, সেই ভাল। আমি এখন তাহলে চললুম। যদি সময় পাই কাল একবার আসবো।

তখনও অপূর্ব্ব চোখ খুলিতে পারিল না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। যাইবার

পূর্ব্বে ভারতী বলিল, সবই আছে, কেবল মোমবাতি ফুরিয়ে গেছে, আমি নীচে থেকে এক বাণ্ডিল কিনে দিয়ে যাচ্ছি, এই বলিয়া সে নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। মিনিট-কয়েক পরে বাতি লইয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন কতকটা পরিমাণে বোধ হয় আপনাকে অপূর্ব্ব সামলাইয়া লইতে পারিয়াছিল। চোখ মুছা শেষ হইয়াছে, কিন্তু ভিজা পাতার নীচে সে দুটি রাঙা হইয়া আছে। ভারতী ঘরে ঢুকিতেই সে আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। হাতের মোড়কটি কাছে রাখিয়া দিয়া কি যেন সে একবার বলিতে চাহিল, কিন্তু আর একজন যখন কথা না কহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, তখন সেও আর প্রশ্ন না করিয়া পলকমাত্র নিঃশব্দে থাকিয়া প্রস্থানের জন্য দ্বার খুলিতেই অপূর্ব্ব অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, তেওয়ারী যদি জল খেতে চায়?

ভারতী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, জল দেবেন।

অপূর্ব্ব কহিল, আর যদি পাশ ফিরে শুতে চায়?

ভারতী বলিল, পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেবেন।

বলা ত সহজ। আমি শোব কোথায় শুনি? তাহার কণ্ঠস্বরের ক্রোধ চাপা রহিল না, কহিল, বিছানা ত রইল ওপরের ঘরে।

ভারতী কি মনে করিল তাহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল না। এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া তেমনি শান্ত-মৃদুকণ্ঠে কহিল, আর একটা বিছানা ত আপনার খাটের ওপরে আছে, তাতে ত অনায়াসে শুতে পারবেন।

অপূর্ব্ব কহিল, আপনি ত বলবেনই ও-কথা। আর আমার খাবার বন্দোবস্ত কি রকম হবে?

ভারতী চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু এই অসঙ্গত ও অত্যন্ত খাপছাড়া প্রশ্নে গোপন হাসির আবেগে তাহার চোখের পাতা দুটি যেন কাঁপিতে লাগিল। খানিক পরে পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, আপনার শোওয়া এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করার ভার কি আমার ওপরে আছে?

তাই কি আমি বলচি?

এই মাত্র ত বললেন, এবং ভাল করে নয়, রাগ করে?

অপূর্ব্ব ইহার উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। তাহার মলিন বিপন্ন মুখের প্রতি চাহিয়া ভারতী ধীরে ধীরে কহিল, আপনার বলা উচিত ছিল, দয়া করে আমার এইসব বিলি-ব্যবস্থা আপনি করে দিন।

অপূর্ব্ব কোন দিকে না চাহিয়া কহিল, তা বলা আর শক্ত কি?

ভারতী কহিল, বেশ ত, তাই বলুন না।

তাই ত বলচি, বলিয়া অপূর্ব্ব মুখ ভারি করিয়া আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া রহিল।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কখনো কি কারও রোগে সেবা করেন নি?

না।

আর কখনো বিদেশেও আসেননি?

না। মা আমাকে কোথায় যেতে দেন না।

তবে, এবার যে বড় আপনাকে ছেড়ে দিলেন?

অপূর্ব্ব চুপ করিয়া রহিল। কেমন করিয়া এবং কি কারণে যে তাহার বিদেশে আসায় মা সম্মত হইয়াছিলেন একথা সে পরের কাছে বলিতে চাহিল না। ভারতী কহিল, এতবড় চাকরি,—না ছেড়ে দিলেই বা চলবে কেন? কিন্তু তিনি সঙ্গে এলেন না কেন?

তাহার এই প্রকার তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশে অপূর্ব্ব ক্ষুণ্ন হইয়া বলিল, আমার মাকে আপনি দেখেননি, নইলে একথা বলতে পারতেন না। অনেক দুঃখেই আমাকে ছেড়ে দিয়েচেন, কিন্তু বিধবা মানুষ, এ ম্লেচ্ছ-দেশে তিনি আসবেন কেমন করে?

ভারতী এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, ম্লেচ্ছদের প্রতি আপনাদের ভয়ানক ঘৃণা। কিন্তু রোগ ত শুধু গরীবের জন্য সৃষ্টি হয়নি, আপনারও ত হতে পারতো, এখনো ত হতে পারে, মা কি তাহলে আসবেন না?

অপূর্ব্বর মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, কহিল, এমন করে ভয় দেখালে আমি কি করে একলা থাকবো?

ভারতী কহিল, ভয় না দেখালেও আপনি একলা থাকতে পারবেন না। আপনি অত্যন্ত ভীতু মানুষ।

অপূর্ব্ব প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ভারতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি আমি। আমার হাতে জল খেয়ে তেওয়ারীর ত জাত গেছে, ভাল হয়ে সে কি করবে?

অপূর্ব্ব ইহার শাস্ত্রোক্ত বিধি জানিত না, একটু চিন্তা করিয়া কহিল, সে তো আর সজ্ঞানে খায়নি, মরণাপন্ন ব্যারামে খেয়েচে, না খেলে হয় ত মরে যেত। এতে বোধ হয় জাত যায় না, একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই হতে পারে।

ভারতী ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, হুঁ। তার খরচ বোধ হয় আপনাকেই দিতে হবে,—নইলে আপনি বা তার হাতে খাবেন কি করে?

অপূর্ব্ব তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিল, আমিই দেব বৈ কি, নিশ্চয় দেব। ভগবান করুন সে শীঘ্র ভাল হয়ে উঠুক।

ভারতী বলিল, আর আমিই শুশ্রূষা করে তাকে ভাল করে তুলি, না?

তাহার শান্ত কঠিন কণ্ঠস্বর অপূর্ব্ব লক্ষ্যই করিল না, কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উত্তর দিল, সে আপনার দয়া। তেওয়ারী বাঁচুক, কিন্তু আপনিই ত তার প্রাণ দিলেন।

ভারতী একটুখানি হাসিল। কহিল, ম্লেচ্ছতে প্রাণ দিলে দোষ নেই, মুখে জল দিলেই তার প্রায়শ্চিত্ত চাই, না? এই বলিয়া সে পুনরায় একটু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, এখন আমি চললাম। কাল যদি সময় পাই ত একবার দেখে যাবো। এই কথা বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আর যদি আসতে না পারি ত তেওয়ারী ভাল হলে তাকে বলবেন, আপনি না এসে পড়লে আমি যেতাম না, কিন্তু ম্লেচ্ছদেরও একটা সমাজ আছে, আপনার সঙ্গে একঘরে রাত্রি কাটালে তারাও ভাল বলে না। কাল সকালে আপনার পিয়ন এলে তলওয়ারকরবাবুকে খবর দেবেন। তিনি পাকা লোক, সমস্ত ব্যবস্থাই করে দিতে পারবেন। আচ্ছা, নমস্কার।

অপূর্ব্ব কহিল, পাশ ফিরিয়ে দিলে ওর লাগবে না?

ভারতী বলিল, না।

রাত্রে যদি বিছানা বদলে দেবার দরকার হয়? কি করে দেব?

ভারতী কহিল, সাবধানে দেবেন। আমি মেয়েমানুষ হয়ে যদি পেরে থাকি আপনি পারবেন না?

অপূর্ব্ব শঙ্কিতমুখে স্থির হইয়া রহিল। ভারতী যাইবার জন্য দ্বার খুলিতেই অপূর্ব্ব সভয়ে বলিয়া উঠিল, আর যদি হঠাৎ বসে? যদি কাঁদে?

ভারতী এ-সকল প্রশ্নের আর কোন জবাব দিবার চেষ্টা না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া সাবধানে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার মৃদু পদশব্দ কাঠের সিঁড়ির উপরে যতক্ষণ শুনা গেল ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল, কিন্তু শব্দ থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাহার চোখের উপরে কোথা হইতে একটা কালো জাল নামিয়া আসিয়া সমস্ত দেহ কি করিয়া যে উঠিল সে জীবনে কখনো অনুভব করে নাই। ভয়ে ছুটিয়া গিয়া বারান্দার কপাট খুলিয়া ফেলিয়া নীচে চাহিয়া দেখিল ভারতী দ্রুতপদে রাস্তায় চলিয়াছে। মিস জোসেফ নামটা সে মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতেই পারিল না, উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, ভারতী!

ভারতী মাথা তুলিয়া চাহিতে অপূর্ব্ব দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, একবার আসুন—মুখ দিয়া আর তাহার কথা বাহির হইল না। ভারতী দ্বিরুক্তি না করিয়া ফিরিল। মিনিট-দুই পরে দ্বার খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল অপূর্ব্ব নাই, তেওয়ারী একাকী পড়িয়া আছে। আগাইয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল বারান্দায় সে নাই

—কোথাও নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, স্নানের ঘরের কপাট খোলা। কিন্তু মিনিট পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করিয়াও যখন কেহ আসিল না, তখন সে সন্দিগ্ধচিত্তে দরজার ভিতরে গলা বাড়াইয়া যাহা দেখিতে পাইল তাহাতে ভয়ের আর সীমা রহিল না। অপূর্ব্ব মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুপুরবেলা যাহা কিছু খাইয়াছিল সমস্ত বমি করিয়াছে, তাহার চোখ মুদিত এবং সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভাসিয়া যাইতেছে। কাছে গিয়া ডাকিল, অপূর্ব্ববাবু!

প্রথম ডাকেই অপূর্ব্ব চোখ মেলিয়া চাহিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার চোখ বুজিয়া তেমনি স্থির হইয়া রহিল। ভারতী মুহূর্ত্তকাল দ্বিধা করিল, তাহার পরেই সে অপূর্ব্বর কাছে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, উঠে বসতে হবে যে। মাথায় মুখে জল না দিলে ত শরীর শোধরাবে না অপূর্ব্ববাবু।

অপূর্ব্ব উঠিয়া বসিলে সে হাত ধরিয়া তাহাকে কলের কাছে আনিয়া জল খুলিয়া দিলে সে হাত-মুখ ধুইয়া ফেলিল। তখন ধীরে ধীরে তাহাকে তুলিয়া আনিয়া খাটের উপরে শোয়াইয়া দিয়া ভারতী গামছার অভাবে নিজের আঁচল দিয়া তাহার হাত ও পায়ের জল মুছাইয়া দিল এবং একটা হাতপাখা খুঁজিয়া আনিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, এইবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, আপনি সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি যাবো না।

অপূর্ব্ব লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, কিন্তু আপনার যে এখনো খাওয়া হয়নি।

ভারতী বলিল, খেতে আর আপনি দিলেন কই? আপনি ঘুমোন।

ঘুমিয়ে পড়লে ত আপনি চলে যাবেন না?

না, আপনার ঘুম না ভাঙা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব।

অপূর্ব্ব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনাকে মিস ভারতী বলে ডাকলে কি আপনি রাগ করবেন?

নিশ্চয়ই করব। অথচ শুধু ভারতী বলে ডাকলে করব না।

কিন্তু অন্য সকলের সামনে?

ভারতী একটু হাসিয়া কহিল, হলই বা অন্য সকলের সামনে। কিন্তু চুপ করে একটু ঘুমোন দিকি—আমার ঢের কাজ আছে।

অপূর্ব্ব বলিল, ঘুমোতে আমার ভয় করে, আপনি পাছে ফাঁকি দিয়ে চলে যান।

কিন্তু জেগে থাকলেও যদি যাই, আপনি আটকাবেন কি করে?

অপূর্ব্ব চুপ করিয়া রহিল। ভারতী কহিল, আমাদের ম্লেচ্ছসমাজে কি সুনাম দুর্নাম বলে জিনিস নেই? আমাকে কি তার ভয় করে চলতে হয় না?

অপূর্ব্বর বুদ্ধি ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিল না, প্রত্যুত্তরে সে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া

বসিল। কহিল, আমার মা এখানে নেই, আমি রোগে পড়ে গেলে তখন আপনি কি করবেন? তখন ত আপনাকেই থাকতে হবে।

ভারতী কহিল, আমাকেই থাকতে হবে? আপনার বন্ধু তলওয়ারকরবাবুদের খবর দিলে হবে না?

অপূর্ব্ব সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না, তা কিছুতেই হবে না। হয় আমার মা, না হয় আপনি—একজনকে দেখতে না পেলে আমি কখ্‌খনো বাঁচব না। কাল যদি আমার বসন্ত হয়, এ কথা যেন আপনি কিছুতেই ভুলে যাবেন না। তাহার অনুরোধের শেষ দিকটা কি যে একরকম শুনাইল, ভারতী হঠাৎ আপনাকে যেন বিস্মৃত হইয়া গেল। বিছানার একপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া সে অপূর্ব্বর গায়ের উপর একটা হাত রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—না না, ভুলব না, ভুলব না! এ-কি কখনো আমি ভুলতে পারি? কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া চক্ষের পলকে উঠিয়া দাঁড়াইল। জোর করিয়া একটু হাসিয়া কহিল, কিন্তু ভুল হয়েও ত বিপদ কম ঘটবে না অপূর্ব্ববাবু! ঘটা করে আবার ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু ভয় নেই, তার দরকার হবে না। আচ্ছা, চুপ করে একটু ঘুমোন; বাস্তবিক, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

কি কাজ।

ভারতী কহিল, কি কাজ? খাওয়া ত দূরে থাক, সারাদিন স্নান পর্য্যন্ত করবার সময় পাইনি।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় স্নান করলে অসুখ করবে না?

ভারতী বলিল, করতেও পারে, অসম্ভব নয়। কিন্তু স্নানের ঘরে যে কাণ্ড করে রেখেচেন তা' পরিষ্কার করার পরে না নেয়ে কি কারু উপায় আছে নাকি? তারপর দুটো খেতেও হবে ত?

অপূর্ব্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিল, কিন্তু সে সব আমি সাফ করে ফেলবো—আপনি যাবেন না। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইতেছিল। ভারতী রাগ করিয়া কহিল, আর বাহাদুরির দরকার নেই, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। কিন্তু এতবড় ঠুনকো জিনিসটিকে যে মা কোন্‌ প্রাণে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন আমি তাই শুধু ভাবি। সত্যি বলচি, উঠবেন না যেন। তিনি নেই, কিন্তু এখানে আমার কথা না শুনলে ভারি অন্যায় হবে বলে দিচ্চি। এই বলিয়া সে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে শাসনের হুকুম জারি করিয়া দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

উদ্বিগ্ন, শ্রান্ত ও একান্ত নির্জ্জীবের ন্যায় অপূর্ব্ব কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সে জানিতেও পারে নাই, তাহার ঘুম ভাঙ্গিল ভারতীর ডাকে। চোখ মুছিয়া

বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সম্মুখের ঘড়িতে চাহিয়া দেখিল রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে। ভারতী পাশে দাঁড়াইয়া। অপূর্ব্বর প্রথম দৃষ্টি পড়িল তাহার চুলের আয়তন ও দীর্ঘতার প্রতি। সদ্যস্নান-সিক্ত বিপুল কেশভার ভিজিয়া যেমন নিবিড় কালো হইয়াছে, তেমনি ঝুলিয়া প্রায় মাটিতে পড়িয়াছে। স্নিগ্ধ সাবানের গন্ধে ঘরের সমস্ত রুদ্ধ বায়ু হঠাৎ যেন পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। পরণে একখানি কালো পাড়ের সূতার শাড়ি,- গায়ে জামা না থাকায় বাহুর অনেকখানি দেখা যাইতেছে ;--ভারতীর এ যেন আর এক নূতন মূর্ত্তি, অপূর্ব্ব পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই। তাহার মুখ দিয়া প্রথমেই বাহির হইল, এত ভিজে চুল শুকোবে কি করে ?

ভারতী কহিল, শুকোবে না। কিন্তু সে জন্যে ভাবতে হবে না, আপনি আসুন দিকি আমার সঙ্গে।

তেওয়ারী কেমন আছে ?

ভাল আছে। অন্ততঃ, আজ রাত্রির মত আপনাকে ভাবতে হবে না, আসুন।

তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব স্নানের ঘরে আসিয়া দেখিল ছোট একটি টুকরিতে কতকগুলি ফল-মূল, একটা বঁটি, একটা থালা, একটা গেলাস,—ভারতী দেখাইয়া কহিল, এর বেশী করা ত চলবে না। কলের জলে সমস্ত ধুয়ে ফেলুন বঁটি, থালা, গেলাস সব। গেলাসে করে জল নিন, নিয়ে ও-ঘরে আসুন, আমি আসন পেতে রেখেচি।

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, এ সকল আপনি কখন আনলেন ?

ভারতী বলিল, আপনি ঘুমোলে। কাছেই একটা ফলের দোকান আছে, দূরে যেতে হয়নি। আর টুকরিটা ত আপনাদেরই। এই বলিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল, শুধু সতর্ক করিয়া দিয়া গেল, বঁটি ধুইতে গিয়া যেন হাত না কাটে।

খানিক পরে আসনে বসিয়া অপূর্ব্ব ফল কাটিতেছিল এবং ভারতী অদূরে বসিয়া হাসিতেছিল। অপূর্ব্ব কহিল, আপনি হাসুন ক্ষতি নেই। পুরুষমানুষে বঁটিতে কাটতে পারে না সবাই জানে। কিন্তু আপনি আমার খাবার জন্যে যে যত্ন করেচেন সে জন্যে আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। মা ছাড়া এমন আর কেউ করতেন না।

তাহার শেষ কথাটা ভারতী কানেই তুলিল না। আগের কথার উত্তরে কহিল, হাসি কি সাধে অপূর্ব্ববাবু! পুরুষমানুষে বঁটিতে কাটতে পারে না সবাই জানে সত্যি, কিন্তু তাই বলে এমনটি কি সবাই জানে ? তেওয়ারী ভাল হয়ে গেলে মাকে আমি নিশ্চয়ই চিঠি লিখে দেব, হয় তিনি আসুন, না হয় ছেলেকে তাঁর ফিরিয়ে নিয়ে যান। এ মানুষকে বাইরে ছেড়ে রাখা চলবে না।

অপূর্ব্ব কহিল, মা তাঁর ছেলেকে ভাল করেই জানেন। কিন্তু দেখুন, আমি

না হয়ে আমার দাদাদের কেউ হলে আপনার এত কথা আজ চলত না। আপনাকে দিয়েই তাঁরা সব কাজ করিয়ে নিতেন।

ভারতী বুঝিতে পারিল না। অপূর্ব্ব কহিল, দাদারা ছোন না, খান না এমন জিনিসই নেই। মুর্গি এবং হোটেলের ডিনার না হ'লে ত তাঁদের খাওয়াই হয় না।

ভারতী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, বলেন কি?

অপূর্ব্ব কহিল, ঠিক তাই। বাবা ত অর্দ্ধেক ক্রীশ্চান ছিলেন বললেই হয়। মাকে কি এই নিয়ে কম দুঃখ পেতে হয়েছে!

ভারতী উৎসুক হইয়া কহিল, সত্য নাকি? কিন্তু মা বুঝি ভয়ানক হিন্দু?

অপূর্ব্ব বলিল, ভয়ানক আর কি, হিন্দু-ঘরের মেয়ের যথার্থ যা হওয়া উচিত, তাই। মায়ের কথা বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর করুণ এবং স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল, বাড়িতে দুই বউ, তবু মাকে আমার নিজে রেঁধে খেতে হয়। কিন্তু এমনি মা যে কখ্‌খনো কারু ওপর জোর করেন না, কখ্‌খনো কাউকে এর জন্যে অনুযোগ করেন না। বলেন, আমিও ত নিজের আচার-বিচার ত্যাগ করে আমার স্বামীর মতে মত দিতে পারিনি, এখন ওরাও যদি আমার মতে সায় দিতে না পারে ত নালিশ করা উচিত নয়। আমার বুদ্ধি এবং আমার সংস্কার মেনেই যে বউ-ব্যাটাদের চলতে হবে তার কি মানে আছে?

ভারতী ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া কহিল, মা সেকালের মানুষ, কিন্তু ধৈর্য্য ত খুব বেশী।

অপূর্ব্ব উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, ধৈর্য্য? মায়ের ধৈর্য্যের কি সীমা আছে নাকি? আপনি তাঁকে দেখেননি, কিন্তু দেখলে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন বলে দিচ্চি।

ভারতী প্রসন্ন মৌন মুখে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, অপূর্ব্ব ফলের খোসা ছাড়ানো বন্ধ রাখিয়া বলিতে লাগিল, ধরলে, সমস্ত জীবনই মা আমার দুঃখ পেয়ে আসচেন এবং সমস্ত জীবনই স্বামী-পুত্রদের ম্লেচ্ছাচার বাড়ির মধ্যে নিঃশব্দে সহ্য করে আসচেন। তাঁর একটি মাত্র ভরসা আমি। অসুখে-বিসুখে কেবল আমার হাতেই দুটো হবিষ্য সিদ্ধ তিনি মুখে দেন।

ভারতী কহিল, এখন ত তাঁর কষ্ট হতে পারে।

অপূর্ব্ব কহিল, পারেই ত। হয়ত হচ্চেও! তাই ত আমাকে তিনি প্রথমে ছেড়ে দিতে চাননি। কিন্তু, আমিও ত চিরকাল ঘরে বসে থাকতে পারিনে! কেবল তাঁর একটি আশা আমার বউ এলে আর তাঁকে রেঁধে খেতে হবে না।

ভারতী একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাঁর সেই আশাটি কেন পূর্ণ করেই এলেন না? সেই ত উচিত ছিল!

অপূর্ব্ব তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিয়া উঠিল, ছিলই ত। মেয়ে নিজে পছন্দ করে মা যখন সমস্ত ঠিক করেছিলেন তখনি আমাকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হল, সময় হল না। কিন্তু বলে এলাম, মা, যখনি চিঠি লিখবে তখনি ফিরে এসে তোমার আদেশ পালন করব।

ভারতী বলিল, তাই ত উচিত।

অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া কহিল, উচিত নয়? বার-ব্রত করবে, বিচার-আচার জানবে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে হবে,—মাকে কখনো দুঃখ দেবে না,—সেই ত আমি চাই। কাজ কি আমার গান-বাজনা-জানা কলেজে-পড়া বিদুষী মেয়ে?

ভারতী বলিল, দরকার কি!

অপূর্ব্ব নিজেই যে একদিন ইহার বিরোধী ছিল এবং বৌদিদিদের স্বপক্ষে লড়াই করিয়া মাকে রাগ করিয়া বলিয়াছিল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘর হইতে যাহোক একটা মেয়ে ধরিয়া আনিয়া ল্যাঠা চুকাইয়া দিতে, সে-কথা আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইল। বলিতে লাগিল, দেখুন আপনি আমাদের জাতও নয়, সমাজেরও নয়, জলটুকু পর্য্যন্ত নেওয়া যায় না, ছোঁয়া-ছুঁয়ি হলে কাপড়খানা অবধি ছেড়ে ফেলতে হয় এত তফাৎ, তবু আপনি যা বোঝেন আমার দাদারা কিংবা বৌদিদিরা তা বুঝতে চান না। যার যা ধর্ম্ম তাই ত তার মেনে চলা চাই? একবাড়ি লোকের মধ্যে থেকেও যে মা আমার একলা, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য কি আর আছে? তাই ভগবানের কাছে আমি শুধু এই প্রার্থনা করি, আমার কোন আচরণে আমার মা যেন না কোনদিন ব্যথা পান। বলিতে বলিতে তাহার গলা ভারি হইয়া অশ্রুভারে দুই চক্ষু টলটল করিতে লাগিল।

এই সময়ে ঘুমন্ত তেওয়ারী কি একটা শব্দ করিতে ভারতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল। অপূর্ব্ব হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া পুনরায় ফল বানাইতে প্রবৃত্ত হইল। মাকে সে অতিশয় ভালবাসিত এবং বাড়িতে থাকিতে সেই মাকে খুশী রাখিতে সে মাথার টিকি হইতে একাদশীর দিনে ভাতের বদলে লুচি খাওয়া অবধি সবই পালন করিয়া চলিত। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ সন্তানের আচারভ্রষ্টতাকে সে নিন্দাই করিত, কিন্তু প্রবাসে আসিয়া আচার-বিচারের প্রতি তাহার এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ বোধ হয় তাহার জননীও সন্দেহ করিতে পারিতেন না। আসল কথা এই যে, আজ তাহার দেহ-মন ভয়ে ও ভাবনায় নিরতিশয় বিকল হইয়াছিল, মাকে কাছে পাইবার একটা অন্ধ আকুলতায় ভিতরে ভিতরে তাহার কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিতেছিল, সেখানে সমস্ত ভাবই যে পরিমাণ হারাইয়া বিকৃত আতিশয্যে রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছিল এ খবর অন্তর্য্যামীর অগোচর রহিল না, কিন্তু ভারতীর বুকের মধ্যেটা অপমানের বেদনায় একেবারে টন্ টন্ করিতে লাগিল।

সে খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল অপূর্ব্ব কোনমতে ফল কাটা শেষ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কহিল, বসে আছেন, খাননি?

অপূর্ব্ব বলিল, না, আপনার জন্যে বসে আছি।

কিসের জন্যে?

আপনি খাবেন না?

না। দরকার হলে আমার আলাদা আছে।

অপূর্ব্ব ফলের থালাটা হাত দিয়া একটুখানি ঠেলিয়া দিয়া বলিল, বাঃ—তা' কি কখন হয়? আপনি সারাদিন খাননি, আর

তাহার কথাটা তখনো শেষ হয় নাই, একটা অত্যন্ত শুষ্ক চাপা কণ্ঠস্বরে জবাব আসিল, আঃ—আপনি ভারি জ্বালাতন করেন। ক্ষিদে থাকে খান, না হয় জানালা দিয়ে ফেলে দিন। এই বলিয়া সে মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল। বস্তুতঃ মুহূর্ত্ত মাত্রই তাহার মুখের চেহারা অপূর্ব্ব দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তকালই তাহার বুকে মরণকাল পর্য্যন্ত ছাপ মারিয়া দিল। এ মুখ সে আর ভুলিল না। সেই আসার দিন হইতে অনেকবার দেখা হইয়াছে; বিবাদে, সৌহৃদ্যে, শত্রুতায়, বন্ধুত্বে, সম্পদে ও বিপদে কতবার ত এই মেয়েটিকে সে দেখিয়াছে, কিন্তু সে-দেখার সহিত এ-দেখার সাদৃশ্য নাই। এ যেন আর কেহ।

ভারতী চলিয়া গেল, ফলের পাত্র তেমনি পড়িয়া রহিল এবং তেমনি নির্ব্বাক নিস্পন্দ কাঠের মত অপূর্ব্ব বসিয়া রহিল। কিসে যে কি হইল সে যেন তাহার উপলব্ধির অতীত।

ঘণ্টাখানেক পরে সে এ-ঘরে আসিয়া দেখিল তেওয়ারীর শিয়রের কাছে একটা মাদুর পাতিয়া ভারতী বাহুতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া তাহার খাটে শুইয়া পড়িল এবং শ্রান্ত চক্ষু মুদিত হইতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইল না। এই ঘুম যখন ভাঙ্গিল তখন ভোর হইয়াছে।

ভারতী কহিল, আমি চললুম।

অপূর্ব্ব ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, কিন্তু ভাল করিয়া চেতনা হইবার পূর্ব্বেই দেখিল, সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেছে।

১০

শেষোক্ত ঘটনার পরে মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তেওয়ারী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু গায়ে এখনও জোর পায় নাই। যে লোকটি সঙ্গে ভামোয় গিয়াছিল সে-ই রাঁধিতেছে। তেওয়ারীকে বাঁচাইবার জন্য প্রায় আফিসসুদ্ধ সকলেই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছে, রামদাস নিজে কতদিন ত বাসায় পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই। শহরের একজন বড় ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছেন, তাঁহারই সুপারিশে তাহাকে বসন্ত-হাসপাতালে লইয়া যায় নাই। এই ব্রহ্মদেশটা তেওয়ারীর কোনদিনই ভাল লাগে নাই, অপূর্ব্ব তাহাকে ছুটি দিয়াছে, স্থির হইয়াছে আর একটু সারিলেই সে বাড়ি চলিয়া যাইবে। আগামী সপ্তাহে বোধ হয় তাহা অসম্ভব হইবে না, তেওয়ারী নিজে এইরূপ আশা করে। ভারতী সেই যে গিয়াছে, কোনদিন খবর লইতেও আসে নাই। অথচ, এত বড় একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার নিজেদের মধ্যে তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত হইত না। ইহাতে তেওয়ারীর বিশেষ অপরাধ ছিল না; বরঞ্চ সে যেন ভয়ে ভয়েই থাকিত, পাছে কেহ তাহার নাম করিয়া ফেলে। ভারতী শত্রু-পক্ষীয়া, এখানে আসা অবধি তাহাদের অশেষ প্রকারে দুঃখ দিয়াছে, মিথ্যা সাক্ষের জোরে অপূর্ব্বকে জেল খাটাবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিয়াছে; মনিবের অবর্ত্তমানে তাহাকেই ঘরে ডাকিয়া আনার কথায় সে লজ্জা ও সংকোচ দুই-ই অনুভব করিত। কিন্তু সে কবে এবং কি ভাবে চলিয়া গেছে তেওয়ারী জানে না; জানিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিত, —তাহার উদ্বেগ ও আশঙ্কার অবধি ছিল না, কিন্তু কি করিয়া যে জানা যায় কিছুতেই খুঁজিয়া পাইত না। কখনো ভাবিত ভারতী চালাক মেয়ে, অপূর্ব্বর আসার সংবাদ পাইয়া সে নিজেই লুকাইয়া পলাইয়াছে। কখনো ভাবিত অপূর্ব্ব আসিয়া পড়িয়া হয়ত তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই দু'য়ের যাহাই কেননা ঘটিয়া থাক, ভারতী আপনি ইচ্ছা করিয়া যে এ বাটীতে আর তাহাকে দেখিতে আসিবে না, সে বিষয়ে তেওয়ারী নিশ্চিন্ত ছিল। অপূর্ব্ব নিজে কিছুই বলে না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে তেওয়ারীর এই ভয়টাই সবচেয়ে বেশী করিত, পাছে তাহারই জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা সকল কথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। ঝগড়া-বিবাদের কথা চুলোয় যাক্, সে যে তাহার হাতে জল খাইয়াছে, তাহার রাঁধা সাগু-বার্লি খাইয়াছে,—হয়ত এমন ভয়ানক জাত গিয়াছে যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত নাই। তেওয়ারী স্থির করিয়াছিল কোনমতে এখান হইতে কলিকাতায় গিয়া সে সোজা বাড়ি চলিয়া যাইবে। সেখানে গঙ্গাস্নান করিয়া, গোপনে গোবর প্রভৃতি খাইয়া

কোন একটা ছল-ছুতায় ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া দেহটাকে কাজ-চলা-গোছের শুদ্ধ করিয়া লইবে। কিন্তু ঘাঁটা-ঘাঁটি করিয়া কথাটাকে একবার মায়ের কানে তুলিয়া দিলে যে কিসে কি দাঁড়াইবে তাহার কিছুই বলা যায় না। হালদার বাড়ির চাকরি ত ঘুচিবেই, এমন কি তাহাদের গ্রামের সমাজ পর্য্যন্ত গিয়া টান ধরাও বিচিত্র নয়।

কিন্তু ইহাই তেওয়ারীর সবটুকু ছিল না। এই স্বার্থ ও ভয়ের দিক ছাড়া তাহার অন্তরের আর একটা দিক ছিল যেমন মধুর, তেমনি বেদনায় ভরা। অপূর্ব্ব অফিসে চলিয়া গেলে দুপুরবেলায় সে প্রত্যহ একখানি বেতের মোড়া লইয়া বারান্দায় আসিয়া বসিত। দুর্ব্বল দেহটিকে দেওয়ালের গায়ে এলাইয়া দিয়া গলির যে অংশটি গিয়া বড় রাস্তায় মিলিয়াছে সেইখানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। এই পথে ভারতীর কোনদিন প্রয়োজন হইবে না, ওই মোড় অতিক্রম করিবার বেলা অভ্যাসবশতঃ একবার এদিকে সে চাহিবে না, এমন হইতেই পারে না। অপূর্ব্ব ভামোয় চলিয়া গেলে এই মেয়েটির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় যেদিন দুপুর-বেলা হঠাৎ তাহার মা মরিয়া যায়। তখনও তেওয়ারীর খাওয়া হয় নাই, মেয়েটা কাঁদিয়া আসিয়া তাহার রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করে। দিন-দুই পূর্ব্বে জোসেফ সাহেব মরিয়াছে, তাহার সে ভয় ছিল না, আসিয়া কপাট খুলিতেই ভারতী ঘরে ঢুকিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া সে কি কান্না! কে বলিবে সে ম্লেচ্ছ, কে বলিবে সে ক্রীশ্চানের মেয়ে! তেওয়ারীর রাঁধা ভাত হাঁড়িতেই রহিল, সারাদিন চিঠি লইয়া তাহাকে কোথায় না সেদিন ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল। পরদিন কফিন লইয়া যাইবার বেলা এই বারান্দায় দাঁড়াইয়া চোখের জল যেন তাহার আর থামিতেই চাহে না। এই সময় হইতে ভারতীকে সে কখনো মা, কখনো দিদি বলিতে শুরু করিয়া-ছিল। এবং জোর করিয়া তাহাকে সে চার-পাঁচদিন রাঁধিতে দেয় নাই, নিজে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিল। তারপরে যেদিন ভারতী জিনিসপত্র লইয়া স্থানান্তরে গেল, সেদিন সন্ধ্যাবেলাটা তাহার যেন আর কাটিবে না এমনি মনে হইয়াছিল। তাহার বসন্ত রোগে ভারতী কতখানি কি করিয়াছিল তাহা সে ভাল জানিতও না, ভাবিতও না। মনে হইলেই মনে হইত জাত যাইবার কথা। কিন্তু এই সঙ্গেই আর একটা কথা সে সর্ব্বদাই ভাবিবার চেষ্টা করিত। সকালবেলা স্নান করিয়া মস্ত ভিজা চুলের রাশি পিঠে মেলিয়া দিয়া সে একবার করিয়া তেওয়ারীর তত্ত্ব লইতে আসিত। রান্নাঘরেও ঢুকিত না, কোন কিছু স্পর্শ করিত না, চৌকাঠের বাহিরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিত, আজ কি কি রাঁধলে দেখি তেওয়ারী।

দিদি, একটা আসন পেতে দিই।

না, আবার ত কাচতে হবে!

তেওয়ারী কহিত, বাঃ, আসন কি কখনও ছোঁয়া যায় নাকি?

ভারতী বলিত, যায় বই কি। তোমার বাবু ত ভাবেন আমি থাকার জন্যে সমস্ত বাড়িটাই ছোঁয়া গেছে। নিজের হ'লে বোধ হয় আগুন ধরিয়ে একে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে নিতেন। ঠিক না তেওয়ারী?

তেওয়ারী হাসিয়া কহিত, তোমার এক কথা দিদি। তুমি নিজে দেখতে পারো না বলে সবাইকে তাই ভাবো। কিন্তু আমার বাবুকে যদি একবার ভাল করে জানতে ত তুমিও বলতে এমন মানুষ সংসারে নেই।

ভারতী বলিত, নেই তা আমিও ত বলি। নইলে যে চুরি করা আটকালে, তাকেই গেলেন চোর বলে ধরিয়ে দিতে।

এই ব্যাপারে নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া তেওয়ারী মর্ম্মাহত হইয়া পড়িত। কথাটাকে চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিত, কিন্তু তুমিও ত কিছু কম করনি? সমস্ত মিথ্যে জেনেও ত বাবুর কুড়ি টাকা দণ্ড করালে, দিদি।

ভারতী অপ্রতিভ হইয়া বলিত, তেমনি দণ্ড ত নিজেই নিলাম তেওয়ারী, তোমার বাবুকে ত আর দিতে হ'ল না।

দিতে হ'ল না কি রকম? স্বচক্ষে দেখলাম যে দু'খানা নোট দিয়ে তবে তিনি বার হলেন।

আমিও যে স্বচক্ষে দেখলাম তেওয়ারী, তুমি ঘরে ঢুকেই দু'খানা নোট কুড়িয়ে পেয়ে তা বাবুর হাতে দিলে।

তেওয়ারীর হাতের খুন্তি হাতেই থাকিত,—ও! তাই বটে।

কিন্তু ভাজাটা যে পুড়ে উঠল তেওয়ারী, ও যে আর মুখে দেওয়া চলবে না।

তেওয়ারী কড়াটা নামাইয়া কহিত, বাবুকে কিন্তু একথা আমি বলে দেব দিদি।

ভারতী সহাস্যে জবাব দিত, দিলেই বা। তোমার বাবুকে কি আমি ভয় করি নাকি?

কিন্তু এত বড় আশ্চর্য্য কথাটা ছোটবাবুকে জানাইবার তেওয়ারীর আর সুযোগ মিলিল না। কবে এবং কেমন করিয়া যে মিলিবে ইহাও সে খুঁজিয়া পাইত না। একদিন আলস্যবশতঃ সে বাসি হলুদ দিয়া তরকারী রাঁধিতে গিয়া ভারতীর কাছে বকুনি খাইয়াছিল। আর একদিন স্নান না করিয়াই রাঁধিয়াছিল বলিয়া ভারতী তাহার হাতে খায় নাই। তেওয়ারী রাগ করিয়া বলিয়াছিল, তোমরা ক্রীশ্চান দিদি, তোমাদের এত বাচ-বিচার? এ যে দেখি আমাদের মা-ঠাকুরুণকেও ছাড়িয়ে গেলে!

ভারতী শুধু হাসিয়া চলিয়া গিয়াছিল, জবাব দেয় নাই। বস্তুতঃ রান্নার ব্যাপারে

এক মা-ঠাকুরাণী ছাড়া তাহার শুচিতায় কেহ প্রশ্ন করিতেও পারে ইহাতে সে মনে মনে আহত হইয়াছিল, কিন্তু আচার-বিচার লইয়া এই ম্লেচ্ছ মেয়েটার কাছেই সে সতর্ক না হইয়াও পারে নাই। তখন এ-সকল তাহার ভাল লাগে নাই, যাহা ভালো লাগিয়াছে তাহারও তেমন করিয়া মর্য্যাদা উপলব্ধি করে নাই, অথচ, এই সব চিন্তাই যেন এখন তাহাকে বিভোর করিয়া দিত। বর্ম্মায় সে আর ফিরিবে না। যাইবার পূর্ব্বে দেখা হইবার আর আশা নাই, দেখা করিবার হেতু নাই, যত কিছু সে জানে বলিবার লোক নাই—দিনের পর দিন একই পথের প্রান্তে নিষ্ফল দৃষ্টি পাতিয়া একাকী চুপ করিয়া বসিয়া তাহার বুকের মধ্যেটা যেন আঁচড়াইতে থাকিত।

সেদিন আফিস হইতে ফিরিয়া অপূর্ব্ব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, ভারতীর বাসাটা ঠিক কোন্ জায়গায় রে তেওয়ারী?

তেওয়ারী সংশয়তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল, আমি কি গিয়ে দেখে এসেচি নাকি?

যাবার সময় তোকে বলেনি?

আমাকে বলতে যাবে কিসের জন্যে।

অপূর্ব্ব কহিল, আমাকে বলেছিল বটে, কিন্তু জায়গাটা ঠিক মনে নেই। কাল একবার খুঁজে দেখতে হবে।

তেওয়ারীর মনটা দুলিতে লাগিল, হয়ত কি আবার একটা ফ্যাসাদ জুটিয়াছে,—কিন্তু এ-সাহস তাহার হইল না যে কারণ জিজ্ঞাসা করে। অপূর্ব্ব নিজেই বলিল। কহিল, সে চুরির জিনিসগুলো এখন পুলিশের লোকে দিতে চায়, কিন্তু ভারতীর একটা সই চাই।

তেওয়ারী আর একদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল, অপূর্ব্ব বলিতে লাগিল, সেদিন একথাই ত জানাতে এসে তোর অবস্থা দেখে আর ফিরতে পারলেন না। তিনি না দেখলে ত তুই কবে মরে ভূত হয়ে যেতিস্ তেওয়ারী, আমার সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা হ'ত না।

তেওয়ারী হাঁ না কিছুই কহিল না, শেষ কথাটা শুনিবার জন্য নিঃশব্দে কাঠের মত বসিয়া রহিল। অপূর্ব্ব বলিল, এসে দেখি অন্ধকার ঘরে তুই আর তিনি। দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, কি যে ঘটবে তার ঠিক নেই, কোথায় খাওয়া, কোথায় শোওয়া, দুদিন আগে নিজের বাপ-মা মরে গেছে,—কিন্তু কি শক্ত মেয়েমানুষ তেওয়ারী, কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই!

তেওয়ারী আর থাকিতে না পারিয়া বলিল, কবে গেলেন তিনি?

অপূর্ব্ব কহিল, আমার আসার পরদিনই। ভোর না হতেই 'চললুম' বলে যেন একেবারে উবে গেলেন।

রাগ করে চলে গেলেন নাকি?

রাগ করে? অপূর্ব্ব একটু ভাবিয়া কহিল, কি জানি হতেও পারে। তাঁকে বোঝাই তো যায় না,—নইলে তোর উপর এত যত্ন, একবার খবর নিতেও ত এলেন না তুই ভাল হলি কিনা!

এই কথা তেওয়ারীর ভাল লাগিল না। বলিল, তাঁর নিজেরই হয়ত অসুখ-বিসুখ কিছু করেচে।

নিজের অসুখ-বিসুখ! অপূর্ব্ব চমকিয়া গেল। তাহার সম্বন্ধে অনেকদিন অনেক কথাই মনে হইয়াছে, কিন্তু কোনদিন এ আশঙ্কা মনেও উদয় হয় নাই। যাবার সময় সে হয়ত রাগ করিয়াই গিয়াছে এবং এই রাগ করা লইয়াই মন তাহার যত কিছু কারণ খুঁজিয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু অন্য সম্ভাবনাও যে থাকিতে পারে এদিক পানে ক্ষুব্ধ চিত্ত তাহার দৃষ্টিপাতই করে নাই। হঠাৎ অসুখের কথায় এ লইয়া যত আলোচনা সে রাত্রে হইয়াছিল সমস্ত এক নিমিষে মনে পড়িয়া অপূর্ব্ব বসন্ত ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারিল না। তাহার নূতন বাসায় দেখিবার কেহ নাই, হয়ত হাসপাতালে লইয়া গেছে, হয়ত এতদিনে বাঁচিয়াও নাই, মনে মনে সে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। একটা চেয়ারে বসিয়া আফিসের কলার নেকটাই ওয়েস্টকোট খুলিতে খুলিতে তাহাদের আলাপ শুরু হইয়াছিল, হাতের কাজ তাহার সেইখানেই বন্ধ হইয়া গেল, মুখে তাহার শব্দ রহিল না, সেই চেয়ারে মাটির পুতুলের মত বসিয়া এই এক প্রকারের অপরিচিত, অস্পষ্ট অনুভূতি যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল যে সংসারে আর তাহার কোন কাজ করিবার নাই।

কিছুক্ষণ অবধি কেহই কথা কহিল না। এমনি একভাবে মিনিট কুড়ি-পঁচিশ কাটিয়া গেলেও যখন অপূর্ব্ব নড়িবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না, তখন তেওয়ারী মনে মনে শুধু আশ্চর্য্য নয়, উদ্বিগ্ন হইল। আস্তে আস্তে কহিল, ছোটবাবু, বাড়িওয়ালার লোক এসেছিল; যদি তেতালার ঘরটাই নেওয়া হয় ত, এই মাসের মধ্যেই বদলানো চাই বলে গেল। আমার ভাবনা হয় পাছে কেউ আবার এসে পড়ে।

অপূর্ব্ব মুখ তুলিয়া বলিল, কে আর আসচে।

তেওয়ারী কহিল, আজ মায়ের একখানা পোস্টকার্ড পেয়েচি। দরওয়ানকে দিয়ে তিনি লিখিয়েচেন।

কি লিখেচেন?

আমি ভাল হয়েচি বলে অনেক আহ্লাদ করেচেন। দরওয়ানের ভাই ছুটি

নিয়ে দেশে যাচ্ছে, তার হাতে 'বশেশ্বরের নামে পাঁচ টাকায় পুজো পাঠিয়েচেন।

অপূর্ব্ব কহিল, ভালই ত! মা তোকে ছেলের মত ভালবাসেন।

তেওয়ারী শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া কহিল, ছেলের বেশি। আমি চলে যাবো, মার ইচ্ছে ছুটি নিয়ে আমরা দুজনেই যাই। চারিদিকে অসুখ-বিসুখ—

অপূর্ব্ব কহিল, অসুখ-বিসুখ কোথায় নেই? কলকাতায় হয় না? তাই বুঝি ভয় দেখিয়ে নানা কথা লিখেছিলি?

আজ্ঞে না। তেওয়ারী ভাবিয়া রাখিয়াছিল আসল কথাটা সে রাত্রে আহারাদির পরে ধীরে-সুস্থে পাড়িবে। কিন্তু আর অপেক্ষা করা চলিল না। কহিল, কালীবাবু একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে ধরেচেন। বোধহয় সকলেরই ইচ্ছে মাঝের চোত্ মাসটা বাদ দিয়ে বোশেখের প্রথমেই শুভ কাজটা হয়ে যায়।

কালীবাবু অতিশয় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, তাঁহার পরিবারের আচার-পরায়ণতায় খ্যাতি প্রসিদ্ধ। তাঁহারই কনিষ্ঠা কন্যাকে মাতাঠাকুরাণী পছন্দ করিয়াছেন এ আভাস তাঁহার কয়েকখানা পত্রেই ছিল। তেওয়ারীর কথাটা অপূর্ব্বর ভাল লাগিল না। কহিল, এত তাড়াতাড়ি কিসের? কালীবাবুর গৌরীদানের সবুর না সয়, তিনি ত আর কোথাও চেষ্টা করতে পারেন।

তেওয়ারী একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তাড়াতাড়ি তাঁর কি মা'র কি করে জানবো ছোটবাবু? লোকে হয়ত তাঁকে ভয় দেখায় বর্ম্মা দেশটা তেমন ভাল নয়,—এখানে ছেলেরা বিগড়ে যায়।

অপূর্ব্ব খামোকা ভয়ানক জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, দেখ্ তেওয়ারী, তুই আমার ওপর অত পণ্ডিতি করিসনে বলে দিচ্ছি। মাকে তুই রোজ রোজ অত চিঠি লিখিস কিসের? আমি ছেলেমানুষ নই!

এই অকারণ ক্রোধে তেওয়ারী প্রথমে বিস্মিত হইল, বিশেষতঃ রোগ হইতে উঠিয়া নানা কারণে তাহারও মেজাজ খুব ভাল ছিল না, সে রাগিয়া বলিল, আসবার সময় মাকে একথা বলে আসতে পারেননি? তাহলে ত বেঁচে যেতাম, জাত-জন্ম খোয়াতে জাহাজে চড়তে হোত না।

অপূর্ব্ব চোখ রাঙ্গাইয়া চট্ করিয়া কলার ও নেকটাই তুলিয়া লইয়া গলায় পরিতে লাগিল। তেওয়ারী বহুকাল হইতেই ইহার অর্থ জানিত। কহিল, তাহলে জলটল কিছু খাবেন না?

অপূর্ব্ব তাহার প্রশ্নের জবাবে আলনা হইতে কোট লইয়া তাহাতে হাত গলাইতে গলাইতে দুম দুম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

তেওয়ারী গরম হইয়া বলিল, কাল রবিবার চাটগাঁ দিয়ে একটা জাহাজ যায়—আমি তাতেই বাড়ি যাব বলে রাখলাম। অপূর্ব্ব সিঁড়ি হইতে কহিল, না যাস্ তো তোর দিব্বি রইল!—বলিয়া নীচে চলিয়া গেল।

মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে প্রভু ও ভৃত্যের কিসের জন্য যে এমন একটা রাগারাগি হইয়া গেল অনভিজ্ঞ কেহ উপস্থিত থাকিলে সে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া যাইত, সে ভাবিয়াও পাইত না যে, এমনি অর্থহীন আঘাতের পথ দিয়াই মানুষের ব্যথিত বিক্ষুব্ধ চিত্ত চিরদিন আপনাকে সহজের মধ্যে ফিরাইয়া আনিবার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

১১

অপূর্ব্বর যাইবার জায়গা একমাত্র ছিল তলওয়ারকরের বাটী। এখানে বাঙালীর অভাব নাই, কিন্তু আসিয়া পর্য্যন্ত এমন ঝড়-ঝাপটার মধ্যেই তাহার দিন কাটিয়াছে যে কাহারও সহিত পরিচয় করিবার আর ফুরসৎ পায় নাই। বাহির হইয়া আজও সে রেলওয়ে স্টেশনের দিকেই চলিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল আজ শনিবার, তাহার সস্ত্রীক থিয়েটারে যাইবার কথা। অতএব পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো ব্যতীত অন্য কিছু করিবার যখন রহিল না এবং কোথায় যাইবে ভাবিতেছে, তখন অকস্মাৎ ভারতীকে মনে পড়িয়া তাহার প্রতি গভীর অকৃতজ্ঞতা আজ তাহাকে তীক্ষ্ণ করিয়া বিঁধিল। তাহার আহত অপরাধী মন তাহারি কাছে যেন জবাবদিহি করিয়া বারবার বলিতে লাগিল, সে ভালই আছে, তাহার কিছুই হয় নাই; নহিলে এতবড় জীবন-মরণ সমস্যার একটা খবর পর্য্যন্ত দিত না তাহা হইতেই পারে না, তবুও সে ওই জবাবদিহির বেশি আর অগ্রসর হইল না। তেলের কারখানার কাছাকাছি কোথায় তাহার নূতন বাসা ইহা সে ভুলে নাই, ইহাই খুঁজিয়া বাহির করিবার কল্পনায় মন তাহার নাচিয়া উঠিল, কিন্তু এমন করিয়া যে-লোক আত্মগোপন করিয়া আছে, এতকাল পরে তাহার তত্ত্ব লইতে যাওয়ার লজ্জাও সে সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। হয়ত সে ইহাও চাহে না, হয়ত সে তাহাকে দেখিয়া বিরক্ত হইবে, তাই চলিতে চলিতে আপনাকে আপনি সে একশতবার করিয়া বলিতে লাগিল, পুলিশের লোকে তাহার সই চাহে, অতএব কাজের জন্যই সে আসিয়াছে; সে কেমন আছে কোথায় আছে এ-সকল অকারণ কৌতূহল তাহার নাই। এতদিন পরে এ অভিযোগ ভারতী কোন মতেই তাহার প্রতি আরোপ করিতে পারিবে না।

এ অঞ্চলে অপূর্ব্ব আর কখনো আসে নাই। পূর্ব্বমুখে প্রশস্ত রাস্তা সোজা গিয়াছে, অনেক দূর হাঁটিয়া ডান দিকে নদীর ধারে যে পথ, সেইখানে আসিয়া একজনকে সে জিজ্ঞাসা করিল, এদিকে সাহেব মেমেরা কোথায় থাকে জানো? লোকটি প্রত্যুত্তরে আশে-পাশে যে সকল ছোট-বড় বাঙলো দেখাইয়া দিল তাহাদের আকৃতি, অবয়ব ও সাজসজ্জা দেখিয়াই অপূর্ব্ব বুঝিল তাহার প্রশ্ন করা ভুল হইয়াছে, সংশোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অনেক বাঙালীরাও ত থাকে এখানে, কেউ কারিকর, কেউ মিস্ত্রী, তাদের ছেলেমেয়েরা—

লোকটি কহিল, ঢের ঢের। আমিই ত একজন মিস্ত্রী। আমার তাঁবেই ত পঞ্চাশজন কারিকর—যা কব্রব তাই! ছোট সাহেবকে বলে জবাব পর্য্যন্ত দিতে পারি। কাকে খোঁজেন?

অপূর্ব্ব চিন্তা করিয়া কহিল, দেখো আমি যাকে খুঁজি,—আচ্ছা, যারা বাঙালী ক্রীশ্চান কিংবা—

লোকটি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, বলচেন বাঙালী,—আবার খ্রীষ্টান কি রকম? খ্রীষ্টান হলে আবার বাঙালী থাকে না কি? খ্রীষ্টান—খ্রীষ্টান। মোচলমান—মোচলমান। ব্যস, এই ত জানি মশায়!

অপূর্ব্ব বলিল, আহা! বাঙলা দেশের লোক ত! বাঙলা ভাষা বলে ত?

সে গরম হইয়া কহিল, ভাষা বললেই হ'ল? যে জাত দিয়ে খ্রীষ্টান হয়ে গেল তাতে আর পদার্থ রইল কি মশায়? কোন বাঙালী তার সঙ্গে আচার-ব্যবহার করুক একবার দেখি ত! ওই যে কোত্থেকে সব মেয়ে-মাস্টার এসেচে ছেলেপুলেদের পড়ায়—ব্যস্! তা বলে কেউ কি তাদের সঙ্গে খাচ্ছে, না বসচে?

অপূর্ব্ব কূল দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায় থাকেন জানেন!

সে কহিল, তা আর জানিনে! এই রাস্তায় সোজা গাঙের ধারে গিয়ে জিজ্ঞেসা করবেন নতুন ইস্কুল-ঘর কোথায়,—কচি ছেলেটা পর্য্যন্ত দেখিয়ে দেবে। ডাক্তারবাবু থাকেন কি না! মানুষ ত নয়,—দেবতা! মরা বাঁচাতে পারেন!—এই বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল। সেই পথে সোজা আসিয়া অপূর্ব্ব লাল রঙের একখানি কাঠের বাড়ি দেখিতে পাইল। বাড়িটি দ্বিতল, একেবারে নদীর উপরে। তখন রাত্রি হইয়াছে, পথে লোক নাই—উপরে খোলা জানালা হইতে আলো আসিতেছে, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সে সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সন্দেহ রহিল না যে এইখানেই ভারতী থাকে এবং ওই জানালাতেই তাহার দেখা মিলিবে।

মিনিট পনর পরে জন দুই-তিন লোক বাহির হইয়া তাহাকে দেখিয়া সহসা যেন চকিত হইয়া উঠিল। একজন প্রশ্ন করিল, কে? কাকে চান?

তাহার সন্দিগ্ধ কণ্ঠস্বরে অপূর্ব্ব সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, মিস্ জোসেফ বলে কোন স্ত্রীলোক থাকেন এখানে?

সে তৎক্ষণাৎ বলিল, থাকেন বই কি—আসুন।

অপূর্ব্বর ঠিক যাইবার সঙ্কল্প ছিল না, কিন্তু দ্বিধা করিতেই লোকটি কহিল, আপনি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন? কিন্তু তিনি ত ঘরেই আছেন, আসুন। আমরা আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি, এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

তাহার ত্বরা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল ইহারা তাহাকে যাচাই করিয়া লইতে চায়। অতএব, দ্বার হইতে এখন না বলিয়া ফিরিতে চাহিলে সন্দেহ ইহাদের এমনিই বিশ্রী হইয়া উঠিবে যে সে তাহা ভাবিতেই পারিল না। তাই চলুন, বলিয়া সে লোকটির অনুসরণ করিয়া এক মুহূর্ত্ত পরেই এই কাঠের বাড়ির নীচেকার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারই এক পাশ দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি। ঘরটি হলের মত প্রশস্ত। ছাদ হইতে ঝুলানো একটা মস্ত আলো, গোটা-কয়েক টেবিল চেয়ার, একটা কালো বোর্ড এবং সমস্ত দেয়াল জুড়িয়া নানা আকারের ও নানা রঙের ম্যাপ টাঙানো। ইহাই যে নূতন স্কুলঘর অপূর্ব্ব তাহা দেখিয়াই চিনিল। তথায় চার-পাঁচ জন স্ত্রীলোক ও পুরুষে মিলিয়া বোধ হয় একটা তর্কই করিতেছিল, সহসা একজন অপরিচিত লোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিল। অপূর্ব্ব একবার মাত্র তাহাদের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া যে তাহাকে আনিয়াছিল তাহারই পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া গেল। ভারতী ঘরেই ছিল, অপূর্ব্বকে দেখিয়া তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া চেয়ারে বসাইয়া কহিল, এতদিন আমার খোঁজ নেননি যে বড়?

অপূর্ব্ব বলিল, আপনিও ত আমাদের খোঁজ নেননি! কিন্তু কথাটা যে জবাব হিসাবে ঠিক হইল না তাহা সে বলিয়াই বুঝিল। ভারতী শুধু একটু হাসিল, কহিল, তেওয়ারী বাড়ি যেতে চাচ্ছে, যাক। না গেলে সে সারবে না।

অপূর্ব্ব কহিল, অর্থাৎ আপনি যে আমাদের খবর নেন না এ অভিযোগ সত্য নয়।

ভারতী পুনশ্চ একটু হাসিয়া কহিল, কাল রবিবার, কাল কিছু আর হবে না, কিন্তু পরশু বারোটার মধ্যেই কোর্টে গিয়ে টাকা আর জিনিসগুলো আপনার ফিরিয়ে আনবেন। একটু দেখে-শুনে নেবেন, যেন ঠকায় না।

আপনার কিন্তু একটা সই চাই।

তা জানি।

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল, আপনার সঙ্গে তেওয়ারীর বোধ হয় দেখা হয়, না?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না। কিন্তু আপনি যেন গিয়ে তার ওপর মিছে রাগ করবেন না।

অপূর্ব্ব কহিল, মিছে না হোক, সত্যি রাগ করা উচিত। আপনি তার প্রাণ দিয়েচেন এটুকু কৃতজ্ঞতা তার থাকা উচিত ছিল!

ভারতী বলিল, নিশ্চয়ই আছে। নইলে, সে তো আমাকে জেলে পাঠাবার একবার অন্ততঃ চেষ্টা করেও দেখতো।

অপূর্ব্ব এ ইঙ্গিত বুঝিল। আনতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, আপনি আমার উপর ভয়ানক রাগ করে আছেন।

ভারতী বলিল, কখ্‌খনো না। সারাদিন ইস্কুলে ছেলেমেয়ে পড়িয়ে, ঘরে ফিরে আবার সমিতির সেক্রেটারির কাজে অসংখ্য চিঠিপত্র লিখে, বিছানায় শুতে-না-শুতেই ত ঘুমিয়ে পড়ি,—রাগ করবার সময় কোথায় আমার?

অপূর্ব্ব কহিল, ওঃ—রাগ করবারও সময়টুকু নেই?

ভারতী বলিল, কই আর আছে। আপনি বরঞ্চ কোনদিন সকাল থেকে এসে দেখবেন সত্যি না মিছে!

অপূর্ব্বর মুখ দিয়া অলক্ষিত একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। কহিল, দেখবার আমার দরকার কি! একটুখানি থামিয়া কহিল, ইস্কুলে আপনাকে কত মাইনে দেয়?

ভারতী হাসি চাপিয়া গম্ভীর হইয়া কহিল, বেশ ত আপনি! মাইনের কথা বুঝি কাউকে জিজ্ঞাসা করতে আছে? এতে তার অপমান হয় না?

অপূর্ব্ব ক্ষুণ্নকণ্ঠে কহিল, অপমান করবার জন্যে ত আর বলিনি। চাকরিই যখন করচেন—

ভারতী কহিল, না করে কি শুকিয়ে মরতে বলেন?

অপূর্ব্ব বলিল, এ যা চাকরি, এই ত শুকিয়ে মরা! তার চেয়ে বরঞ্চ আমাদের আফিসে একটা চাকরি আছে, মাইনে একশ' টাকা—হয়ত দু-এক ঘণ্টার বেশী খাটাতেও হবে না।

ভারতী প্রশ্ন করিল, আমাকে সেই চাকরি করতে বলেন?

অপূর্ব্ব কহিল, দোষই বা কি?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমি করব না। আপনি ত তার কর্ত্তা, কাজে ভুলচুক হলেই লাঠি হাতে দরজায় এসে দাঁড়াবেন।

অপূর্ব্ব জবাব দিল না। সে মনে মনে বুঝিল ভারতী শুধু পরিহাস করিয়াছে, তথাপি তাহার সেই একটা দিনের আচরণের ইঙ্গিত করায় তাহার গা জলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ হইতেই একটা তর্ক-বিতর্কের কলরোল নীচে হইতে শুনা যাইতেছিল, সহসা তাহা উদ্দাম হইয়া উঠিল। অপূর্ব্ব ভালমানুষটির মত জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের ইস্কুল বোস্‌লো বোধ হয়—ছেলেরা সব পড়ায় মন দিয়েচে।

ভারতী গম্ভীর মুখে কহিল, তাহলে হাঁকা-হাঁকিটা কিছু কম হ'তো। তাদের শিক্ষকেরা বোধ করি বিষয় নির্ব্বাচনে মন দিয়েচেন।

আপনি যাবেন না?

যাওয়া ত. উচিত, কিন্তু আপনাকে ছেড়ে যেতে যে মন সরে না। এই বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিল। কিন্তু অপূর্ব্বর কান পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। সে আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া পাশের দেয়ালের গায়ে সাজানো কাঁচা ঝাউপাতা দিয়া লেখা কয়েকটা অক্ষরের প্রতি সহসা দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, ওটা কি লেখা ওখানে?

ভারতী কহিল, পড়ুন না।

অপূর্ব্ব ক্ষণকাল মনঃসংযোগ করিয়া বলিল, পথের দাবী। তার মানে?

ভারতী কহিল, ওই আমাদের সমিতির নাম, ওই আমাদের মন্ত্র, ওই আমাদের সাধনা! আপনি আমাদের সভ্য হবেন?

অপূর্ব্ব বলিল, আপনি নিজে একজন সভ্য নিশ্চয়ই, কিন্তু কি আমাদের করতে হবে?

ভারতী বলিল, আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্ব্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙে-চুরে চলবো। আমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে, তাদের অবাধ মুক্ত গতিকে কেউ যেন না রোধ করতে পারে, এই আমাদের পণ। আসবেন আমাদের দলে?

অপূর্ব্ব কহিল, আমরা পরাধীন জাতি, ইংরেজ নই, ফরাসী নই, আমেরিকান নই,—কোথায় পাবো আমরা অপ্রতিহত গতি? স্টেশনের একটা বেঞ্চে বসবার আমাদের অধিকার নেই, অপমানিত হয়ে নালিশ করবার পথ নেই,—বলিতে বলিতে সেদিনের সমস্ত লাঞ্ছনা,—ফিরিঙ্গী ছোঁড়াদের বুটের আঘাত হইতে স্টেশন মাস্টারের বাহির করিয়া দেওয়া অবধি সকল অপমান কষ্ট অনুভব করিয়া তাহার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, আমরা বসলে বেঞ্চ অপবিত্র হয়, আমরা গেলে ঘরের হাওয়া কলুষিত হয়,—আমরা যেন মানুষ নই! আমাদের যেন মানুষের প্রাণ, মানুষের রক্ত-মাংস গায়ে নেই! এই যদি আমাদের সাধনা হয়, আছি আমি আপনাদের দলে।

ভারতী কহিল, আপনি কি মানুষের জ্বালা টের পান অপূর্ব্ববাবু? সত্যই কি

মানুষের ছোঁয়ায় মানুষের আপত্তি করবার কিছু নেই, তার গায়ের বাতাসে আর একজনের ঘরের বাতাস অপবিত্র হয়ে ওঠে না ?

অপূর্ব্ব তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় নয়। মানুষের চামড়ার রঙ ত তার মনুষ্যত্বের মাপকাঠি নয়! কোন একটা বিশেষ দেশে জন্মানই ত তার অপরাধ হতে পারে না! মাপ করবেন আপনি, কিন্তু জোসেফ সাহেব ক্রীশ্চান বলেই ত শুধু আদালতে আমার কুড়ি টাকা দণ্ড হয়েছিল। ধর্ম্মমত ভিন্ন হলেই কি মানুষ হীন প্রতিপন্ন হবে ? এ কোথাকার বিচার! এই বলচি আপনাকে আমি, এর জন্যই এরা একদিন মরবে। এই যে মানুষকে অকারণে ছোট করে দেখা, এই যে ঘৃণা, এই যে বিদ্বেষ, এ অপরাধ ভগবান কথ্‌খনো ক্ষমা করবেন না।

বেদনা ও লাঞ্ছনার মত মানুষের সত্যবস্তুটিকে টানিয়া বাহিরে আনিতে ত দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তাই সে সমস্ত ভুলিয়া অপমানকারীর বিরুদ্ধে অপমানিতের, পীড়কের বিরুদ্ধে পীড়িতের মর্ম্মান্তিক অভিযোগে সহস্রমুখ হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতী তাহার দৃপ্ত মুখের প্রতি চাহিয়া এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়াছিল। কিন্তু কথা তাহার শেষ হইতেই সে শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল। অপূর্ব্ব চমকিয়া উঠিল, তাহার মুখের উপর কে যেন সজোরে মারিল। ভারতীর কোন প্রশ্নই এতক্ষণ সে খেয়াল করে নাই, কিন্তু সেগুলি অগ্নিরেখার মত তাহার মাথার মধ্যে দিয়া সশব্দে খেলিয়া গিয়া তাহাকে একেবারে বাক্যহীন করিয়া দিল।

মিনিট-খানেক পরে ভারতী পুনরায় যখন মুখ ফিরাইয়া চাহিল, তখন তাহার ওষ্ঠাধারে হাসির চিহ্নমাত্র ছিল না, কহিল, আজ শনিবারে আমাদের স্কুল বন্ধ, কিন্তু সমিতির কাজ হয়। চলুন না, নীচে গিয়ে আপনাকে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়ে পথের দাবীর সভ্য করে নিই।

তিনি বুঝি সভাপতি ?

সভাপতি ? না, তিনি আমাদের মূল শিকড়। মাটির তলায় থাকেন, তাঁর কাজ চোখে দেখা যায় না।

শিকড়ের প্রতি অপূর্ব্বর কিছুমাত্র কৌতূহল জন্মিল না। জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের সভ্যরা বোধহয় সকলে ক্রীশ্চান ?

ভারতী কহিল, না, আমি ছাড়া সকলেই হিন্দু।

অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কিন্তু মেয়েদের গলা পাচ্ছি যে ?

ভারতী কহিল, তাঁরাও হিন্দু।

অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তকাল দ্বিধা করিয়া বলিল, কিন্তু তাঁরা বোধ হয় জাতিভেদ—অর্থাৎ কিনা, খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার বোধ করি করেন না ?

ভারতী বলিল, না। তারপরে হাসিমুখে কহিল, কিন্তু কেউ যদি মেনে চলেন, তাঁর মুখেও আমরা কেউ খাবার জিনিস জোর করে গুঁজে দিইনে। মানুষের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিকে আমরা অত্যন্ত সম্মান করে চলি। আপনার ভয় নেই।

অপূর্ব্ব বলিল, ভয় আবার কিসের? কিন্তু—আচ্ছা, আপনার মত শিক্ষিতা মহিলাও বোধ করি আপনাদের দলে আছেন?

আমার মত? এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, আমাদের প্রেসিডেণ্ট যিনি, তাঁর নাম সুমিত্রা, তিনি একলা পৃথিবী ঘুরে এসেচেন,- শুধু ডাক্তার ছাড়া তাঁর মত বিদুষী বোধ হয় এ দেশে কেউ নেই।

অপূর্ব্ব বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, আর ডাক্তার যাঁকে বলচেন, তিনি?

ডাক্তার? শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে ভারতীর দুইচক্ষু যেন সজল হইয়া উঠিল, কহিল, তাঁর কথা থাক্ অপূর্ব্ববাবু। পরিচয় দিতে গেলেই হয়ত তাঁকে ছোট করে ফেলবো।

অপূর্ব্ব আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। দেশের প্রতি ভালবাসার নেশা তাহার রক্তের মধ্যে—এই দিক দিয়া পথের দাবীর বিচিত্র নামটা তাহাকে টানিতে লাগিল। এই সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন বিদেশে এতগুলি অসাধারণ শিক্ষিত নর-নারীর আশা ও আকাঙ্খা, চেষ্টা ও উদ্যম, তাহাদের ইতিহাস, তাহাদের রহস্যময় কর্ম্ম-জীবনের অপরিজ্ঞাত পদ্ধতি ওই যে অদ্ভুত নামটাকে জড়াইয়া উঠিতে চাহিতেছে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ মিলনের লোভ সংবরণ করা কঠিন, কিন্তু তবুও কেমন যেন একপ্রকার বিজাতীয়, ধর্ম্মবিহীন, অস্বাস্থ্যকর বাষ্প নীচে হইতে উঠিয়া তাহার মনটাকে ধীরে ধীরে গ্লানিতে ভরিয়া আনিতে লাগিল।

কলরব বাড়িয়া উঠিতেই ছিল, ভারতী কহিল, চলুন যাই।

অপূর্ব্ব সায় দিয়া বলিল, চলুন—

উভয়ে নীচে আসিলে ভারতী তাহাকে একটা বেতের সোফায় বসিতে দিয়া স্থানাভাবে তাহার পার্শ্বেই উপবেশন করিল।

এই আসনটি এমন সঙ্কীর্ণ যে এতে লোকের সম্মুখে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া দুজনের বসা চলে না। এরূপ অদ্ভুত আচরণ ভারতী কোনদিন করে নাই, অপূর্ব্ব শুধু সঙ্কোচ নয়, অত্যন্ত লজ্জা বোধ করিতে লাগিল, কিন্তু এখানে এই সকল ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করিবারও যেন কাহারও অবসর নাই। সে আর একটা বস্তু লক্ষ্য করিল যে, তাহার মত অপরিচিত ব্যক্তিকে আসন গ্রহণ করিতে দেখিয়া প্রায় সকলেই চাহিয়া দেখিল, কিন্তু, যে বিতণ্ডা উদ্দাম বেগে বহিতেছিল তাহাতে লেশমাত্র বাধা পড়িল না। কেবল একটি মাত্র লোক যে পিছন ফিরিয়া কোণের টেবিলে বসিয়া লিখিতে-ছিল সে লিখিতেই রহিল তাহার আগমন বোধ হয় জানিতেই পারিল না। অপূর্ব্ব

গনিয়া দেখিল ছয়জন রমণী এবং আটজন পুরুষে মিলিয়া এই ভীষণ আলোচনা চলিতেছে। ইহাদের সকলেই অচেনা কেবল একটি ব্যক্তিকে অপূর্ব্ব চক্ষের পলকে চিনিতে পারিল। বেশভূষায় কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু এই মূর্ত্তিকেই সে কিছুকাল পূর্ব্বে মিক্‌থিলা রেলওয়ে স্টেশনে টিকিট না কেনার দায় হইতে পুলিশের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল এবং টাকাটা যত শীঘ্র সম্ভব ফিরাইয়া দিতে যিনি স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। লোকটি চাহিয়া দেখিল, কিন্তু মদের নেশায় যাহার কাছে হাত পাতিয়া উপকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, মদ না-খাওয়া অবস্থায় তাহাকে স্মরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু ইহার জন্য নয়, ভারতীকে মনে করিয়া তাহার বুকে এই ব্যথাটা অতিশয় বাজিল যে এরূপ সংসর্গে সে আসিয়া পড়িল কিরূপে?

সুমুখে কে একজন দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িতেই অপূর্ব্বর কানের কাছে মুখ আনিয়া ভারতী চুপি চুপি কহিল, উনিই আমাদের প্রেসিডেণ্ট সুমিত্রা।

বলিবার প্রয়োজন ছিল না। অপূর্ব্ব দেখিয়াই চিনিল। কারণ, নারীকে দিয়াই যদি কোন সমিতি পরিচালনা করিতে হয়, এই ত সেই বটে! বয়স বোধ করি ত্রিশের কাছে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু যেন রাজ-রাণী! বর্ণ কাঁচা সোনার মত, দাক্ষিণাত্যের ধরণে এলো করিয়া মাথার চুল বাঁধা, হাতে গাছ-কয়েক করিয়া সোনার চুড়ি, ঘাড়ের কাছে সোনার হারের কিয়দংশ চিক্ চিক্ করিতেছে, কানে সবুজ পাথরের তৈরী দুলের উপর আলো পড়িয়া যেন সাপের চোখের মত জ্বলিতেছে,—এই ত চাই! ললাট, চিবুক, নাক, চোখ, ভ্রূ, ওষ্ঠাধর,—কোথাও যেন আর খুঁত নাই,—একি ভয়ানক আশ্চর্য্য রূপ! কালো বোর্ডের গায়ে একটা হাত রাখিয়া তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, অপূর্ব্বর চোখে আর পলক পড়িল না। সে আঁক কষিয়াই মানুষ হইয়াছে, কাব্যের সহিত পরিচয় তাহার অত্যন্ত বিরল, কিন্তু, কাব্য যাঁহারা লেখেন, কেন যে তাঁহারা এত কিছু থাকিতে তরুণ লতিকার সঙ্গেই নারীদেহের তুলনা করেন তাহার জানিবার কিছু আর রহিল না। সম্মুখে একটি বিশ-বাইশ বছরের সাধারণ গোছের মহিলা আনতমুখে বসিয়াছিলেন, ভাবে বোধ হয় তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এই তর্কের ঝড় উঠিয়াছে। আবার তাঁহারই অনতিদূরে বসিয়া প্রৌঢ় গোছের একজন ভদ্রলোক; তাঁহার পরনের কাটছাঁট পরিশুদ্ধ বিলাতি পোষাক দেখিয়া অবস্থাপন্ন বলিয়াই মনে হয়। খুব সম্ভব তিনিই প্রতিপক্ষ, কি বলিতেছিলেন অপূর্ব্ব ভাল শুনিতেও পায় নাই, মনোযোগও করে নাই, তাহার সমস্ত চিত্ত সুমিত্রার প্রতিই একেবারে একাগ্র হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বরে কি জানি কোন পরম বিস্ময় ঝরিয়া পড়িবে এই ছিল তার আশা। অনতিকাল পূর্ব্বের ক্ষোভের হেতু তাঁহার মনেও ছিল না। সাহেবি পোষাক-পরা ভদ্রলোকটির প্রত্যুত্তরে

এইবার তিনি কথা কহিলেন। এই ত! নারীর কণ্ঠস্বর ত একেই বলে! ইহার কণাটুকুও না বাদ যায়, অপূর্ব্ব এমনি করিয়াই কান পাতিয়া রহিল। সুমিত্রা কহিলেন, মনোহরবাবু, আপনি ছেলেমানুষ উকিল নয়, আপনার তর্ক অসংলগ্ন হয়ে পড়লে ত মীমাংসা করতে পারব না।

মনোহরবাবু উত্তর দিলেন, অসংলগ্ন তর্ক করা আমার পেশাও নয়।

সুমিত্রা হাসিমুখে কহিলেন, তাই ত আশা করি। বেশ, বক্তব্য আপনার ছোট করে আনলে এইরূপ দাঁড়ায়। আপনি নবতারার স্বামীর বন্ধু। তিনি জোর করে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর ঘর করতে চান না, দেশের কাজ করতে চান, এতে অন্যায় কিছু ত দেখিনে।

মনোহর বলিলেন, কিন্তু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য আছে ত? দেশের কাজ করব বললেই ত তার উত্তর হয় না।

সুমিত্রা কহিলেন, দেখুন মনোহরবাবু, নবতারা কোন্ কাজ করবেন, না-করবেন, সে বিচার তার উপর, কিন্তু তাঁর স্বামীরও স্ত্রীর প্রতি যে কর্ত্তব্য ছিল, তিনি তা কোন-দিন করেননি, এ-কথা আপনারা সবাই জানেন! কর্ত্তব্য ত কেবল একদিকে নয়।

মনোহর রাগিয়া কহিলেন, কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকেও যে অসতী হয়ে যেতে হবে, সেও ত কোন যুক্তি হতে পারে না। এই বয়সে এই দলের মধ্যে থেকেও উনি সতীত্ব বজায় রেখে যে দেশের সেবা করতে পারবেন, এ ত কোনমতেই জোর করে বলা চলে না!

সুমিত্রার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়াই তখনি সহজ হইয়া গেল, বলিলেন, জোর করে কিছু বলাও উচিত নয়। কিন্তু আমরা দেখচি নবতারার হৃদয় আছে, প্রাণ আছে, সাহস আছে এবং সবচেয়ে বড় যা সেই ধর্ম্মজ্ঞান আছে। দেশের সেবা করতে এইটুকুই আমরা যথেষ্ট জ্ঞান করি। তবে, আপনি যাকে সতীত্ব বলচেন, সে বজায় রাখবার ওঁর সুবিধে হবে কিনা সে উনিই জানেন!

মনোহর নবতারার আনত মুখের প্রতি একবার কটাক্ষে চাহিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, খাসা ধর্ম্মজ্ঞান ত! দেশের কাজে এই শিক্ষাই বোধ হয় উনি দেশের মেয়েদের দিয়ে বেড়াবেন?

সুমিত্রা বলিলেন, ওঁর দায়িত্ববোধের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে। ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র আলোচনা করা আমাদের নিয়ম নয়, কিন্তু যে স্বামীকে উনি ভালবাসতে পারেননি, আর একটা বড় কাজের জন্য যাঁকে ত্যাগ করে আসা উনি অন্যায় মনে করেননি, সেই শিক্ষাই যদি দেশের মেয়েদের উনি দিতে চান ত আমরা আপত্তি করব না।

মনোহর কহিলেন, আমাদের এই সীতা-সাবিত্রীর দেশে এমন শিক্ষা উনি গৃহস্থ মেয়েদের দেবেন ?

সুমিত্রা সায় দিয়া বলিলেন, দেওয়া ত উচিত। মেয়েদের কাছে শুধু অর্থহীন বুলি উচ্চারণ না করে নবতারা যদি বলেন যে, এই দেশে একদিন সীতা আত্মসম্মান রাখতে স্বামী ত্যাগ করে পাতালে গিয়েছিলেন এবং রাজকন্যা সাবিত্রী দরিদ্র সত্যবানকে বিবাহের পূর্ব্বে এত ভালবেসেছিলেন যে অত্যন্ত স্বল্পায়ু জেনেও তাঁকে বিবাহ করতে তাঁর বাধেনি, এবং আমি নিজেও যে দুর্বৃত্ত স্বামীকে ভালোবাসতে পারিনি, তাকে পরিত্যাগ করে এসেচি, অতএব, আমার মত অবস্থায় তোমরাও তাই কোরো,- এ শিক্ষায় ত দেশের মেয়েদের ভালই হবে মনোহরবাবু।

মনোহরের ওষ্ঠাধর ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল, প্রথমটা ত তাঁহার মুখ দিয়া কথাই বাহির হইল না, তারপর বলিয়া উঠিলেন, তাহলে দেশ উচ্ছন্নে যাবে। হঠাৎ হাত জোড় করিয়া কহিলেন, দোহাই আপনাদের, নিজেরা যা ইচ্ছে করুন, কিন্তু অপরকে এ শিক্ষা দেবেন না। ইউরোপের সভ্যতা আমদানি করে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তার প্রচার করে সমস্ত ভারতবর্ষটাকে আর রসাতলে পাঠাবেন না।

সুমিত্রার মুখের উপর বিরক্তি ও ক্লান্তি যেন একই সঙ্গে ফুটিয়া উঠিল, কহিলেন, রসাতল থেকে বাঁচাবার যদি কোন পথ থাকে ত এই। কিন্তু, ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আপনার বিশেষ কোন জ্ঞান নেই, সুতরাং, এ নিয়ে তর্ক করলে শুধু সময় নষ্ট হবে। অনেক সময় গেছে,—আমাদের অন্য কাজ আছে।

মনোহরবাবু যথাসাধ্য ক্রোধ দমন করিয়া কহিলেন, সময় আমারও অপর্য্যাপ্ত নয়। নবতারা তাহলে যাবেন না ?

নবতারা এতক্ষণ মুখ তুলিয়াও চাহে নাই, সে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

মনোহর সুমিত্রাকে প্রশ্ন করিলেন, এঁর দায়িত্ব তাহলে আপনারাই নিলেন।

নবতারাই ইহার জবাব দিল, কহিল, আমার দায়িত্ব আমিই নিতে পারবো, আপনি চিন্তিত হবেন না।

মনোহর বক্রদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া সুমিত্রাকেই পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, কহিলেন, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, স্বামীগৃহে বিবাহিত জীবনের চেয়ে গৌরবের বস্তু নারীর আর কিছু আছে আপনি বলতে পারেন ?

সুমিত্রা কহিলেন, অপরের যাই হোক, অন্ততঃ, নবতারার স্বামীগৃহে তার বিবাহিত জীবনকে আমি গৌরবের জীবন বলতে পারিনে।

এই উত্তরের পরে মনোহর আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। অত্যন্ত

কটুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু এইবার ঘরের বাইরে তার অসতী জীবনটাকে বোধ করি গৌরবের জীবন বলতে পারবেন ?

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এত বড় কদর্য্য বিদ্রূপেও কাহারও মুখে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না। সুমিত্রা শান্তস্বরে বলিলেন, মনোহরবাবু, আমাদের সমিতির মধ্যে সংযতভাবে কথা বলা নিয়ম।

আর এ নিয়ম যদি না মানতে পারি ?

আপনাকে বার করে দেওয়া হবে।

মনোহরবাবু যেন ক্ষেপিয়া গেলেন। জ্যা-মুক্ত শরের ন্যায় সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, আচ্ছা চললুম ! গুড বাই ! এই বলিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া তাঁহার উন্মত্ত ক্রোধ যেন সহস্রধারে ফাটিয়া পড়িল। হাত পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি সমস্ত খবর তোমাদের জানি। ইংরেজ রাজত্ব তোমরা ঘুচাবে ? মনেও কোরো না ! আমি চাষা নই, আমি অ্যাডভোকেট। কোথায় বিচার পেতে হয়, কোথায় তোমাদের হাতে শেকল পরাতে হয় ভাল রকম জানি। আচ্ছা,—এই বলিয়া তিনি অন্ধকারে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

হঠাৎ কি যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। উত্তেজনা কেহই প্রকাশ করিল না, কিন্তু সকলের মুখেই যেন কি একপ্রকার ছায়া পড়িল, কেবল যে লোকটা কোণে বসিয়া লিখিতেছিল, সে একবার চোখ তুলিয়াও চাহিল না। অপূর্ব্বর মনে হইল, হয় সে সম্পূর্ণ বধির, না হয়, একেবারে পাষাণের ন্যায় নিরাকুল, নির্ব্বিকার। ভারতীর মুখের চেহারাটা সে দেখিতে চাহিল, কিন্তু সে যেন ইচ্ছা করিয়াই আর একদিকে ঘাড় ফিরাইয়া রহিল। মনোহর ব্যক্তিটি যেই হোক, রাগের মাথায় এই সমিতির বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলিয়া গেলেন তাহা অতিশয় সন্দেহজনক। এতগুলি আশ্চর্য্য নর-নারী কোথা হইতে আসিয়াই বা এখানে সমিতি গঠন করিলেন, কি বা তাহার সত্যকার উদ্দেশ্য, হঠাৎ ভারতীই বা কি করিয়া ইহাদের সন্ধান পাইল ? আর ওই যে লোকটি টিকিটের পরিবর্ত্তে একদিন অনায়াসে মদ কিনিয়া খাইয়া তাহারই চোখের সম্মুখে ধরা পড়িয়াছিল,—আর সকলের বড় এই নবতারা ! স্বামী ত্যাগ করিয়া দেশের কাজ করিতে আসিয়াছে, সতীত্ব রক্ষার কথা ভাবিবার এখন যাহার সময় নাই, অথচ এই লোকগুলা এত বড় অন্যায়কে শুধু সমর্থন নয়, প্রাণপণে প্রশ্রয় দিতেছে। এবং যিনি ইহাদের কর্ত্রী, স্ত্রীলোক হইয়াও তিনি প্রকাশ্য সভায় এতগুলি পুরুষের সমক্ষে সতীধর্ম্মের প্রতি তাঁহার একান্ত অবজ্ঞাই অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধটুকুও করিলেন না !

কিছুক্ষণ অবধি সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, বাহিরে অন্ধকার, অপ্রশস্ত

রাজপথ তেমনি জনহীন নীরব, কেমন একপ্রকার উদ্বিগ্ন আশঙ্কায় অপূর্ব্বর মনের ভিতরটা যেন ভার হইয়া উঠিল।

হঠাৎ সুমিত্রার কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, অপূর্ব্ববাবু!

অপূর্ব্ব চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

সুমিত্রা কহিলেন, আপনি আমাদের চেনেন না, কিন্তু ভারতীর কাছ থেকে আমরা সবাই আপনাকে চিনি। শুনলাম আপনি আমাদের সমিতির মেম্বার হতে চান। সত্য?

অপূর্ব্ব না বলিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। যে লোকটি একমনে লিখিতেছিল সুমিত্রা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ডাক্তার, অপূর্ব্ববাবুর নামটা লিখে নেবেন। অপূর্ব্বকে হাসিয়া বলিলেন, আমাদের কোনরকম চাঁদা নেই, টাকাকড়ি দিতে হয় না এইটে আমাদের সমিতির বিশেষত্ব।

প্রত্যুত্তরে অপূর্ব্ব নিজেও একটু হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। একটা মোটা বাঁধানো খাতায় যথার্থই তাহার নাম লেখা হইয়া গেল দেখিয়া মনে মনে সে অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল। এবং চুপ করিয়া থাকিতে আর না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, কিন্তু কি উদ্দেশ্য, কি আমাকে করতে হবে কিছুই ত জানতে পারলাম না।

ভারতী আপনাকে জানান নি।

অপূর্ব্ব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, কিছু জানিয়েচেন, কিন্তু একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, নবতারার আচরণ আপনারা কি সত্যই অন্যায় মনে করেন না?

সুমিত্রা কহিলেন, অন্ততঃ আমি করিনে। কারণ, দেশের বড় আমার কাছে কিছুই নেই।

অপূর্ব্ব শ্রদ্ধাভরে কহিল, দেশকে আমিও প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। এবং দেশের সেবা করবার অধিকার স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সমান, কিন্তু এদের কর্ম্মক্ষেত্র ত এক নয়; আমরা পুরুষে বাইরে এসে কাজ করব, কিন্তু নারী গৃহের মধ্যে, শুদ্ধান্তঃপুরে স্বামী-পুত্রের সেবার মধ্যে দিয়েই সার্থক হবেন। তাঁদের সত্যকার কল্যাণে দেশের যত বড় কাজ হবে বাইরে এসে পুরুষের সঙ্গে ভিড় করে দাঁড়ালে ত সে কাজ কিছুতেই হবে না।

সুমিত্রা হাসিলেন। অপূর্ব্ব লক্ষ্য করিয়া দেখিল সকলেই যেন তাঁহার প্রতি চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসি গোপন করিল। সুমিত্রা কহিলেন, অপূর্ব্ববাবু, এটা অনেক দিনের এবং অনেকের মুখের কথা তা আমরা অস্বীকার করিনে। কিন্তু আপনি ত জানেন কোন একটা কথা কেবলমাত্র বহুদিন ধরে বহু লোকে বলতে

থাকলেই তা সত্য হয়ে উঠে না। এ ফাঁকির কথা। যারা কোনদিন দেশের কাজ করেনি এ তাদের কথা, দেশের চেয়ে নিজের স্বার্থ যাদের ঢের বড় এ তাদের কথা। এর মধ্যে এতটুকু সত্য নেই। আপনি নিজে যখন কাজে লাগবেন, তখনই এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করবেন যে যাকে আপনি নারীর বাইরে এসে ভিড় করা বলচেন সে যদি কখনও ঘটে, তখনই দেশের কাজ হবে, নইলে পুরুষের ভিড়ে শুকনো বালির মত সমস্ত ঝরে পড়বে, কোনদিন জমাট বাঁধবে না।

অপূর্ব্ব মনে মনে লজ্জা পাইয়া কহিল, কিন্তু এতে কি দুর্নীতি বাড়বে না? চরিত্র কলুষিত হবার ভয় থাকবে না?

সুমিত্রা বলিলেন, ভয় কি ভিতরেই কম থাকে নাকি? অপূর্ব্ববাবু, ওটা বাইরে আসার দোষ নয়, দোষ বিধাতার, যিনি নর-নারী সৃষ্টি করেচেন, তাদের মধ্যে অনুরাগের আকর্ষণ দিয়েচেন, তাঁর। অপূর্ব্ববাবু, মনের মধ্যে একটুখানি বিনয় রেখে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দিকে একবার চেয়ে দেখুন দিকি?

এই মন্তব্য শুনিয়া অপূর্ব্ব খুশী হইতে পারিল না, বরঞ্চ একটুখানি তীব্রতার সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, অন্য দেশের কথা অন্য দেশ ভাবুক, আমি আমাদের নিজেদের কল্যাণ চিন্তা করতে পারলেই যথেষ্ট মনে করব। আপনি আমায় ক্ষমা করবেন, কিন্তু এখানে একটা বস্তু আমি লক্ষ্য না করে পারিনি যে, বিবাহিত জীবনের প্রতি আপনাদের আস্থা নেই, এমন কি নারীত্বের যা চরম উৎকর্ষ, সেই সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মকেও আপনারা অবহেলার চক্ষে দেখেন। এর থেকে আসবে দেশের কল্যাণ?

সুমিত্রা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া সকৌতুক স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, অপূর্ব্ববাবু, আপনি একটু রাগ করে বলচেন, নইলে ঠিক ও ভাব ত আমি প্রকাশ করিনি। তবে, আগাগোড়াই যে আপনি ভুল বুঝেচেন তাও নয়। যে সমাজে কেবলমাত্র পুত্রার্থেই ভার্য্যা গ্রহণের বিধি আছে, নারী হয়ে তাকে ত আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারিনে। আপনি সতীত্বের চরম উৎকর্ষের বড়াই করেছিলেন, কিন্তু, এই যে-দেশে বিবাহের ব্যবস্থা, সে-দেশে ও-বস্তু বড় হয় না, ছোটই হয়। সতীত্ব ত শুধু দেহেই পর্য্যবসিত নয় অপূর্ব্ববাবু, মনেরও ত দরকার? কায়মনে ভালবাসতে না পারলে ত ওর উচ্চস্তরে পৌছান যায় না? আপনি কি সত্যই মনে করেন মন্ত্র পড়ে বিয়ে দিলেই যে-কোন বাঙালী মেয়ে যে-কোন বাঙালী পুরুষকে ভালবাসতে পারে? এ কি পুকুরের জল যে যে-কোন পাত্রে ঢেলে মুখ বন্ধ করে দিলেই কাজ চলে যাবে?

অপূর্ব্ব হঠাৎ কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কহিল, কিন্তু চিরকাল চলেও ত যাচ্চে?

সুমিত্রা তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন, তা যাচ্চে। প্রাণাধিক স্বামী বলে পাঠ লিখতেও তার বাধে না, কর্ত্তব্যবোধে শ্রদ্ধাভক্তি করতেও

হয়ত তার আটকায় না। বস্তুতঃ ঘরকন্নার কাজে এর বেশি তার প্রয়োজন হয় না। আপনি ত গল্প পড়চেন, কোন্ এক ঋষি-পুত্রের দুধের বদলে চালের গুঁড়োর জল খেয়েই আরামে দিন কাটাতো। কিন্তু আরাম যেমনই হোক, যা নয় তাকে তাই বলে গর্ব্ব করা ত যায় না।

এই আলোচনা অপূর্ব্বর অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকিল, কিন্তু এবারেও সে জবাব দিতে না পারিয়া কহিল, আপনি কি বলতে চান এর অধিক কারও ভাগ্যেই জোটে না?

সুমিত্রা কহিলেন, না, তা আমি বলতেই পারিনে। কারণ, সংসারে দৈবাৎ বলেও একটা শব্দ আছে।

অপূর্ব্ব কহিল, ওঃ—দৈবাৎ। কিন্তু কথা যদি আপনার সত্যও হয়, তবুও আমি বলি সমাজের মঙ্গলের জন্য, উত্তর পুরুষের কল্যাণের জন্য, আমাদের এই-ই ভাল।

সুমিত্রা তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, না অপূর্ব্ববাবু, সমাজ এবং আপনার উত্তর পুরুষ কোনটারই এতে শেষ পর্য্যন্ত কল্যাণ হবে না। সমাজ ও বংশের নাম করে ব্যক্তিকে একদিন বলি দেওয়া হতো, কিন্তু ফল তার ভাল হয় নি;—আজ তা অচল। ভালবাসার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন উত্তর পুরুষের জন্য না হলে এমন ভয়ানক স্নেহের ব্যবস্থা তার মাঝখানে স্থান পেত না। এই ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের মোহ নারীকে কাটাতেই হবে। তাকে বুঝাতেই হবে, এতে লজ্জাই আছে, গৌরব নেই।

অপূর্ব্ব ব্যাকুল হইয়া কহিল, কিন্তু ভেবে দেখুন আপনাদের এই সকল শিক্ষায় আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত সমাজের অশান্তি এবং বিপ্লব এসেই উপস্থিত হবে।

সুমিত্রা বলিলেন, হলই বা। অশান্তি এবং বিপ্লব মানেই ত অকল্যাণ নয় অপূর্ব্ববাবু। যে রুগ্ন, জীর্ণ, জরাগ্রস্ত সেই শুধু উৎকণ্ঠিত সতর্কতায় আপনাকে আগলে রাখতে চায়, কোন দিক দিয়ে না তার গায়ে ধাক্কা লাগে। অনুক্ষণ এই ভয়েই সে কাঁটা হয়ে থাকে, এতটুকু নাড়াচাড়াতেই তার প্রাণবায়ু চোখের পলকে বেরিয়ে যাবে। আর এমনি অবস্থাই যদি সমাজের হয়ে থাকে ত যাক্ না একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে। দুদিন আগে-পাছের জন্য কি-ই বা এমন ক্ষতি হবে?

এ-কথার অপূর্ব্ব আর জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল। সুমিত্রা নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, ঋষি-পুত্রের উপমা দিয়ে হয়তো আপনাকে আমি ব্যথা দিয়েচি। কিন্তু ব্যথা যে আপনার পাওনা ছিল, তার থেকে আপনাকে আমি বাঁচাতামই বা কি করে।

তাঁর শেষের কথাটা অপূর্ব্ব বুঝিতে পারিল না, কিন্তু বিরক্তির পাত্র তাহার

পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাই প্রত্যুত্তরে বলিয়া ফেলিল, জগন্নাথের পথে দাঁড়িয়ে ক্রীশ্চান মিশনারীরা যাত্রীদের অনেক ব্যথা দেয়। তবুও সেই ঠুঁটো জগন্নাথকে ত্যাগ করে কেউ হাত-ওয়ালা খ্রীষ্টকেও ভজে না। ঠুঁটো নিয়েই তাদের কাজ চলে যায়, এই আশ্চর্য্য!

সুমিত্রা রাগ করিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, সংসারে আশ্চর্য্য আছে বলেই ত মানুষের বাঁচা অসম্ভব হয়ে ওঠে না অপূর্ব্ববাবু। গাছের পাতার রঙ যে সবাই সবুজ দেখে না এ তারা জানেও না। তবুও যে লোকে তাকে সবুজ বলে, সংসারে এই কি কম আশ্চর্য্য! সতীত্বের সত্যিকার মূল্য জানলে কি—

সুমিত্রা! যে লোকটি নিঃশব্দে এতক্ষণ লিখিতেছিল সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল।

অপূর্ব্ব দেখিল, গিরীশ মহাপাত্র।

ভারতী তাহার কানে কানে বলিল, উনিই আমাদের ডাক্তার। উঠে দাঁড়ান।

কলের পুতুলের মত অপূর্ব্ব উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ক্রুদ্ধ মনোহরের শেষ কথাগুলা তাহার চক্ষের নিমেষে মনে পড়িয়া সমস্ত দেহের রক্ত যেন হিম হইয়া গেল।

গিরীশ কাছে আসিয়া কহিলেন, আমাকে বোধ হয় আপনি ভুলে যাননি? আমাকে এঁরা সবাই ডাক্তার বলেন। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

অপূর্ব্ব হাসিতে পারিল না; কিন্তু আস্তে আস্তে বলিল, আমার কাকাবাবুর খাতায় কি একটা ভয়ানক নাম লেখা আছে—

গিরীশ সহসা তাহার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপিচুপি কহিলেন, সব্যসাচী ত? এই বলিয়া পুনশ্চ হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু রাত হয়ে গেছে অপূর্ব্ববাবু, চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। পথটা তেমন ভাল নয়,—পাঠান ওয়ার্কমেনগুলোর মদ খেলে আর যেন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। চলুন। এই বলিয়া যেন একপ্রকার জোর করিয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

সুমিত্রাকে একটা নমস্কার করা হইল না, ভারতীকে একটা কথা বলা হইল না,—কিন্তু সবচেয়ে যে কথাটা তাহার বুকে ধাক্কা মারিল সে ওই বাঁধানো খাতাটা,—তাহার নাম তাহাতে লেখা রহিল।

১২

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই অপূর্ব্ব সৌজন্য প্রকাশ করিয়া কহিল, আপনার এই অসুস্থ দুর্ব্বল শরীর নিয়ে আর পথ হেঁটে কাজ নেই। এই ত সোজা রাস্তা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েচে, আমি অনায়াসে যেতে পারবো।

ডাক্তার চলিতে চলিতেই একটু হাসিয়া বলিলেন, অনায়াসে এলেই কি অনায়াসে যেতে পারা যায় অপূর্ব্ববাবু? তখন, সন্ধ্যাবেলা যে পথটা সোজাই ছিল, এখন, এতরাত্রে জেরবাদী পাঠান আর বেকার কাফ্রিতে মিলে হয়ত তাকে রীতিমত বাঁকিয়ে রেখেচে। চলুন আর দাঁড়াবেন না।

অপূর্ব্ব ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিয়াও জিজ্ঞাসা করিল, কি করে এরা? মারামারি?

তাহার সঙ্গী পুনশ্চ হাসিয়া বলিলেন, করে বই কি! মদের খরচা তারা পরের ঘাড়ে চাপাবার কাজে ও-অনুষ্ঠানটুকু বোধ করি ঠিক বাদ দিয়ে উঠতে পারে না। এই যেমন সোনার ঘড়িটা আপনার। অপরের পকেটে চালান যাবার সময়ে আপত্তি হবারই সম্ভাবনা। তার পরের ব্যাপারটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। ঠিক না?

অপূর্ব্ব সভয়ে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ঠিক বটে, কিন্তু এ যে আমার বাবার ঘড়ি!

ডাক্তার বলিলেন, এই তো তারা বুঝতে চায় না! কিন্তু, আজ না বুঝলে চলবে না।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, আজ এর বদলে কারুরই মদ খাবার সুবিধে হবে না।

অপূর্ব্ব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সান্দগ্ধকণ্ঠে কহিল, বরঞ্চ চলুন, আর কোন পথ দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাক্।

ডাক্তার তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অনেকটা মেয়েদের মত স্নিগ্ধ সকৌতুক হাসি। কহিলেন, ঘুরে? এই দুপুর রাতে? না না, তার আবশ্যক নেই, চলুন। এই বলিয়া সেই শীর্ণ হাতখানি দিয়ে অপূর্ব্বর ডান হাতটি টা.নয়া লইয়া একটা চাপ দিতেই অপূর্ব্বর অনেক দিনের অনেক জিমনাস্টিক, অনেক ক্রিকেট-হকি-খেলা হাতের ভিতরের হাড়গুলা পর্য্যন্ত যেন মড়মড় করিয়া উঠিল।

অপূর্ব্ব হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, চলুন, বুঝেচি। এই বলিয়া সে নিজেও একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, কাকাবাবু সেদিন আপনার কথাতেই রহস্য করে আমাকে বলেছিলেন, সাধে কী বাবাজী মহাপুরুষের সম্বর্দ্ধনায় এত লোকজনের আয়োজন করতে হয়? আমাদের গুহ্য কেতাবে লেখা আছে, কৃপা করলে তিনি

পাঁচ-সাত-দশজন পুলিশের ভবলীলা শুধু চড় মেরেই সাঙ্গ করে দিতে পারেন! কাকা-বাবুর মুখের ভঙ্গীতে সেদিন আমরা খুব হেসেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অত হাসা ঠিক সঙ্গত হয়নি—আপনি পারলেও বা পারতে পারেন।

ডাক্তারের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, কহিলেন, ওটা অতিশয়োক্তি। কিন্তু আমরা কে কে?

অপূর্ব্ব কহিল, আমি এবং তাঁরই দু-চারজন কর্ম্মচারী।

ওঃ—এঁরা! এই বলিয়া তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। অপূর্ব্ব ইহার অর্থ বুঝিল; এবং কিছুক্ষণ অবধি কোন কথা যেন তাহার মুখে আসিল না। সোজা পথটা আজ সোজাই ছিল, কারণ, যে জন্যই হোক, পথিকের টাকাকড়ি কাড়িয়া লইবার জন্য আজ কেহ তথায় উপস্থিত ছিল না। নির্জ্জন গলিটা নিঃশব্দে পার হইয়া তাহারা বড় রাস্তার কাছাকাছি পৌঁছিলে অপূর্ব্ব সহসা বলিয়া উঠিল, এবার বোধ হয় আমি নির্ভয়ে যেতে পারব। ধন্যবাদ।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার স্বল্পালোকিত সম্মুখের প্রশস্ত রাজপথের বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, পারবেন বোধ হয়।

অপূর্ব্ব নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়া ভিতরের কৌতূহল কোনমতেই আর সংবরণ করিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা, সব্য—

না না, সব্য নয়, সব্য নয়—ডাক্তারবাবু।

অপূর্ব্ব ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমাদের সৌভাগ্য যে পথে কেউ ছিল না, কিন্তু ধরুন তারা দলে বেশি থাকলেও কি সত্য সত্যই কোন ভয় ছিল না?

ডাক্তার কহিলেন, দলে তারা দু-দশজনের বেশি কোন দিনই থাকে না।

অপূর্ব্ব বলিল; দু-দশজন! অর্থাৎ, দু-জন থাকলেও ভয় ছিল না, দশজন থাকলেও না?

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন না।

বড় রাস্তার মোড়ের উপর আসিয়া অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, বাস্তবিকই কি আপনার পিস্তলের লক্ষ্য কিছুতেই ভুল হয় না?

ডাক্তার তেমনি সহাস্যে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন, না। কিন্তু কেন বলুন ত? আমার সঙ্গে ত পিস্তল নেই।

অপূর্ব্ব বলিল, ওটা না নিয়েই বেরিয়েছিলেন,—আশ্চর্য্য! অন্ধকার গভীর রাত্রি ঝাঁঝাঁ করিতেছে, সে জনহীন দীর্ঘ পথের প্রতি চাহিয়া কহিল, পথে না আছে

লোক, না আছে একটা পুলিশ; আলো ত না থাকার মধ্যেই—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমার বাসাটা প্রায় ক্রোশখানেক হবে, না?

ডাক্তার বলিলেন, তা হবে বই কি।

অপূর্ব্ব কহিল, আচ্ছা নমস্কার, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। এই বলিয়া সে চলিতে উদ্যত হইয়া কহিল, আচ্ছা এমন ত হতে পারে, সে ব্যাটারা আজ আর কোন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে?

ডাক্তার সায় দিয়া কহিলেন, বিচিত্র নয়।

অপূর্ব্ব কহিল, নয়ই ত! আছেই!—আচ্ছা, নমস্কার! কিন্তু মজা দেখেছেন, যেখানে আসল দরকার সেখানে পুলিশের ছায়াটি পর্য্যন্ত দেখবার জো নেই। এই হ'ল তাঁদের কর্ত্তব্যজ্ঞান! আর এর জন্যেই আমরা ট্যাক্স জুগিয়ে মরি! সমস্ত বন্ধ করে দেওয়া উচিত, কি বলেন?

তাতে আর সন্দেহ কি! বলিয়া ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন। তেমনি মেয়েলি কোমল সুমিষ্ট হাসি। কহিলেন, চলুন, কথা কইতে কইতে আর খানিকটা আপনার সঙ্গে এগিয়ে যাই।

অপূর্ব্ব লজ্জায় একেবারে ম্লান হইয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত মাটির দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি বড্ড ভীরু লোক ডাক্তারবাবু, আমার কিচ্ছু সাহস নেই। আর কেউ হলে অনায়াসে যেতে পারতো, এত রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিত না।

তাহার এই বিনয়-নম্র, নিরভিমান সত্য কথায় ডাক্তার নিজের হাসির জন্য নিজেও যেন লজ্জা পাইলেন, সস্নেহে তাহার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া কহিলেন, সঙ্গে যাবার জন্যেই আমি এসেচি অপূর্ব্ববাবু, নইলে প্রেসিডেণ্ট আমাকে এ জিনিসটা হাতে গুঁজে দিতেন না। এই বলিয়া তিনি বাঁ হাতের মোটা কালো লাঠিটা দেখাইলেন।

অপূর্ব্ব চকিত হইয়া কহিল, সুমিত্রা? তিনি কি আপনাকেও আদেশ করতে পারেন?

ডাক্তার হাসিলেন, পারেন বই কি।

অপূর্ব্ব বলিল, কিন্তু তিনি ত অন্য লোকও সঙ্গে দিতে পারতেন?

ডাক্তার কহিলেন, তার মানে সবাইকে দল বেঁধে পাঠানো। তার চেয়ে এই ব্যবস্থাই সোজা হয়েচে অপূর্ব্ববাবু।

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। ডাক্তার কহিলেন, সুমিত্রা আমাদের দলের কর্ত্রী, তাঁকে সকল দিক চেয়ে দেখে কাজ করতে হয়। যেখানে ছুরি-ছোরা খুন-জখম লেগেই আছে সেখানে যাকে তাকে ত পাঠানো যায় না। আমি উপস্থিত না

থাকলে আজ আপনাকে থাকতে হতো,—তিনি কোনমতেই আসতে দিতেন না।

এই অন্ধকার জনহীন পথে, ছুরি-ছোরার কথায় অপূর্ব্বর সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া গেল। আস্তে আস্তে কহিল, কিন্তু এই পথেই যে আপনাকে একাকী ফিরতে হবে?

ডাক্তার বলিলেন, তা হবে।

অপূর্ব্ব আর প্রশ্ন করিল না। তাহাদের নিভৃত আলাপের গুঞ্জন শব্দ পাছে অবাঞ্ছিত কাহাকেও আকৃষ্ট করিয়া আনে এ খেয়াল তাহার মনের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সে তাহার চক্ষু কর্ণ ও মনকে একই কালে রাস্তার দক্ষিণে বামে ও সম্মুখে একান্ত নিবিষ্ট করিয়া নিঃশব্দ দ্রুতপদে পথ চলিতে লাগিল। মিনিট পনর এই ভাবে চলিয়া সহরের প্রথম পুলিশ স্টেশনটা ডানহাতে রাখিয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব্ব আবার কথা কহিল, বলিল, ডাক্তারবাবু, আমার বাসা ত বেশি দূরে নয়, আজ রাত্রিটা ওখানে থাকলে ক্ষতি কি?

ডাক্তার তাহার মনের কথা অনুমান করিয়া সহাস্যে কহিলেন, ক্ষতি ত অনেক জিনিসেই হয় না অপূর্ব্ববাবু, কিন্তু বিনা প্রয়োজনেও কোন কাজ করা আমাদের বারণ। শুধু কেবল প্রয়োজন নেই বলেই আমাকে ফিরে যেতে হবে।

আপনারা কি অপ্রয়োজনে জগতে কিছুই করেন না?

করা বারণ। আমি তাহলে বিদায় হই অপূর্ব্ববাবু?

অপূর্ব্ব কটাক্ষে পশ্চাতের সমস্ত অন্ধকার পথটার প্রতি চাহিয়া এই লোকটিকে একাকী ফিরিয়া যাইতে কল্পনা করিয়া আর একবার কণ্ঠকিত হইয়া উঠিল। কহিল, ডাক্তারবাবু, মানুষের মর্য্যাদা রক্ষা করাও কি আপনাদের বারণ?

ডাক্তার আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, হঠাৎ এ কথা কেন?

অপূর্ব্ব ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে বলিল, তা ছাড়া আর কি বলুন? আমি ভীতু লোক, দলবদ্ধ গুণ্ডাদের মধ্যে দিয়ে একলা যেতে পারিনে;—আমাকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে সেই বিপদের ভেতর দিয়ে আপনি যদি আজ একাকী ফিরে যান, আর কি আমি মুখ দেখাতে পারব?

ডাক্তার চক্ষের নিমেষে তাহার দুই হাত সস্নেহে ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, আচ্ছা চলুন তবে আজ রাত্রির মত আপনার বাসাতে গিয়েই অতিথি হইগে। কিন্তু এ-সব হাঙ্গামা কি সহজে নিতে আছে ভাই?

কথাটা অপূর্ব্ব ঠিক বুঝিল না, কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই হাতের মধ্যে কেমনতর একপ্রকার টান অনুভব করিয়া ফিরিয়া চাহিয়াই কহিল, আপনার জুতোয় বোধকরি লাগচে ডাক্তারবাবু, আপনি খোঁড়াচ্চেন।

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ও কিছু না। লোকালয়ে আমার পা দুটো কেমন আপনিই খুঁড়িয়ে চলে। গিরিশ মহাপাত্রের চলন মনে পড়ে?

অপূর্ব্ব থমকাইয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনাকে যেতে হবে না ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার তেমনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু আপনার মর্য্যাদা?

অপূর্ব্ব বলিল, আপনার কাছে আবার মর্য্যাদা কি? পায়ের ধুলোর যোগ্যও ত নই। আপনি ছাড়া পৃথিবীতে কি আর কারও এত বড় সাহস আছে!

এই ডাক্তার ব্যক্তিটির জীবন-ইতিহাসের সহিত অপূর্ব্বর প্রত্যক্ষ পরিচয় কিছুই ছিল না। থাকিলে সে এই অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার লইয়া এতখানি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লজ্জায় মরিয়া যাইত। সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের ন্যায় এই পথটুকুতে একাকী হাঁটা এই লোকটির কাছে কি! পুলিশের লোকে যাহাকে সব্যসাচী বলিয়া জানে, দশ-বারোজন দুর্ব্বৃত্তে মিলিয়া তাহার পথরোধ করিবে কি করিয়া?

ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিয়া শেষে ভাল মানুষটির মত কহিলেন, আচ্ছা, তার চেয়ে চলুন না কেন দুইজনেই আবার একসঙ্গে ফিরে যাই? আমাকে একলা যদি বা কেউ আক্রমণ করতে সাহস করে আপনি কাছে থাকলে ত সে সম্ভাবনা থাকবে না!

অপূর্ব্ব অনিশ্চিতকণ্ঠে বলিল, আবার ফিরে যাব?

ডাক্তার বলিলেন, দোষ কি? আমার একলা যাবার বিপদের শঙ্কাও থাকবে না।

থাকব কোথায়?

আমার কাছে।

আফিস হইতে ফিরিয়া আজ অপূর্ব্বর খাওয়া হয় নাই, তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতেছিল, একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, দেখুন, আমার কিন্তু এখনো খাওয়া হয়নি, আচ্ছা তা না হয় আজ—

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, চলুন না, ভাগ্য পরীক্ষা করে আজ দেখাই যাক। কিন্তু একটা কথা, তেওয়ারী বেচারা বড় চিন্তিত হয়ে থাকবে।

তেওয়ারীর উল্লেখে অপূর্ব্বর মনের মধ্যে হঠাৎ একটা হিংস্র প্রতিশোধের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল, রাগ করিয়া বলিল, মরুকগে ব্যাটা ভেবে,—চলুন যাই। এই বলিয়া সে একরম জোর করিয়াই তাহাকে বাধা দিয়া সেই আলো-আঁধারের জনশূন্য পথে উভয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে আবার ফিরিয়া চলিল। এবার কিন্তু ভয়ের কথা তাহার মনে হইল না। পুলিশ থানা পার হইয়া সহসা একসময়ে সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি কি এ্যানার্কিস্ট?

ডাক্তার অন্ধকারে তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কাকাবাবু কি বলেন?

অপূর্ব্ব কহিল, তিনি বলেন সব্যসাচী একজন এ্যানার্কিস্ট।

আমি যে সব্যসাচী এ সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ নেই।

না।

এ্যানার্কিস্ট বলতে আপনি কি বোঝেন?

অপূর্ব্ব এ প্রশ্নের হঠাৎ জবাব দিতে পারিল না। একটু ভাবিয়া কহিল, অর্থাৎ কিনা রাজদ্রোহী,—যিনি রাজার শত্রু।

ডাক্তার বলিলেন, আমাদের রাজা এ দেশে থাকেন না, থাকেন বিলাতে। লোকে বলে অতিশয় ভদ্রলোক। আমি তাঁকে কখনও চোখে দেখিনি, তিনিও আমার কখনও লেশমাত্র ক্ষতি করেননি। তাঁর প্রতি বৈরীভাব আসবে আমার কোথা থেকে অপূর্ব্ববাবু?

অপূর্ব্ব কহিল, যাদের আসে, তাদেরই বা কি করে আসে বলুন? তাদেরও ত তিনি কোন অনিষ্ট করেননি!

ডাক্তার সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, তাই আপনি যা বলচেন এদেশে তা নেই, একেবারে মিছে কথা!

তাঁহার কণ্ঠস্বরের প্রবলতায় ও অস্বীকার করিবার তীব্রতায় অপূর্ব্ব চমকিয়া গেল। অবিশ্বাস করিবার সাহস তাহার হইল না, অথচ দেশে কিছু যে একটা আছেই, ছেলেবেলায় তাহারও গায়ে যে ইহার আঁচ লাগিয়া গেছে এবং ডেপুটী-ম্যাজিস্ট্রেট বাবা না থাকিলে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়া গড়াইতে পারিত ইহা সে বড় বয়সে পদে পদে অনুভব করিয়াছে। একটু ভাবিয়া কহিল, রাজা না হোন রাজকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে যে একটা ষড়যন্ত্র ছিল একথা ত মিথ্যে নয় ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, কর্ম্মচারীরা রাজার ভৃত্য, মাইনে পায় হুকুম পালন করে। একজন যায় আর একজন আসে। এটা সহজ এবং মোটা কথা। কিন্তু এই সহজকে জটিল এবং মোটাকে নিরর্থক সূক্ষ্ম করে মানুষ যখন দেখতে চায়, তখনই তার সবচেয়ে বড় ভুল হয়। সেইজন্যে তাদের আঘাত করাকেই রাজশক্তির মূলে আঘাত করা ব'লে আত্মবঞ্চনা করে। এত বড় মারাত্মক ব্যর্থতা আর নেই।

অপূর্ব্ব একটু চুপ করিয়া কহিল, কিন্তু এই ব্যর্থ কাজ করবার লোক কি ভারতবর্ষে নেই?

ডাক্তার শান্তভাবে কহিলেন, হয়ত থাকতেও পারে।

কিন্তু অপূর্ব্ব সহসা আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এ রা আজকাল কোথায় থাকেন এবং কি করেন?

তাহার ঔৎসুক্য ও ব্যগ্রতায় ডাক্তার শুধু মুচকিয়া হাসিলেন।

অপূর্ব্ব কহিল, হাসলেন যে?

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, আপনাদের সেই কাকাবাবুটি উপস্থিত থাকলে কিন্তু বুঝতেন। আপনার বিশ্বাস আমি একজন এ্যানার্কিস্টদের পাণ্ডা। তার মুখ থেকে কি এর জবাব আশা করতে আছে অপূর্ব্ববাবু?

নিজের বুদ্ধিহীনতার এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে অপূর্ব্ব অপ্রতিভ হইল, মনে মনে একটু রাগও করিল, কহিল, আশা করা সম্পূর্ণই অনুচিত হতো আজ যদি না আমাকে দলভুক্ত করে নিতেন। মেম্বারদের এটুকু জানবার অধিকার আছে, এ বোধ করি আপনি অস্বীকার করেন না। এ তো ছেলেখেলা নয়, ভীষণ দায়িত্ব আছে যে!

আছেই ত। বলিয়া ডাক্তারবাবু হাসিলেন। এই সুমিষ্ট হাসি ও নিরাতঙ্ক সহজ উক্তি ঠিক ব্যাঙ্গোক্তির মতই অপূর্ব্বর কানে বাজিল। বিদ্রোহী দলের বাঁধানো খাতায় যাহার নাম লেখা হইল তাহার প্রশ্নের এই উত্তর? এর বেশি জানিবার তাহার প্রয়োজন নাই! মনে মনে ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া এই লোকটিকে আজ সে ভুল বুঝিল, কিন্তু এই ভুল সংশোধন করিয়া পরবর্ত্তীকালে বহুবারই তাহাকে দেখিতে হইয়াছে, কোন অবস্থায় কোন কারণেই ইহার মুখের হাসি উদ্বেগে এবং গলার স্বর উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠে না।

নিঃশব্দ গাম্ভীর্য্যে ডাক্তারের এই সামান্য সংক্ষিপ্ত জবাবটাকে সে প্রতিঘাত করিতে চাহিয়া নিরুত্তরে পথ চলিতে লাগিল, কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না, ওই ছোট্ট কথাটুকুর নিদারুণ তীক্ষ্ণতা তীরের ফলাটুকুর মতন যেন তাহার বুকে বিঁধিতে লাগিল, তিক্তকণ্ঠে কহিল, দলের খাতায় তাড়াতাড়ি নাম লিখে নিলেই ত হয় না, তার ফলাফল বুঝিয়েও দিতে হয়।

কিন্তু সে কি তাঁরা দেন নি?

অপূর্ব্ব কহিল, কিছুই না। পথের দাবী, না পথের দাবী! দাবীর বহর যে এত তা কে জানতো? আর আপনিও ত ছিলেন, নাম লেখাবার পূর্ব্বে আপনারও ত জানা উচিত ছিল আমার যথার্থ মতামত কি!

ডাক্তার একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, মেয়েরা একটা ব্যাপার করেচেন, তাঁরাই জানেন কাকে মেম্বার করবেন এবং কাকে করবেন না। আমি হঠাৎ জুটে গেছি মাত্র। বাস্তবিকই আমি এদের সভার বিশেষ কিছু জানিনে অপূর্ব্ববাবু!

অপূর্ব্ব বুঝিল ইহাও পরিহাস। উৎকণ্ঠায় ও আশঙ্কায় সমস্ত জিনিসটাই তাহার

অত্যন্ত বিশ্রী লাগিতেছিল, আপনাকে সে আর সংবরণ করিতে পারিল না, জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, কেন ছলনা করচেন ডাক্তারবাবু, সুমিত্রাকে প্রেসিডেণ্ট করুন, আর যাকেই যা করুন, দল আপনার এবং আপনিই এর সব, তাতে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। পুলিশের চোখে ধূলো দিতে পারবেন, কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না, এ আপনি নিশ্চয় জানবেন।

তাহার কথা শুনিয়া একবার এই শীর্ণদেহ রহস্যপ্রিয় লোকটি অকৃত্রিম বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, আমার দল মানে এ্যানার্কিস্টের দল ত? আপনি মিথ্যে শঙ্কিত হয়ে উঠেচেন অপূর্ব্ববাবু, আপনার আগাগোড়া ভুল হয়েচে। তাদের হ'ল জীবন-মৃত্যুর খেলা, তারা আপনার মত ভীতু লোককে দলে নেবে কেন? তারা কি পাগল?

অপূর্ব্ব লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল, কিন্তু তাহার বুকের উপর হইতে গুরুভার পাষাণ নামিয়া গেল।

ডাক্তার কহিলেন, পথের দাবী নাম দিয়ে সুমিত্রা এই ছোট্ট দলটির প্রতিষ্ঠা করেচেন। জীবন-যাত্রায় মানুষের পথ চলবার অধিকার যে কত বড় এবং কত পবিত্র এই মস্ত সত্যটাই মানুষে যেন ভুলে গেছে। আপনারা অর্থাৎ দলের সভ্য যাঁরা, তাঁরা নিজেদের সমস্ত জীবন দিয়ে এই কথাটাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান। সুমিত্রা অনুরোধ করলেন আমি যে কয়দিন এখানে আছি তাঁর দলটিকে যেন গড়ে দিয়ে যাই। আমি রাজি হয়েচি—এ ছাড়া আপনাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আপনারা হলেন সমাজ-সংস্কারক, কিন্তু আমার সমাজ-সংস্কার করে বেড়াবার সময়ও নেই, ধৈর্য্যও নেই। হয়ত কিছুদিন আছি, হয়ত কালই চলে যেতে পারি; সারাজীবনে কখনো দেখাও না হতে পারে। বেঁচে আছি কি নেই, এটুকু খবরও হয়ত আপনাদের কানে পৌঁছবে না।

কথাগুলি শান্ত ধীর—উচ্ছ্বাস বা আবেগের বাষ্পও নাই। এই ব্যক্তি যেই হোক, কিন্তু সব্যসাচীর যে বিবরণ অপূর্ব্ব কাকাবাবুর মুখে শুনিয়াছে, সেইসব দপ্ করিয়া মনে পড়িয়া তাহার বুকের কোথায় যেন খোঁচার মত বিঁধিল। কিন্তু তখনি মনে হইল, সে ত পাষাণ,—তাহার জন্য আবার বেদনাবোধ কি? ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তারবাবু, সুমিত্রা কে? আপনি তাঁকে জানলেন কি করে?

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু একটুখানি হাসিলেন। উত্তর না পাইয়া অপূর্ব্ব নিজেই বুঝিল এরূপ কৌতূহল সঙ্গত হয় নাই। এই অল্পকালের মধ্যেই সে এই রহস্যময় বিচিত্র সমাজের আচরণের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিতেছিল, তাই, সে ভারতীর সম্বন্ধেও তাহার প্রবল কৌতূহলও সংবরণ করিয়া মৌন হইয়া রহিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় এইভাবে নিঃশব্দে কাটিলে ডাক্তার প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, আপনার কল্যাণেই বোধ হয় রাস্তা আজ একেবারে নিরাপদ। এমন প্রায় ঘটে না, কিন্তু কি ভাবচেন বলুন ত?

অপূর্ব্ব বলিল, ভাবচি অনেক কিছু, কিন্তু সে যাক। আচ্ছা আপনি বললেন মানুষের নির্ব্বিঘ্নে পথ চলবার অধিকার। এই যেমন আমরা আজ নির্ব্বিঘ্নে পথ চলছি,—এমনি?

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, এমনিই কিছু একটা হবে বোধ হয়।

অপূর্ব্ব কহিল, ওই যে মেয়েটি, স্বামী পরিত্যাগ করে পথের দাবীর সভ্য হতে এসেচেন ওটাও ঠিক বুঝলাম না!

ডাক্তার কহিলেন, আমিও যে ঠিক বুঝেচি তা বলতে পারিনে। ওসব ব্যাপার সুমিত্রাই বোঝেন ভাল।

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল, তাঁর বোধহয় স্বামী নেই?

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্ব্বকে লজ্জা ও ক্ষোভের সহিত পুনরায় স্মরণ করিতে হইল তাহার অহেতুক ঔৎসুক্যের তিনি জবাব দিবেন না। বরং এই কথা অলক্ষ্যে যাচাই করিতে সে সঙ্গীর মুখের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া কিন্তু একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, এই আশ্চর্য্য মানুষটির অপরিজ্ঞাত জীবনের একটা নিভৃত দিক যেন সে হঠাৎ দেখিতে পাইল। সে ঠিক কি তাহা বলা কঠিন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যাহা কিছু সে জানিয়াছে তাহার অতীত। যেন কোন বহু-দূরাঞ্চলে তাঁহার চিন্তা সরিয়া গেছে, কাছাকাছি কোথাও আর নাই। অনতিদূরবর্ত্তী ল্যাম্পপোস্ট হইতে কিছুক্ষণ হইতেই একটা ক্ষীণ আলোক ইহার মুখের উপরে পড়িয়াছিল, পাশ দিয়া যাইবার সময় অপূর্ব্ব স্পষ্ট দেখিতে পাইল, এই ভয়ঙ্কর সতর্ক লোকটির চোখের উপরে একটা ঝাপসা জাল ভাসিয়া বেড়াইতেছে—এই মুহূর্ত্তের জন্য যেন তিনি সমস্ত ভুলিয়া মনে মনে কি একটা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

অপূর্ব্ব দ্বিতীয় প্রশ্ন করে নাই, নীরবে পথ চলিতেছিল, কিন্তু মিনিট দু'য়ের বেশী হইবে না, অকস্মাৎ অকারণেই হাসিয়া উঠিয়া ডাক্তার বলিলেন, দেখুন অপূর্ব্ববাবু, আপনাকে আমি সত্যই বলচি মেয়েদের এই সব প্রণয়-ঘটিত মান-অভিমানের ব্যাপার আমি কিছুই বুঝিনে। বোঝবার চেষ্টা করতে গেলেও নিরর্থক ভারী সময় নষ্ট হয়। কোথায় পাই এত সময়?

অপূর্ব্বর প্রশ্নের ইহা উত্তর নয়, সে চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, ভারী মুস্কিল, এদের বাদ দিয়ে কাজও চলে না, নিলেও গণ্ডগোল বাধে।

এ মন্তব্যও অসম্বদ্ধ। অপূর্ব্ব নিরুত্তরেই রহিল।

কি হ'লো? কথা ক'ন না যে বড়?

অপূর্ব্ব কহিল, কি বলব বলুন।

ডাক্তার কহিলেন, যা ইচ্ছে। দেখুন অপূর্ব্ববাবু, এই ভারতীটি বড় ভাল মেয়ে। যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি কর্ম্মঠ এবং তেমনি ভদ্র।

ইহাও বাজে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে এ প্রশ্ন সে ইচ্ছা করিয়াই করিল না যে, আপনি তাহাকে কতদিন হইতে জানিলেন এবং কি করিয়া জানিলেন। শুধু বলিল, হাঁ। কিন্তু শ্রোতার যদি এদিকে কিছুমাত্র খেয়াল থাকিত ত অপূর্ব্বর মুখ হইতে এই এক অক্ষরের জবাবে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি যে বিমনা হইয়াই আলাপ করিতেছিলেন, অপূর্ব্বকে তাহা আর নূতন করিয়া বুঝিতে হইল না। বক্তা বোধকরি তাঁহার শেষ কথারই সূত্র ধরিয়া কহিলেন, আপনাদের প্রসঙ্গে কথা কইতে তিনি আপনার সম্বন্ধে বলছিলেন, আপনি নাকি ভয়ানক হিন্দু—একেবারে গোঁড়া। ভারতী বলছিলেন, এত বড় ভয়ঙ্কর হিঁদু বামুনের তিনি জাত মেরে দিয়েচেন।

অপূর্ব্ব বলিল, তা হবে। এই একান্ত অন্যমনস্ক লোকটির সহিত তর্ক করিতে তাহার ইচ্ছাই হইল না। বড় রাস্তা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, গলির মোড়ে সামনা-সামনি আলো দুইটা সম্মুখেই দেখা দিল, আর মিনিট দশেকের মধ্যেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো যাইবে, এমনি সময়ে ডাক্তার তাঁহার ঘুমন্ত মনটাকে যেন অকস্মাৎ ঝাড়া দিয়া একেবারে সজাগ করিয়া দিলেন, কহিলেন, অপূর্ব্ববাবু।

অপূর্ব্ব তাঁহার কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতায় নিজেও সচেতন হইয়া উঠিল, কহিল, বলুন।

ডাক্তার বলিলেন, এদেশে আমি থাকা পর্য্যন্ত কাজ নেই, কিন্তু চলে গেলে আপনি নিঃসঙ্কোচে সুমিত্রাকে সাহায্য করবেন। এমন মানুষ আপনি পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেও কখনো পাবেন না। এঁর পথের দাবী যেন অনাদরে অবহেলায় না মারা পড়ে। এতবড় একটা আইডিয়া কি কেবল এই ক'টি মেয়েমানুষেই সার্থক করে তুলতে পারবে। আপনার একনিষ্ঠ সেবার একান্ত প্রয়োজন।

এই ব্যক্তির ধারণায় সে যে সত্যই এতবড় লোক অপূর্ব্ব তাহা প্রত্যয় করিল না। কহিল, এতবড় একটা আইডিয়াকে তবে আপনিই বা ফেলে যেতে চাচ্চেন কেন?

ডাক্তার কহিলেন, অপূর্ব্ববাবু, যেখানে ফেলে যাওয়াই মঙ্গল, সেখানে আঁকড়ে থাকাতেই অকল্যাণ। আমার সাহায্যে আপনাদের কাজ নেই,—আপনারা নিজেরাই এটা গড়ে তুলুন, হয়ত বা এর ভেতর দিয়েই দেশের সবচেয়ে বড় কাজ হবে।

অপূর্ব্ব কহিল, নবতারার ব্যাপারটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনে ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার বলিলেন, কিন্তু সুমিত্রাকে বিশ্বাস করবেন। বিশ্বাসের এত বড় উঁচু জায়গা

আর কোথাও পাবেন না অপূর্ব্ববাবু। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আপনাকে ত আমি পূর্ব্বেই বলেচি, মেয়েদের ব্যাপার আমি বুঝতে পারিনে; কিন্তু সুমিত্রা যখন বলেন, জীবন-যাত্রায় মানবের পথ চলবার বাধাবন্ধহীন স্বাধীন অধিকার, তখন এ দাবীকে ত কোন যুক্তি নিয়েই ঠেকিয়ে রাখতে পারিনে। শুধু ত মনোহরের নয়, বহু লোকের নির্দ্দিষ্ট পথে চলায় নবতারার জীবনটা নির্বিঘ্ন হ'তো, এ আমি বুঝি এবং যে পথটা সে নিজে বেছে নিলে সে পথটাও নিরাপদ নয়, কিন্তু নিজে বিপদের মাঝখানে ডুবে থেকে আমিই বা তাকে বিচার করব কি দিয়ে বলুন? সুমিত্রা বলেন, এ জীবনটা নির্বিঘ্নে কাটাতে পারাটাই কি মানুষের চরম কল্যাণ? মানুষের চিন্তা এবং প্রবৃত্তিই তার কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু পরের নির্দ্ধারিত চিন্তা ও প্রবৃত্তিকে দিয়ে সে যখন তার নিজের স্বাধীন চিন্তার মুখ চেপে ধরে তখন তার চেয়ে বড় আত্মহত্যা মানুষের ত আর হতেই পারে না। এ কথার ত কোন জবাব আমি খুঁজে পাইনে অপূর্ব্ববাবু।

অপূর্ব্ব বলিল, কিন্তু সবাই যদি নিজের চিন্তার মত—

ডাক্তার বাধা দিয়া কহিলেন, অর্থাৎ সবাই যদি নিজের খেয়াল মত কাজ করতে চায়?—বলিয়াই একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, তাহলে কি কাণ্ড হয় আপনি সুমিত্রাকে একবার জিজ্ঞাসা করবেন।

অপূর্ব্ব তাহার প্রশ্নের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া সলজ্জে সংশোধন করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সময় হইল না। ডাক্তার পুনশ্চ বাধা দিয়া কহিলেন, কিন্তু তর্ক আর চলবে না অপূর্ব্ববাবু, আমরা এসে পড়েচি। আর একদিন না হয় এ আলোচনা শেষ করা যাবে।

অপূর্ব্ব সুমুখে চাহিয়া দেখিল, সেই লাল রঙের বিদ্যালয় গৃহ, এবং তাহার দ্বিতলে ভারতীর ঘর হইতে তখনও আলো দেখা যাইতেছে।

ডাক্তার ডাকিলেন, ভারতী!

ভারতী জানালায় মুখ বাহির করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, বিজয়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে ডাক্তারবাবু? আপনাকে সে ডাকতে গিয়েচে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের প্রেসিডেন্টের আদেশ ত? কিন্তু কোন হুকুমই এত রাত্রে ও-পথে কাউকে পাঠাতে পারবে না। কিন্তু কাকে ফিরিয়ে এনেচি দেখেচ?

ভারতী ঠাওর করিয়া দেখিয়া অন্ধকারেও চিনিতে পারিল। কহিল, ভাল করেননি। আপনি কিন্তু শীঘ্র যান, নরহরি মদ খেয়ে তার হৈমর মাথায় কুড়ুল মেরেচে, বাঁচে কিনা সন্দেহ। সুমিত্রাদিদি সেখানেই গেছেন।

ডাক্তার কহিলেন, ভালই ত করেচে। মরে ত সে মরুক না। কিন্তু আমার অতিথি?

ভারতী বলিল, মেয়েদের প্রতি আপনার অসীম অনুগ্রহ। এটা কিন্তু হৈম না হয়ে নরহরি হলে আপনি এতক্ষণ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তেন।

ডাক্তার কহিলেন, না হয় উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়চ্চি। কিন্তু অতিথি?

আমি যাচ্চি, বলিয়া ভারতী আলো হাতে পরক্ষণেই নীচে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল, কহিল, বাস্তবিক আর দেরি করবেন না ডাক্তারবাবু, যান। কিন্তু খ্রীষ্টানের আতিথ্য কি উনি স্বীকার করবেন?

ডাক্তার মনে মনে একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া কহিলেন, এঁকে ফেলে আমি যাই কি করে ভারতী? হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করনি কেন?

ভারতী রাগ করিয়া কহিল, যা করতে হয় করুন গে ডাক্তারবাবু, আপনার পায়ে পড়ি আর দেরি করবেন না। আমার অনেক অভ্যাস আছে, ওঁকে আমি সামলাতে পারবো—আপনি দয়া করে একটু শীঘ্র যান।

অপূর্ব্ব এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। কিন্তু তাহার জন্য একটা লোক মারা পড়িবে ইহা ত কোন মতেই হইতে পারে না! সে কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ডাক্তার দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

১৩

নীচেকার ঘরের দরজা জানালা ভারতী বন্ধ করিতে ব্যাপৃত রহিল, অপূর্ব্ব সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিল এবং ভাল দেখিয়া একটা আরাম কেদারা বাছিয়া লইয়া হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। চোখ বুজিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আঃ! সে যে কতখানি শ্রান্ত হইয়াছিল তাহা উপলব্ধি করিল।

মিনিট কয়েক পরে ভারতী উপরে আসিয়া হাতের আলোটা যখন তে-পায়ার উপর রাখিতেছে অপূর্ব্ব তখন টের পাইল, কিন্তু সহসা তাহার এমন লজ্জা করিয়া উঠিল যে, এই ক্ষণকালের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ার ন্যায় একটা অত্যন্ত অসম্ভব ভান করার অপেক্ষা আর কোন সঙ্গত ছলনাই তাহার মনে আসিল না। অথচ, ইহা নূতন নহে। ইতিপূর্ব্বেও তাহারা একঘরে রাত্রি যাপন করিয়াছে, কিন্তু সরমের বাষ্পও তাহার অন্তরে উদয় হয় নাই। মনে মনে ইহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহার তেওয়ারীকে মনে পড়িল। সে তখন মরণাপন্ন, তাহার জ্ঞান ছিল

না, সে না থাকার মধ্যেই ; তথাপি সে উপলক্ষটুকুকেই হেতু নির্দ্দেশ করিতে পাইয়া অপূ স্বস্তি বোধ করিল।

ভারতী ঘরে ঢুকিয়া তাহার প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া যে সকল হাতের কাজ তখন পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল করিতে লাগিল, তাহার কপট নিদ্রা ভাঙাইবার চেষ্টা করিল না, কিন্তু এই পুরাতন বাটীর সুপ্রাচীন দরজা জানালা বন্ধ করার কাজে যে পরিমাণে শব্দ-সাড়া উত্থিত হইতে লাগিল তাহা সত্যকার নিদ্রার পক্ষে যে একান্ত বিঘ্নকর তাহা নিজেই উপলব্ধি করিয়া অপূর্ব্ব উঠিয়া বসিল। চোখ রগড়াইয়া হাই তুলিয়া কহিল, উঃ—এই রাত্রে আবার ফিরে আসতে হোলো।

ভারতী টানাটানি করিয়া একটা জানলা রুদ্ধ করিতেছিল, বলিল, যাবার সময় এ কথা বলে গেলেন না কেন ? সরকার মহাশয়কে দিয়ে আপনার খাবারটা একেবারে আনিয়ে রেখে দিতাম।

কথা শুনিয়া অপূর্ব্বর ঘুম-ভাঙা গলার শব্দ একেবারে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, কহিল, তার মানে ? ফিরে আসবার কথা আমি জানতাম না কি ?

ভারতী লোহার ছিটকিনিটা চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া সহজকণ্ঠে জবাব দিল, আমারই ভুল হয়েচে। খাবার কথাটা তখনি তাকে বলে পাঠানো উচিত ছিল। এত রাত্তিরে আর হাঙ্গামা পোয়াতে হোতো না। এতক্ষণ কোথায় দুজনে বসে কাটালেন ?

অপূর্ব্ব কহিল, তাঁকেই জিজ্ঞেসা করবেন। ক্রোশ-তিনেক পথ হাঁটার নাম বসে কাটানো কি না, আমি ঠিক জানিনে।

ভারতীর জানালা বন্ধ করার কাজ তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, ছিটের পর্দ্দাটা টানিয়া দিতেছিল, সেই কাজেই নিযুক্ত থাকিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, ইস, গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন বলুন! হাঁটাই সার হ'ল! এই বলিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটু হাসিয়া কহিল, সন্ধ্যা-আহ্নিক করার বালাই এখনো আছে না গেছে ? থাকে ত কাপড় দিচ্চি ওগুলো সব ছেড়ে ফেলুন। এই বলিয়া সে অঞ্চল সুদ্ধ চাবির গোছা হাতে লইয়া একটা আলমারি খুলিতে খুলিতে কহিল, তেওয়ারী বেচারা ভেবে সারা হয়ে যাবে। আজ ত দেখচি অফিস থেকে একেবারে বাসায় যাবারও সময় পাননি।

অপূর্ব্ব রাগ চাপিয়া বলিল, অবশ্য আপনি এমন অনেক জিনিস দেখতে পান যা আমি পাইনে তা স্বীকার করচি, কিন্তু কাপড় বার করবার দরকার নেই। সন্ধ্যা-আহ্নিকের বালাই আমার যায়নি, এ-জন্মে যাবেও তা মনে হয় না, কিন্তু আপনার দেওয়া কাপড়েও তার সুবিধে হবে না। থাক্, কষ্ট করবেন না।

ভারতী কহিল, দেখুন আগে কি দিই—

অপূর্ব্ব বলিল, আমি জানি তসর কিংবা গরদ। কিন্তু আমার প্রয়োজন নেই,—আপনি বার করবেন না।

সন্ধ্যা করবেন না?

না।

শোবেন কি পরে? আফিসের ওই কোট-পেন্টুলানসুদ্ধ না কি?

হাঁ।

খাবেন না?

না।

সত্যি?

অপূর্ব্বর কণ্ঠস্বরে বহুক্ষণ হইতেই তাহার সহজ স্বর ছিল না, এবার সে স্পষ্টই রাগ করিয়া কহিল, আপনি কি তামাসা করচেন না কি?

ভারতী মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, বলিল, তামাসা ত আপনিই করচেন। আপনার সাধ্য আছে না খেয়ে উপোস করে থাকেন?

এই বলিয়া সে আলমারির মধ্য হইতে একখানি সুন্দর গরদের শাড়ি বাহির করিয়া কহিল, একেবারে নিভাঁজ পবিত্র। আমিও কোনদিন পরিনি। ওই ছোট ঘরটায় গিয়ে কাপড় ছেড়ে আসুন, নীচে কল আছে, আমি আলো দেখাচ্চি, হাত-মুখ ধুয়ে ওইখানেই মনে মনে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে নিন। নিরুপায়ে এ ব্যবস্থা আছে,—ভয়ঙ্কর অপরাধ কিছু হবে না।

হঠাৎ তাহার গলার শব্দ ও বলার ভঙ্গী এমন বদলাইয়া গেল যে অপূর্ব্ব থতমত খাইয়া গেল। তাহার দপ্‌ করিয়া মনে পড়িল সেদিন ভোরবেলাতেও ঠিক যেন এমনি করিয়াই কথা কহিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। অপূর্ব্ব হাত বাড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, দিন না কাপড়, আমি নিজেই আলো নিয়ে নীচে যাচ্চি। আমি কিন্তু যার তার হাতে ভাত খেতে পারব না তা বলে দিচ্চি।

ভারতী নরম হইয়া কহিল, সরকার মশায় যে ভাল বামুন। গরীব লোক, হোটেল করেচেন, কিন্তু অনাচারী ন'ন। নিজেই রাঁধেন, সবাই তাঁর হাতে খায়,—কেউ আপত্তি করে না—আমাদের ডাক্তারবাবুর খাবার পর্য্যন্ত তাঁর কাছ থেকেই আসে।

তথাপি অপূর্ব্বর কুণ্ঠা ঘুচিল না, বিরসমুখে কহিল, যা তা খেতে আমার বড় ঘৃণা বোধ হয়।

ভারতী হাসিল, কহিল, যা তা খেতে কি আমিই আপনাকে দিতে পারি?

আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে দিয়ে সমস্ত গুছিয়ে আনবো,—তা হলে ত আর আপত্তি হবে না?—এই বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

অপূর্ব্ব আর প্রতিবাদ করিল না, আলো ও কাপড় লইয়া নীচে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া ভারতীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, সে হোটেলের অন্ন আহার করিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ ও বিঘ্ন অনুভব করিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে অপূর্ব্ব যখন গরদের শাড়ি পরিয়া নীচের একটা কাঠের বেঞ্চে বসিয়া আহ্নিকে নিযুক্ত, ভারতী দ্বার খুলিয়া একাকী অন্ধকারে বাহির হইয়া গেল, বলিয়া গেল, সরকার মশায়কে লইয়া ফিরিয়া আসিতে তাহার বিলম্ব হইবে না, ততক্ষণ সে যেন নীচেই থাকে। বস্তুতঃ ফিরিতে তাহার দেরি হইল না। সেই মাত্র অপূর্ব্বর আহ্নিক শেষ হইয়াছে, ভারতী আলো হাতে করিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে প্রবেশ করিল, সঙ্গে তাহার সরকার মশায়, হাতে তাহার খাবারের থালা একটা বড় পিতলের গামলা দিয়া ঢাকা, তাঁহার পিছনে আর একজন লোক জলের গ্লাস এবং আসন আনিয়াছে, সে ঘরের একটা কোণ ভারতীর নির্দ্দেশমত জল ছিটাইয়া মুছিয়া লইয়া ঠাঁই করিয়া দিলে ব্রাহ্মণ অন্ন-পাত্র রক্ষা করিলেন। সকলে প্রস্থান করিলে ভারতী কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া গলায় অঞ্চল দিয়া যুক্তকরে সবিনয়ে নিবেদন করিল, এ ম্লেচ্ছের অন্ন নয়, সমস্ত খরচ ডাক্তারবাবুর। আপনি অসঙ্কোচে আতিথ্য স্বীকার করুন।

কিন্তু তাহার এই সকৌতুক পরিহাসটুকু অপূর্ব্ব প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে জাতি মানে, যে-সে লোকের ছোঁয়া খায় না, হোটেলে প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণে কিছুতেই তাহার রুচি হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া দামের পয়সাটা আজ ম্লেচ্ছ দিল কি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ দিলেন এত গোঁড়ামিও তাহার ছিল না। বড় ভাইয়েরা তাহার শুদ্ধচারিণী মাতাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে, ভাল হোক, মন্দ হোক সেই মায়ের আদেশ ও অন্তরের ইচ্ছাকে তাহার লঙ্ঘন করিতে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হয়। এ কথা ভারতী যে একেবারে জানে না তাহাও নয়, অথচ যখন তখন তাহার এই আচার-নিষ্ঠাকেই লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সৃষ্টি করার চেষ্টায় মন তাহার উত্যক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কোন জবাব না দিয়া সে আসনে আসিয়া বসিল এবং আচ্ছাদন খুলিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। ভারতী সাবধানে সর্ব্বপ্রকার স্পর্শ বাঁচাইয়া দূরে ভূমিতলে বসিয়া ইহাই তদারক করিতে গিয়া মনে মনে কুণ্ঠিত ও অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ক্রীশ্চান বলিয়া হোটেলের রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে পারে নাই, এই গভীর রাত্রে, সকলের আহারান্তে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তারাই যে কোন মতে সংগ্রহ করিয়া সরকার মশায় হাজির করিয়াছিলেন ভারতী তাহা ভাবিয়া দেখে নাই।

ঘরে যথেষ্ট আলোক ছিল না, তথাপি আবরণ উন্মোচন করায় অন্ন-ব্যঞ্জনের যে মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল তাহাতে মুখে আর তাহার কথা রহিল না। অনেকদিন সে তাহাদের উপরের ঘর হইতে মেঝের ছিদ্রপথে এই লোকটির খাওয়ার ব্যাপার লুকাইয়া লক্ষ্য করিয়াছে, তেওয়ারীর ছোট-খাটো সামান্য ত্রুটিতে এই খুঁতখুঁতে মানুষটির খাওয়া নষ্ট হইতে কতদিন ভারতী নিজের চোখে দেখিয়াছে, সে-ই যখন আজ নিঃশব্দ ম্লান মুখে এই কদন্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হইল, তখন কিছুতেই সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, থাক্, থাক্, ও আর খেয়ে কাজ নেই,—এ আপনি খেতে পারবেন না।

অপূর্ব্ব বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, খেতে পারব না কেন?

ভারতী কেবলমাত্র মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, না, পারবেন না।

অপূর্ব্বও প্রতিবাদ করিয়া তেমনি মাথা নাড়িয়া কহিল, না, বেশ পারব, এই বলিয়া সে ভাত ভাঙিবার উদ্যোগ করিতেই ভারতী উঠিয়া একেবারে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আপনি পারলেও আমি পারব না। জোর করে খেয়ে অসুখ হলে এ-বিদেশে আমাকেই ভুগে মরতে হবে। উঠুন।

অপূর্ব্ব উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কি খাবো তা হলে? আজ আবার তলওয়ারকর পর্য্যন্ত আফিসে আসেননি, যা পারি এই দুটি না হয় খেয়েনি? কি বলেন? এই বলিয়া সে এমন করিয়া ভারতীর মুখের প্রতি চাহিল যে তাহার অপরিসীম ক্ষুধার কথা অপরের বুঝিতে আর লেশমাত্র বাকী রহিল না।

ভারতী ম্লানমুখে হাসিল; কিন্তু মাথা নাড়িয়া বলিল, এ ছাই-পাঁশ আমি মরে গেলেও ত আপনাকে খেতে দিতে পারব না অপূর্ব্ববাবু,—হাত ধুয়ে উপরে চলুন, আমি বরঞ্চ আর কোন ব্যবস্থা করচি।

অনুরোধ অথবা আদেশ মত অপূর্ব্ব শান্ত বালকের মত হাত ধুইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। মিনিট দশকের মধ্যেই পুনরায় সেই সরকার মশাই এবং তাহার হোটেলের সহযোগীটি আসিয়া দেখা দিলেন। এবার ভাতের বদলে একজনের হাতে মুড়ির পাত্র এবং দুধের বাটি, অপরের হাতে সামান্য কিছু ফল ও জলের ঘটী, আয়োজন দেখিয়া অপূর্ব্ব মনে মনে খুশী হইল। এইটুকু সময়ে এতখানি সুব্যবস্থা সে কল্পনাও করে নাই। তাহারা চলিয়া গেলে অপূর্ব্ব হৃষ্টচিত্তে আহারে মন দিল। দ্বারের বাহিরে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ভারতী দেখিতেছিল, অপূর্ব্ব কহিল, আপনি ঘরে এসে বসুন। কাঠের মেঝেতে দোষ ধরতে গেলে আর বর্ম্মায় বাস করা চলে না।

ভারতী সেইখান হইতেই সহাস্যে কহিল, বলেন কি? আপনার মত যে একেবারে উদার হয়ে উঠল!

অপূর্ব্ব কহিল, না এতে সত্যই দোষ নেই। ডাক্তারবাবু বললেন, চলুন, ফিরে যাই—আমিও ফিরে এলাম। এখানে যে মাতালের কাণ্ডে খুনোখুনি ব্যাপার হয়ে আছে সে কে জানতো?

জানলে কি করতেন?

জানলে? অর্থাৎ,—আমার জন্যে আপনাকে এত কষ্ট পেতে হবে জানলে আমি কখ্খনো ফিরে আসতে রাজি হোতাম না।

ভারতী কহিল, খুব সম্ভব বটে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আপনি নিজেই ইচ্ছে করে ফিরে এসেচেন।

অপূর্ব্বর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া সজোরে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কখ্খনো না! নিশ্চয় না! কাল বরঞ্চ আপনি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।

ভারতী শান্তভাবে কহিল, এত জিজ্ঞাসা করারই বা দরকার কি? আপনার কথাই কি আর বিশ্বাস করা যায় না!

তাহার কণ্ঠস্বরের কোমলতা সত্ত্বেও অপূর্ব্বর গা জ্বলিয়া গেল। সে ফিরিয়া আসিতেই ভারতী যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া উত্তাপের সহিত বলিল, আমার মিথ্যা কথা বলা অভ্যাস নয়,—আপনি বিশ্বাস না করতে পারেন।

ভারতী কহিল, আমিই বা বিশ্বাস না করব কেন?

অপূর্ব্ব বলিল, তা জানিনে। যার যেমন স্বভাব! এই বলিয়া সে মুখ নীচু করিয়া আহারে মন দিল।

ভারতী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আপনি মিথ্যে রাগ করচেন। ডাক্তারের কথায় না এসে নিজের ইচ্ছেয় ফিরে এলেই বা দোষ কি, তাই শুধু আপনাকে আমি বলছিলাম। এই যে তখন আপনি নিজে খুঁজে খুঁজে আমার এখানে এলেন তাতেই কি কোন দোষ হয়েচে?

অপূর্ব্ব খাবার হইতে মুখ তুলিল না, বলিল, বিকালবেলা সংবাদ নিতে আসা এবং দুপুর রাত্রে বিনা কারণে ফিরে আসা ঠিক এক নয়।

ভারতী তৎক্ষণাৎ কহিল, নয়ই ত। তাই ত আপনাকে জিজ্ঞেসা করছিলাম, একটু জানিয়ে গেলে ত এতখানি খাবার কষ্ট হোত না। সমস্তই ঠিক করে রাখা যেতে পারতো।

অপূর্ব্ব নীরবে খাইতে লাগিল, উত্তর দিল না। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখন হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল, ভারতী স্নিগ্ধ সকৌতুক দৃষ্টে তাহার প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া আছে। কহিল, দেখুন ত, খাবার কত কষ্টই হ'ল?

অপূর্ব্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, আজ আপনার যে কি হয়েচে জানিনে, খুব সোজা কথাও কিছুতে বুঝতে পারচেন না।

ভারতী বলিল, আর এমনও ত হতে পারে খুব সোজা নয় বলেই বুঝতে পারচিনে? বলিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

এই হাসি দেখিয়া সে নিজেও হাসিল, তাহার সন্দেহ হইল, হয়ত ভারতী এতক্ষণ তাহাকে শুধু মিথ্যা জ্বালাতন করিতেছিল! এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে পড়িল, এমনিধারা সব ছোটখাটো ব্যাপার লইয়া এই খ্রীষ্টান মেয়েটি তাহাকে প্রথম হইতেই কেবল খোঁচা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, অথচ, ইহা বিদ্বেষ নয়, কারণ, যে কোন বিপদের মধ্যে এতবড় নিঃসংশয় নির্ভরের স্থলও যে এই বিদেশে তাহার অন্য কোথাও নাই,—এ সত্যও ঠিক স্বতঃসিদ্ধের মতই হৃদয় তাহার চিরদিনের জন্য একেবারে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

জলের গ্লাসটায় জল ফুরাইয়াছিল, শূন্য পাত্রটা অপূর্ব্ব হাতে করিয়া তুলিতেই ভারতী ব্যস্ত হইয়া উঠিল, ঐ যাঃ--

আর জল নেই নাকি?

আছে বই কি! এই বলিয়া ভারতী রাগ করিয়া কহিল, অত নেশা করলে কি আর মানুষের কিছু মনে থাকে! খাবার জলের ঘটীটা শিবু নীচের টুলটার ওপর ভুলে রেখে এসেচে,—আমারও পোড়া কপাল চেয়ে দেখিনি। এখন আর ত উপায় নেই, একেবারে আঁচিয়ে উঠেই খাবেন, কি বলেন? কিন্তু রাগ করতে পাবেন না বলে রাখচি।

অপূর্ব্ব হাসিয়া কহিল, এতে রাগ করবার কি আছে?

ভারতী আন্তরিক অনুতাপের সহিত বলিল, হয় বৈ কি। খাবার সময় তেষ্টার জল না পেলে ভারি একটা অতৃপ্তি বোধ হয়। মনে হয় যেন পেট ভরলো না। তাই বলে কিন্তু ফেলে রেখেও কিছু উঠলে চলবে না। আচ্ছা যাবো চট্ করে, শিবুকে ডেকে আনবো?

অপূর্ব্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া কহিল, এর জন্যে এই অন্ধকারে যাবেন ডেকে আনতে? আমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই মনে করেন?

তাহার খাওয়া শেষ হইয়াছিল, তথাপি সে জোর করিয়া আরও দুই-চারি গ্রাস মুখে পুরিয়া অবশেষে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার নিজের কেমন যেন ভারি লজ্জা করিতে লাগিল, কহিল, বাস্তবিক বলচি আপনাকে, আমার কিছুমাত্র অসুবিধে হয়নি। আমি আঁচিয়ে উঠেই জল খাবো—আপনি মিথ্যে দুঃখ করবেন না।

ভারতী হাসিয়া জবাব দিল, দুঃখ করতে যাবো? কখ্খনো না। আমি

জানি দুঃখ করবার আমার কিছু নেই। এই বলিয়া সে আলোটা তুলিয়া ধরিয়া আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, আমি আলো দেখাচ্চি, যান আপনি নীচে থেকে মুখ ধুয়ে আসুন। জলের ঘটীটা সুমুখেই আছে,—যেন ভুলে আসবেন না।

অপূর্ব্ব নীচে চলিয়া গেল। খানিক পরে মুখ-হাত ধুইয়া উপরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার ভুক্তাবশেষ সরাইয়া উচ্ছিষ্ট স্থানটা ভারতী ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করিয়াছে; দুই-একটা চৌকি প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিয়া তাহার খাবার জায়গা করা হইয়াছিল, সেগুলা যথাস্থানে আনা হইয়াছে এবং যে ইজি-চেয়ারটায় সে ইতিপূর্ব্বে বসিয়াছিল তাহারই একপাশে ছোট টিপায়ার উপরে রেকাবিতে করিয়া সুপারি-এলাচ প্রভৃতি মশলা রাখা হইয়াছে। ভারতীর হাত হইতে তোয়ালে লইয়া মুখ-হাত মুছিয়া মশলা মুখে দিয়া সে আরাম কেদারায় বসিয়া পড়িল এবং হেলান দিয়া তৃপ্তির গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, আঃ—এতক্ষণে দেহে প্রাণ এল। কি ভয়ঙ্কর ক্ষিদেই না পেয়েছিল!

তাহার চোখের সুমুখ হইতে আলোটা সরাইয়া ভারতী একপাশে রাখিতেছিল, সেই আলোতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অপূর্ব্ব হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, আপনার খুব সর্দ্দি হয়েচে দেখচি যে!

ভারতী বাতিটা তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া বলিল, কই, না।

না কেন! গলা ভারি, চোখ ফুলো-ফুলো, দিব্যি ঠাণ্ডা লেগেচে! এতক্ষণ খেয়ালই করিনি।

ভারতী জবাব দিল না। অপূর্ব্ব কহিল, ঠাণ্ডা লাগার অপরাধ কি! এই রাত্তিরে যা ছুটোছুটি করতে হল!

ভারতী ইহারও উত্তর দিল না। অপূর্ব্ব ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল, ফিরে এসে নিরর্থক আপনাকে কষ্ট দিলাম। কিন্তু কে জানত বলুন, ডাক্তারবাবু ডেকে এনে শেষে আপনাকে বোঝা টানতে দিয়ে নিজে সরে পড়বেন। ভুগতে হ'ল আপনাকে।

ভারতী জানালার কাছে পিছন ফিরিয়া কি একটা করিতেছিল, কহিল, তা তো হোলই। কিন্তু ভগবান বোঝা টানতে দিলে আর নালিশ করতে যাবো কার বিরুদ্ধে বলুন?

অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তার মানে?

ভারতী তেমনি কাজ করিতে করিতেই বলিল, মানে কি ছাই আমিই জানি? কিন্তু দেখচি ত, বর্ম্মায় আপনি পা দেওয়া পর্য্যন্ত বোঝা টেনে বেড়াচ্চি শুধু আমিই। বাবার সঙ্গে করলেন ঝগড়া, দণ্ড দিলাম আমি। ঘর পাহারা দিতে রেখে গেলেন তেওয়ারীকে, তারা সেবা করে মলুম আমি। ডেকে আনলেন ডাক্তারবাবু, হাঙ্গামা

পোহাতে হচ্চে আমাকে। ভয় হয়, সারা জীবনটা না শেষে আমাকেই আপনার বোঝা বয়ে কাটাতে হয়! কিন্তু রাত ত আর নেই, শোবেন কোথায় বলুন ত?

অপূর্ব্ব বিস্মিত হইয়া বলিল, বাঃ, আমি তার জানি কি?

ভারতী কহিল, হোটেলে ডাক্তারবাবুর ঘরে আপনার বিছানা করতে বলে এসেচি, ব্যবস্থা বোধহয় হয়েছে!

কে নিয়ে যাবে? আমি ত চিনিনে।

আমিই নিয়ে যাচ্চি, চলুন ডাকাডাকি করে তাদের তুলিগে।

চলুন, বলিয়া অপূর্ব্ব তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু সংকোচের সহিত কহিল, কিন্তু আপনার বালিশ এবং বিছানার চাদরটা আমি নিয়ে যাবো। অন্ততঃ এ দুটো আমার চাই-ই, পরের বিছানায় আমি মরে গেলেও শুতে পারবো না। এই বলিয়া সে শয্যা হইতে তুলিতে যাইতেছিল, ভারতী বাধা দিল। এতক্ষণে তাহার মলিন গম্ভীর মুখ স্নিগ্ধ কোমল হাস্যে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু সে তাহা গোপন করিতে মুখ ফিরাইয়া আস্তে আস্তে বলিল, এও তো পরের বিছানা অপূর্ব্ববাবু, ঘৃণা বোধ না হওয়াই ত ভারি আশ্চর্য্য। কিন্তু তাই যদি হয়, আপনার হোটেলে শুতে যাবার প্রয়োজন কি, আপনি এই খাটেতেই শোন। এ কথাটা সে ইচ্ছা করিয়াই বলিল না যে, মাত্র ঘণ্টা-কয়েক পূর্ব্বেই তাহার দেওয়া অশুচি বস্ত্রে ভগবানের উপাসনা করিতেও ঘৃণা বোধ হইয়াছিল।

অপূর্ব্ব অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, বলিল, কিন্তু আপনি কোথায় শোবেন? আপনার ত কষ্ট হবে!

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, একটুও না। অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওই ছোট ঘরটায় যা হোক একটা কিছু পেতে নিয়ে আমি স্বচ্ছন্দে শুতে পারবো। শুধু কাঠের মেঝের উপরে হাতে মাথা রেখে তেওয়ারীর পাশে কত রাত্রি কাটাতে হয়েচে সে তো আপনি দেখতে পাননি?

অপূর্ব্ব একমাস পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া বলিল, একটা রাত্রি আমিও দেখতে পেয়েচি, একেবারে পাইনি তা নয়।

ভারতী হাসিমুখে বলিল, সে কথা আপনার মনে আছে? বেশ তেমনি ধারাই না হয় আর একটা রাত্রি দেখতে পাবেন।

অপূর্ব্ব ক্ষণকাল আধোমুখে নীরবে থাকিয়া বলিল, তেওয়ারীর তখন ভয়ানক অসুখ, —কিন্তু এখন লোকে কি মনে করবে?

ভারতী জবাব দিল, কিছুই মনে করবে না। কারণ, পরের কথা নিয়ে নিরর্থক মনে করবার মত ছোট মন এখানে কারও নেই।

অপূর্ব্ব কহিল, নীচের বেঞ্চে বিছানা করেও ত আমি অনায়াসে শুতে পারি?

ভারতী বলিল, আপনি পারলেও আমি তা দেব না। কারণ, তার দরকার নেই। আমি আপনার অস্পৃশ্য, আপনার দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হতে পারে এ ভয় আমার নেই।

অপূর্ব্ব আবেগের সহিত কহিল, আমার দ্বারা কখনো আপনার লেশমাত্র অনিষ্ট হতে পারে এ ভয় আমারও নেই। কিন্তু আপনাকে অস্পৃশ্য বললে আমার সব চেয়ে বেশি দুঃখ হয়। অস্পৃশ্য কথার মধ্যে ঘৃণার ভাব আছে, কিন্তু আপনাকে ত আমি ঘৃণা করিনে। আমাদের জাত আলাদা, আপনার ছোঁয়া আমি খেতে পারিনে, কিন্তু তার হেতু কি ঘৃণা? এত বড় মিছে কথা আর হতেই পারে না। বরঞ্চ, এরজন্যে আপনিই আমাকে মনে মনে ঘৃণা করেন। সেদিন ভোরবেলায় যখন আমাকে অকূল সমুদ্রে ফেলে রেখে চলে আসেন, তখনকার মুখের চেহারা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, সে আমি জীবনে ভুলব না!

ভারতী বলিল, আমার আর যাই কেন না ভুলুন, সে অপরাধ ভুলবেন না!

কখনও না।

সে মুখে আমার কি ছিল? ঘৃণা?

নিশ্চয়!

ভারতী তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল, তার পরে ধীরে ধীরে বলিল, অর্থাৎ, মানুষের মন বোঝবার বুদ্ধি আপনার ভয়ানক সূক্ষ্ম,—আছে কি নেই! কিন্তু আর কাজ নেই, আপনি শোন্। আমার রাত জাগার অভ্যাস আছে, কিন্তু আপনি আর বেশি জেগে থাকলে আমারই হয়ত বিপদের অবধি থাকবে না। এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের আর অবকাশ না দিয়া র‍্যাকের উপর হইতে গোটা-দুই কম্বল পাড়িয়া লইয়া পাশের ছোট ঘরের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া মশারি ফেলিয়া চারিদিক ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া ভারতী চলিয়া গেল, কিন্তু অপূর্ব্বর নিমীলিত চোখের কোণে ঘুমের ছায়াপাতটুকুও হইল না। ঘরের এক কোণে আড়াল-করা আলোটা মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, বাহিরে গভীর অন্ধকার, রাত্রি স্তব্ধ হইয়া আছে—হয়ত, সে ছাড়া কোথাও কেহ জাগিয়া নাই, কখন যে ঘুম আসিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই, তবুও এই জাগরণের মধ্যে নিদ্রাবিহীনতার বিন্দুমাত্র অস্তিত্বও সে অনুভব করিল না। তাহার সকল দেহ-মন যেন বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিতে লাগিল এই ঘরে, এই শয্যায়, এই নীরব নিশীথে ঠিক এমনি চুপ করিয়া শুইয়া থাকার মত সুন্দর মধুর বস্তু আর ত্রিভুবনে নাই। এমন একান্ত ভাবনা-হীন নিশ্চিন্ত বিশ্রামের আনন্দ সে যেন আর

কখনও পায় নাই—তাহার এমনি মনে হইতে লাগিল।

সকালবেলায় তাহার ঘুম ভাঙিল ভারতীর ডাকে। চোখ মেলিয়া দেখিল সম্মুখে তাহার পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া এই মেয়েটি, পূবের জানালা দিয়া প্রভাতসূর্য্যের রাঙা আলো তাহার সদ্যস্নাত ভিজা চুলের উপরে, তাহার পরণের শাদা গরদের রাঙা পাড়টুকুর উপরে, তাহার সুন্দর মুখখানির স্নিগ্ধ শ্যাম রঙের উপরে পড়িয়া একেবারে যেন অপরূপ হইয়া অপূর্ব্বর চোখে ঠেকিল।

ভারতী কহিল, উঠুন, আবার আফিসে যেতে হবে ত !

তা'তো হবেই বলিয়া অপূর্ব্ব শয্যা ত্যাগ করিল। আপনার ত দেখচি স্নান পর্য্যন্ত সারা হয়ে গেছে।

ভারতী কহিল, আপনাকেও সমস্ত তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে। কাল অতিথি-সংকারের যথেষ্ট ক্রটি হয়েচে, আজ আমাদের প্রেসিডেণ্টের আদেশে আপনাকে ভাল করে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়া হবে না।

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, কালকের সেই মেয়েটি বেঁচেচে ?

তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েচে—বাঁচবে বলেই আশা।

মেয়েটিকে অপূর্ব্ব চোখেও দেখে নাই, তথাপি তাহারই সুখবরে মন যেন তাহার পরম লাভ বলিয়া গণ্য করিল। আজ কাহারও কোন অকল্যাণ সে যেন সহিতেই পারিবে না তাহার এমনি জ্ঞান হইল।

সে স্নান-আহ্নিক সারিয়া কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া যখন উপরে আসিল তখন বেলা প্রায় নয়টা। ইতিমধ্যে ঠাঁই করিয়া সরকার মশায় খাবার রাখিয়া গেছেন, অপূর্ব্ব আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কই, আপনাদের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে ত দেখা হ'ল না। তাঁর অতিথি-সংকারের বুঝি এই রীতি ?

ভারতী বলিল, আপনার যাবার আগে দেখা হবে বই কি। তাঁর আপনার সঙ্গে বোধ করি একটু কাজও আছে।

অপূর্ব্ব কহিল, আর ডাক্তারবাবু ? যিনি আমাকে ডেকে এনেচেন ? এখনো বোধহয় তিনি বিছানাতেই পড়ে ? এই বলিয়া সে হাসিল।

ভারতী এ হাসিতে যোগ দিল না, কহিল, বিছানায় পড়বার তাঁর সময়ই হয়নি। এই ত হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন। শোওয়া না-শোওয়া কোনটার কোন মূল্যই তাঁর কাছে নেই।

অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এতে তাঁর অসুখ করে না ?

ভারতী বলিল, কখনো দেখিনে ত। সুখ অসুখ দুই-ই বোধহয় তাঁর কাছে হার মেনে পালিয়েচে। মানুষের সঙ্গেই তাঁর তুলনা হয় না।

অপূর্ব্বর কাল রাত্রের অনেক কথাই স্মরণ হইল, মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনারা সকলেই বোধ হয় তাকে অতিশয় ভক্তি করেন?

ভক্তি করি? ভক্তি ত অনেকেই অনেককে করে। বলিতে বলিতেই তাহার কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ গাঢ় হইয়া উঠিল, কহিল, তিনি চলে গেলে মনে হয় পথের ধুলোয় পড়ে থাকি, তিনি বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যান। মনে হয়, তবুও আশা মেটে না অপূর্ব্ববাবু। বলিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া চট্ করিয়া চোখের কোণ দুটা মুছিয়া ফেলিল।

অপূর্ব্ব আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, নতমুখে নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল। তাহার এই কথাটাই বার বার মনে হইতে লাগিল, সুমিত্রা ও ভারতীর মত এতবড় শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী নারী-হৃদয়ে যে-মানুষ এতখানি উচ্চে সিংহাসন গড়িয়াছে, জানি না ভগবান তাহাকে কোন্ ধাতু দিয়া তৈরি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন! কোন্ অসাধারণ কার্য্য তাহাকে দিয়া তিনি সম্পন্ন করাইয়া লইবেন।

দূরে দরজার কাছে ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, অপূর্ব্ব নিজেও বিশেষ কোন কথা কহিল না, অতঃপর খাওয়াটা তাহার এক প্রকার নিঃশব্দেই সমাধা হইল। অপ্রীতিকর কোন কিছুই ঘটে নাই, তথাপি যে প্রভাতটা আজ তাহার বড় মিষ্ট হইয়া শুরু হইয়াছিল, অকারণে কোথা হইতে যেন তাহার উপরে একটা ছায়া আসিয়া পড়িল।

আফিসের কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সে কহিল, চলুন, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

চলুন, তিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েচেন।

সরকার মহাশয়ের জরা-জীর্ণ হোটেল-বাড়ির একটা অত্যন্ত ভিতরের দিকের ঘরে ডাক্তারবাবুর বাসা। আলো নাই, বাতাস নাই, আশেপাশে নোংরা জল জমিয়া একটি দুর্গন্ধ উঠিতেছে, অতিশয় পুরাতন তক্তার মেঝে, পা দিতে ভয় হয় পাছে সমস্ত ভাঙিয়া পড়ে, এমনি একটা কদর্য্য বিশ্রী ঘরে ভারতী যখন তাহাকে পথ দেখাইয়া আনিল, তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। ঘরে ঢুকিয়া অপূর্ব্ব ক্ষণকাল ত ভাল দেখিতেই পাইল না।

ডাক্তারবাবু অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, আসুন অপূর্ব্ববাবু।

উঃ—কি ভীষণ ঘরই আপনি আবিষ্কার করেচেন ডাক্তারবাবু?

কিন্তু কি রকম সস্তা বলুন ত! মাসে দশ আনা ভাড়া।

অপূর্ব্ব কহিল, বেশি, বেশি, ঢের বেশি। দশ পয়সা হওয়া উচিত।

ডাক্তার কহিলেন, আমরা দুঃখী লোকেরা সব কি রকম থাকি আপনাদের চোখে দেখা উচিত। অনেকের কাছে এই আবার রাজপ্রাসাদ।

অপূর্ব্ব কহিল, তা'হলে প্রাসাদ থেকে ভগবান যেন আমাকে চিরদিন বঞ্চিত রাখেন! বাপরে বাপ্!

ডাক্তার বলিলেন, শুনলাম কাল রাত্রে আপনার কষ্ট হয়েচে অপূর্ব্ববাবু, আমাকে ক্ষমা করতে হবে।

অপূর্ব্ব কহিল, ক্ষমা করব শুধু আপনি এ ঘর ছাড়লে। তার আগে নয়।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু একটু হাসিলেন, বলিলেন, আচ্ছা তাই হবে।

এতক্ষণ অপূর্ব্ব নজর করে নাই, হঠাৎ ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে পাইল, দেওয়ালের কাছে একটা মোড়ার উপরে বসিয়া সুমিত্রা। আপনি এখানে? আমাকে মাফ করবেন, আমি একেবারে দেখতে পাইনি।

সুমিত্রা কহিলেন, সে অপরাধ আপনার নয় অপূর্ব্ববাবু, অন্ধকারের।

অপূর্ব্বর বিস্ময়ের সীমা রহিল না তাহার গলা শুনিয়া। সে কণ্ঠস্বর যেমন করুণ তেমনি বিষণ্ণ। কি একটা ঘটিয়াছে বলিয়া যেন তাহার ভয় করিতে লাগিল। ভাল করিয়া ঠাওর করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, ডাক্তারবাবু, এ আপনার আজ কি রকম পোষাক? কোথাও কি বার হচ্ছেন?

ডাক্তারের মাথায় পাগড়ী, গায়ে লম্বা কোট, পরণে ঢিলা পায়জামা, পায়ে রাওলপিণ্ডির নাগরা, একটা চামড়ার ব্যাগে কি কতকগুলো বাণ্ডিল বাঁধা। কহিলেন, আমি ত এখন চলতি অপূর্ব্ববাবু, এঁরা সব রইলেন, আপনাকে দেখতে হবে। আপনাকে এর বেশি বলার আমি আবশ্যক মনে করিনে।

অপূর্ব্ব অবাক হইয়া কহিল, হঠাৎ চলতি কি রকম! কোথায় চলতি?

এই ডাক্তার লোকটির কণ্ঠস্বরে ত কোন পরিবর্ত্তন হয় না, তেমনি সহজ, শান্ত, স্বাভাবিক গলায় বলিলেন, আমাদের অভিধানে কি 'হঠাৎ' শব্দ থাকে অপূর্ব্ববাবু? চলতি সম্প্রতি ভামোর পথে আরও কিছু উত্তরে। কিছু সাঁচ্চা জরির মাল আছে, সিপাইদের কাছে বেশ দামে বিক্রী হয়। এই বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

সুমিত্রা এতক্ষণ কথা কহে নাই, সহসা বলিয়া উঠিল, তাদের পেশোয়ার থেকে একেবারে ভামোয় সরিয়ে এনেচে, তুমি জানো তাদের ওপর কি রকম কড়া নজর। তোমাকেও অনেকে চেনে, কখ্খনো ভেবো না সকলের চোখেই তুমি ধুলো দিতে পারবে। এখন কিছুদিন কি না গেলেই নয়? শেষের দিকে তাহার গলাটা যেন অদ্ভুত শুনাইল।

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, তুমি ত জানো না গেলেই নয়।

সুমিত্রা আর কথা কহিলেন না, কিন্তু অপূর্ব্ব ব্যাপারটা একেবারে চক্ষের পলকে বুঝিতে পারিল। তাহার চোখ ও দুই কান গরম হইয়া সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন আগুন

ছুটিতে লাগিল। কোনমতে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, ধরুন, তারা যদি কেউ চিনতেই পারে? যদি ধরে ফেলে?

ডাক্তার কহিলেন, ধরে ফেললে বোধ হয় ফাঁসিই দেবে। কিন্তু দশটার ট্রেনের আর ত সময় নেই অপূর্ব্ববাবু, আমি চললাম। এই বলিয়া তিনি স্ট্র্যাপে বাঁধা মস্ত বোঝাটা অবলীলাক্রমে পিঠে ফেলিয়া চামড়ার ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইলেন।

ভারতী একটি কথাও কহে নাই, একটি কথাও কহিল না, শুধু পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। সুমিত্রাও প্রণাম করিল, কিন্তু সে পায়ের কাছে নয়, একেবারে পায়ের উপরে। হঠাৎ মনে হইল সে বুঝি আর উঠিবে না, এমনি করিয়া পড়িয়াই থাকিবে—বোধ হয় মিনিট খানেক হইবে—যখন সে নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল তখন স্বল্পালোকিত সেই ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে তাহার আনত মুখের চেহারা দেখিতে পাওয়া গেল না!

ডাক্তার ঘরের বাহিরে আসিয়া অপূর্ব্বর হাতখানি গত রাত্রির মতো মুঠার মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন, চললাম অপূর্ব্ববাবু—আমি সব্যসাচী।

অপূর্ব্বর মুখের ভিতরটা শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া গিয়াছিল, তাহার গলা দিয়া স্বর ফুটিল না, কিন্তু সে চক্ষের পলকে হাঁটু পাতিয়া তাঁহার পায়ের কাছে মেয়েদের মতই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ডাক্তার মাথায় তাহার হাত দিলেন, আর একটা হাত ভারতীর মাথায় দিয়া অস্ফুটে কি বলিলেন শোনা গেল না, তাহার পরে একটু দ্রুত পদেই বাহির হইয়া গেলেন।

অপূর্ব্ব উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল ভারতীর পাশে সে একাকী দাঁড়াইয়া আছে, পিছনে সেই ভাঙা ঘরের রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে কর্ত্তব্য-কঠিন অশেষ বুদ্ধিশালিনী পথের দাবীর ভয়লেশহীনা তেজস্বিনী সভানেত্রী কি যে করিতে লাগিলেন তাহার কিছুই জানা গেল না।

১৪

ভারতী ও অপূর্ব্ব দুজনেই পিছনের দরজায় প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু কেহই কোন কথা কহিল না। অপূর্ব্ব কিছুই না বুঝিয়াও এটুকু বুঝিল যে, এমন করিয়া যে লোক নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী করিয়া রাখিল তাহার সম্বন্ধে কৌতূহলী হইতে নাই। উভয়ে নীরবে হোটেলের বাহিরে আসিতে ভারতী কহিল, চলুন অপূর্ব্ববাবু আমরা ঘরে যাই—

কিন্তু আমার যে আবার অফিসের বেলা--

রবিবারেও অফিস?

রবিবার, তাই ত বটে! অপূর্ব্ব খুশী হইয়া বলিল, একথা সকালে মনে হলে নাওয়া-খাওয়ার জন্য আর ব্যস্ত হতে হত না। আপনার এত জিনিস মনে থাকে, কিন্তু ওটুকু ভুলে গিয়েছিলেন।

ভারতী একটু হাসিয়া বলিল, তা' হবে, কিন্তু কাল রাত্রে আপনার না-খাওয়ার কথাটি ভুলিনি।

অপূর্ব্ব হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমার দেরি করবার জো নেই, তেওয়ারী বেচারা হয়ত ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছে।

ভারতী বলিল, যাচ্চে না তার কারণ, আপনি জাগবার পূর্ব্বেই সে খবর পেয়েচে আপনি কুশলে আছেন।

সে জানে আমি আপনার কাছে আছি?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানে। ভোরবেলাতেই আমি লোক পাঠিয়ে দিয়েচি।

এই সংবাদ শুনিয়া অপূর্ব্ব শুধু নিশ্চিন্ত নয়, তাহার মনের উপর হইতে একটা সত্যকার বোঝা নামিয়া গেল। কালরাত্রে ফিরিবার পথে, ফিরিয়া আসিয়া, খাওয়া শোয়া, সকল কাজে সকল কথার মধ্যে এই ভাবনাই বহুবার তাহাকে ধাক্কা মারিয়া গেছে, কি জানি কাল সকালে তেওয়ারী ব্যাটা তাহার কথা বিশ্বাস করিবে কি না। এই বর্ম্মাদেশের কতপ্রকার জনশ্রুতিই না প্রচলিত আছে,—হয়ত, বাড়িতে মায়ের কাছে কি একটা লিখিয়া দিবে, না হয়ত ফিরিয়া গিয়া গল্প করিবে,—পাকা কালীর মত, কাশী গেলেও যাহার দাগ মুছিবে না—এই তুচ্ছ বস্তুটাই ছোট্ট কাঁটার মত তাহার পায়ে প্রতি পদক্ষেপেই খচ্‌ খচ্‌ করিতেছিল। এতক্ষণ পরে সে যেন নির্ভয়ে পা ফেলিয়া বাঁচিল। তেওয়ারী আর যাহাই করুক, ভারতীর মুখের কথা সে মরিয়া গেলেও অবিশ্বাস করিবে না। যে ছাড়-পত্র ভারতী লিখিয়া দিয়াছে তাহার চেয়ে নিষ্কলঙ্কতার বড় দলিল তেওয়ারীর কাছে যে আর নাই, অপূর্ব্ব তাহা ভাল করিয়াই জানিত। পুলকিতচিত্তে কহিল, আপনার সকল দিকে চোখ আছে। বাড়িতে বৌদিদেরও দেখেচি, অন্য সব মেয়েদেরও দেখেচি, আমার মাকেও দেখেচি, কিন্তু এমন সবদিকে দৃষ্টি আমি কাউকে দেখিনি। বাস্তবিক বলচি, আপনি যে বাড়ির গৃহিণী হবেন সে বাড়ির লোকেরা চোখ বুজে দিন কাটিয়ে দেবে, কখনো কাউকে দুঃখ পেতে হবে না।

ভারতীর মুখের উপর দিয়া যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। অপূর্ব্ব ইহার কিছুই দেখিল না, সে পিছনে আসিতেছিল, পিছন হইতেই পুনরায় কহিল, এই বিদেশে আপনি না থাকলে আমার কি হোত বলুন ত? সমস্ত চুরি যেত, তেওয়ারী

হয়ত ঘরেই মরে থাকতো,—বামুনের ছেলেকে মেথর মুদ্দফরাসে টানা হেঁচড়া করত,—এই ভয়ানক সম্ভাবনায় তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া গেল। একটু থামিয়া কহিল,—আমিই কি আর থাকতে পারতাম? চাকরি ছেড়ে দিয়ে হয়ত চলে যেতে হ'তো, তারপরে আবার যা-কে তাই। সেই বউদিদির গঞ্জনা আর মায়ের চোখের জল। আপনিই ত সব। সমস্ত বাঁচিয়ে দিয়েচেন।

ভারতী বলিল, অথচ, এসেই আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন।

অপূর্ব্ব লজ্জা পাইয়া কহিল, সমস্ত ওই তেওয়ারী ব্যাটার দোষ, কিন্তু মা এসব শুনলে আপনাকে যে কত আশীর্ব্বাদ করবেন তা আপনি জানেন না।

ভারতী কহিল, কেমন করে জানবো? মা এলেই ত তবেই তাঁর মুখ থেকে শুনতে পাবো!

অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, মা আসবেন বর্ম্মায়? আপনি বলেন কি?

ভারতী জোর দিয়া কহিল, কেন আসবেন না,—কত লোকেরই ত মা নিত্য আসচেন। এখানে এলেই কি কারও জাত যেতে পারে নাকি?

অপূর্ব্ব ঘরে ঢুকিয়া সেই আরাম চৌকিটাতেই পুনরায় আসিয়া বসিল। পাশের জানালা দিয়া তাহার মুখে রোদ লাগিতেই ভারতী হাত বাড়াইয়া বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল, বৌদিদিরা মাকে তেমন যত্ন করেন না এবং আপনাকে চিরকাল যদি বিদেশে চাকরি করেই কাটাতে হয়, এ-বয়সে তাঁর সেবা কে করবে বলুন ত?

অপূর্ব্ব কহিল, মা বলেন ছোট বৌ এসে তাঁর সেবা করবে।

ভারতী বলিল, আর সে যদি সেবা না করে! আপনি থাকবেন বিদেশে, বড় জায়েদের দেখে সে যদি তাঁদের মতই হয়ে দাঁড়ায়, মাকে যত্ন না করে কষ্ট দিতেই শুরু করে, কি করবেন বলুন ত?

অপূর্ব্ব ভীত হইয়া কহিল, সে রকম কখ্খনো হবে না। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশ থেকে এসে কিছুতেই মাকে দুঃখ দিতে পারবে না, আপনাকে আমি নিশ্চয় বলচি।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশ? এই বলিয়া ভারতী মুচকিয়া শুধু একটু হাসিয়া কহিল, এখন থাক্, যদি প্রয়োজন হয় ত সে গল্প আপনার কাছে অন্য একদিন করব। ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কেবল মাত্র মায়ের সেবা করবার জন্যই যাকে বিবাহ ক'রে আপনি ফেলে আসবেন, তাতে কি তার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হবে না।

অপূর্ব্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া স্বীকার করিয়া বলিল, তা হবে।

ভারতী কহিল, এবং সেই অবিচারের বদলে তার কাছ থেকে নিজে সুবিচার দাবী করবেন?

অপূর্ব্ব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিল, কিন্তু এ-ছাড়া আর আমার উপায় কি ভারতী?

ভারতী কহিল, উপায় না থাকতে পারে, কিন্তু এ অসম্ভব আপনি অতি বড় নিষ্ঠাবানের ঘর থেকেও প্রত্যাশা করবেন না। এর ফল কখনো ভাল হবে না। আপনার নিষ্ঠুরতার বদলে যতই সে নিজের কর্ত্তব্য পালন করবে, ততই তার কাছে আপনি ছোট হয়ে যাবেন! স্ত্রীর কাছে অশ্রদ্ধেয়, হীন হওয়ার চেয়ে বড় দুর্ভোগ সংসারে আর নেই অপূর্ব্ববাবু!

কথাটা এত বড় সত্য যে অপূর্ব্ব নিরুত্তর হইয়া রহিল। শাস্ত্রমতে স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি, পতিব্রতা কাহাকে বলে, নিঃস্বার্থ শাশুড়ী-সেবার কতখানি মাহাত্ম্য, স্বামীর ইচ্ছামাত্র পালন করার কিরূপ পুণ্য ইত্যাদি নানাবিধ উপাখ্যান বন্ধুমহলে আধুনিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করিবার কালে সে শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে নজির স্বরূপে উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু এই খ্রীষ্টান মেয়েটির সম্মুখে তাহার আভাসমাত্রও উচ্চারণ করিতে তাহার মুখ ফুটিল না। খানিক পরে সে কতকটা যেন আপনাকে আপনি বলিল, বাস্তবিক, আজকালকার দিনে এ-রকম মেয়ে বোধ হয় কেউ নেই।

ভারতী হাসিল, কহিল, একেবারে কেউ নেই তা' কেমন করে বললেন? নিষ্ঠাবানের ঘরে না থাকলেও হয়ত আর কোথাও কেউ থাকতে পারে, যে আপনার জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিতে পারে, কিন্তু তাকে আপনারা খুঁজে পাবেন কোথায়?

অপূর্ব্ব নিজের চিন্তাতেই ছিল, ভারতীর কথায় মন দেয় নাই, কহিল, সে তো বটেই।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কবে বাড়ি যাবেন?

অপূর্ব্ব অন্যমনস্কের মতই জবাব দিল, কি জানি, মা কবে চিঠি লিখে পাঠাবেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিতে লাগিল, বাবার সঙ্গে মতের অমিল নিয়ে মা আমার কোনদিন জীবনে সুখ ভোগ করেননি। সেই মাকে একলা ফেলে রেখে আসতে আমার কিছুতে মন সরে না। কি জানি, এবার গেলে আর আসতে পারবো কি না। হঠাৎ ভারতীর মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল, দেখুন, বাইরে থেকে দেখতে আমাদের সাংসারিক অবস্থা যতই সচ্ছল হোক ভিতরে কিন্তু বড় অনটন! সহরে অধিকাংশ গৃহস্থের এমনি দশা। বৌদিদিরা যে-কোনদিন আমাদের পৃথক করে দিতে পারেন। আমি ফিরে যদি না আসতে পারি ত আমাদের কষ্টের হয়ত সীমা থাকবে না।

ভারতী বলিল, আপনাকে আসতেই হবে।

মায়ের কাছ থেকে চিরদিন আলাদা হয়ে থাকবো?

তাঁকে রাজি করে সঙ্গে নিয়ে আসুন। আমি নিশ্চয় জানি, তিনি আসবেন।

অপূর্ব্ব হাসিয়া কহিল, কখ্খনো না। যাকে আপনি জানেন না। আচ্ছা, ধরুন যদি তিনি আসেন, তাঁকে দেখবে কে এখানে?

ভারতীও হাসিয়া কহিল, আমি দেখবো।

আপনি? ঘরে ঢুকলেই ত মা হাঁড়ি ফেলে দেবেন।

ভারতী জবাব দিল, কতবার দেবেন? আমি রোজ রোজ ঘরে ঢুকবো। দুজনেই হাসিয়া উঠিল! ভারতী সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, আপনি নিজেও ত ওই হাঁড়ি ফেলার দলে, কিন্তু হাঁড়ি ফেলে দিলেই যদি সব ল্যাঠা চুকে যেতো, পৃথিবীর সমস্যা তাহলে খুব সোজা হয়ে উঠতো। বিশ্বাস না হয় তেওয়ারীকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।

অপূর্ব্ব স্বীকার করিয়া কহিল, তা সত্যি। সে বেচারা হাঁড়ি ফেলবে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ দিয়ে তার জলও পড়বে। আপনাকে সে এত ভক্তি করে যে, একটু জপালে হয়ত সে ক্রীশ্চান হতেও রাজি হয়ে পড়ে, বলা যায় না।

ভারতী কহিল, সংসারে কিছুই বলা যায় না। চাকরের কথাও না, মনিবের কথাও না। এই বলিয়া সে হাসি গোপন করিতে যখন মুখ নীচু করিল, তখন অপূর্ব্বর নিজের মুখখানা একেবারে আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল, সংসারে এটুকু কিন্তু স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে চাকর ও মনিবের বুদ্ধির তারতম্য থাকতে পারে।

ভারতী মুখ তুলিয়া কহিল, আছেই ত। সেই জন্য তার রাজি হ'তে দেরি হ'তে পারে, কিন্তু আপনার হবে না। তাহার চোখের দৃষ্টি চাপা হাসির বেগে একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, অপূর্ব্ব পরিহাস বুঝিতে পারিয়া খুশী হইয়া কহিল, আচ্ছা, তামাসা নয়, বাস্তবিক বলচি, আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারি এ আপনি ভাবতে পারেন?

ভারতী কহিল, পারি।

সত্যিই পারেন।

সত্যিই পারি।

অপূর্ব্ব কহিল, অথচ, সত্যিই আমি প্রাণ গেলেও পারিনে।

ভারতী বলিল, প্রাণ যাওয়া যে কি জিনিস সে তো আপনি জানেন না। তেওয়ারী জানে। কিন্তু, এ নিয়ে তর্ক করে আর কি হবে, আপনার মত অন্ধকারের মানুষকে আলোতে আনার চেয়ে ঢের বেশি জরুরী কাজ আমার এখনো বাকী। আপনি বরঞ্চ একটু ঘুমোন।

অপূর্ব্ব বলিল, দিনের বেলা আমি ঘুমুইনে। কিন্তু জরুরী কাজটা আবার

আপনার কি ?

ভারতী কহিল, আপনার বেগার খেটে বেড়ানোই আমার একমাত্র জরুরী কাজ নাকি ? আমাকেও দুটি রেঁধে খেতে হয়। ঘুমুতে না পারেন আমার সঙ্গে নীচে চলুন। আমি কি কি রাঁধি, কেমন করে রাঁধি দেখবেন। হাতে যখন একদিন খেতেই হবে তখন একেবারে অনভিজ্ঞ থাকা ভাল নয়। এই বলিয়া সে সহসা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অপূর্ব্ব কহিল, আমি মরে গেলেও আপনার হাতে খাবো না।

ভারতী বলিল, আমি বেঁচে থেকে খাবার কথাই বলচি। এই বলিয়া সে হাসি-মুখে নীচে নামিয়া গেল।

অপূর্ব্ব ডাকিয়া কহিল, আমি তাহলে এখন বাসায় যাই,—তেওয়ারী বেচারা ভেবে সারা হয়ে যাচ্চে। এই বলিয়া সে কিয়ৎকাল জবাবের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া অবশেষে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িল। হয়ত, সে শুনিতে পায় নাই, হয়ত, শুনিয়াও উত্তর দেয় নাই, কিন্তু ইহাই বড় সমস্যা নয়; বড় সমস্যা এই যে, তাহার অবিলম্বে বাসায় যাওয়া উচিত। কোন অজুহাতেই আর দেরি করা সাজে না। অথচ, ভিতর হইতে যাওয়ার তাগিদ যতই অনুভব করিতে লাগিল, ততই কিন্তু দেহ যেন তাহার অলস শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। শেষকালে সেই বড় চেয়ারের উপরেই মুখের উপর হাত চাপা দিয়া অপূর্ব্ব ঘুমাইয়া পড়িল।

১৫

বেলা যে যায়! উঠুন!

অপূর্ব্ব চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিল। দেওয়ালের ঘড়ির প্রতি চাহিয়া কহিল, ইস্! তিন-চার ঘণ্টার কম নয়! আমাকে তুলে দেননি কেন? বাঃ—মাথায় একটা বালিশ পর্য্যন্ত কখন দিয়ে দিয়েচেন। এতে কি আর কারও ঘুম ভাঙে!

ভারতী কহিল, ঘুম ভাঙবার হ'লে তখনি ভাঙতো। এটা না দিলে মাঝে থেকে ঘাড়ে শুধু একটা ব্যথা হোতো। যান, মুখ-হাত ধুয়ে আসুন, সরকারমশায় জলখাবারের থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন,—তাঁর ঢের কাজ, একটু চট্‌পট্ করে তাঁকে ছুটি দিন।

দ্বারের বাহিরে যে লোকটি দাঁড়াইয়াছিল, মুখ বাড়াইয়া সে তাহার ত্বরা নিবেদন করিল।

নীচে হইতে হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া অপূর্ব্ব খাবার খাইয়া সুপারি, এলাচ প্রভৃতি মুখে দিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিল, এবার আমাকে ছুটি দিন, আমি বাসায় যাই।

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, সেটি হবে না। তেওয়ারীকে খবর দিয়েচি যে, অফিসের ফেরত কাল বিকালে আপনি বাসায় যাবেন এবং খবর নিয়েচি যে সে সুস্থ দেহে, বহাল তবিয়তে ঘর আগলাচ্চে,—কোন চিন্তা নেই।

কিন্তু কেন?

ভারতী বলিল, কারণ সম্প্রতি আপনি আমাদের অভিভাবক। আজ সুমিত্রাদিদি অসুস্থ, নবতারা গেছেন অতুলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ওপারে, আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে। আপনার প্রতি প্রেসিডেন্টের এই আদেশ। ওই ধুতি এনে রেখেচি, পরে নিয়ে চলুন।

কোথায় যেতে হবে?

মজুরদের লাইনের ঘরে। অর্থাৎ, বড় বড় কারখানার ক্রোড়পতি মালিকেরা ওয়ার্কমেনদের জন্যে লাইনবন্দী যে সব নরককুণ্ড তৈরী করে দিয়েছে সেইখানে। আজ রবিবারে ছুটির দিনেই সেখানে কাজ।

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সেখানে কেন?

ভারতী উত্তর দিল, নইলে পথের দাবীর সত্যিকারের কাজ কি এই ঘরে হতে পারে? একটু হাসিয়া কহিল, আপনি এ-সভার মাতব্বর সভ্য, সরেজমিনে না গেলে ত কাজের ধারা বুঝতে পারবেন না অপূর্ব্ববাবু।

চলুন, বলিয়া অপূর্ব্ব আফিসের পোষাক ছাড়িয়া মিনিট পাঁচেকের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া লইল।

ভারতী আলমারী খুলিয়া কি একটা বস্তু লুকাইয়া তাহার জামার পকেটে রাখিতে অপূর্ব্ব দেখিতে পাইয়া কহিল, ওটা কি নিলেন?

গাদা পিস্তল।

পিস্তল। পিস্তল কেন?

আত্মরক্ষার জন্যে।

ওর পাশ আছে?

না।

অপূর্ব্ব বলিল, পুলিশে যদি ধরে ত আত্মরক্ষা দু'জনেরই হবে। ক'বছর দেয়?

দেবে না,—চলুন!

অপূর্ব্ব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দুর্গা—শ্রীহরি। চলুন।

বড় রাস্তা ধরিয়া উত্তরে বর্ম্মী ও চীনা পল্লী পার হইয়া বাজারের পাশ দিয়া

তুজনে প্রায় মাইলখানেক পথ হাঁটিয়া একটা প্রকাণ্ড কারখানার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বন্ধ ফটকের কাটা দরজার ফাঁক দিয়া গলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ডানদিকে সারি সারি করোগেট লোহার গুদাম ও তাহারই ও-ধারে কারিগর ও মজুরদিগের বাস করিবার ভাঙা কাঠ ও ভাঙা টিনের লম্বা লাইনবন্দী বস্তি। সুমুখ দিয়া সারি সারি কয়েকটা জলের কল এবং পিছন দিকে সারি সারি টিনের পায়খানা। গোড়াতে হয়তো দরজা ছিল, এখন থলে ও চট-ছেঁড়া ঝুলিতেছে। ইহাই ভারতবর্ষীয় কুলী-লাইন। পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বর্ম্মী, বাঙালী, উড়ে, হিন্দু, মুসলমান, স্ত্রী ও পুরুষে প্রায় হাজার-খানেক জীব এই ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চলিয়াছে।

ভারতী কহিল, আজ কাজের দিন নয়, নইলে এই জলের কলেই তু'একটা রক্তারক্তি কাণ্ড দেখতে পেতেন।

অপূর্ব্ব ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ছুটির দিনের ভিড় দেখেই তা অনুভব করতে পারচি।

এই জনতার সম্মুখেই একজন মাদ্রাজী স্ত্রীলোক পর্দ্দা ঠেলিয়া পায়খানায় ঢুকিতেছিল, পর্দ্দার অবস্থা দেখিয়া অপূর্ব্ব লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া বলিল, পথের দাবী করতে হয় ত আর কোথাও শীঘ্র চলুন, এখানে আমি দাঁড়াতে পারব না।

ভারতী নিজেও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুধু একটুখানি হাসিল। অর্থাৎ মানুষের ধাপ হইতে নামাইয়া যাহাদের পশু করিয়া তোলা হইয়াছে তাহাদের আবার এসকল বালাই কেন?

কয়েকখানা ঘর পরে উভয়ে আসিয়া একজন বাঙালী মিস্ত্রির ঘরে প্রবেশ করিল। লোকটার বয়স হইয়াছে, কারখানায় পিতল ঢালাইয়ের কাজ করে, মদ খাইয়া কাঠের মেঝের উপর পড়িয়া অত্যন্ত মুখ খারাপ করিয়া কাহাকে গালি পাড়িতেছিল, ভারতী ডাকিয়া কহিল, মানিক, কার ওপরে রাগ করচ? সুশীলা কই? সে আজ তু'দিন পড়তে যায় না কেন?

মানিক কোন মতে হাতে পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল, চোখ চাহিয়া চিনিতে পারিয়া বলিল, দিদিমণি! এসো, ব'সো। সুশী কি ক'রে তোমার ইস্কুলে যাবে বল? রাঁধা-বাড়া বাসন মাজা মায় ছেলেটাকে সামলানো পর্য্যন্ত— বুক ফেটে যাচ্চে দিদিমণি, যোদো শালাকে আমি খুন না করি ত আমি কৈবর্ত্ত থেকে খারিজ। বড় সাহেবকে এমনি দরখাস্ত দেব যে শালার চাকরি খেয়ে দেব।

ভারতী সহাস্যে কহিল, তা দিয়ো। আর বল ত না হয়, সুমিত্রাদিদিকে দিয়ে আমিই তোমার দরখাস্ত লিখে দেব। কিন্তু কাল আমাদের ফয়ার মাঠে মিটিং, তা মনে আছে ত?

এমন সময় বছর দশ-এগারোর একটি মেয়ে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে অঞ্চলের ভিতর হইতে এক বোতল মদ বাহির করিয়া সাবধানে মেঝের উপর রাখিয়া কহিল, বাবা, ঘোড়া মার্কা মদ আর নেই, তাই টুপি মার্কা মদ নিয়ে এলুম। চারটে পয়সা বাকী রইল। দেখ বাবা, রাম আইয়া মাতাল হয়ে আমাকে কি বলছিল জানো?

প্রত্যুত্তরে তাহার পিতা রামিয়ার উদ্দেশে একটা কদর্য্য ভাষা উচ্চারণ করিল। ভারতী কহিল, ও-সব জায়গায় তুমি আর যেয়ো না। তোমার মা কোথায় সুশীলা?

মা? মা তো পরশু রাত্তিরে যদুকাকার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে লাইনের বাইরে ঘর ভাড়া করেচে। মেয়েটা আরও কি বলিতেছিল, কিন্তু বাপ গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—করাচ্চি। এ বাবা বিয়ে-করা পরিবার, বেউশ্যে নয়! এই বলিয়া সে অনিশ্চিত কম্পিত হস্তে স্ক্রুর অভাবে ভাঙা খুন্তির ডগা দিয়া নূতন বোতলের ছিপি খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

ভারতী হঠাৎ তাহার অঞ্চল-প্রান্তে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, অপূর্ব্বর মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। কখনো সে ভারতীকে স্পর্শ করে নাই, কিন্তু এখন সে জ্ঞানই তাহার ছিল না। কহিল, চলুন এখান থেকে।

একটু দাঁড়ান।

না, এক মিনিট না। এই বলিয়া সে একপ্রকার জোর করিয়া তাহাকে বাহিরে আনিল। ঘরের ভিতরে মানিক ছিপি বোতল ও খুন্তির বাঁট লইয়া বীরদর্পে গর্জ্জাইতে লাগিল যে, খুন করিয়া ফাঁসি যাইতে হয় সে ভি আচ্ছা। সে দেশো গুণ্ডার ছেলে, সে জেল বা ফাঁসি কোনটাকেই ভয় করে না।

বাহিরে আসিয়া অপূর্ব্ব যেন অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল,—হারামজাদা, নচ্ছার, পাজি মাতাল! যেন পিশাচের নরককুণ্ড বানিয়ে রেখেচে! এখানে পা দিতে আপনার ঘৃণা বোধ হ'ল না?

ভারতী তাহার মুখের পানে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, না। তার কারণ, এ নরককুণ্ড ত এরা বানায়নি। এরা শুধু তার প্রায়শ্চিত্ত করেচে।

অপূর্ব্ব কহিল, না, এরা বানায়নি আমি বানিয়েচি! মেয়েটার কথা শুনলেন! ওর মা যেন কোন্ তীর্থযাত্রা করেচে। নির্লজ্জ বেহায়া শয়তান! আর কখ্খনো যদি এখানে আসবেন ত টের পাবেন বলে দিচ্ছি।

ভারতী একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমি ম্লেচ্ছ ক্রীশ্চান, আমার এখানে আসতে দোষ কি?

অপূর্ব্ব রাগ করিয়া বলিল, দোষ নেই? ক্রীশ্চানের জন্য কি সৎ-অসৎ বস্তু নেই, নিজেদের সমাজের কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হয় না?

ভারতী উত্তর দিল, কে আছে আমার যে জবাবদিহি করবো? কার মাথাব্যথা পড়েচে আমার জন্যে, আপনি বলুন?

অপূর্ব্ব সহসা কোন প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বলিল, এসব আপনার চালাকি। আপনি ঘরে ফিরে চলুন।

আমাকে আরও পাঁচ জায়গায় যেতে হবে। আপনার ভাল না লাগে আপনি ফিরে যান।

ফিরে যান বললেই কি আপনাকে এখানে রেখে আমি যেতে পারি?

তাহলে সঙ্গে থাকুন। মানুষের প্রতি মানুষে কত অত্যাচার করচে চোখ মেলে দেখতে শিখুন! কেবল ছোঁয়া-ছুঁয়ি বাঁচিয়ে, নিজে সাধু হয়ে থেকে ভেবেচেন পুণ্য সঞ্চয় করে একদিন স্বর্গে যাবেন? মনেও করবেন না। বলিতে বলিতে ভারতীর মুখের চেহারা কঠোর এবং গলার স্বর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, এই মূর্ত্তি ও কণ্ঠ অপূর্ব্বর অত্যন্ত পরিচিত। ভারতী কহিল, ওই মেয়েটার মা এবং যদু যে অপরাধ করেচে সে শুধু ওদের দণ্ড দিয়েই শেষ হবে? আপনি তার কেউ নয়? কখ্খনো না। ডাক্তারবাবুকে না জানা পর্য্যন্ত আমিও ঠিক এমনি করেই ভেবে এসেচি। কিন্তু আজ আমি নিশ্চয় জানি, এই নরককুণ্ডে যত পাপ জমা হবে তার ভার আপনাকে পর্য্যন্ত স্বর্গের দোর থেকে টেনে এনে এই নরককুণ্ডে ডোবাবে। সাধ্য কি আপনার এই দুষ্কৃতির ঋণ শোধ না করে পরিত্রাণ পান। আমরা নিজের গরজেই আসি অপূর্ব্ববাবু, এই উপলব্ধিই আমাদের 'পথের দাবী'র সবচেয়ে বড় সাধনা। চলুন।

অপূর্ব্ব নিরীহ ও নিস্পৃহের ন্যায় কহিল, চলুন। ভারতীর কথা কিন্তু সে বুঝিতেও পারিল না, বিশ্বাসও করিল না।

কিছুদূরে একটা সেগুন গাছ ছিল, ভারতী আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওই সামনে ক'ঘর বাঙালী থাকে,—চলুন।

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, বাঙালী ভিন্ন অপর জাতের মধ্যে আপনারা কাজ করেন না?

ভারতী বলিল, করি। সকলকেই আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ছাড়া আর ত কেউ সকলের ভাষা জানে না, তিনি সুস্থ থাকলে এ-কাজ তাঁরই, আমার নয়।

তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষা জানেন?

জানেন।

আর ডাক্তারবাবু?

ভারতী হাসিয়া বলিল, ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে আপনার ভারী কৌতূহল। একথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না কেন যে, পৃথিবীতে যা' কিছু জানা যায় তিনি জানেন, যা' কিছু পারা যায় তিনি পারেন। কে তাঁর সব্যসাচী নাম রেখেছিল আমরা কেউ জানিনে, কিন্তু তাঁর অসাধ্য, তাঁর অজ্ঞাত সংসারে কিছু নেই। এই বলিয়া সে নিজের মনে চলিতেই লাগিল, কিন্তু তাহারই পিছনে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপূর্ব্বর মুখ দিয়া গভীর নিশ্বাস পড়িল। অকস্মাৎ এই কথাটা তাহার বুকের মধ্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল যে, এই হতভাগ্য পরাধীন দেশে এতবড় একটা প্রাণের কোন মূল্য নাই, যে-কোন লোকের হাতে যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহা কুকুর-শিয়ালের মত বিনষ্ট হইতে পারে! সমস্ত জগৎ-বিধানে এতবড় নিষ্ঠুর অবিচার আর কি আছে! ভগবান মঙ্গলময় এই যদি সত্য, এ তবে কাহার ও কোন্ পাপের দণ্ড?

উভয়ে একটা ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। ভারতী ডাকিল, পাঁচকড়ি, কেমন আছ আজ?

অন্ধকার কোণ হইতে সাড়া আসিল, আজ একটু ভাল। এই বলিয়া একজন বুড়া গোছের লোক ডান হাতটা উঁচু করিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আগাগোড়া কি কতকগুলি প্রলেপ দেওয়া, কহিল, মা, মেয়েটা রক্ত আমাশায় বোধ হয় বাঁচবে না, ছেলেটার আবার কাল থেকে বেহুঁস জ্বর, এমন একটা পয়সা নেই যে এক ফোঁটা ওষুধ কিনে দি, কি এক বাটি সাগু-বার্লি রেঁধে খাওয়াই। তাহার দুই চোখ ছল ছল করিয়া আসিল।

অপূর্ব্বর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল, পয়সা নেই কেন?

এই অপরিচিত বাবুটিকে লোকটা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, পুলির শেকল পড়ে ডানহাতটাই জখম হয়ে গেছে, মাসখানেক ধরে কাজে বার হতে পারিনি, পয়সা থাকবে কি করে বাবুমশায়?

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল, কারখানার ম্যানেজার এর ব্যবস্থা করেন না?

পাঁচকড়ি কপালে একবার বাম হাতটা স্পর্শ করিয়া কহিল, হায়! হায়! দিন-মজুরদের আবার ব্যবস্থা! এতেই বলচে কাজ করতে না পারো ত ঘর ছেড়ে দাও, আবার যখন ভাল হবে তখন এস—কাজ দেব। এ অবস্থায় কোথায় যাই বলুন ত মশায়? ছোট সাহেবের হাতে-পায়ে ধরে বড় জোর হপ্তাহখানেক থাকতে পাব। বিশ বচ্ছর কাজ করচি মশায়, এরা এমনি নেমকহারাম!

কথা শুনিয়া অপূর্ব্ব রাগে জ্বলিতে লাগিল। তাহার এমনি ইচ্ছা করিতে লাগিল,

ম্যানেজার লোকটাকে পায় ত কান ধরিয়া টানিয়া আনিয়া দেখায় সুদিনে যাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া দিয়াছে, আজ দুর্দ্দিনে তাহারা কি দুঃখই ভোগ করিতেছে! অপূর্ব্বদের বাটীর কাছে গরুর গাড়ির আড্ডা, তাহার মনে পড়িল, এক জোড়া গরু সমস্ত জীবন ধরিয়া বোঝা টানিয়া অবশেষে বৃদ্ধ ও অক্ষম হইয়া পড়িলে লোকটা তাহাদের কসাইখানায় বিক্রী করিয়া দিয়াছিল। এই হৃদয়হীনতা নিবারণ করিবার উপায় নাই, লোকে করে না, কেহ করিতে চাহিলে সবাই তাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দেয়। সেই পথ দিয়া যখনই সে গিয়াছে, তখনই এই কথা মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিয়াছে। গরুর জন্য নয়, কিন্তু অর্থের পিপাসায় এই বর্ব্বর নিষ্ঠুরতায় মানুষে আপনাকে আপনি কত ছোটই না প্রতিদিন করিয়া আনিতেছে। সহসা ভারতীর কথাটা স্মরণ করিয়া সে মনে মনে কহিল, ঠিক কথাই ত! কে কোথায় করিতেছে—আমি ত করি না, অথবা, এমনিই ত হয়, এই ত চিরদিন হইয়া আসিতেছে—এই বলিয়াই ত এত বড় ত্রুটির জবাবদিহি হয় না! গরু-ঘোড়া শুধু উপলক্ষ। এই হাত-ভাঙা পাঁচকড়িটাও তাই। আপনাকে যে বাঁচাইতে পারে না তাহার হত্যায়, যে দুর্ব্বল তাহার পীড়নে, যে নিরুপায় তাহার লজ্জাহীন বঞ্চনায় এই যে মানুষে আপনার হৃদয়-বৃত্তির জীবন হরণ করিতেছে, সকলের এই যে আত্মহত্যার অহোরাত্রব্যাপী উৎসব চলিতেছে, ইহার বাতি নিভিবে কবে? এই সর্ব্বনাশা উন্মত্ততার পরিসমাপ্তি ঘটিবে কোন্ পথ দিয়া? মরণের আগে কি আর তাহার চেতনা ফিরিবে না!

ঘরের একধারে মলিন শতচ্ছিন্ন শয্যায় ছেলে-মেয়ে দুটি মৃতকল্পের ন্যায় পড়িয়াছিল, ভারতী কাছে গিয়া তাহাদের গায়ে হাত দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। অপূর্ব্ব ভয়ে সেখানে যাইতে পারিল না, কিন্তু দরিদ্র, পীড়িত শিশু দুটির নিঃশব্দ বেদনা তাহার বুকের মধ্যে যেন মুগুরের ঘা মারিতে লাগিল। সে সেইখানে দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, লোকে বলে, এই ত দুনিয়া! এমনি ভাবেই ত সংসারের সকল কাজ চিরদিন হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই কি যুক্তি! পৃথিবী কি শুধু অতীতেরই জন্য! মানুষ কি কেবল তাহার পুরাতন সংস্কার লইয়া অচল হইয়া থাকিবে! নতুন কিছু কি সে কল্পনা করিবে না! উন্নতি করা কি তাহার শেষ হইয়া গেছে! যাহা বিগত, যাহা মৃত, কেবল তাহারই ইচ্ছা, তাহারই বিধান মানুষের সকল ভবিষ্যৎ, সকল জীবন, সকল বড় হওয়ার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া চিরকাল ধরিয়া প্রভুত্ব করিতে থাকিবে!

চলুন।

অপূর্ব্ব চমকিয়া দেখিল, ভারতী। পাঁচকড়ি নীরবে ম্লানমুখে দাঁড়াইয়াছিল,

তাহাকে উদ্দেশ করিয়া ভারতী স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, ভয় নেই তোমার, এরা সেরে উঠবে। কাল সকালেই আমি ডাক্তার, ওষুধ, পথ্য সব পাঠিয়ে দেব—

তাহার কথা শেষ না হইতেই অপূর্ব্ব পকেটে হাত দিয়া টাকা বাহির করিতেছিল, সেই হাত ভারতী হাত বাড়াইয়া চাপিয়া ধরিয়া নিবারণ করিল। পাঁচকড়ির দৃষ্টি অন্যত্র ছিল, সে ইহা দেখিতে পাইল না, কিন্তু অপূর্ব্বও ইহার হেতু বুঝিল না। ভারতী তখন নিজের জামার পকেট হইতে চার আনা পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, ছেলেদের চার পয়সার মিছরি, চার পয়সার সাগু, আর বাকী দু-আনার চাল ডাল এনে তুমি এ-বেলার মত খাও পাঁচকড়ি, কাল তোমার ব্যবস্থা করে দেব। আজ আমরা চললাম। এই বলিয়া অপূর্ব্বকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

পথে আসিয়া অপূর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আপনি ভারি কৃপণ। আমাকেও দিতে দিলেন না, নিজেও দিলেন না।

ভারতী কহিল, দিয়েই ত এলাম।

একে দিয়ে আসা বলে? তার এই দুঃসময়ে পাই-পয়সার হিসেব করে চার আনা মাত্র হাতে দেওয়া ত শুধু অপমান।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কত দিতে যাচ্ছিলেন?

অপূর্ব্ব ঠিক কিছুই করে নাই, খুব সম্ভব হাতে যাহা উঠিত, তাহাই দিত। কিন্তু এখন ভাবিয়া বলিল, অন্ততঃ গোটা-পাঁচেক টাকা।

ভারতী জিভ কাটিয়া কহিল, ওরে বাপ্ রে! সর্ব্বনাশ করেছিলেন আর কি। বাপ ত মদ খেয়ে সারারাত বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকতো, কিন্তু ছেলে-মেয়ে দুটো মরে যেতো।

মদ খেতো?

খেতো না! হাতে টাকা পেলে মদ খায় না এমন অসাধারণ ব্যক্তি সংসারে কে আছে?

অপূর্ব্ব ক্ষণকাল অভিভূতের ন্যায় স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, আপনার সব কথায় তামাসা। রুগ্ন সন্তানের চিকিৎসার টাকায় বাপ মদ কিনে খাবে, এ কি কখনো সত্যি হতে পারে?

ভারতী কহিল, সত্যি না হয় ত আপনি যে ঠাকুরের দিব্যি করতে বলবেন,—মা মনসা, ওলা বিবি—হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়াই কিন্তু আপনাকে তৎক্ষণাৎ সংযত করিয়া লইয়া বলিল, নইলে, দাতার হাত চেপে ধরে দুঃখীকে পেতে দেব না, সত্যি বলুন ত আমি কি এতই ছোট?

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, এদের মা নেই?

না।

কোথাও কোন আত্মীয় নেই বোধ করি!

ভারতী বলিল, থাকলেও কাজে লাগবে না। বছর দশ-বারো পূর্ব্বে পাচকড়ি একবার দেশে যায়, কোন এক প্রতিবেশীর বিধবা মেয়েকে ভুলিয়ে সাগর পার করে নিয়ে আসে। ছেলে-মেয়ে দুটি তারই; বছর-দুই হল, গলায় দড়ি দিয়ে সে ভবযন্ত্রণা এড়িয়েচে,—এই ত পাঁচকড়িদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

অপূর্ব্ব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নরককুণ্ডই বটে!

ভারতী নিতান্ত সহজকণ্ঠে মাথা নাড়িয়া বলিল, তাতে আর লেশমাত্র মতভেদ নেই। কিন্তু মুস্কিল হয়েচে এই যে, এরা সব ভাই-বোন। রক্তের সম্বন্ধ অস্বীকার করেই রেহাই মিলবে না অপূর্ব্ববাবু, উপরে বসে যে ব্যক্তিটি সমস্ত দেখচেন তিনি কড়ায় গণ্ডায় এর কৈফিয়ৎ নিয়ে তবে ছেড়ে দেবেন।

অপূর্ব্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, এখন মনে হচ্ছে যেন একেবারে অসম্ভব নয়। ক্ষণকাল পূর্ব্বে পাঁচকড়ির ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়াই যে সকল চিন্তা তাহার মনে হইয়াছিল, বিদ্যুদ্বেগে সেই সমস্তই আর একবার তাহার মনের মধ্যে বহিয়া গেল। বলিল, আমিও যখন মানুষ তখন দায়িত্ব আছে বৈ কি।

ভারতী সায় দিল। বলিল, আগে আগে আমিও দেখতে পেতাম না, রাগ করে ঝগড়া করতাম। এই সব অজ্ঞান, দুঃখী, দুর্ব্বল-চিত্ত ভাই-বোনের ঘাড়ে অসহ্য পাপের বোঝা কে অহরহ চাপাচ্ছে এখন স্পষ্ট দেখতে পাই অপূর্ব্ববাবু।

পাশের ঘরে একজন উড়িয়া মিস্ত্রী থাকে, তাহার পাশের ঘর হইতে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ হাসি ও উচ্চ কোলাহল আসিতেছিল, পাচকড়ির ঘরের ভিতর হইতেও অপূর্ব্ব তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। সে ঘরে আসিয়া দুজনে উপস্থিত হইল। ভারতী ইহাদের পরিচিত, সকলে সমস্বরে তাহার অভ্যর্থনা করিল। একজন ছুটিয়া গিয়া একটা টুল ও একটা বেতের মোড়া আনিয়া বসিতে দিল। অনাবৃত কাষ্ঠের মেঝেতে বসিয়া ছয়-সাতজন পুরুষ ও আট-দশজন স্ত্রীলোকে মিলিয়া মদ খাইতেছিল। একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়াম ও একটা বাঁয়া মাঝখানে, নানা রঙের ও নানা আকারের খালি বোতল চতুর্দ্দিকে গড়াইতেছে, একজন বুড়া গোছের স্ত্রীলোক মাতাল হইয়া ঘুমাইতেছে,—তাহাকে বিবস্ত্রা বলিলেই হয়। ষাট হইতে পঁচিশ-ছাব্বিশ পর্য্যন্ত সকল বয়সের স্ত্রী-পুরুষই বসিয়া গিয়াছে,—আজ রবিবার, পুরুষদের ছুটির দিন। পিঁয়াজ-রশুনের তরকারির সঙ্গে মিশিয়া সস্তা জারমান মদের অবর্ণনীয় গন্ধ অপূর্ব্বর নাকে লাগিতে তাহার গা বমি-বমি করিয়া আসিল। একজন অল্পবয়সী

স্ত্রীলোকের হাতে মদের গেলাস ছিল, সে বোধ হয় তখনও পাকা হইয়া উঠে নাই, হয়ত অল্পদিন পূর্ব্বেই গৃহত্যাগ করিয়াছে, সে বাঁ হাতে সজোরে নিজের নাক টিপিয়া ধরিয়া গেলাসটা মুখে ঢালিয়া দিয়া তক্তার ফাঁক দিয়া অপর্য্যাপ্ত থুথু ফেলিতে লাগিল। একজন পুরুষ তাড়াতাড়ি তাহার মুখে খানিকটা তরকারি গুঁজিয়া দিল। বাঙালী মেয়েমানুষকে চোখের সুমুখে মদ খাইতে দেখিয়া অপূর্ব্ব যেন একেবারে শীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সে আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, এতবড় ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্যেও ভারতীর মুখের উপরে বিকৃতির চিহ্ন মাত্র নাই। এসব তাহার সহিয়া গেছে। কিন্তু ক্ষণেক পরে গৃহস্বামীর ফরমাসে টুনি যখন গান ধরিল, এই যমুনা সেই যমুনা—এবং পাশের লোকটা হারমোনিয়াম টানিয়া লইয়া খামোকা একটা চাবি টিপিয়া ধরিয়া প্রাণপণে বেলো করিতে শুরু করিল, তখন এত ভার ভারতীর বোধ হয় সহিল না। সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, মিস্ত্রীমশায়, কাল আমাদের মিটিং—এ কথা বোধ হয় ভোলনি? যাওয়া কিন্তু চাই-ই।

চাই বই কি দিদিমণি! এই বলিয়া কালাচাঁদ একপাত্র মদ গলায় ঢালিয়া দিল।

ভারতী কহিল, ছেলেবেলায় পড়েচ ত খড় পাকিয়ে দড়ি করলে হাতী বাঁধা যায়। এক না হলে তোমরা কখনোও কিছু করতে পারবে না। কেবল তোমাদের ভালর জন্যই সুমিত্রাদিদি কি পরিশ্রম করেচেন বল ত!

এ কথায় সকলে একবাক্যে সায় দিল। ভারতী বলিতে লাগিল, তোমরা ছাড়া কি এতবড় কারখানা একদিন চলে? তোমরাই ত এর সত্যিকারের মালিক, এ তো সোজা কথা কালাচাঁদ, এ তোমরা না বুঝতে চাইলে হবে কেন?

সবাই বলিল, এ ঠিক কথা। তাহারা না চালাইলে সমস্ত অন্ধকার।

ভারতী কহিল, অথচ, তোমাদের কত কষ্ট একবার ভেবে দেখ দিকি। যখন তখন বিনা দোষে সাহেবরা তোমাদের লাথি জুতো মেরে বার করে দেয়। এই পাশের ঘরেই দেখ, কাজ করতে গিয়ে পাঁচকড়ির হাত ভেঙেচে বলে আজ সে খেতে পায় না, তার ছেলে-মেয়ে দুটো ওষুধ-পথ্যির অভাবে মারা যাচ্চে। ঘর থেকে পর্য্যন্ত বড়সাহেব তাকে দূর করে দিতে চায়! এই যে ক্রোর ক্রোর টাকা এরা লাভ করেচে সে কাদের দৌলতে? আর তোমরা পাও কতটুকু? এই যে সেদিন শ্যামলালকে ছোটসাহেব ঠেলে ফেলে দিলে, আজও সে হাসপাতালে, এ তোমরা সহ্য করবে কেন? একবার সবাই এক হয়ে দাঁড়িয়ে জোর করে বল ত, এ নির্য্যাতন আমরা আর সইব না, কেমন তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করে দেখি! কেবল একটি বার তোমাদের সত্যিকার জোরটুকু তোমরা চেয়ে দেখতে শেখো—আর আমরা তোমাদের কাছে কিছুই চাইনে কালাচাঁদ।

একজন মাতাল হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, সে কহিল, বাবা! পারিনে কি? এমন একটি বল্টু ঢিল করে রেখে দিতে পারি, যে—কড় কড় কড়াৎ! ব্যস? অর্দ্ধেক কারখানাই ফরসা!

ভারতী সভয়ে বলিয়া উঠিল, না না, দুলাল, ওসব কাজ কখ্খনো ক'রো না। ওতে তোমাদেরই সর্ব্বনাশ, হয়ত লোক মারা যাবে, হয়ত—না না, এসব কথা স্বপ্নেও ভাবতে যেও না দুলাল। ওর চেয়ে ভয়ানক পাপ আর নেই।

লোকটা মাতালের হাসি হাসিয়া বলিল, নাঃ তা কি আর জানিনে! ও শুধু কথার কথা বলচি, আমরা পারিনে কি!

ভারতী বলিতে লাগিল, তোমাদের সৎপথে, সত্যিকার পথে দাঁড়ানো চাই-- তাতেই তোমরা সমস্ত পাবে। ওদের কাছে তোমাদের বহু বহু টাকা পাওনা—তাই কেবল কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিতে হবে।

মেয়ে-পুরুষে এই লইয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল। ভারতী কহিল, সন্ধ্যা হয়, এখনো আর এক জায়গার যেতে হবে। আমরা তবে এখন আসি, কিন্তু কালকের কথা যেন কিছুতেই না ভুল হয়। এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

এই কালাচাঁদের আড্ডার সমস্ত ব্যাপারই অপূর্ব্বর অত্যন্ত বিশ্রী লাগিয়াছিল, কিন্তু শেষের দিকে যে-সব আলোচনা হইল তাহাতে তাহার বিরক্তির অবধি রহিল না। বাহিরে আসিয়া ভয়ানক রাগ করিয়া কহিল, তুমি এসব কথা এদের বলতে গেলে কেন?

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, কি সব কথা?

অপূর্ব্ব বলিল, ওই ব্যাটা হারামজাদা মাতাল! দুলাল না কি নাম,—কি বললে শুনলে ত? ধর এ কথা যদি সাহেবের কানে যায়?

কানে যাবে কি করে?

আরে, এরাই বলে দেবে। এরা কি যুধিষ্ঠির নাকি? মদের ঝোঁকে কখন কি কাণ্ড করে বসবে, তখন তোমার নামেই দোষ হবে। হয়ত বলবে তুমিই শিখিয়ে দিয়েচ।

কিন্তু সে তো মিছে কথা?

অপূর্ব্ব অধীর হইয়া বলিল, মিছে কথা! আরে, ইংরেজ-রাজত্বে মিছে কথায় কখনো কারো জেল হয়নি নাকি? রাজত্বটাই ত মিছের ওপর দাঁড়িয়ে।

ভারতী কহিল, আমারও না হয় জেল হবে।

অপূর্ব্ব বলিল, তুমি ত বলে ফেললে, না হয় জেল হবে! না, না, এসব হবে না, এখানে আসা তোমার আর কখ্খনো চলবে না।

কিছুদূরে একজনের কাছে প্রয়োজন ছিল, কিন্তু দ্বারে তাহার তালা দেওয়া দেখিয়া উভয়েই সেই পথেই ফিরিল। কালাচাঁদের ঘরের কাছে আসিয়া দেখিল সেই 'যমুনা প্রবাহিনী'র গান তখন থামিয়াছে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে মদ-মত্ত তর্ক একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে! একজন স্ত্রীলোক মাতাল হইয়া তাঁহার স্বামীর শোকে কান্না শুরু করিয়াছে, আর একজন তাহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেছে যে, দেশের কথা বলিয়া আর লাভ নাই, এইখানেই আবার তোর সব হবে, তুই বরঞ্চ মানত করিয়া পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের কথা দে। অনেকে এই বলিয়া ঝগড়া করিতেছে যে, এই ক্রীশ্চান মেয়েগুলো কারখানায় ধর্ম্মঘট বাধাইয়া দিতে চায়। তাহা হইলে তাহাদের কষ্টের সীমা থাকিবে না, উহাদের লাইনের ঘরে আর আসিতে দেওয়া উচিত নয়। কালাচাঁদ মিস্ত্রী বুঝাইয়া বলিতেছে যে সে বোকা ছেলে নয়। ইহাদের দৌড়টাই কেবল সে দেখিতেছে। একজন অতিসাবধানী মেয়েমানুষ পরামর্শ দিল যে, খোকা, সাহেবকে এই বেলা সাবধানে করিয়া দেওয়া ভাল।

সেখান হইতে ভারতীকে জোর করিয়া দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া অপূর্ব্ব তিক্তকণ্ঠে কহিল, আর করবে এদের ভাল? নেমকহারাম! হারামজাদা! পাজি! নচ্ছার! উঃ—পাশের ঘরে দুটো অনাথ ছেলেমেয়ে মরে, একজন কেউ চেয়ে দেখে না। নরক আর কোথায়?

ভারতী মুখপানে চাহিয়া বলিল, হঠাৎ হল কি আপনার?

অপূর্ব্ব কহিল, আমার কিছুই হয়নি, আমি জানতাম। কিন্তু তুমি শুনলে কি না, তাই বল?

ভারতী বলিল, নূতন কিছুই নয়, এ রকম তো আমরা রোজ শুনি।

অপূর্ব্ব গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল, এমনি শয়তানি? এমনি কৃতঘ্নতা? এদের চাও তুমি দলে আনতে—দলবদ্ধ করতে? এদের চাও তুমি ভাল?

ভারতীর কণ্ঠস্বরে কোন উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না। বরঞ্চ, সে একটুখানি মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, এরা কারা অপূর্ব্ববাবু? এরা ত আমরাই। এই ছোট্ট কথাটুকু যখনই ভুলচেন, তখনি আপনার গোল বাঁধচে। আর ভাল? ভাল-করা বলে যদি সংসারে কোন কথা থাকে, তার যদি কোন অর্থ থাকে সে তো এইখানে। ভাল ত ডাক্তারবাবুর করা যায় না অপূর্ব্ববাবু।

অপূর্ব্ব এ কথার কোন জবাব দিল না।

দুজনে নিঃশব্দে ফটক পার হইয়া আবার বর্ম্মী পাড়ার ভিতর দিয়া বাজারের পথ ঘুরিয়া বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে, গৃহস্থের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, পথের দুধারে ছোট ছোট রাত-দোকান বসিয়া বেচা-কেনা

আরম্ভ হইয়াছে,—ইহারই মধ্যে দিয়া ভারতী মাথার কাপড় কপালের নীচে পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া নিঃশব্দে দ্রুতবেগে পথ হাঁটিয়া চলিল। অবশেষে লোকালয় শেষ হইয়া যেখানে জলা ও মাঠ শুরু হইল, সেইখানে তে-মাথায় আসিয়া সে পিছনে চাহিয়া কহিল, আপনি বাসায় যান ত সহরে যাবার এই ডানদিকের পথ।

অপূর্ব্ব অন্যমনস্ক হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি বলেন?

ভারতী বলিল, এতক্ষণে আপনার মাথা ঠাণ্ডা হয়েচে। যথাযোগ্য সম্বোধনের ভাষা মনে পড়েচে।

তার মানে?

তার মানে রাগের মাথায় এতক্ষণ আপনি-তুমির ভেদাভেদ ছিল না। এখন ফিরে এল।

অপূর্ব্ব অতিশয় লজ্জিত হইয়া স্বীকার করিয়া কহিল, আপনি রাগ করেননি?

ভারতী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, একটু করলেই বা। চলুন।

আবার যাবো?

যাবেন না ত কি অন্ধকার পথে আমি একলা যাবো?

অপূর্ব্ব আর দ্বিরুক্তি করিল না। আজ মনের মধ্যে তাহার অনেক বিষ, অনেক জ্বালা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। মাতালগুলার কথা সে কোন মতে ভুলিতে পারিতেছিল না। চলিতে চলিতে হঠাৎ কটুকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, এ সব হ'ল সুমিত্রার কাজ, আপনার ওখানে মোড়লি করতে যাবার দরকার কি? কে কোথায় কি করে বসবে, আর আপনাকে নিয়ে টানাটানি পড়বে।

ভারতী বলিল, পড়লেই বা।

অপূর্ব্ব বলিল, বা রে, পড়লেই বা! আসল কথা হচ্চে সর্দ্দারি করাই আপনার স্বভাব। কিন্তু আরো ত ঢের জায়গা আছে।

একটা দেখিয়ে দিন না।

আমার বয়ে গেছে।

খানিকটা খুঁড়িয়া রাস্তার এই স্থানটা মেরামত হইতেছিল। যাইবার সময় দিনের বেলায় কষ্ট হয় নাই, কিন্তু দুপাশের কৃষ্ণচূড়ার গাছের নীচে ভাঙা পথটা অন্ধকারে একেবারে দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতী হাত বাড়াইয়া অপূর্ব্বর বাঁ হাতটা শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, স্বভাব ত আমার যাবে না অপূর্ব্ববাবু, কিছু একটা করাই চাই। কিন্তু আপনার মত আনাড়ির ওপরে মোড়লি করতে পাই ত আমি আর সমস্ত ছেড়ে দিতে পারি!

আপনার সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই। এই বলিয়া সে সাবধানে ঠাওর করিয়া করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

১৬

পরদিন অপরাহ্ণবেলায় সুমিত্রার নেতৃত্বে ফয়ার-মাঠে যে সভা আহূত হইল তাহাতে লোকজন বেশী জমিল না, এবং বক্তৃতা দিতে যাঁহারা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই আসিয়া জুটিতে পারিলেন না। নানা কারণে সভার কার্য্য আরম্ভ করিতে বিলম্ব ঘটিল এবং আলোর বন্দোবস্ত না থাকায় সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই তাহা ভাঙিয়া দিতে হইল। সুমিত্রার নিজের বক্তৃতা ভিন্ন বোধ করি সভায় উল্লেখযোগ্য কিছুই হইতে পাইল না, কিন্তু তাই বলিয়া পথের দাবীর এই প্রথম উদ্যমটিকে ব্যর্থ বলিয়া অভিহিত করা যায় না। কারণ মুখে-মুখে চারিদিকের মজুরদের মধ্যেও যেমন ব্যাপারটা প্রচারিত হইয়া পড়িতে বাকী রহিল না, তেমনি কারখানার কর্ত্তৃপক্ষদের কানেও কথাটা পৌঁছতে বিলম্ব হইল না। যেমন করিয়া হৌক, ইহাই সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, কে একজন বাঙালী স্ত্রীলোক সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া অবশেষে বর্ম্মায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার যেমন রূপ তেমনি শক্তি। তাঁহাকে বাধা দেয় কার সাধ্য! কেমন করিয়া তিনি সাহেবদের কানে ধরিয়া মজুরদের সর্ব্বপ্রকার সুখ-সুবিধা আদায় করিয়া লইবেন এবং তাহাদের মজুরির হার দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন, নিজের মুখেই সে সকল কথা তিনি প্রকাশ্যে বিবৃত করিয়াছেন। যাহারা খবর না পাওয়ার জন্য সেদিন উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিজের মুখ হইতে সকল কথা শুনিতে পায় নাই তাহারা আগামী শনিবারে গিয়া যেন মাঠে উপস্থিত হয়।

বিশ-পঁচিশ ক্রোশের মধ্যে যতগুলো কল-কারখানা ছিল এই সংবাদ দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। সুমিত্রাকে কয়টা লোকই বা চোখে দেখিয়াছে, কিন্তু তাঁহার রূপ ও শক্তির খ্যাতি অতিরঞ্জিত, এমন কি অমানুষিক হইয়াই যখন লোকের কানে গেল তখন এই অশিক্ষিত মজুরদের মধ্যে সহসা যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। চিরদিন সংসারে অত্যাচারিত, পীড়িত, দুর্ব্বল বলিয়া মানুষের সহজ অধিকার হইতে যাহারা সবলের দ্বারা প্রবঞ্চিত, নিজের উপর বিশ্বাস করিবার কোন কারণ যাহারা দুনিয়ায় খুঁজিয়া পায় না, দেবতা ও দৈবের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস সবচেয়ে বেশী। সুমিত্রার সম্বন্ধে জনশ্রুতি তাহাদের কাছে কিছুই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না, —এটা প্রায় একপ্রকার স্থির হইয়া গেল যে, একটা রোজ কামাই করিয়া শনিবার দিন ফয়ার-মাঠে হাজির হইতেই হইবে। তাঁহার কথা ও উপদেশের মধ্যে এমন পরশ-পাথর যদি বা কিছু থাকে যাহা দিয়া দিন-মজুরের দুঃখের কপাল রাতারাতি

একেবারে ভোজবাজির মত সৌভাগ্যের দীপ্তিতে রাঙা হইয়া উঠিবে, তা হইলে যেমন করিয়া হোক সে দুর্লভ বস্তু তাহাদের সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে।

সেদিন বৈকালের সভায় বক্তার অভাবে অপূর্ব্বর মত আনাড়িকেও সনির্ব্বন্ধ উপরোধের তাড়নায় বাধ্য হইয়া দুই-চারিটা কথা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতে হইয়াছিল। বলার অভ্যাস তাহার কোনকালে ছিল না, বলিয়াও ছিল সে অতিশয় বিশ্রী এবং এজন্য মনে মনে সে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়াই ছিল, কিন্তু আজ হঠাৎ যখন খবর পাইল তাহাদের সেদিনকার বক্তৃতা বৃথা ত হয়ই নাই, বরঞ্চ ফল এতদূর গড়াইয়াছে যে তাহাদের আগামী সভায় সমস্ত কল-কারখানার কাজ বন্ধ করিয়া কারিকরের দল উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে, তখন শ্লাঘায় ও আত্মপ্রসাদের আনন্দে বুকের মধ্যেটা তাহার ফুলিয়া উঠিল। সেদিন নিজের বক্তব্যকে সে পরিস্ফুট করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার ভয় ভাঙিয়াছিল। বহুলোকের মাঝখানে উঠিয়া জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলার মধ্যে যে নেশা আছে, সেদিন সে তাহার স্বাদ পাইয়াছিল, আজ আফিসে আসিয়াই সুমিত্রার চিঠির মধ্যে বহুবিধ প্রশংসার সঙ্গে আগামী সভার জন্যও পুনরায় বক্তার নিমন্ত্রণ পাইয়া সে উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আফিসের কাজে মন দিতে পারিল না এবং কি করিয়া আরও বিশদ, আরও সতেজ ও আরও সুন্দর করিয়া বলা যায় তখন হইতে মনে মনে তাহার ইহারই মহড়া চলিতে লাগিল। দুপুরবেলা টিফিন খাইতে বসিয়া আজ সে হঠাৎ রামদাসের কাছে এই কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। একদিন তাহারই জন্য সে ভারতীকে অপমান করিয়াছিল, সেই অবধি তাহার লেশমাত্র সংশ্রবের কথাও এই লোকটির কাছে বলিতে অপূর্ব্বর অত্যন্ত লজ্জা করিত। আদালতে সেই জরিমানার দিন হইতে গণনার হিসাবে কত দিনই বা গত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সেই দুর্দ্দান্ত বর্ব্বর সাহেবটা মরিয়াছে, তাহার বাঙালী-স্ত্রী মরিয়াছে এবং তাহাদের সেই শয়তান ক্রীশ্চান মেয়েটাও ঘর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে এইটুকুই শুধু রামদাস জানিত। কিন্তু অবসরটুকুর মধ্যেই যে সেই ঘরছাড়া মেয়েটির সহিত নিঃশব্দ গোপনে তাহার বন্ধুর জীবনে কতবড় কাব্য ও কতবড় দুঃখের ইতিহাস দুঃসহ দ্রুতবেগে রচিত হইয়া উঠিতেছিল সে তাহার কোন খবরই পায় নাই। আজ পুলকের আতিশয্যে সকল কথাই যখন অপূর্ব্ব ব্যক্ত করিয়া কহিতে লাগিল, তখন রামদাস তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। ভারতী, সুমিত্রা, ডাক্তারবাবু, নবতারা, এমন কি সেই মাতালটার পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া সে তাহাদের পথের দাবীর কর্ম্ম ও লক্ষ্য বিবৃত করিয়া সেদিনকার লাইনের ঘরে অভিযানের বিবরণ যখন একটি একটি করিয়া দিতে লাগিল তখন পর্য্যন্তও রামদাস একটি প্রশ্ন করিল না। একদিন দেশের জন্য এই লোকটি জেল খাটিয়াছে, বেত

খাইয়াছে, হয়ত আরও কত-কি নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে, কেবল একটি দিন ছাড়া যাহার কোন বিবরণ কোনদিন সে রামদাসের কাছে শুনিতে পায় নাই, তথাপি তাহাকেই কল্পনায় বাড়াইয়া লইয়া অপূর্ব্ব আফিসের মধ্যে বড় হইয়াও আপনাকে সর্ব্বদাই ছোট না ভাবিয়া পারিত না। ক্ষুদ্রতা তাহার ছিল না, রামদাস তাহার বন্ধু—বন্ধুর প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু বড় ও ছোটর ভাবটাও সে মন হইতে তাড়াইতে পারিত না। এমন করিয়া এই দুটি বন্ধুর ঘনিষ্ঠতার মাঝখানেও ব্যবধানের প্রাচীর গড়িয়া উঠিতেছিল। আজ সুমিত্রার পত্রখানি সে রামদাসের চোখের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া নিজেকে পথের দাবীর একজন বিশিষ্ট সভ্য, এবং দেশের কাজে নিয়োজিত-প্রাণ বলিয়া আপনাকে ব্যক্ত করিয়া একদণ্ডেই যেন সে বন্ধুর সমকক্ষ হইয়া উঠিল।

চিঠিখানি ইংরেজীতে লেখা, তলওয়ারকর আদ্যোপান্ত বার-দুই তাহা নিঃশব্দে পাঠ করিয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবুজি, এ সকল কথা আমাকে আপনি একদিনও বলেননি কেন?

অপূর্ব্ব কহিল, বললেও কি এখন আর আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারতেন?

তলওয়ারকর বলিল, এ-কথা কেন জিজ্ঞাসা করচেন? আমাকে ত আপনি যোগ দিতে ডাকেননি।

তাহার কণ্ঠস্বরে একটা অভিমানের সুর অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়াই অপূর্ব্বর কানে বাজিল, সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, তার কারণ আছে রামদাসবাবু। আপনি ত জানেন, এ-সব কাজের কতবড় দায়িত্ব, কতবড় শঙ্কা। আপনি বিবাহ করেচেন, আপনার মেয়ে আছে, স্ত্রী আছেন, আপনি গৃহস্থ—তাই আপনাকে ঝড়ের মধ্যে আর ডাকতে চাইনি।

তলওয়ারকর বিস্মিত হইয়া বলিল, গৃহস্থের কি দেশের সেবার অধিকার নেই? জন্মভূমি কি শুধু আপনাদের, আমাদের নয়?

অপূর্ব্ব লজ্জা পাইয়া কহিল, সে ইঙ্গিত আমি করিনি তলওয়ারকর, আমি শুধু এই কথাই বলেচি, যে আপনি বিবাহিত, আপনি গৃহস্থ। অন্যত্র আপনার অনেক দায়িত্ব, তাই এ-বিদেশে এতবড় বিপদের মধ্যে যাওয়া বোধ করি আপনার ঠিক নয়।

তলওয়ারকর কহিল, বোধ হয়! তা হ'তে পারে। কিন্তু বিজিত পরাধীন দেশের সেবা করার নামই ত বিপদ অপূর্ব্ববাবু। তার আর কোন নাম নেই এ-কথা আমি চিরদিন জানি। আমাদের হিন্দুর ঘরে বিবাহটা ধর্ম্ম, মাতৃভূমির সেবা তার চেয়ে বড় ধর্ম্ম। এক ধর্ম্ম আর এক ধর্ম্মাচরণে বাধা দেবে এ যদি আমি একটা দিনও মনে করতাম বাবুজি, আমি কখনো বিবাহ করতাম না!

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অপূর্ব্ব আর প্রতিবাদ করিল না, চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু এই যুক্তিকে সে মনে মনে সমর্থন করিল না। একদিন স্বদেশের কাছে এই লোকটি বহু দুঃখ পাইয়াছে, আজও তাহার অন্তরের তেজ একেবারে নিবিয়া যায় নাই, সামান্য প্রসঙ্গেই সহসা তাহা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, এই কথা মনে করিয়া অপূর্ব্ব শ্রদ্ধায় বিগলিত হইল, কিন্তু তাহার অধিক আর কিছু সে সত্য-সত্যই প্রত্যাশা করিল না। আহ্বান করিলেই সে যে স্ত্রী-পুত্রের মায়া কাটাইয়া, তাহাদের প্রতিপালনের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া পথের দাবীর সভ্য হইতে ছুটিয়া যাইবে ইহা সে বিশ্বাসও করিল না, ইচ্ছাও করিল না। স্বদেশ-সেবার অধিকারের স্পর্দ্ধা এই কয়দিনেই তাহার এতখানি উঁচু হইয়া গিয়াছিল। সহসা এ প্রসঙ্গ সে বন্ধ করিয়া আগামী সভার হেতু ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বন্ধুর কাছে কিন্তু এখন সরলকণ্ঠেই ব্যক্ত করিল যে, সেই একটি দিন ভিন্ন জীবনে কখনো সে বক্তৃতা করে নাই; সুমিত্রার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিবে না, কিন্তু একের কথা বহুজনকে শুনাইবার মত ভাষা বা অভিজ্ঞতা কোনটাই তাহার আয়ত্ত নয়।

তলওয়ারকর জিজ্ঞাসা করিল, কি করবেন তাহ'লে?

অপূর্ব্ব বলিল, বক্তৃতা করার মত কেবল একটি দিনই জীবনে আমার কারখানা দেখবার সুযোগ ঘটেছে। তাদের কুলি-মজুরেরা যে অধিকাংশই পশুর জীবন-যাপন করে এ আমি অসংশয়ে অনুভব করে এসেচি, কিন্তু কেন, কিসের জন্যে তার ত কিছুই জানিনে।

রামদাস হাসিয়া কহিল, তবু আপনাকে বলতে হবে? নাই-ই বললেন।

অপূর্ব্ব চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল, এতবড় মর্য্যাদা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে কঠিন।

রামদাস নিজে তখন বলিল, আমি কিন্তু এদের কথা কিছু কিছু জানি।

কেমন করে জানলেন?

বহুদিন এদের মধ্যে ছিলাম অপূর্ব্ববাবু। আমার চাকরির সার্টিফিকেটগুলো একবার চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন দেশে আমি কলকারখানা, কুলি-মজুর নিয়েই কাল কাটিয়েচি। যদি হুকুম করেন ত অনেক দুঃখের কাহিনীই আপনাকে শোনাতে পারি। বাস্তবিক, এদের না দেখলে যে দেশের সত্যকার ব্যথার জায়গাটাই বাদ পড়ে যায় বাবুজি।

অপূর্ব্ব কহিল, সুমিত্রাও ঠিক এই কথাই বলেন!

রামদাস কহিল, না বলে ত উপায় নেই। এবং জানেন বলেই ত পথের দাবীর কর্ত্রী তিনি! বাবুজি, আত্মত্যাগের উৎসই ঐখানে। দেশের সেবার বনেদ ওর 'পরে,

ওর নাগাল না পেলে যে আপনার সকল উদ্যম, সকল ইচ্ছা মরুভূমির মত দুদিনে শুকিয়ে উঠবে।

কথাগুলো অপূর্ব্ব এই নতুন শুনিল না, কিন্তু রামদাসের বুকের মধ্যে হইতে যেন তাহারা সশব্দে উঠিয়া আজ তাহার বুকের উপর তীক্ষ্ণ আঘাত করিল। রামদাস আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ পর্দ্দা সরাইয়া সাহেব প্রবেশ করিতে দুজনেই চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সাহেব অপূর্ব্বকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি চললাম। তোমার টেবিলের উপরে একটা চিঠি রেখে এসেচি, কালই তার জবাব দেওয়া প্রয়োজন, এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন। উভয়েই ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে দেখিল বেলা চারিটা বাজিয়া গেছে।

১৭

সাহেব চলিয়া গেলে আজ একটুখানি সকাল-সকাল আফিসের ছুটি দিয়া উভয়ে ফয়ার-মাঠের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। পাঁচটায় মিটিং শুরু হইবার কথা, তাহার আর বিলম্ব নাই। এই দিকটায় গাড়ি মিলে না, সুতরাং একটু দ্রুত না গেলে সময়ে পৌঁছানো যাইবে কি না সন্দেহ। পথের মধ্যে অপূর্ব্ব কথাবার্ত্তা প্রায় কিছুই বলিল না। তাহার জীবনের আজ একটা বিশেষ দিন। আশঙ্কা ও আনন্দের উত্তেজনায় তাহার মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল। কারিকর ও কুলি-মজুরদের সম্বন্ধে কতক একখানা পুস্তক হইতে এবং কতক রামদাসের নিকট সে যোগাড় করিয়া লইয়াছিল, সেই সমস্ত মনে মনে সাজাইয়া গুছাইয়া অপূর্ব্ব নিঃশব্দে মহড়া দিতে দিতে চলিতে লাগিল। ১৮৬৩ সালে বোম্বাইয়ের কোন্‌খানে সর্ব্বপ্রথমে তুলার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তারপরে সেইগুলা বাড়িয়া বাড়িয়া আজ তাহাদের সংখ্যা কত দাঁড়াইয়াছে, তখন কুলি-মজুরদের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল, কিরূপ দিন-রাত্রি মেহন্নত করিতে হইত এবং এই লইয়া কবে বিলাতের তুলার কলের মালিকদের সহিত ভারতবর্ষীয় মালিকদের প্রথম বিবাদের সূত্রপাত হয় এবং কারখানা আইন কোন সনের কোন তারিখে কি কি বাধা অতিক্রম করিয়া পাশ হইয়া এদেশে প্রথম প্রচলিত হয় এবং সর্ত্ত তাহাতে কি ছিল এবং কখনই বা সেই আইন পরিবর্ত্তিত হইয়া কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তখনকার ও এখনকার বিলাতের ও ভারতবর্ষের মজুরির হারে পার্থক্য কতখানি, ইহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কল্পনা কবে এবং কে উদ্ভাবন করিয়াছিল, তাহার ফল কি

দাঁড়াইয়াছে, সে-দেশের ও এ-দেশের শ্রমিকগণের মধ্যে সুনীতি ও দুর্নীতির তুলনা-মূলক আলোচনা করিলে কি দেখা যায় এবং সংসারে লাভ-ক্ষতির পরিমাণ তাহাতে কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি সংগ্রহমালার কোথাও না খেই হারাইয়া যায় এই ভয়ে সে আপনাকে আপনি বার বার সতর্ক করিল। তাহার স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ ছিল, বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ যে ভুলিয়া যাইবে না, অনেকগুলা একজামিন ভাল করিয়া পাশ করার ফলে এ ভরসা তাহার ছিল। সুতরাং মুখ দিয়া তাহার এই সকল নিরতিশয় সারগর্ভ বাক্যধারা কখনো বা উচ্চসপ্তকে, কখনো বা গম্ভীর খাদে, কখনো বা হুঙ্কার শব্দে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া এক সময়ে যখন সমাপ্ত হইবে তখন বিপুল শ্রোতৃ-মণ্ডলীর করতালিধ্বনি হয়ত বা সহজে থামিতেই চাহিবে না। সুমিত্রার প্রসন্ন দৃষ্টি সে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। আর ভারতী! এইটুকু সময়ে এতখানি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সে যে কি করিয়া আয়ত্ত করিল ইহারই আনন্দিত বিস্ময়ে মুখ তাহার সমুজ্জ্বল ও চোখের দৃষ্টি সজল হইয়া একমাত্র তাহার মুখের 'পরে নিপতিত হইয়াছে, কল্পনায় প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইয়া অপূর্ব্বর শিরার রক্ত সবেগে বহিতে লাগিল। তাহার দ্রুত পদক্ষেপের সমান তালে পা ফেলিয়া চলা তলওয়ারকরের পক্ষে আজ যেন দুরূহ হইয়া পড়িল। তাহারা মাঠে পৌঁছিয়া দেখিল তথায় তিল-ধারণের স্থান নাই, লোক জমিয়াছে যে কত তাহার সংখ্যা হয় না। সেদিনকার বক্তা হিসাবে অপূর্ব্বকে যাহারা চিনিতে পারিল তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল, যাহারা চিনিত না তাহারাও দেখা-দেখি সরিয়া দাঁড়াইল। বিপুল জনতার মাঝখানে মাচা বাঁধা। ডাক্তার আজিও ফিরেন নাই, তাই শুধু তিনি ছাড়া পথের দাবীর সকল সভ্যই উপনীত। বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া কোনমতে ভিড় ঠেলিয়া অপূর্ব্ব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মাচার উপরে একখানা বেঞ্চ তখনও খালি ছিল, চোখের ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিয়া সুমিত্রা সেইখানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। মাচার পুরোভাগে দাঁড়াইয়া পাঞ্জাবী একজন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বক্তৃতা দিতেছিল, বোধ করি সে জবাব-পাওয়া মিস্ত্রী কিংবা এমনি কিছু একটা হইবে, অপূর্ব্বদের অভ্যাগমে ক্ষণকাল মাত্র বাধা পাইয়া পুনশ্চ দ্বিগুণ তেজে চীৎকার করিতে লাগিল। ভাল বক্তার কাছে জনতা যুক্তিতর্ক চাহে না, যাহা মন্দ তাহা কেন মন্দ এ খবরে তাহাদের আবশ্যক হয় না, শুধু মন্দ যে কত অসংখ্য বিশেষণ যোগে ইহাই শুনিয়া তাহারা চরিতার্থ হইয়া যায়। পাঞ্জাবী মিস্ত্রীর প্রচণ্ড বলার মধ্যে বোধ করি এই গুণটাই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় শ্রোতার দল যে কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল তাহাদের মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝা যাইতেছিল।

অকস্মাৎ কি যেন একটা ভয়ানক বিঘ্ন ঘটিল। মাঠের কোন এক প্রান্ত হইতে অগণিত চাপা-কণ্ঠে সত্রাস কলরব উঠিল এবং পরক্ষণেই দেখা গেল বহু লোক

ঠেলা-ঠেলি করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এবং তাহাকেই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পিষিয়া মাড়াইয়া প্রকাণ্ড বড়-বড় ঘোড়ায় চড়িয়া বিশ-পঁচিশজন গোরা পুলিশ-কর্ম্মচারী দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তাহাদের একহাতে লাগাম এবং অন্যহাতে চাবুক,—কোমরবন্ধে পিস্তল ঝুলিতেছে। তাহাদের কাঁধের লোহার জাল ঝক্ ঝক্ করিতেছে এবং রাঙা মুখ ক্রোধে ও অস্তমান সূর্য্যকিরণে একেবারে সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি বক্তৃতা দিতেছিল তাহার বজ্রকণ্ঠ হঠাৎ কখন নীরব হইল এবং মঞ্চ হইতে নীচের ভিড়ের মধ্যে চক্ষের পলকে সে যে কি করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইল জানা গেল না।

সর্দ্দার গোরা মঞ্চের ধার ঘেঁষিয়া আসিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল, মিটিং বন্ধ করিতে হইবে।

সুমিত্রা এখনও আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই, তাহার উপবাস-ক্লিষ্ট মুখের 'পরে পাণ্ডুর ছায়া পড়িল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

সে কহিল, হুকুম।

কার হুকুম?

গভর্ণমেণ্টের।

কিসের জন্য?

স্ট্রাইক করার জন্য মজুরদের ক্ষ্যাপাইয়া তোলা নিষেধ।

সুমিত্রা বলিল, বৃথা ক্ষেপিয়ে দিয়ে তামাসা দেখবার আমাদের সময় নেই। ইউরোপ প্রভৃতি দেশের মত এদের দলবদ্ধ হওয়ায় প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেওয়াই এই মিটিংএর উদ্দেশ্য।

সাহেব চমকিয়া কহিল, দলবদ্ধ করা? কার্ম্মের বিরুদ্ধে? সে তো এদেশে ভয়ানক বে-আইনি। তাতে নিশ্চয় শান্তিভঙ্গ হতে পারে।

সুমিত্রা কহিল, নিশ্চয়, পারে বই কি! যে দেশে গভর্ণমেণ্ট মানেই ইংরাজ ব্যবসায়ী এবং সমস্ত দেশের রক্ত শোষণের জন্যই যে দেশে এই বিরাট যন্ত্র খাড়া করা—

বক্তব্য তাহার শেষ হইতে পাইল না, গোরার রক্ত-চক্ষু আগুন হইয়া উঠিল। ধমক দিয়া বলিল, দ্বিতীয়বার এ-কথা উচ্চারণ করলে আমি অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব।

সুমিত্রার আচরণে এতটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না, শুধু ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া মুচকিয়া একটু হাসিল। কহিল, সাহেব, আমি অসুস্থ এবং অতিশয় দুর্ব্বল। না হলে শুধু দ্বিতীয়বার কেন, এ কথা একশবার চীৎকার করে এই লোকগুলিকে শুনিয়ে দিতাম। কিন্তু আজ আমার শক্তি নেই। এই বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

এই পীড়িত রমণীর সহজ শান্ত হাসিটুকুর কাছে সাহেব মনে মনে বোধ হয় লজ্জা পাইল, অল্ রাইট। আপনাকে সাবধান করে দিলাম। ঘড়ি খুলিয়া কহিল, মিটিং বন্ধ করবার আমার হুকুম আছে, কিন্তু ভেঙ্গে দেবার নেই! দশ মিনিট সময় দিলাম, দু'চার কথায় এদের শান্তভাবে যেতে বলে দিন। আর কখনো যেন এরূপ না হয়।

কিছুদিন হইতে প্রায় উপবাসেই সুমিত্রার দিন কাটিতেছিল। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও সে আজ সামান্য একটু জ্বর লইয়াই সভায় উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন শ্রান্তি ও অবসাদ তাহাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। চৌকির পিঠে মাথা হেলান দিয়া সে অস্ফুটে ডাকিয়া কহিল, অপূর্ব্ববাবু, দশ মিনিট মাত্র সময় আছে,—হয়ত তাও নেই। চীৎকার করে সকলকে জানিয়ে দিন সঙ্ঘবদ্ধ না হ'লে এদের আর উপায় নেই। কারখানার মালিকেরা আজ আমাদের যে অপমান করলে, মানুষ হলে এরা যেন তার শোধ নেয়। বলিতে বলিতে তাহার দুর্ব্বল কণ্ঠ ভাঙিয়া পড়িল, কিন্তু সভানেত্রীর এই আদেশ শুনিয়া অপূর্ব্বর সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল। বিহ্বল-নেত্রে সুমিত্রার প্রতি চাহিয়াই কহিল, উত্তেজিত করা কি বে-আইনি হবে না?

সুমিত্রা বিস্মিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, পিস্তলের জোরে সভা ভেঙ্গে দেওয়াই কি আইন-সঙ্গত? বৃথা রক্তপাত আমি চাইনে, কিন্তু এই কথাটা সকল শক্তি দিয়ে আপনি শুনিয়ে দিন আজকের অপমান শ্রমিকেরা যেন কিছুতে না ভোলে।

পথের দাবীর অন্য চার-পাঁচজন পুরুষ সভ্য যাহারা মঞ্চের পরে আসীন ছিল চেহারা দেখিয়াই মনে হয় তাঁহারা সামান্য এবং তুচ্ছ ব্যক্তি। হয়ত কারিকর কিংবা এমনি কিছু হইবে। অপূর্ব্ব নূতন হইলেও সমিতির শিক্ষিত এবং বিশিষ্ট সভ্য। এতবড় জনতাকে সম্বোধন করিবার ভার তাই তাহার প্রতি পড়িয়াছে। অপূর্ব্ব শুষ্ককণ্ঠে কহিল, আমি ত হিন্দী ভাল জানিনে।

সুমিত্রা কথা কহিতে পারিতেছিল না, তথাপি কহিল, যা জানেন তাতেই দু'কথা বলে দিন অপূর্ব্ববাবু, সময় নষ্ট করবেন না।

অপূর্ব্ব সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। ভারতী মুখ ফিরাইয়া ছিল, তাহার অভিমত জানা গেল না, কিন্তু জানা গেল সর্দ্দার-গোরার মনে ভাব। তাহার সহিত অত্যন্ত কাছে, অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অত্যন্ত কঠিন চোখা-চোখি হইল। বলিবার জন্য অপূর্ব্ব উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার ঠোঁট নড়িতে লাগিল, কিন্তু সেই কম্পিত ওষ্ঠাধর হইতে বাঙলা ইংরাজি হিন্দী কোন ভাষাই ব্যক্ত হইল না। কেবল একান্ত পাণ্ডুর মুখের 'পরে ব্যক্ত যাহা হইল, তাহা আর যাহারই হোক পথের দাবীর সভ্যদের জন্য নহে।

তলওয়ারকর উঠিয়া দাঁড়াইল। সুমিত্রাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমি বাবুজির বন্ধু। আমি হিন্দী জানি। আদেশ পাই ত ওর বক্তব্য আমি চেঁচিয়ে সকলকে

শুনিয়ে দিই। ভারতী মুখ ফিরাইয়া চাহিল, সুমিত্রা বিস্মিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া স্থির হইয়া রহিল এবং এই দুইটি নারীর উন্নদ্ধ চোখের সম্মুখে লজ্জিত, অভিভূত, বাক্যহীন অপূর্ব্ব স্তব্ধ নতমুখে জড়বস্তুর মত বসিয়া পড়িল।

রামদাস ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার দক্ষিণে বামে ও সম্মুখের বিক্ষুব্ধ, ভীত, চঞ্চল জনসমষ্টিকে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, ভাইসব! আমার অনেক কথা বলবার ছিল, কিন্তু এরা গায়ের জোরে আমাদের মুখ বন্ধ করচে। এই বলিয়া সে আঙ্গুল দিয়া সুমুখের পুলিশ-সওয়ারগণকে দেখাইয়া বলিল, এই ডাল-কুত্তাদের যারা আমাদের বিরুদ্ধে, তোমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে, তারা তোমাদেরই কারখানার মালিকেরা! তারা কিছুতেই চায় না যে কেউ তোমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা তোমাদের জানায়। তোমরা তাদের কল চালাবার, বোঝা বইবার জানোয়ার! অথচ তোমরাও ত তাদেরি মত মানুষ, তেমনি পেট ভরে খাবার, তেমনি প্রাণ খুলে আনন্দ করবার জন্মগত অধিকার তোমরাও যে ভগবানের কাছ থেকে পেয়েচ এই সত্যটাই এরা সকল শক্তি, সকল শঠতা দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে গোপন রাখতে চায়। শুধু একবার যদি তোমাদের ঘুম ভাঙে, কেবল একটিবার মাত্র যদি এই সত্য কথাটা বুঝতে পার যে, তোমরাও মানুষ, তোমরা যত দুঃখী, যত দরিদ্র, যত অশিক্ষিতই হও তবুও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবী কোন ওজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তা হলে, এই গোটা-কতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু? এই সত্য তোমরা কি বুঝবে না? এ যে কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই! এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম্ম নেই, মতবাদ নেই—হিন্দু নেই, মুসলমান নেই,—জৈন, শিখ, কোন কিছুই নেই,—আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক, আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক। তোমাদের গায়ের জোরকে তারা ভয় করে, তোমাদের শিক্ষার শক্তিকে তারা অত্যন্ত সংশয়ের চোখে দেখে, তোমাদের জ্ঞানের আকাঙ্খায় তাদের রক্ত শুকিয়ে যায়। অক্ষম দুর্ব্বল, মূর্খ, দুর্নীতিপরায়ণ তোমরাই যে তাদের বিলাস-ব্যসনের একমাত্র পাদপীঠ! তাই, মাত্র তোমাদের জীবনধারণটুকুর বেশি তিলার্দ্ধ যে তারা স্বেচ্ছায় কোনদিন দেবে না এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা কি তোমাদের এতই কঠিন! আর সেই কথা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করার অপরাধেই কি আজ এই গোরাগুলোর কাছে আমাদের লাঞ্ছনাই সার হবে! দরিদ্রের এই বাঁচবার লড়াইয়ে তোমরা কি সকল শক্তি দিয়ে যোগ দিতে পারবে না?

সর্দ্দার-গোরা এদেশে যেটুকু হিন্দি-ভাষায় জ্ঞানলাভ করিয়াছিল তাহাতে বক্তৃতার মর্ম্ম প্রায় কিছুই বুঝিল না, কিন্তু সমবেত শ্রোতৃবর্গের মুখে চোখে উত্তেজনার চিহ্ন

লক্ষ্য করিয়া নিজেও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার রিস্টওয়াচের প্রতি বক্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল, আর পাঁচ মিনিট মাত্র সময় আছে, আপনি শেষ করুন।

তলওয়ারকর কহিল, শুধু পাঁচ মিনিট! তার বেশী এক মুহূর্ত্তও নয়! তবুও এই অমূল্য ক'টি মিনিট আমি কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেব না। ভাই বঞ্চিতের দল! তোমাদের কাছে আমার মিনতি—আমাদের তোমরা অবিশ্বাস কোরো না। শিক্ষিত বলে, ভদ্র-বংশের বলে, কারখানায় দিন-মজুরি করিনি বলে আমাদের সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখে নিজেদের সর্ব্বনাশ তোমরা নিজেরাই করো না। তোমাদের ঘুম ভাঙাবার প্রথম শঙ্খধ্বনি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে আমরাই করে এসেচি। আজ হয়ত না বুঝতেও পার, কিন্তু নিশ্চয়ই জেনো এই পথের দাবীর চেয়ে বড় বন্ধু এদেশে তোমাদের আর কেউ নেই। তাহার কণ্ঠ শুষ্ক ও কঠিন হইয়া আসিতেছিল, তথাপি প্রাণপণে চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, আমি বহুদিন তোমাদের মধ্যে কাজ করে এসেচি, আমাদের তোমরা চেনো না, কিন্তু আমি তোমাদের চিনি। যাদের তোমরা মনিব বলে জানো, একদিন আমি তাদেরই একজন ছিলাম। তারা কিছুতেই তোমাদের মানুষ হ'তে দেবে না। কেবল পশুর মত করে রেখেই তোমাদের মনুষ্যত্বের অধিকার তারা আটকে রাখতে পারে, আর কোন মতেই না —এই কথাটা তোমাদের আজ না বুঝলেই নয়। তোমরা অসাধু, তোমরা উচ্ছৃঙ্খল, তোমরা ইন্দ্রিয়াশক্ত—তাদের মুখ থেকে এই সকল অপবাদই তোমরা চিরদিন শুনে এসেচ। তাই, যখনই তোমরা দাবী জানিয়েচ, তখনই তোমাদের সকল দুঃখ-কষ্টের মূলে তোমাদের অসংযত চরিত্রকে দায়ী করে তারা তোমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিকে নিবারিত করে এসেচে। কেবল এই মিথ্যেই তোমাদের তারা অনুক্ষণ বুঝিয়ে এসেচে, ভাল না হলে কারও উন্নতিই কোনদিন হতে পারে না। কিন্তু, আজ আমি তোমাদের অসঙ্কোচে একান্ত অকপটে জানাতে চাই ঐ উক্তি তাদের কখনই সম্পূর্ণ সত্য নয়। তোমাদের চরিত্রই শুধু তোমাদের অবস্থার জন্য দায়ী নয়; তোমাদের এই প্রবঞ্চিত হীন অবস্থাও তোমাদের চরিত্রের জন্য দায়ী। তাদের অসত্যকে আজ তোমাদের নির্ভয়ে প্রতিবাদ করতেই হবে। প্রবলকণ্ঠে তোমাদের ঘোষণা করতেই হবে কেবল টাকাই সবটুকু নয়। বলিতে বলিতে তাহার নীরস কণ্ঠ অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিল, কহিল, বিনাশ্রমে সংসারে কিছুই উৎপন্ন হয় না—তাই, শ্রমিকও ঠিক তোমাদেরই মত মালিক,—ঠিক তোমাদেরই মত সকল বস্তু, সকল কারখানার অধিকারী। এমনি সময়ে কে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সর্দ্দার-গোরার কানে কানে কি একটা কথা বলিতেই তাহার রক্ত-চক্ষু জ্বলন্ত অঙ্গারের মত উগ্র হইয়া উঠিল। সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, স্টপ! এ চলবে না। এতে শান্তি ভঙ্গ হবে।

অপূর্ব্ব চমকিয়া উঠিল। রামদাসের জামার খুঁট ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল,—থামো, রামদাস থামো। এই নিঃসহায় নির্বান্ধব বিদেশে যে তোমার স্ত্রী আছে,—তোমার ছোট্ট একফোঁটা মেয়ে আছে।

রামদাস কর্ণপাতও করিল না। চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, এরা অন্যায়-কারী! এরা ভীরু! সত্যকে এরা কোনমতেই তোমাদের শুনতে দিতে চায় না! কিন্তু এরা জানে সত্যকে গলা টিপে মারা যাবে না। সে চিরজীবী। সে অমর! গোরা ইহার অর্থ বুঝিল না। কিন্তু অকস্মাৎ সহস্র লোকের সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঠিকরিয়া আসিয়া যেন তীক্ষ্ণ উত্তাপের ঝাঁঝ তাহার মুখে লাগিল। সে হুঙ্কার দিয়া উঠিল, এ চলবে না। এ রাজদ্রোহ!

চক্ষের পলকে পাঁচ-ছয়জন ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া রামদাসের দুই হাত ধরিয়া তাহাকে সবলে টানিয়া নীচে নামাইল তাহার দীর্ঘ দেহে ঘোড়া ও ঘোড়-সওয়ারের মাঝখানে এক মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল, কিন্তু তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠস্বর তাহার কিছুতেই চাপা পড়িল না—এই বিক্ষুব্ধ বিপুল জনতার একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতে লাগিল,—ভাইসকল, কখনো হয়ত আর আমাকে দেখবে না, কিন্তু মানুষ হয়ে জন্মাবার মর্য্যাদা যদি না মনিবের পায়ে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে থাকো ত এত বড় উৎপীড়ন, এত বড় অপমান তোমরা সহ্য ক'রো না।

কিন্তু তাহার কথা শেষ না হইতেই যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। ঘোড়া ছুটিল, চাবুক চলিল এবং অবমানিত অভিভূত সন্ত্রস্ত শ্রমিকের দল উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে কে যে কাহার ঘাড়ে পড়িল এবং কে যে কাহার পদতলে গড়াইতে লাগিল তাহার ঠিকানা রহিল না।

জনকয়েক দলিত পিষ্ট আহত লোক ছাড়া সমস্ত মাঠ জনশূন্য হইতে বিলম্ব ঘটিল না। কোন মতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে যাহারা তখনও চলিয়াছিল তাহাদেরই প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া সুমিত্রা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন এবং তাহারই অনতিদূরে বসিয়া অপূর্ব্ব ও আর একজন নির্ব্বাক নতমুখে তেমনি বিমূঢ়ের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল।

যে ব্যক্তি গাড়ি ডাকিতে গিয়াছিল, মিনিট-দশেক পরে গাড়ি লইয়া আসিলে সুমিত্রা নিঃশব্দে ভারতীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে গিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। নিজে হইতে কথা না কহিলে তাঁহার চিন্তার ব্যাঘাত করিতে কেহ তাঁহাকে ব্যর্থ প্রশ্ন করিত না। বিশেষতঃ আজ তিনি অসুস্থ, শ্রান্ত এবং উৎপীড়িত।

ভারতী ফিরিয়া আসিয়া কহিল, চলুন।

অপূর্ব্ব মুখ তুলিয়া চাহিল, ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় আমাকে যেতে বলেন?

ভারতী কহিল, আমার বাড়িতে।

অপূর্ব্ব কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল। শেষে আস্তে আস্তে বলিল, আপনারা ত জানেন সমিতির আমি অযোগ্য। ওখানে আর ত আমার ঠাঁই হতে পারে না।

ভারতী প্রশ্ন করিল, তাহলে কোথায় এখন যাবেন? বাসায়?

বাসায়? একবার যেতে হবে,—এই বলিয়াই অপূর্ব্বর চক্ষু সজল হইয়া আসিল; তাহা কোনমতে সংবরণ করিয়া বলিল, কিন্তু এই বিদেশে আর একটা জায়গায় যে কি করে যাব আমি ভেবে পাইনে ভারতী!

সুমিত্রা গাড়ির মধ্যে হইতে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা এসো।

ভারতী পুনশ্চ কহিল, চলুন।

অপূর্ব্ব ঘাড় নাড়িয়া বলিল; পথের দাবীতে আমার স্থান নেই।

ভারতী হঠাৎ যেন তাহার হাত ধরিতে গেল, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া এক মুহূর্ত্ত তাহার মুখের 'পরে দুই চক্ষের সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চুপি চুপি কহিল, পথের দাবীতে স্থান নাও থাকতে পারে, কিন্তু আর একটা দাবী থেকে আপনাকে স্থানচ্যুত করতে পারে সংসারে এমন ত কিছুই নেই, অপূর্ব্ববাবু!

গাড়ি হইতে সুমিত্রা পুনশ্চ অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমাদের আসতে কি দেরি হবে ভারতী?

ভারতী হাত নাড়িয়া গাড়োয়ানকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া কহিল, আপনি যান, এটুকু আমরা হেঁটেই যাব।

পথে চলিতে চলিতে অপূর্ব্ব হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তুমি আমার সঙ্গে চল ভারতী!

ভারতী কহিল, সঙ্গেই ত যাচ্ছি।

অপূর্ব্ব বলিল, সে নয়। তলওয়ারকরের স্ত্রীর কাছে আমি কি করে যাব, কি গিয়ে তাকে বলব, কি তাঁর উপায় করব আমি ত কোন মতেই ভেবে পাইনে। রামদাসকে এখানে সঙ্গে আনবার দুর্ব্বুদ্ধি আমার কেন হল?

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব্ব কহিতে লাগিল, এই বিদেশে হঠাৎ কি সর্ব্বনাশই হয়ে গেল! আমি ত কূল-কিনারা দেখতে পাইনে।

ভারতী কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিল না। উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিবার পরে অপূর্ব্ব উপায়হীন দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া সহসা গর্জ্জিয়া উঠিল, আমার দোষ কি? বার বার সাবধান করে দিলেও কেউ যদি গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলে তাকে বাঁচাবো আমি কি করে? আমি কি বলেছিলাম যা তা বক্তৃতা দিতে। স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে, ঘর-সংসার আছে এ হুঁস যার নেই সে মরবে না তো মরবে কে? খাটুক আবার দু-বছর জেল!

ভারতী বলিল, আপনি কি তাঁর স্ত্রীর কাছে এখন যাবেন না?

অপূর্ব্ব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, যেতে হবে বই কি। কিন্তু সাহেবকেই বা কাল কি জবাব দেব? তোমাকে কিন্তু বলে রাখচি ভারতী, সাহেব একটা কথা বললেই আমি চাকরি ছেড়ে দেব।

দিয়ে কি করবেন?

বাড়ি চলে যাব। এদেশে মানুষ থাকে?

ভারতী বলিল, তাঁর উদ্ধারেরও চেষ্টাও করবেন না?

অপূর্ব্ব থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল না একজন ভাল ব্যারিস্টারের কাছে যাই ভারতী। আমার প্রায় এক হাজার টাকা আছে,—এতে হবে না? আমার ঘড়িটড়ি-গুলো বিক্রী করলে হয়ত আরও পাঁচ-ছ'শ টাকা হবে। চল না যাই।

ভারতী বলিল, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কাছে যাওয়া যে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন অপূর্ব্ববাবু। আমার সঙ্গে আর যাবেন না, এইখান থেকেই একটা গাড়ি নিয়ে স্টেশনে চলে যান, তাঁর কি চাই, কি অভাব, অন্ততঃ একটা খবর দেওয়া যে বড় দরকার।

অপূর্ব্ব ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল; কিন্তু তথাপি সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে লাগিল। ভারতী বলিল, এটুকু আমি একাই যেতে পারব, আপনি ফিরুন।

জবাব দিতে বোধ হয় অপূর্ব্বর বাধিতেছিল, কিন্তু ক্ষণেক মাত্র। তাহার পরেই কহিল, আমি একলা যেতে পারব না।

ভারতী বলিল, বাসা থেকে তেওয়ারীকে না হয় সঙ্গে নেবেন।

না, তুমি সঙ্গে চল।

আমার যে জরুরি কাজ আছে।

তা হোক, চল।

কিন্তু কেন আমাকে এত করে জড়াচ্ছেন অপূর্ব্ববাবু?

অপূর্ব্ব চুপ করিয়া রহিল।

ভারতী তার মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিল, কহিল, আচ্ছা চলুন আমার সঙ্গে। নিজের কাজটুকু আগে সেরে নিই।

পথের মধ্যে ভারতী সহসা একসময়ে কহিল, যে আপনাকে চাকরি করতে বিদেশে পাঠিয়েচে সে আপনাকে চেনে না। তিনি মা হলেও, না। তেওয়ারী দেশে যাচ্চে, আমি নিজে গিয়ে উদ্যোগ করে তার সঙ্গে আপনাকেও বাড়ি পাঠিয়ে দেব।

অপূর্ব্ব মৌন হইয়া রহিল। ভারতী বলিল, কই, উত্তর দিলেন না যে বড়?

অপূর্ব্ব কহিল, উত্তর দেবার কিছু ত নেই। মা বেঁচে না থাকলে আমি সন্ন্যাসী হতুম।

ভারতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, সন্ন্যাসী? কিন্তু মা তো বেঁচে আছেন!

অপূর্ব্ব কহিল, হ্যাঁ। দেশের পল্লীগ্রামে আমাদের একটা ছোট বাড়ি আছে, মাকে আমি সেইখানেই নিয়ে যাব!

তারপরে?

আমার যে এক হাজার টাকা আছে তাই দিয়ে একটা ছোট মুদির দোকান খুলবো। আমাদের দুজনের চলে যাবে।

ভারতী কহিল, তা যেতে পারে। কিন্তু হঠাৎ এর দরকার হল কিসে?

অপূর্ব্ব বলিল, আজ আমি নিজেকে চিনতে পেরেছি। শুধু মা ছাড়া সংসারে আমার দাম নেই। ভগবান করুন এর বেশি যেন না আমি কারো কাছে কিছু চাই।

ভারতী পলকমাত্র তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা আপনাকে বুঝি বড্ড ভালবাসেন?

অপূর্ব্ব কহিল, হ্যাঁ। চিরকাল মার দুঃখে দুঃখেই কাটলো, কেবল ভয় হয় তা আর যেন না বাড়ে। আমার সকল কাজে-কর্ম্মে আমার আধখানা যেন মা হয়ে আমার আর আধখানাকে দিবারাত্রি আঁকড়ে ধরে থাকে। এ থেকে আমি এক মুহূর্ত্ত ছাড়া পাইনে, ভারতী, তাই আমি ভীতু, তাই আমি সকলের অশ্রদ্ধার পাত্র। এই বলিয়া তাহার মুখ দিয়া সহসা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

ইহার জবাব ভারতী দিল না, কেবল হাতখানি তাহার ধীরে ধীরে অপূর্ব্বর হাতের মধ্যে ধরা দিয়া নীরবে পথ চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, অপূর্ব্ব উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, রামদাসের পরিবারের কি উপায় করবে ভারতী? শুধু দাসী ছাড়া এদেশে তাদের দেশের লোক বোধ করি কেউ নেই। থাকলেই বা কেউ কি তাদের ভার নেবে?

ভারতী নিজেও কিছু ভাবিয়া পায় নাই, শুধু সাহস দেবার জন্যই কহিল, চলুন ত গিয়ে দেখি। উপায় একটা হবেই।

অপূর্ব্ব বুঝিল ইহা ফাঁকা কথা। তাহার মন কোন সান্ত্বনাই মানিল না, কহিল, তোমাকে হয়ত সেখানে থাকতে হবে।

কিন্তু আমি ত ক্রীশ্চান, তাঁদের কি কাজেই বা লাগবো?

তা বটে। কথাটা নূতন করিয়া অপূর্ব্বর বিঁধিল।

উভয়ে বাসায় আসিয়া যখন পৌছিল তখন সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। এই রাত্রে কেমন করিয়া যে কি হইবে চিন্তা করিয়া মনে মনে তাহাদের ভয় ও উদ্বেগের সীমা ছিল না। নীচের ঘর খোলা ছিল, ভিতরে পা দিয়াই ভারতী দেখিতে

পাইল ওদিকের খোলা জানালার ধারে ইজিচেয়ারে কে একজন শুইয়া আছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিতেই ভারতী চিনিতে পারিয়া উল্লাসে কলরব করিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু, কখন এলেন আপনি? সুমিত্রাদিদির সঙ্গে দেখা হয়েচে?

না।

অপূর্ব্ব কহিল, ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে ডাক্তারবাবু, আমাদের একাউন্টেন্ট রামদাস তলওয়ারকরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

ভারতী বলিল, ইন্‌সিনে তাঁর বাসা। সেখানে স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে, তাঁরা এখনও কিছুই জানেন না।

অপূর্ব্ব বলিল, অত দূরে এই অন্ধকার রাতে—কি ভয়ানক বিপদই ঘটলো ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার হাই তুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া হাসিলেন, ভারতীকে কহিলেন, আমি বড় শ্রান্ত, আমাকে একটু চা তৈরী করে খাওয়াতে পারো ভাই?

ভারতী বলিল, পারি, কিন্তু আমাদের যে এখুনি বেরোতে হবে ডাক্তারবাবু।

কোথায়?

ইন্‌সিনে। তলওয়ারকরবাবুর বাসায়।

কোন প্রয়োজন নেই।

অপূর্ব্ব সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, প্রয়োজন নেই কি রকম ডাক্তারবাবু? তাঁর বিপন্ন পরিবারের ব্যবস্থা করা, অন্ততঃ একটা খোঁজ-খবর নেওয়া ত প্রয়োজন বলেই মনে হয়।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সে ভার আমার; আপনারা বড় জোর এই অন্ধকারে সারারাত্রি ধরে ইন্‌সিনের বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পারবেন,—শেষ পর্য্যন্ত হয়ত বাড়িটাও চিনে বার করতে পারবে না। এই বলিয়া তিনি পুনরায় হাস্য করিয়া কহিলেন, তাঁর চেয়ে বরঞ্চ আপনি বসুন, এবং ভারতী চা তৈরী করে আনুক। কিন্তু আপনার বুঝি চলে না? তা বেশ, হোটেলের বামুনঠাকুর পবিত্রভাবে কিছু খাবার তৈরী করে দিয়ে যাক, আহারাদি করে বিশ্রাম করুন।

ভারতী নিশ্চিন্ত ও প্রফুল্লচিত্তে চা তৈরী করিতে উপরে যাইতেছিল, কিন্তু অপূর্ব্ব কিছুই বিশ্বাস করিল না। ডাক্তারের সমস্ত কথা-বার্ত্তাই তাহার কাছে হেঁয়ালির মত ঠেকিয়া অতিশয় খারাপ বোধ হইল। ভারতীকে উদ্দেশ করিয়া ক্ষুন্নকণ্ঠে বলিল, এই রাত্রে কষ্ট করা থেকে তুমি বেঁচে গেলে, কিন্তু আমার দায়িত্ব ঢের বেশি। যত রাত্রিই হোক আমাকে সেখানে যেতেই হবে।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া ভারতী থমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তখনই ডাক্তারের চোখের দিকে চাহিয়া স্বচ্ছন্দমনে কাজে চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু একখণ্ড মোমবাতি জ্বালাইয়া পকেট হইতে কয়েকখানা চিঠি বাহির করিয়া জবাব লিখিতে বসিলেন। মিনিট-দশেক নীরবে অপেক্ষা করিয়া অপূর্ব্ব বিরক্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, চিঠিগুলো কি অত্যন্ত জরুরি?

ডাক্তার মুখ না তুলিয়া কহিলেন, হ্যাঁ।

অপূর্ব্ব বলিল, ওদিকে একটা ব্যবস্থা হওয়াও ত কম জরুরি নয়। আপনি কি তাঁর বাসায় কাউকে পাঠাবেন না?

ডাক্তার কহিলেন, এত রাত্রে? কাল সকালের পূর্ব্বে বোধ হয় আর লোক পাওয়া যাবে না।

অপূর্ব্ব বলিল, তাহলে তার জন্যে আর আপনি চিন্তিত হবেন না, সকালে আমি নিজেই যেতে পারবো। ভারতীকে নিষেধ না করলে আমরা যেতে পারতাম এবং আমার মনে হয় সেইটেই সবচেয়ে ভাল হতো।

ডাক্তারের চিঠি লেখায় বাধা পড়িল না, কারণ তিনি মুখ তুলিবারও অবকাশ পাইলেন না, শুধু বলিলেন, আবশ্যক ছিল না।

অপূর্ব্ব অন্তরের উষ্মা যথাসাধ্য চাপিয়া কহিল, আবশ্যকতার ধারণা এ ক্ষেত্রে আপনার এবং আমার এক নয়। আমার সে বন্ধু।

ভারতী চায়ের সরঞ্জাম লইয়া নীচে আসিল এবং পেয়ালা দুই চা তৈরী করিয়া দিয়া কাছে বসিল। ডাক্তারের চিঠি লেখা এবং চা খাওয়া দুই কাজই একসঙ্গে চলিতে লাগিল। মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে কাটিবার পরে সহসা ভারতী অভিমানের সুরে বলিয়া উঠিল, আপনি সদাই ব্যস্ত। দুদণ্ড যে আপনার কাছে বসে কথা শুনবো সে সময়টুকুও আমরা পাইনে।

ডাক্তারের অন্যমনস্ক কানের মধ্যে গিয়া রমণীর এই অভিমানের সুর বাজিল, তিনি চায়ের পেয়ালা হইতে মুখ সরাইয়া হাসিমুখে কহিলেন, করি কি ভাই, এই দুটোর ট্রেনেই আবার রওনা হতে হবে।

সংবাদ শুনিয়া ভারতী চকিত হইল এবং অপূর্ব্ব মনের সংশয় তাহার বন্ধুর সম্বন্ধে একেবারে ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, একটা রাতও কি আপনি বিশ্রামের অবকাশ পাবেন না ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া কহিলেন, আমার শুধু একটি দিনের অবসর আছে ভাই ভারতী, সে কিন্তু আজও আসেনি।

ভারতী বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কবে আসবে?

ডাক্তার ইহার উত্তর দিলেন না।

অপূর্ব্বর মনের মধ্যে কেবল একটা কথা তোলা-পাড়া করিতেছিল, সে তাহারই সূত্র ধরিয়া বলিল, সমিতির সভ্য না হয়েও রামদাস যে শাস্তি ভোগ করতে যাচ্চে তা অসাধারণ।

ডাক্তার কহিলেন, শাস্তি নাও হতে পারে।

অপূর্ব্ব কহিল, না হয় ত সে তার ভাগ্য। কিন্তু যদি হয় সমস্ত অপরাধ আমার। আমিই তাকে এনেছিলাম।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু মুচকিয়া হাসিয়া চুপ করিলেন।

অপূর্ব্ব কহিতে লাগিল, দেশের জন্য যে ব্যক্তি দু বছর জেল খেটেছে, অসংখ্য বেতের দাগ যার পিঠ থেকে আজও মোছেনি, এই বিদেশে স্ত্রী-পুত্র যার শুধু তারই মুখ চেয়ে আছে তার এতবড় সাহস অসামান্য। ওর আর তুলনা নেই।

তাহার বন্ধুর প্রতি উচ্ছ্বসিত এই অকৃত্রিম প্রশংসা-বাক্যের মধ্যেও একটা গোপন আঘাত ছিল, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। ডাক্তার মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, তাতে আর সন্দেহ কি অপূর্ব্ববাবু। পরাধীনতার আগুনে বুকের মধ্যে যার আহোরাত্র জ্বলে যাচ্ছে, এ ছাড়া তার তো উপায় নেই! সাহেবের দোকানের বড় চাকরি বা ইন্‌সিনের বাসায় স্ত্রী-পুত্র-পরিবার কিছুই তাকে ঠেকাতে পারে না,—এই তার একটিমাত্র পথ।

দুশ্চিন্তা ও তীব্র সংশয়ে অপূর্ব্বর বুদ্ধি ও জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া না থাকিলে সে এত বড় ভুল করিতে পারিত না। ডাক্তারের উক্তিকে সে শ্লেষ কল্পনা করিয়া হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া গেল। কহিল, আপনি তাঁর মহত্ত্ব অনুভব না করতে পারেন, কিন্তু সাহেবের দোকানের চাকরি তলওয়ারকরের মত মানুষকে ছোট করে দিতে পারে না। আমাকে আপনি যত ইচ্ছে ব্যঙ্গ করুন, কিন্তু রামদাস কোন অংশেই আপনার ছোট নয়। এ আপনি নিশ্চিত জানবেন।

ডাক্তার আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, আমি নিশ্চিতই জানি। তাঁকে আমি ছোট বলিনি অপূর্ব্ববাবু!

অপূর্ব্ব কহিল, বলেচেন। তাঁকে এবং আমাকে আপনি পরিহাস করেচেন। কিন্তু আমি জানি জন্মভূমি তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়! সে নির্ভীক! সে বীর! আপনার মত সে লুকিয়ে বেড়ায় না। আপনার মত পুলিশের ভয়ে ছদ্মবেশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে না। আপনি ত ভীরু।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে ভারতী অবাক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর সে সহিতে পারিল না। দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আপনি কাকে কি বলছেন অপূর্ব্ববাবু? হঠাৎ পাগল হয়ে গেলেন কি?

অপূর্ব্ব কহিল, না পাগল হইনি। উনি যেই হোন, রামদাস তলওয়ারকরের পদধূলির যোগ্য ন'ন, একথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলব। তার তেজ, তার বাগ্মিতা, তার নির্ভীকতাকে ইনি মনে মনে ঈর্ষা করেন। তাই তোমাকে যেতে দিলেন না, তাই আমাকে কৌশলে বাধা দিলেন।

ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইল। আপনাকে অপরিসীম যত্নে সংযত করিয়া সহজকণ্ঠে কহিল, আপনাকে আমি অপমান করতে পারব না, কিন্তু এখান থেকে আপনি যান অপূর্ব্ববাবু। আপনাকে আমরা ভুল বুঝেছিলাম। ভয়ে যার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, সে উন্মাদের এখানে ঠাঁই নেই। আপনার কথাই সত্য, পথের দাবীতে আপনার স্থান হবে না। এর পরে আর কোন ছলে কোনদিন আমার বাসায় ঢোকবার চেষ্টা করবেন না।

অপূর্ব্ব নিরুত্তরে উঠিয়া দাঁড়াইতেই ডাক্তার তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, আর একটু বসুন অপূর্ব্ববাবু, এই অন্ধকারে একলা যাবেন না। আমি স্টেশনে যাবার পথে আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাব।

অপূর্ব্বর চেতনা ফিরিয়া আসিতেছিল, সে পুনরায় অধোমুখে বসিয়া পড়িল।

ভুক্তাবশিষ্ট বিস্কুটগুলি ডাক্তার পকেটে পুরিতেছিলেন দেখিয়া ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, ওকি হচ্চে আপনার?

রসদ সংগ্রহ করে রাখচি ভাই।

সত্য সত্যই আজ রাত্রে যাবেন না কি?

নইলে কি মিথ্যামিথ্যিই অপূর্ব্ববাবুকে ধরে রাখলাম? সবাই মিলে এমন অবিশ্বাস করলে আমি বাঁচি কি করে বল ত? এই বলিয়া তিনি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিতে ভারতী অভিমান করিয়া কহিল, আজ আপনার যাওয়া হবে না, আপনি বড় ক্লান্ত। তা ছাড়া সুমিত্রাদিদি অসুস্থ, আপনি কেবলি কোথায় চলে যাবেন,—একটা কথা শুনতে পাইনে, একটা উপদেশ নিতে পাইনে, পথের দাবী একলা আমি চালাই কি করে বলুন ত? আমিও তাহলে যেখানে খুশি চলে যাব।

লেখা চিঠিগুলি ডাক্তার তাহার হাতে দিয়া হাসিয়া কহিলেন, একখানি তোমার, একখানি সুমিত্রার, অন্যখানি তোমাদের পথের দাবীর! আমার উপদেশ বল, আদেশ বল, সবই এর মধ্যে পাবে।

চিঠিগুলি মুঠোর মধ্যে লইয়া ভারতী মুখ মলিন করিয়া বলিল, এবার কি আপনি বেশিদিনের জন্যে যাচ্চেন?

দেবা ন জানন্তি,—বলিয়া ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন।

ভারতী কহিল, আমাদের মুস্কিল হয়েচে, না মুখ দেখে, না কথা শুনে আপনার মনের কথা জানবার জো আছে। ঠিক করে বলে যান কবে ফিরবেন?

ঐ-যে বললাম, দেব না জানন্তি—

না তা হবে না, সত্যি করে বলুন কবে ফিরবেন?

এত তাগাদা কেন বলত?

ভারতী কহিল, কি জানি এবার কেমন যেন ভয় করচে। মনে হচ্চে যেন সব ভেঙে-চুরে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। বলিতে বলিতে সহসা তাহার চক্ষু অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া ডাক্তার রহস্যভরে কহিলেন, হবে না গো, হবে না,—সব ঠিক হয়ে যাবে। বলিয়াই হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, কিন্তু এই মানুষটির সঙ্গে এমন মিছি-মিছি ঝগড়া করলে কিন্তু সতিাই কাঁদতে হবে তা বলে রাখচি। অপূর্ব্ববাবু রাগ করেন বটে, কিন্তু ভাল যাকে বাসেন তাকে ভালবাসতেও জানেন। মানুষের মধ্যে যে হৃদয়বস্তুটি আছে সে আমাদের সংসর্গে এখনো শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়নি। ফুটন্ত পদ্মটির মত ঠিক তাজা আছে।

ভারতী কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু অপূর্ব্ব হঠাৎ মুখ তুলিতেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ বন্ধ হইয়া গেল।

এমন সময়ে দ্বারের কাছে আসিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ি থামিল এবং অনতিকাল মধ্যেই দুইজন লোক প্রবেশ করিল। একজনের পরিধানে আগাগোড়া সাহেবী পোষাক, ডাক্তার ভিন্ন বোধ করি সকলেরই অপরিচিত; আর একজন রামদাস তলওয়ারকর। অপূর্ব্বর মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কলরব করিয়া সে বন্ধুকে সংবর্দ্ধনা করিতে গেল না। রামদাস অগ্রসর হইয়া ডাক্তারের পদধূলি গ্রহণ করিল। অপূর্ব্বর কাছে ইহা অদ্ভুত ঠেকিল। কিন্তু ডাক্তারের মুখের প্রতি সে শুধু নীরবে নেত্রপাত করিয়া নীরব হইয়াই রহিল।

ইংরাজি পোষাক পরা লোকটি ইংরাজীতেই কথা কহিলেন, বলিলেন, জামিনের জন্যই এত বিলম্ব ঘটিল। কেস বোধ হয় গভর্ণমেণ্ট চালাবে না।

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তার মানে গভর্ণমেণ্টকে তুমি আজও চেননি কৃষ্ণ আইয়ার।

এই কথায় রামদাস সহাস্যে যোগ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাঠ থেকে থানা পর্য্যন্ত আপনাকে সকল সময়েই সঙ্গে দেখেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ কখন যে অন্তর্হিত হয়েছিলেন সেইটাই জানতে পারিনি।

ডাক্তার হাসিমুখে কহিলেন, অন্তর্দ্ধানের গভীর কারণ ঘটেছিল রামদাসবাবু।

এমন কি রাতারাতি এখান থেকেও অন্তর্হিত হতে হ'ল। রামদাস কহিল, সেদিন রেলওয়ে স্টেশনে আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম।

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, জানি। কিন্তু সোজা বাসায় না গিয়ে এত রাত্রে এখানে কেন?

রামদাস কহিল, আপনাকে প্রণাম করতে। পুনার সেণ্ট্রাল জেলে আমি যাবার পরেই আপনি চলে গেলেন। তখন সুযোগ পাইনি। নীলাকান্ত যোশীর কি হ'ল জানেন? সে তো আপনার সঙ্গে ছিল।

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হ্যাঁ। ব্যারাকের পাঁচিল টপকাতে পারলে না বলে সিঙ্গাপুরে তার ফাঁসি হ'ল।

অপূর্ব্বর কাছে এই সকল অচিন্ত্যনীয়, অদ্ভুত দুঃস্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। সে আর থাকিতে না পারিয়া অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু, আপনারও কি তাহলে ফাঁসি হতো?

ডাক্তার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। এই হাসি দেখিয়া অপূর্ব্বর মাথার চুল পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল।

রামদাস উৎসুক হইয়া কহিল, তার পরে?

ডাক্তার বলিলেন, একবার এই সিঙ্গাপুরেই আমাকে বছর তিনেক আটক থাকতে হয়েছিল, কর্ত্তৃপক্ষরা আমাকে চেনেন। তাই সোজা-রাস্তাটা এড়িয়ে ব্যাঙ্ককের পথে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে টেভয়ে এসে পৌঁছুলাম। জোর কপাল! হঠাৎ বনের মধ্যে একটা হাতীর বাচ্চাও ভগবান পাইয়ে দিলেন। সেটা সঙ্গে থাকায় বরাবর ভারি সুবিধে হয়ে গেল। শেষে হাতীর বাচ্চা বিক্রী করে দেশী জাহাজে নারকেল চালানের সঙ্গে নিজেকে চালান দিয়ে মাস তিনেকের মধ্যে একেবারে আরাকানে এসে পাড়ি জমালাম। খাসা থাকা গিয়েছিল রামদাসবাবু, হঠাৎ থানার মধ্যে আজ পরম বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা সাক্ষাৎ। ভি. এ. চেলিয়া তাঁর নাম, বড্ড স্নেহ করেন আমাকে। বহুদিনের অদর্শনে খুঁজতে খুঁজতে একেবারে সিঙ্গাপুর থেকে বর্ম্মা মুলুকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভাবে বোধ হয় খোঁজ পেয়েচেন। তবে, ভিড়ের মধ্যে তেমন নজর দিতে পারেননি, নইলে পৈতৃক গলাটার,—এই বলিয়া তিনি হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে গিয়া অকস্মাৎ অপূর্ব্বর মুখের দিকে চাহিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিলেন,—ও কি অপূর্ব্ববাবু? কি হ'ল আপনার?

অপূর্ব্ব দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া আপনাকে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। তাঁহার কথা শেষ না হইতেই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সবেগে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

১৮

অপূর্ব্বর এমন করিয়া বাহির হইয়া যাওয়াটা সকলকেই বিস্মিত করিল। ঘরে আলো বেশি ছিল না, কিন্তু তাহার অস্বাভাবিক মুখের ভাব ও অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠস্বর যেন অতিশয় বে-মানান দেখাইল। ব্যারিস্টার কৃষ্ণ আইয়ার ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে ডাক্তার? অত্যন্ত সেন্টিমেণ্টাল! তাঁহার শেষ কথাটার উপরে স্পষ্ট একটা অভিযোগের খোঁচা ছিল। অর্থাৎ, এসকল লোক এখানে কেন?

ডাক্তার শুধু একটুখানি হাসিলেন, কিন্তু তাড়াতাড়ি এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন তলওয়ারকর! কহিলেন, ইনি মিস্টার হালদার—অপূর্ব্ব হালদার। এক অফিসে আমরা কাজ করি, আমার সুপিরিয়র অফিসর। একটু থামিয়া সশ্রদ্ধ স্নেহের সহিত বলিলেন, কিন্তু আমার একান্ত অন্তরঙ্গ,—আমার পরম-বন্ধু। সেন্টিমেণ্টাল? ই—য়েস ডাক্তারবাবু, আপনি বোধ করি হালদারের রেঙ্গুনের প্রথম অভিজ্ঞতার গল্প শোনেননি? সে এক—

সহসা ভারতীর প্রতি চোখ পড়িতেই তিনি সলজ্জে থামিয়া গিয়া কহিলেন, সে যাই হোক, প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই কিন্তু আমরা বন্ধু,—বাস্তবিক পরম-বন্ধু।

তলওয়ারকরের ব্যগ্রতায় ও বিশেষ করিয়া তাঁহার পরম-বন্ধু শব্দটার পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে সেন্টিমেণ্টালিস্‌মের প্রতি খোঁচা দিতে ব্যারিস্টার সাহেব আর সাহস করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখের চেহারাটা যেন সন্দিগ্ধ এবং অপ্রসন্ন হইয়া রহিল।

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, সেন্টিমেণ্ট জিনিসটা নিছক মন্দ নয় কৃষ্ণ আইয়ার। এবং সবাই তোমার মত শক্ত পাথর না হ'লেই চলবে না মনে করাও ঠিক নয়।

কৃষ্ণ আইয়ার খুশী হইলেন না, বলিলেন, তা আমি মনেও করিনি; কিন্তু এটুকু মনে করাও বোধ হয় দোষের নয় ডাক্তার, এই ঘরটা ছাড়াও তাঁদের চলে বেড়াবার যথেষ্ট প্রশস্ত জায়গা পৃথিবীতে খোলা আছে।

তলওয়ারকর মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন। যাঁহাকে তিনি পরম-বন্ধু বলিয়া বারংবার অভিহিত করিতেছেন তাঁহাকে তাঁহারাই সম্মুখে অবাঞ্ছিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কহিলেন, মিস্টার আইয়ার, অপূর্ব্ববাবুকে আমি চিনি। আমাদের মন্ত্রে দীক্ষা তাঁর বেশি দিনের নয় সত্য, কিন্তু বন্ধুর অভাবিত মুক্তিতে সামান্য বিচলিত হওয়া আমাদের পক্ষেও মারাত্মক অপরাধ নয়। সংসারে চলে বেড়াবার স্থান অপূর্ব্ববাবুর যথেষ্টই আছে এবং আশা করি এ-ঘরেও স্থান তাঁর কোনদিন সঙ্কীর্ণ হবে না।

কৃষ্ণ আইয়ার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আজ অপূর্ব্বকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু ডাক্তার তাঁহার স্বাভাবিক শান্তির সহিত কহিলেন, নিশ্চয় হবে না তলওয়ারকর, নিশ্চয় হবে না। এই বলিয়া তিনি উপস্থিত সকলের মুখের প্রতি ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ভারতীকেই যেন বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কিন্তু এই বন্ধুত্ব জিনিসটা সংসারে কতই না ক্ষণভঙ্গুর ভারতী! একদিন যার সম্বন্ধে মনে করাও যায় না, আর একদিন কতটুকু ছোট্ট কারণেই না তার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ হয়ে যায়। সেটাও দুনিয়ায় অস্বাভাবিক নয় তলওয়ারকর, তার জন্যেও প্রস্তুত থাকা ভাল। মানুষ বড় দুর্ব্বল কৃষ্ণ আইয়ার, বড় দুর্ব্বল! তখন এই সেন্টিমেণ্টের দরকার হয় তার ধাক্কা সামলাতে।

এই সকল কথার উত্তর দিবার কিছু নাই; প্রতিবাদ করাও চলে না; উভয়েই মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু ভারতীর মুখ ম্লান হইয়া উঠিল। ডাক্তারের প্রতি তাহাদের অবিচলিত ও অসীম শ্রদ্ধা, অহেতুক একটি বাক্যও উচ্চারণ করা তাঁহার স্বভাব নয়, এ সত্য ভারতী ভাল করিয়াই জানে, কিন্তু কি এবং কাহাকে ইঙ্গিত করিয়া যে এ-কথা তিনি কহিলেন, এবং ঠিক কি ইহার তাৎপর্য্য তাহা ধরিতে না পারিয়া মনের মধ্যেটা তাহার শুধু উদ্বেগ ও আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ডাক্তার সম্মুখের ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন, আমার ত ক্রমশঃ যাবার সময় হয়ে এলো ভারতী, আজ রাত্রের গাড়িতে আমি চললাম তলওয়ারকর।

কোথায় এবং কি জন্য নিজে হইতে না বলিলে এরূপ অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশের বিধি ইহাদের নাই। একমুহূর্ত্ত জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া থাকিয়া তলওয়ারকর প্রশ্ন করিল, আমার প্রতি আপনার কি আদেশ?

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, আদেশই বটে! কিন্তু একটা কথা। বর্ম্মায় স্থানাভাব যদি হয়ও, নিজের দেশে হবে না তা নিশ্চয়। শ্রমিকের দিকে একটু দৃষ্টি রেখো।

তলওয়ারকর ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। আবার কবে দেখা হবে?

ডাক্তার কহিলেন, নীলকান্ত যোশীর শিষ্য তুমি, এ আবার কি প্রশ্ন তলওয়ারকর।

তলওয়ারকর চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার পুনশ্চ কহিলেন, আর দেরি করো না যাও,—বাসায় পৌঁছুতে প্রায় ভোর হয়ে যাবে! প্র্যাকটিস্ তাহলে এখানেই স্থির করলে কৃষ্ণ আইয়ার?

কৃষ্ণ আইয়ার মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। ভাড়াটে গাড়ি বাহিরে অপেক্ষা করিয়াছিল, দুজনে বাহির হইবার সময়ে তলওয়ারকর কেবল একবার কহিল, অন্ধকারে অপূর্ব্ববাবু কোথায় চলে গেলেন একবার দেখা হ'ল না।

কিন্তু এ কথার উত্তর দেওয়া বোধ করি কেহ প্রয়োজন মনে করিলেন না।

কিছুক্ষণেই বাহিরে গাড়ির শব্দে বুঝা গেল তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তখন ডাক্তার বলিলেন, তোমার কি মনে হয় অপূর্ব্ব বাসায় চলে গেছে?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না, খুব সম্ভব আশে-পাশে কোথাও আছেন, একটু খুঁজে দেখলেই পাওয়া যাবে। আপনার সঙ্গে আর একবার দেখা না ক'রে তিনি কখনো যাবেন না।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তাহলে দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই এ কাজটা তার সেরে নেওয়া আবশ্যক। তার বেশি ত আমি সময় দিতে পারব না ভাই!

না, এর মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন, এই বলিয়া ভারতী শুধু যে কেবল উপস্থিত মত ডাক্তারের কথার একটা জবাব দিল তাই নয়, সে আপনাকে আপনি ভরসা দিল। একাকী এই অন্ধকারে অপূর্ব্ব কিছুতেই যাইবে না, অতএব কোথাও নিকটেই আছে এ বিষয়ে সে যেমন নিশ্চিত ছিল, তাহাদের অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন এই অতিমানবের বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে আর একবার সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লওয়ারও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও সে তেমনি নিঃসংশয় ছিল! নানা দিক দিয়া নানা কারণে আজ অপূর্ব্ব বহু অপরাধ জমা করিয়াছে, সময় থাকিতে তাহাকে দিয়াই সেগুলোর ক্ষালন করিয়া না লইয়াই বা ভারতী বাঁচে কি করিয়া? কিন্তু সেই অমূল্য স্বল্পকালটুকু বৃথায় শেষ হইয়া আসিতে লাগিল,—অপূর্ব্বর দেখা নাই! আঁধার দ্বার-পথে ভারতীর চঞ্চল চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া আসিল এবং উৎকর্ণ চিত্ত বাহিরে পরিচিত পদশব্দের প্রতীক্ষায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। কোথাও সে হাতের কাছেই আছে, একবার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া সে এক মুহূর্ত্তে খুঁজিয়া আনে, কিন্তু এতখানি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে আজ তাহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। ডাক্তার তাহার স্ট্র্যাপ-বাঁধা বোঁচকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাই তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ভারতী দেওয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল আর মিনিট পাঁচ-ছয়েক অধিক সময় নাই, কহিল, আপনি হেঁটেই যাবেন?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। দুটো কুড়ি মিনিটে সদর রাস্তার উপর দিয়ে খুব সম্ভব একটা ঘোড়ার গাড়ি ফিরে যাবে, চলতি গাড়ি—গণ্ডা-ছয়েক পয়সা ভাড়া দিলেই স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

ভারতী বলিল, পয়সা না দিলেও দেবে। কিন্তু যাবার পূর্ব্বে সুমিত্রাদিদিকে একবার দেখা দিয়ে যাবেন না? তিনি সত্যই পীড়িত।

ডাক্তার কহিলেন, আমি ত বলিনি তিনি অসুস্থ ন'ন। কিন্তু ডাক্তার না দেখালেই বা সারবে কি করে?

ভারতী বলিল, তাই যদি হয় ত আপনার চেয়ে বড় ডাক্তারই বা পৃথিবীতে আছে কে?

ডাক্তার রহস্তভরে জবাব দিলেন, তাহলেই হয়েচে! দীর্ঘ অভ্যাসে ও-বিদ্যে ত মন থেকে ধুয়ে-মুছে গেছেই, তা ছাড়া বসে বসে কারও চিকিৎসা করি সে সময়ই বা কই?

কথা তাঁহার শেষ না হইতেই ভারতী বলিয়া উঠিল, সময় কই! সময় কই! কেউ মরে গেলেও সময় হবে না—এমনি দেশের কাজ? দেখুন ডাক্তারবাবু, বিদ্যে মুছে যাবার মন ও নয়; মুছে যদি সত্যিই কিছু গিয়ে থাকে ত সে দয়া-মায়া!

ডাক্তারের হাসি-মুখ কেবল মুহূর্ত্তের তরে গম্ভীর হইয়াই পুনরায় পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল। কিন্তু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি ভারতী সেই এক মুহূর্ত্তেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিল। তাহাদের ঘনিষ্ঠতা বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে সত্য, কিন্তু এদিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিবার অধিকার আজও তাহার ছিল না। বস্তুতঃ, সুমিত্রা কে, ডাক্তারের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ এবং কবে কি করিয়া সে যে এই দলভুক্ত হইয়া পড়িল অদ্যাবধি ভারতী তাহার কিছুই জানিত না। তাহাদের সম্প্রদায়ে ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়া একান্ত নিষিদ্ধ। সুতরাং অনুমান ভিন্ন সঠিক কিছুই জানিবার তাহার উপায় ছিল না। শুধু মেয়েমানুষ বলিয়াই সে সুমিত্রার মনোভাব উপলব্ধি করিয়াছিল। কিন্তু নিজের সেই অনুভূতিমাত্রটুকু ভিত্তি করিয়া অকস্মাৎ এতবড় ইঙ্গিত ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়া সে শুধু সঙ্কুচিত নয়, ভয়ও পাইল। ভয় ডাক্তারকে নয়,—সুমিত্রাকে। একথা কোন মতেই তাহার কানে উঠিলে চলিবে না। তাঁহার অন্য পরিচয় জানা না থাকিলেও প্রথম হইতেই সেই নিস্তব্ধ তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী রমণীর দুর্ভেদ্য নিবিড়তার পরিচয় কাহারও অবিদিত ছিল না। তাঁহার স্বল্পভাষণে, তাঁহার প্রখর সৌন্দর্য্যের প্রতি পদক্ষেপে, তাঁহার অবহিত বাক্যালাপে, তাঁহার অচঞ্চল আচরণের গাম্ভীর্য্যে ও গভীরতায় এই দলের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার অপরিসীম দূরত্ব স্বতঃসিদ্ধের মতই যেন সকলে অনুভব করিত। এমন কি তাঁহার অসুস্থতা লইয়াও গায়ে পড়িয়া আলোচনা করিতেও কাহারো সাহস হইত না। কিন্তু একদিন সেই দুর্লঙ্ঘ্য কঠোরতা ভেদ করিয়া তাঁহার অত্যন্ত গোপন দুর্ব্বলতা যেদিন অপূর্ব্ব ও ভারতীর সম্মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, যেদিন একজনের বিদায়ের ক্ষণে সুমিত্রা নিজেকে সংবরণ করিতে পারে নাই, সেদিন হইতেই সে যেন সকলের হইতে আরও বহুদূরে আপনাকে আপনি সরাইয়া লইয়া গেছে। সেই দীর্ঘায়ত ব্যবধান অপরের অযাচিত সহানুভূতির আকর্ষণে সঙ্কুচিত হইবার আভাসমাত্রেই যে তাহার সেই আত্মশ্রী

অন্তর্গূঢ় বেদনা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে এই কথা নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়া ভারতীর ক্ষুব্ধ চিত্ত শঙ্কায় পূর্ণ হইয়া যাইত।

ডাক্তার আরাম-কেদারায় ভাল করিয়া হেলান দিয়া শুইয়া সুদীর্ঘ পদদ্বয় সুমুখের টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া দিয়া সহসা মহা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ—

ভারতী বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, শুলেন যে বড় ?

ডাক্তার রাগ করিয়া বলিলেন, কেন আমি কি ঘোড়া যে একটু শুলেই বেতো হয়ে যাবো ? আমার ঘুম পাচ্চে,—তোমাদের মত আমি দাঁড়িয়ে ঘুমতে পারিনে।

ভারতী বলিল, দাঁড়িয়ে ঘুমতে আমরাও পারিনে। কিন্তু কেউ যদি এসে বলে আপনি দৌড়তে দৌড়তে ঘুমতে পারেন, আমি তাতেও আশ্চর্য্য হইনে। আপনার এই দেহটা দিয়ে সংসারে কি যে না হ'তে পারে তা কেউ জানে না। কিন্তু সময় হল যে ; এখুনি না বেরুলে গাড়ি চলে যাবে যে !

যাক গে।

যাক গে কি রকম ?

উঃ—ভয়ানক ঘুম পাচ্চে ভারতী, চোখ চাইতে পারচিনে। এই বলিয়া ডাক্তার দুই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কথা শুনিয়া ভারতী পুলকিত চিত্তে অনুভব করিল কেবল তাহারই অনুরোধে আজ তাঁহার যাওয়া স্থগিত রহিল। না হইলে শুধু ঘুম কেন ; বজ্রাঘাতের দোহাই দিয়াও তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা দেওয়া যায় না। কহিল, আর ঘুমই যদি সত্যি পেয়ে থাকে ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন না।

ডাক্তার চোখ মুদিয়াই প্রশ্ন করিলেন, তোমার নিজের উপায় হবে কি ? অপূর্ব্বর পথ চেয়ে সারারাত বসে কাটাবে ?

ভারতী বলিল, আমার বয়ে গেছে। পাশের ছোট ঘরে বিছানা করে এখনি গিয়ে শুয়ে ঘুমবো।

ডাক্তার কহিলেন, রাগ করে শোয়া যেতে পারে, কিন্তু রাগ করে ঘুমনো যায় না। বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্ করার মত শাস্তি আর নেই। তার চেয়ে খুঁজে আনো গে,— আমি কারও কাছে প্রকাশ করব না।

ভারতীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে লজ্জা ধরা পড়িল না। কারণ, ডাক্তার চোখ বুজিয়াই ছিলেন। তাঁহার নিমীলিত চোখের প্রতি চোখ রাখিয়া ভারতী মুহূর্ত্তকয়েক মৌন থাকিয়া আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া আস্তে আস্তে

জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করার মত শাস্তি আর নেই এ আপনি জানলেন কি করে?

ডাক্তার উত্তর দিলেন, লোকে বলে তাই শুনি।

নিজে থেকে কিছুই জানেন না?

ডাক্তার চোখ মেলিয়া কহিলেন, আরে ভাই, আমাদের মত দুর্ভাগাদের শুতে বিছানাই মেলে না, তায় আবার ছট্‌ফট্‌ করা! এতখানি বাবুয়ানার কি ফুরসৎ আছে? এই বলিয়া তিনি মুচকিয়া হাসিলেন।

ভারতী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, সবাই যে বলে আপনার দেহের মধ্যে রাগ নেই এ কি কখনো সত্যি হতে পারে?

ডাক্তার বলিলেন, সত্যি? কখনো না, কখনো না। লোকে মিথ্যে করে আমার বিরুদ্ধে গুজব রটায়,—তারা আমাকে দেখতে পারে না।

ভারতী হাসিয়া কহিল, কিংবা অত্যন্ত বেশি ভালবাসে বলেই হয়ত গুজব রটায়। তারা আরও বলে আপনার মান-অভিমান নেই, দয়া-মায়া নেই, বুকের ভেতরটা আগাগোড়া একেবারে পাষাণ দিয়ে গড়া।

ডাক্তার কহিলেন, এও অত্যন্ত ভালবাসার কথা। তারপর?

ভারতী কহিল, তারপর সেই পাষাণ স্তূপের মধ্যে আছে শুধু একটি বস্তু,—জননী জন্মভূমি। তার আদি নেই, অন্ত নেই, ক্ষয় নেই, ব্যয় নেই,—তার ভয়ানক চেহারা আমাদের চোখে পড়ে না বলেই আপনার কাছে কাছেই থাকতে পারি, নইলে,— বলিতে বলিতে সে অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্ত থামিয়া কহিল, কি রকম জানেন ডাক্তারবাবু, সুমিত্রাদিদিকে নিয়ে আমি সেদিন বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর কারখানা ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেদিন তাদের নতুন বয়লার পরীক্ষা হচ্ছিল, অনেক লোক ভিড় করে তামাসা দেখছিল। কালো পাহাড়ের মত একটা প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড,— কিন্তু, জড়পিণ্ডের বেশি সে আর কিছুই নয়। হঠাৎ তার একটা দরজা খুলে যেতে মনে হল যেন গর্ভেতে তার অগ্নির প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। সেখানে এই পৃথিবীটাকেও তাল করে ফেলে দিলে যেন নিমেষে ভস্মসাৎ করে দেবে। শুনলাম সে একাই নাকি এই বিরাট কারখানা চালিয়ে দিতে পারে। দরজা বন্ধ হ'ল, আবার সেই শান্ত জড়পিণ্ড, ভিতরের কোন প্রকাশই বাইরে নেই। সুমিত্রাদিদির মুখ দিয়ে গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়ল। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি দিদি? সুমিত্রা বললেন, এই ভয়ানক যন্ত্রটাকে মনে রেখো ভারতী, তোমাদের ডাক্তারবাবুকে চিনতে পারবে। এই তাঁর সত্যকার প্রতিমূর্ত্তি। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ডাক্তার অন্যমনস্কের মত একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, সবাই কি ভালই আমাকে বাসে। কিন্তু ঘুমে যে আর চোখ চাইতে পারিনে ভারতী, কিছু একটা কর! কিন্তু তার আগে সে লোকটা গেল কোথায় একবার খোঁজ করবে না?

আপনি কিন্তু কারও কাছে গল্প করতে পারবেন না।

না। কিন্তু আমাকে বুঝি লজ্জা করবার দরকার নেই?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না। মানুষের কাছেই শুধু মানুষের লজ্জা করে। এই বলিয়া সে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা হাতে তুলিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মিনিট দশ-পনেরো পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, অপূর্ব্ববাবু চলে গেছেন।

ডাক্তার বিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, এই অন্ধকারে? একা?

তাই ত দেখচি।

আশ্চর্য্য!

ভারতী বলিল, আমার বিছানা করা আছে, শুতে চলুন।

তুমি?

আমি মেঝেতে একটা কম্বল-টম্বল কিছু পেতে নেব। চলুন।

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, তাই চল। লজ্জা সঙ্কোচ মানুষ মানুষকেই করে,—আমি পাষাণ বই ত নয়।

উপরের ঘরে গিয়ে ডাক্তার শয্যায় শয়ন করিলে ভারতী মশারী ফেলিয়া দিয়া সযত্নে চারিদিক গুঁজিয়া দিল, এবং তাহারই অনতিদূরের মেঝের উপর আপনার বিছানা পাতিল। ডাক্তার সেই দিকে চাহিয়া ক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে কহিলেন, সকলে মিলে আমাকে এমন করে অগ্রাহ্য করলে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমরা সকলে মিলে আপনাকে মানুষের দল থেকে বার করে পাথরের দেবতা বানিয়ে রেখেচি।

তার মানে আমাকে ভয়ই নেই?

ভারতী অসঙ্কোচে জবাব দিল, একবিন্দু না। আপনার থেকে কারও লেশমাত্র অকল্যাণ ঘটতে পারে এ আমরা ভাবতেই পারিনে।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার হাসিয়া শুধু বলিলেন, আচ্ছা টের পাবে একদিন।

শয্যা গ্রহণ করিয়া ভারতী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা কে আপনাকে সব্যসাচী নাম দিলে ডাক্তারবাবু? এ ত আপনার আসল নাম নয়।

ডাক্তার হাসিতে লাগিলেন। কহিলেন, আসল যাই হোক, নকল নামটি দিয়েছিলেন আমাদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই, তাঁর মস্ত উঁচু একটা আমগাছ ছিল, কেবল আমিই তার ঢিল মেরে আম পাড়তে পারতাম। একবার ছাত-থেকে লাফাতে

গিয়ে ডান হাতটা আমার মচকে গেল। ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলেন। সবাই আহা আহা করতে লাগলো, শুধু পণ্ডিতমশাই খুশী হয়ে বললেন, যাক আম ক'টা আমার ঢিলের ঘা থেকে বাঁচলো। পাকলে দুটো একটা হয় ত মুখে দিতেও পারবো।

ভারতী বলিল, বড্ড দুষ্টু ছিলেন ত!

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ, দুর্নাম একটু ছিল বটে। যাই হোক পরের দিন থেকেই আবার তেমনি আম পাড়ায় লেগে গেলাম, কিন্তু পণ্ডিতমশাই কি করে খবর পেয়ে সেদিন হাতে-নাতে একেবারে ধরে ফেললেন। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললেন, ঘাট হয়েছে বাবা সব্যসাচী, আমের আশা আর করিনে। ডানটা ভেঙেচে, বাঁ-হাত চলচে, বাঁ-টা ভাঙলে বোধ হয় পা দুটো চলবে। থাক্ বাবা, আর কষ্ট করো না, যে কটা কাঁচা আম বাকি আছে লোক দিয়ে পাড়িয়ে দিচ্চি।

ভারতী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, পণ্ডিতমশায়ের অনেক দুঃখের দেওয়া নাম।

ডাক্তার নিজেও হাসিয়া বলিলেন, হাঁ, আমার অনেক দুঃখের নাম। কিন্তু সেই থেকে আমার আসল নামটা লোকে যেন ভুলেই গেল।

ভারতী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, সকলে যে বলে দেশ আর আপনি, আপনি আর দেশ—এই দুই-ই আপনাতে একেবারে এক হয়ে গেছে, —এ কি করে হল?

ডাক্তার কহিলেন, সেও এক ছেলেবেলার ঘটনা ভারতী। এ জীবনে কত কি এলো, কত কি গেলো, কিন্তু সেদিনটা এ জীবনে একেবারে অক্ষয় হয়ে রইল। আমাদের গ্রামের প্রান্তে বৈষ্ণবদের একটা মঠ ছিল, একদিন রাত্রে সেখানে ডাকাত পড়লো। চেঁচামেচি কান্না-কাটিতে গ্রামের বহুলোক চারদিকে জমা হল, কিন্তু ডাকাতদের সঙ্গে একটা গাদা বন্দুক ছিল, তারা তাই ছুঁড়তে লাগলো দেখে কোন লোক তাদের কাছে ঘেঁষতে পারলে না। আমার জাঠতুতো একজন বড়ভাই ছিলেন, তিনি অত্যন্ত সাহসী এবং পরোপকারী, যাবার জন্য তিনি ছটফট করতে লাগলেন, কিন্তু গেলে নিশ্চয় মৃত্যু জেনে সবাই তাঁকে ধরে রেখে দিলো। নিজেকে কোনমতে ছাড়াতে না পেরে তিনি সেইখান থেকে শুধু নিষ্ফল আস্ফালন এবং ডাকাতদের গালাগালি দিতে লাগলেন। কিন্তু কোন ফলই তাতে হল না, তারা ওই একটি মাত্র বন্দুকের জোরে দু-তিনশ লোকের সুমুখে মোহন্ত বাবাজীকে খুঁটিতে বেঁধে তিল তিল করে পুড়িয়ে মারলে। ভারতী, আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলাম,

কিন্তু আজও তার কাকুতি মিনতি, আজও তার মরণ-চীৎকার যেন মাঝে মাঝে কানে শুনতে পাই। উঃ সে কি ভয়ানক বুক-ফাটা আর্ত্তনাদ!

ভারতী নিরুদ্ধশ্বাসে কহিল, তার পর?

ডাক্তার কহিলেন, তারপর বাবাজীর জীবন ভিক্ষার শেষ অনুনয় সমস্ত গ্রামের সম্মুখে ধীরে ধীরে সাঙ্গ হল, তাদের লুট-পাটের কাজও নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে পরি-সমাপ্ত হল—চলে যাবার সময় সর্দ্দার বড়দাদার উদ্দেশ্যে পিতৃ-উচ্চারণ করে শপথ করে গেল যে, আজ তারা শ্রান্ত কিন্তু মাসখানেক পরে ফিরে এসে এর শোধ দেবে। বড়দা জেলার সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে কেঁদে কেটে পড়লেন একটা বন্দুক চাই। কিন্তু পুলিশ বললে, না। বছর দুই পূর্ব্বে একজন অত্যন্ত অত্যাচারী পুলিশ সাবইন্‌স্পেক্টরের কান মলে দেবার অপরাধে তাঁর দুমাস জেল হয়েছিল এবং এই অপরাধেই সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, কোন মতেই না। দাদা বললেন, সাহেব, আমরা কি তবে মারা যাবো? সাহেব হেসে বললেন, এত যার ভয় সে যেন ঘর-বাড়ি বেচে আমার জেলা থেকে অন্য জেলায় চলে যায়!

ভারতী উত্তেজনায় বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কহিল, দিলে না? এতবড় সর্ব্বনাশ আসন্ন জেনেও দিলে না?

ডাক্তার কহিলেন, না। এবং কেবল তাই নয়, বড়দা ব্যাকুল হয়ে যখন তীর ধনুক ও বর্শা তৈরী করালেন, পুলিশের লোক খবর পেয়ে সেগুলো পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেল।

কি হল তার পর?

ডাক্তার বললেন, তার পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। সেই মাসের মধ্যে সর্দ্দার তার প্রতিজ্ঞা পালন করলে। এবারে বোধ করি আরও একটা বেশী বন্দুক ছিল। বাড়ির আর সকলেই পালালেন, শুধু বড়দাকে কেউ নড়াতে পারলে না। কাজেই ডাকাতের গুলিতে প্রাণ দিলেন।

ভারতী রক্তহীন পাংশুমুখে বলিয়া উঠিল, প্রাণ দিলেন?

ডাক্তার কহিলেন, হাঁ, ঘণ্টা চারেক সজ্ঞানে বেঁচে ছিলেন। গ্রামশুদ্ধ জড় হয়ে হৈ চৈ করতে লাগলো, কেউ ডাকাতদের, কেউ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে গাল পাড়তে লাগলো, শুধু দাদাই কেবল চুপ করে রইলেন! পাড়াগাঁ, হাসপাতাল দশ-বারো ক্রোশ দূরে, রাত্রিকাল, গ্রামের ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে এলে তাঁর হাতটা দাদা সরিয়ে দিয়ে কেবল বললেন, থাক, আমি আর বাঁচতে চাইনে। বলতে বলতে সেই পাষাণ দেবতার কণ্ঠস্বর হঠাৎ একটুখানি যেন কাঁপিয়া গেল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, বড়দা আমাকে বড় ভালবাসতেন। কাঁদতে দেখে

একটিবার মাত্র চোখ মেলে চাইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ছিঃ—মেয়েদের মত এইসব গরু ভেড়া ছাগলের সঙ্গে গলা মিশিয়ে তুই আর কাঁদিসনে শৈল। কিন্তু রাজত্ব করার লোভে যারা সমস্ত দেশটার মধ্যে মানুষ বলতে আর একটা প্রাণীও রাখেনি তাদের তুই জীবনে কখনো ক্ষমা করিসনে। এই কটা কথা, এর বেশী আর একটা কথাও তিনি বলেননি। ঘৃণায় একটা উঃ আঃ পর্য্যন্ত তাঁর মুখ দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত বার হল না, এই অভিশপ্ত পরাধীন দেশ চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে গেলেন। কেবল আমিই জানি ভারতী, কত মস্ত বড় প্রাণ সেদিন বার হয়ে গেল।

ভারতী নীরবে স্থির হইয়া রহিল। কবে কোন পল্লী অঞ্চলের এক দুর্ঘটনার কাহিনী। ডাকাতি উপলক্ষ্যে; গোটা-দুই অজ্ঞাত অখ্যাত লোকের প্রাণ গিয়াছে। এই ত! জগতের বড় বড় বিরোধের দুঃসহ দুঃখের পাশে ইহা কি ই বা! অথচ এই পাষাণে কি গভীর ক্ষতই না করিয়াছে! তুলনা ও গণনার দিক দিয়া দুর্ব্বলের দুঃখের ইতিহাসে এই হত্যার নিষ্ঠুরতা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর! এই বাঙলা দেশেই ত নিত্য কতলোক চোর-ডাকাতের হাতে মরিতেছে! কিন্তু এ কি শুধু তাই? ও পাথর কি এতটুকু আঘাতেই দীর্ণ হইয়াছে? ভারতী অলক্ষ্যে চাহিয়া দেখিল। এবং বিদ্যুৎ-শিখা অকস্মাৎ অন্ধকার চিরিয়া যেমন করিয়া অদৃশ্য বস্তু টানিয়া বাহির করে, ঠিক তেমনি করিয়া এই পাথরের মুখের পরেই সে যেন সমস্ত অজ্ঞাত রহস্য চক্ষের পলকে প্রত্যক্ষ করিল। সে দেখিল, এই বেদনার ইতিহাসে মৃত্যু কিছুই নয়,—মরণ উহাকে আঘাত করে না, কিন্তু মর্ম্মভেদী আঘাত করিয়াছে ওই দুটো লোকের মৃত্যুর মধ্য দিয়া শৃঙ্খলিত, পদানত সমস্ত ভারতীয়ের উপায়বিহীন অক্ষমতা আপন ভাইয়ের আসন্ন হত্যা নিবারণ করিবার অধিকারটুকু হইতেও সে বঞ্চিত—অধিকার আছে শুধু চোখ মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিবার। ভারতীর সহসা মনে হইল, সমস্ত জাতির এই সুদুঃসহ লাঞ্ছনা ও অপমানের গ্লানি এই পাষাণের মুখের 'পরে যেন নিবিড় নিশ্ছিদ্র কালি লেপিয়া দিয়াছে।

বেদনায় সমস্ত বুকের ভিতরটা ভারতীর আলোড়িত হইয়া উঠিল, কহিল, দাদা!

ডাক্তার সবিস্ময়ে ঘাড় তুলিয়া কহিলেন, আমাকে ডাকচো?

ভারতী বলিল, হাঁ তোমাকে। আচ্ছা, ইংরাজের সঙ্গে কি তোমার কখনো সন্ধি হতে পারে না?

না। আমার চেয়ে বড় শত্রু তাদের আর নেই।

ভারতী মনে মনে ক্ষুণ্ন হইয়া বলিল, কারও শত্রুতা, কারও অকল্যাণ তুমি কামনা করতে পারো এ আমি ভাবতেও পারিনে দাদা।

ডাক্তার কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, ভারতী, এ কথা তোমার মুখেই সাজে এবং এর জন্যে আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও। এই বলিয়া তিনি পুনরায় একটুখানি হাসিলেন। কিন্তু এ-কথা ভারতী জানিত যে হাসির মূল্য নাই, হয়ত ইহা আর কিছু—ইহার অর্থ নিরূপণ করিতে যাওয়া বৃথা। তাই সে মৌন হইয়া রহিল। ডাক্তার আস্তে আস্তে বলিলেন, এই কথাটা আমার তুমি চিরদিন মনে রেখ ভারতী, আমার দেশ গেছে বলেই আমি এদের শত্রু নই। একদিন মুসলমানের হাতেও এ দেশ গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত মনুষ্যত্বের এতবড় পরম শত্রু জগতে আর নেই। স্বার্থের দায়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদের মজ্জাগত সংস্কার। এই এদের ব্যবসা, এই এদের মূলধন। যদি পারো দেশের নর-নারীকে শুধু এই সত্যটাই শিখিয়ে দিও।

নীচের ঘড়িতে টং টং করিয়া চারিটা বাজিল। সম্মুখের খোলা জানালার বাহিরে রাত্রি শেষের অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিল, সেই দিকে নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া ভারতী স্তব্ধ, স্থির হইয়া বসিয়া কত কি যে ভাবিতে লাগিল তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু একটা সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে এতবড় অভিযোগ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

১৯

কাল সারারাত্রি ভারতী ঘুমাইতে পায় নাই। দিনের বেলায় তাহার শরীর ও মন দুই-ই খারাপ ছিল; তাই ইচ্ছা করিয়াছিল, আজ একটু সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিবে। এইজন্য সন্ধ্যার প্রাক্কালেই সে রাঁধা-বাড়ায় মন দিয়াছিল। এমন সময় দলের একজন আসিয়া তাহার হাতে একখানা পত্র দিল। সুমিত্রার লেখা, তিনি একটি ছত্রে শুধু এই বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন যে, যে-কোন অবস্থায়, যে-কোন কাজ ফেলিয়া রাখিয়াও সে যেন এই পত্রবাহকের সঙ্গে চলিয়া আসে।

সুমিত্রার আদেশ লঙ্ঘন করিবার জো নাই, কিন্তু ভারতী অত্যন্ত বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর কি হঠাৎ কোন অসুখ করেছে? উত্তরে পত্রবাহক জানাইল, না। নীচে নামিয়া দেখিল দরজায় দাঁড়াইয়া তাহাদের অত্যন্ত সুপরিচিত ভাড়াটে ঘোড়ার-গাড়ি, কিন্তু গাড়োয়ান বদল হইয়াছে। ইহাকে দেখিয়া মনে হয় না

গাড়ি চালানো ইহার পেশা। তা ছাড়া গাড়ি কেন? সুমিত্রার বাসায় যাইতে ৩ মিনিট তিনেকের অধিক সময় লাগে না। অধিকতর বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি হীরা সিং? সুমিত্রা কোথায়?

এই হীরা সিং লোকটি তাহাদের পথের দাবীর সভ্য না হইলেও অতিশয় বিশ্বাসী। জাতিতে পাঞ্জাবী শিখ, পূর্ব্বে হংকঙে পুলিশে চাকরি করিত, এখন রেঙ্গুনে টেলিগ্রাফ আফিসে পিয়নের কাজ করে। সে চুপি চুপি কহিল যে, মাইল চার-পাঁচ দূরে অত্যন্ত গোপন এবং অত্যন্ত জরুরি সভা বসিয়াছে, তাহার না যাইলেই নয়। ভারতী আর কোন প্রশ্ন না করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গাড়ির সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া যাত্রা করিল। এবং হীরা সিং সরকারী পিয়নের পোষাকে সরকারী দু-চাকার গাড়িতে অন্য পথে প্রস্থান করিল। পথে ভারতীর অনেকবার মনে হইল যে, গাড়ি ফিরাইয়া তাহার রিভলবার সঙ্গে লইয়া আসে, কিন্তু দেরি হইবার ভয়ে আর ফিরিতে পারিল না, অস্ত্রহীন অরক্ষিতভাবেই তাহাকে অনিশ্চিত স্থানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া যাইতে হইল। গাড়ি যে অত্যন্ত ঘুর পথে চলিয়াছে তাহা ভিতরে থাকিয়াও ভারতী বুঝিল এবং কিছুক্ষণেই পথের অসমতলতা ও অসংস্কৃত দুরবস্থা অনুভব করিয়া বুঝিতে পারিল তাহারা সহর ছাড়াইয়া গেছে, কিন্তু ঠিক কোথায় তাহা জানা কঠিন। সঙ্গে ঘড়ি ছিল না, কিন্তু অনুমান রাত্রি দশটার কাছাকাছি গাড়ি গিয়া একটা বাগানে প্রবেশ করিয়া থামিল। হীরা সিং পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছিল, সে গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল। মাথার উপরে বড় বড় গাছ মিলিয়া অন্ধকার এমনি দুর্ভেদ্য করিয়াছে যে নিজের হাত পর্য্যন্ত দেখা যায় না, নীচে দীর্ঘ ও অত্যন্ত ঘন-ঘাসের মধ্যে পায়ে-হাঁটা পথের একটা চিহ্নমাত্র আছে, এই ভয়ানক পথে হীরা সিং তাহার দু চাকার গাড়ির ক্ষুদ্র লণ্ঠনের আলোকে পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। পথে চলিতে ভারতীর সহস্রবার মনে হইতে লাগিল সে ভাল করে নাই, ভাল করে নাই। এই ভীষণ স্থানে আসিয়া সে ভাল করে নাই। অনতিকাল পরে তাহারা একটা জীর্ণ ভগ্ন অট্টালিকায় আসিয়া পৌঁছিল, অন্ধকারে তাহার আভাসমাত্র দেখিয়াই ভারতী বুঝিল ইহা বহুদিন পরিত্যক্ত একটা চাউঙ্। কোন্ সুদূর অতীতে বৌদ্ধ শ্রমণগণ এখানে বাস করিতেন, সম্ভবতঃ, কোথাও একটা লোকালয় পর্য্যন্ত ইহার কাছাকাছি নাই।

এতবড় ভাঙা বাড়ি, এতটুকু আলো নাই, মানুষ নাই, মানুষের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে—দরজা জানালা চোরে চুরি করিয়া লইয়া গেছে,—সুমুখের ঘরে ঢুকিতেই বাদুড় ও চামচিকার ভয়ানক গন্ধে ভারতীর দম আটকাইয়া আসিল,—

তাহারই মধ্য দিয়া পথ, বোধ করি কত যে বিষধর সর্প তথায় আশ্রয় লইয়া আছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

মস্ত হল-ঘরের এককোণে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। কাঠের সিঁড়ির মাঝে মাঝে কাঠ নাই, এই দিয়া ভারতী হীরার হাত ধরিয়া দ্বিতলে উঠিয়া সুমুখের বারান্দা পার হইয়া এতক্ষণে এত দুঃখের পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরের মধ্যে চাটাই পাতা, একধারে গোটা-দুই মোমবাতি জ্বলিতেছে এবং তাহারই পার্শ্বে সভানেত্রীর আসনে বসিয়া সুমিত্রা! অপর প্রান্তে ডাক্তার বসিয়াছিলেন, তিনিই সস্নেহ কণ্ঠে ডাকিয়া কহিলেন, এসো ভারতী, আমার কাছে এসে বোস।

অজানা শঙ্কায় ভারতীর বুকের মধ্যে গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, কিন্তু একটুখানি যেন দ্রুতপদেই সে কাছে গিয়া ডাক্তারের বুক ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার কাঁধের উপর বাঁ হাতখানি রাখিয়া যেন তিনি নিঃশব্দে তাহাকে ভরসা দিলেন। হীরা সিং ঘরে ঢুকিল না, দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। ভারতী চাহিয়া দেখিল যাহারা বসিয়া আছে পাঁচ-ছয়জনকে সে একেবারেই চেনে না। পরিচিতের মধ্যে ডাক্তার ও সুমিত্রা ব্যতীত রামদাস তলওয়ারকর ও কৃষ্ণ আইয়ার। একজন ভীষণাকৃতি লোককে সর্ব্বাগ্রেই চোখে পড়ে—পরণে তাহার গেরুয়া রঙের আলখাল্লা এবং মাথায় সুবৃহৎ পাগড়ী। মুখখানা বড় হাঁড়ির মত গোলাকার এবং দেহ গণ্ডারের মত স্থূল, মাংসল ও কর্কশ। ভাঁটার মত চোখের উপর ভ্রূর চিহ্নমাত্র নাই, কঠিন শলার মত গোঁফের রোম বোধ করি দূর হইতে গনিয়া বলা যায়, রঙ্ তামার মত, লোকটা যে অনার্য্য মোঙ্গলজাতীয় দৃষ্টিপাতমাত্র তাহাতে সংশয় থাকে না। এই বীভৎস ভয়ানক লোকটার প্রতি ভারতী চোখ তুলিয়া চাহিতেই পারিল না। মিনিট-দুই সমস্ত ঘরটা একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তখন সুমিত্রা ডাকিয়া কহিলেন, ভারতী, তোমার মনের ভাব আমি জানি, তাই তোমাকে ডেকে এনে দুঃখ দেবার আমার ইচ্ছাই ছিল না, কিন্তু ডাক্তার কিছুতেই হতে দিলেন না। অপূর্ব্ববাবু কি করেচেন জানো?

ভারতীর নিভৃত হৃদয়ে এমনি কি যেন একটা তাহাকে সারাদিন ধরিয়া বলিতেছিল। তাহার কণ্ঠ শুষ্ক ও মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, শুধু সে নীরবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

সুমিত্রা কহিলেন, বোথা কোম্পানী রামদাসকে আজ ডিসমিস করেচে। অপূর্ব্বরও সেই দশা হতো, শুধু পুলিশ কমিশনারের কাছে আমাদের সমস্ত কথা অকপটে ব্যক্ত করেই তাঁর চাকরিটা বেঁচেছে। মাইনে ত কম নয়, বোধহয় পাঁচশো।

রামদাস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

সুমিত্রা কহিলেন, শুধু এই নয়। পথের দাবী যে বিদ্রোহীর দল এবং আমরা যে লুকিয়ে পিস্তল রিভলবার রাখি সে সংবাদও তিনি গোপন করেননি। এর শাস্তি কি ভারতী ?

সেই ভীষণাকৃতি লোকটা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, ডেথ্ !

এতক্ষণে ভারতী নির্নিমেষ দুই চক্ষু তাহার মুখের প্রতি তুলিয়া স্থির হইয়া রহিল।

রামদাস কহিল, সব্যসাচীই যে ডাক্তার এ খবর তারা জানে। হোটেলের ঘরের মধ্যেই তাঁকে ধরা যেতে পারে অপূর্ব্ববাবু এ-কথা জানাতেও ত্রুটি করেননি। এমন কি, আমি ইতিপূর্ব্বে যে পলিটিক্যাল অপরাধে বছর দুই জেল খেটেচি—তাও।

সুমিত্রা কহিলেন, ভারতী, ডাক্তার ধরা পড়লে তার ফল কি জান ? ফাঁসি। তা যদি না হয়, ট্রান্সপোর্টেশন। জেণ্টল্‌মেন! এ অপরাধের কি শাস্তি আপনারা অনুমোদন করেন।

সকলে সমস্বরে কহিল, ডেথ্ !

ভারতী তোমার কিছু বলবার আছে ?

ভারতী কথা কহিতে পারিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল, তাহার বলিবার কিছু নাই।

সেই ভয়ঙ্কর লোকটা এবার বাঙলায় কথা কহিল। উচ্চারণ শুনিয়া বুঝা গেল, সে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগ। বলিল, এক্‌সিকিউশনের ভার আমি নিলাম। আমি কিছু গুলি-গোলা, ছুরি-ছোরা বুঝিনে। এই আমার গুলি এবং এই আমার গোলা। এই বলিয়া সে বাঘের মত দুই থাবা মুঠা করিয়া শূন্যে উত্থিত করিল।

কৃষ্ণ আইয়ার দ্বারের দিকে চাহিয়া হীরা সিংকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, বাগানের উত্তর কোণে একটা শুকনো কুয়া আছে—একটু বেশি মাটি চাপা দিয়ে কিছু শুকনো ডাল-পালা ফেলে দেওয়া চাই। গন্ধ না বার হয়।

হীরা সিং মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, কোনরূপ ত্রুটি হইবে না।

তলওয়ারকর কহিল, বাবুজিকে তাঁর দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়ে দেওয়া হোক।

সমবেত জুরির সাহায্যে অপূর্ব্বর অপরাধের বিচার মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই সমাধা হইয়া গেল। বিচারের রায় যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি স্পষ্ট। না বুঝিবার মত জটিলতা কোথাও নাই। ভারতী সমস্তই শুনিল, কিন্তু তাহার কান ও বুদ্ধির মাঝখানে কোথায় একটা দুর্ভেদ্য প্রাকার দাঁড়াইয়াছিল, বাহিরের বস্তু যেন কিছুতেই সেটা ভেদ করিয়া আর ভিতরে পৌঁছাইতে পারিতেছিল না। তাই, গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে-কেহ কথা কহিতেছিল তাহারই মুখের প্রতি ভারতী ব্যাকুল জিজ্ঞাসু-

চোখে নির্ব্বোধের মত চাহিয়া দেখিতেছিল। এইটুকু মাত্র সে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল, অপূর্ব্ব গুরুতর অপরাধ করিয়াছে এবং এই লোকগুলি তাহাকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। এদেশে জীবন তাহার সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু এ সঙ্কট যে কিরূপ আসন্ন হইয়াছে, সে তাহার কিছুই বুঝে নাই। সুমিত্রার ইঙ্গিতে একজন উঠিয়া বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট-দুই পরে যে দৃশ্য ভারতীর চোখে পড়িল, তাহা অতি বড় দুঃস্বপ্নের অতীত। এই লোকটা অপূর্ব্বকে লইয়া ঘরে ঢুকিল, তাহার দুই হাত পিঠের দিকে শক্ত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধা এবং কোমর হইতে মস্ত ভারি একখণ্ড পাথর ঝুলিতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য চৈতন্য হারাইয়া ভারতী ডাক্তারের দেহের উপর ঢলিয়া পড়িল। কিন্তু সকলের দৃষ্টি তখন অপূর্ব্বর প্রতি নিবদ্ধ বলিয়াই শুধু একজন ভিন্ন এ খবর আর কেহ জানিতে পারিল না!

ভারতী এখানে আসিবার পূর্ব্বেই অপূর্ব্বর এজাহার লওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে অস্বীকার কিছুই করে নাই। আফিসের বড়সাহেব ও পুলিশের বড় সাহেব, এই দুই সাহেব মিলিয়া তাহার নিকট হইতে সমস্ত তথ্যই জানিয়া লইয়াছে, তাহা সে বলিয়াছে, কিন্তু কিসের জন্য সে দলের এবং দেশের এত বড় শত্রুতা সাধন করিল তাহা সে এখনও জানে না।

আজ বেলা বারোটার মধ্যেই রামদাস এ-সংবাদ সুমিত্রার কর্ণগোচর করে। দণ্ড স্থির হইয়া যায় এবং যে উপায়ে অপূর্ব্বকে হস্তগত করা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

আফিসের ছুটির পরে আজ অপূর্ব্ব হাঁটিয়া বাসায় যাইতে সাহস করিবে না তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়া তাহাদের ভাড়াটে গাড়িখানা হীরার সাহায্যে আফিসের গেটের কাছে রাখা হয়। এই ফাঁদে অপূর্ব্ব সহজেই পা দেয়। কিছুদূর আসিয়া গাড়োয়ান জানায় যে, মস্ত একটা রোলার ভাঙ্গিয়া গলির মোড় বন্ধ হইয়া আছে, ঘুরিয়া যাইতে হইবে। অপূর্ব্ব স্বীকার করে। ইহার পরেই বোধ হয় সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে যখন চৈতন্য হয়, তখন হীরা সিং গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পিস্তল দেখাইয়া অনায়াসে এখানে লইয়া আসে।

সুমিত্রা ডাকিয়া কহিলেন, অপূর্ব্ববাবু, আমরা আপনাকে ডেথ্‌ সেনটেন্স দিলাম। আর কিছু আপনার বলার আছে?

অপূর্ব্ব ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল সে কিছুই বুঝে নাই।

ডাক্তার এতক্ষণ কোন কথাই প্রায় বলেন নাই, পিছনে চাহিয়া কহিলেন, হীরা, তোমার পিস্তলটা কই?

হীরা সিং ইঙ্গিতে সুমিত্রাকে দেখাইয়া দিল, ডাক্তার হাত বাড়াইয়া বলিলেন, পিস্তলটা দেখি সুমিত্রা!

সুমিত্রা বেল্ট হইতে খুলিয়া পিস্তলটা ডাক্তারের হাতে দিলেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কারও কাছে পিস্তল কিংবা রিভলবার আছে?

আর কাহারও কাছে ছিল না তাহা সকলেই জানাইল। তখন সুমিত্রার পিস্তল নিজের পকেটের মধ্যে রাখিয়া ডাক্তার একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, সুমিত্রা, তুমি বললে, ডেথ্ সেনটেন্স আমরা দিলাম। কিন্তু ভারতী ত দেয়নি।

সুমিত্রা এক মুহূর্ত্ত ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া দৃঢ়-কণ্ঠে কহিলে, ভারতী দিতে পারে না।

ডাক্তার বলিলেন, পারা উচিতও নয়। তাই না ভারতী?

ভারতী কথা কহিল না, এই কঠিনতম প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু উপুড় হইয়া পড়িয়া ডাক্তারের ক্রোড়ের মধ্যে মুখ লুকাইল।

ডাক্তার তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া কহিলেন, অপূর্ব্ববাবু যা করে ফেলেচেন সে আর ফিরবে না—তার ফলাফল আমাদের নিতেই হবে। শাস্তি দিলেও হবে, না দিলেও হবে। কিন্তু আমি বলি তাতে কাজ নেই—ভারতী এঁর ভার নিন। এই দুর্ব্বল মানুষটিকে একটু মজবুত করে গড়ে তুলুন। কি বল সুমিত্রা?

সুমিত্রা কহিলেন, না!

সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, না।

সেই কুদর্শন লোকটাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আস্ফালন করিল। সে তাহার থাবা-যুগল শূন্যে তুলিয়া ভারতীকে ইঙ্গিত করিয়াই কি একটা বলিয়া ফেলিল।

সুমিত্রা কঠিন-কণ্ঠে কহিলেন, আমরা সকলে একমত। এতবড় অন্যায় প্রশ্রয়ে আমাদের সমস্ত ভেঙে-চুরে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

ডাক্তার বলিলেন, যদি যায় ত উপায় কি?

সুমিত্রার সঙ্গে সঙ্গেই সাত-জন গর্জ্জিয়া উঠিল, উপায় কি? দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, আমরা কিছুই মানবো না। আপনার একার কথায় কিছুই হতে পারবে না।

গর্জ্জন থামিলে ডাক্তার উত্তর দিলেন। এবার তাঁহার কণ্ঠস্বর আশ্চর্য্য রকমের শান্ত ও মৃদু শুনাইল। তাহাতে উৎসাহ বা উত্তেজনার বাষ্পও ছিল না, বলিলেন, সুমিত্রা, বিদ্রোহে প্রশ্রয় দিয়ো না। তোমরা ত জানো, আমার একার মত তোমাদের একশ জনের চেয়েও বেশি কঠিন। সেই ভয়ঙ্কর লোকটাকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, ব্রজেন্দ্র, তোমার ঔদ্ধত্যের জন্য বাটাভিয়াতে একবার আমাকে তুমি শাস্তি দিতে বাধ্য করেছিলে। দ্বিতীয়বার বাধ্য ক'রো না।

ভারতী মুখ তুলে নাই, তখনও তেমনি পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার সর্ব্বদেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। পিঠের উপর স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া তেমনি সহজ গলায় কহিলেন, ভয় নেই ভারতী, অপূর্ব্বকে আমি অভয় দিলাম।

ভারতী মুখ তুলিল না, ভরসাও পাইল না। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের সুদীর্ঘ সরু সরু আঙুলগুলা নিজের মুঠার মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, কিন্তু ওঁরা ত অভয় দিলেন না।

ডাক্তার কহিলেন, সহজে দেবেও না। কিন্তু এ কথা ওরা বোঝে যে, আমি যাকে অভয় দিলাম তাকে স্পর্শ করা যায় না। একটু হাসিয়া বলিলেন, ভাল খেতে পাইনে ভারতী, আধপেটা খেয়েই প্রায় দিন কাটে,—তবুও ওরা জানে এই কটা সরু আঙুলের চাপে আজও ব্রজেন্দ্রের অতবড় বাঘের থাবা গুঁড়ো হয়ে যাবে। কি বল ব্রজেন্দ্র?

চট্টগ্রামী মগ মুখ কালো করিয়া নীরব হইয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, কিন্তু অপূর্ব্ব যেন না আর এখানে থাকে। ও দেশে যাক। অপূর্ব্ব ট্রেটর নয়, স্বদেশকে ও সমস্ত হৃদয় দিয়েই ভালবাসে, কিন্তু অধিকাংশ,—থাক, স্বজাতির নিন্দা আর করব না,—কিন্তু বড় দুর্ব্বল। ওকে মজবুত করবার ভার তোমাকে দিলাম সত্য, কিন্তু আমার ভরসা নেই ভারতী। বাড়ি ফিরে গিয়ে ওর আজকের কথা, তোমার কথা, কোনটা ভুলতেই বেশি সময় লাগবে না। যাক্, সে পরের কথা। আপাততঃ আমরা সভানেত্রীকে অনুরোধ করতে পারি আজকের মত সভা ভঙ্গ করা হোক। এই বলিয়া তিনি সুমিত্রার প্রতি চাহিলেন।

সুমিত্রা তাঁহাকে কখনো তুমি, কখনো আপনি বলিয়া সসম্মানে কথা কহিত, এখন সেইভাবেই কহিল, অধিকাংশের মত যেখানে ব্যক্তিবিশেষের গায়ের জোরে পরাভূত হয়, তাকে আর যাই বলুক সভা বলে না! কিন্তু এই নাটক অভিনয় করবারই যদি আপনার সঙ্কল্প ছিল পূর্ব্বাহ্নে জানাননি কেন?

ডাক্তার কহিলেন, না হলেই ছিল ভাল, কিন্তু অবস্থাবিশেষে নাটক যদি হয়েও থাকে সুমিত্রা, অভিনয়টা যে ভাল হয়েচে, তা তোমাদের স্বীকার করতে হবে।

রামদাস বলিলেন, এ-রকম যে হতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

ডাক্তার বলিলেন, বন্ধুত্ব জিনিসটা যে এমনি ক্ষণভঙ্গুর সে ধারণাই কি তোমার ছিল তলওয়ারকর? অথচ, এমন সত্যও জগতে দুর্ল্লভ।

কৃষ্ণ আইয়ার কহিল, বর্ম্মার এ্যাকটিভিটি আমাদের উঠলো। এখন পালাতে হবে।

ডাক্তার বলিলেন, হবে। কিন্তু সময়মত স্থান ত্যাগ করা এবং এ্যাকটিভিটি ত্যাগ করা এক বস্তু নয় আইয়ার। দীর্ঘকাল কোথাও নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে যদি না পাই, তার জন্যে নালিশ করা আমাদের সাজে না। এই বলিয়া তিনি ভারতীকে ইঙ্গিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, হীরা সিং, অপূর্ব্ববাবুর বাঁধন খুলে দাও, চল ভারতী, তোমাদের একটু নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আসি।

হীরা সিং আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইলে সুমিত্রা কঠিন-কণ্ঠে কহিলেন, অভিনয়ের শেষ অঙ্কে আনন্দে হাততালি দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু এ নতুন নয়। ছেলেবেলায় কোথায় একটা উপন্যাসে যেন পড়েছিলাম। কিন্তু একটুখানি যেন বাদ রইল। যুগল-মিলন আমাদের সম্মুখে হয়ে গেলে অভিনয়ে আর কোথাও খুঁত থাকত না। কি বল ভারতী?

ভারতী লজ্জায় মরিয়া গেল। ডাক্তার কহিলেন, লজ্জা পাবার এতে কিছুই নেই ভারতী। বরঞ্চ, আমি কামনা করি অভিনয় সমাপ্ত করবার মালিক যিনি তিনি যেন একদিন কোথাও এর খুঁত না রাখেন। পকেট হইতে সুমিত্রার পিস্তলটা বাহির করিয়া তাহার কাছে রাখিয়া দিয়া বলিলেন, আমি এদের পৌঁছে দিতে চললাম, কিন্তু ভয় নেই, আমার কাছে আর একটা গাদা পিস্তল রইল। ব্রজেন্দ্রের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন, তোমরা ত সবাই তামাসা করে বলতে, অন্ধকারে আমি প্যাঁচার মত দেখতে পাই—আজ যেন কেউ সে কথা ভুলো না। এই বলিয়া তিনি একটা প্রচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত করিয়া ভারতী ও অপূর্ব্বকে লইয়া বাহির হইতে উদ্যত হইলেন।

সুমিত্রা অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, ফাঁসির দাড়টা কি নিজের হাতে গলায় না পরলেই হ'ত না?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, সামান্য একটা দড়িকে ভয় করলে চলবে কেন সুমিত্রা?

কোন একটা কার্য্যের পূর্ব্বে এই মানুষটিকে মৃত্যুভয় দেখাইতে যাওয়া যে কত বড় বাহুল্য ব্যাপার তা স্মরণ করিয়া সুমিত্রা নিজেই লজ্জিত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সমস্ত ত ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, কিন্তু আবার কখন দেখা হবে?

ডাক্তার বলিলেন, প্রয়োজন হলেই হবে।

সে প্রয়োজন কি হয়নি?

হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই দেখা হবে। এই বলিয়া তিনি অপূর্ব্ব-ভারতীকে সঙ্গে করিয়া সাবধানে নীচে নামিয়া গেলেন।

যে গাড়ি ভারতীকে আনিয়াছিল তাহা অপেক্ষা করিতেছিল। সুমিত্রা হইতে গাড়োয়ান প্রভুকে তুলিয়া ইহাতেই তিনজনে যাত্রা করিলেন। বহুক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া এইবার ভারতী কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, আমরা কোথায় যাচ্চি?

অপূর্ব্ববাবুর বাসায়,—এই বলিয়া ডাক্তার গাড়ি হইতে মুখ বাড়াইয়া অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখিয়া লইয়া স্থির হইয়া বসিলেন। মাইল দুই নিঃশব্দে চলার পরে গাড়ি থামাইয়া ডাক্তার নামিতে উদ্যত হইলে ভারতী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কেন?

ডাক্তার বলিলেন, এইবার ফিরি। ওঁরা অপেক্ষা করে বসে আছেন, একটা বোঝা-পড়া হওয়া ত চাই!

বোঝা-পড়া? ভারতী আকুল হইয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, সে কিছুতেই হতে পারবে না। তুমি সঙ্গে চল। কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিয়া সে সুমিত্রার মতই অপ্রতিভ হইল। কারণ ইঁহার বলা মানেই স্থির করিয়া বলা। এবং সংসারের কোন ভয়ই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিবে না। তথাপি ভারতী হাত ছাড়িয়াও দিল না, ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু তোমাকে যে আমার বড় দরকার দাদা।

সে আমি জানি। অপূর্ব্ববাবু, আপনি কি পরশুর জাহাজে বাড়ি যেতে পারবেন না?

অপূর্ব্ব কহিল, পারবো।

ভারতী হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কহিল, দাদা, এখনই আমাকে বাসায় যেতে হবে।

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিলেন, না। তোমার কাগজ-পত্র, তোমার পথের দাবীর খাতা, তোমার পিস্তল-টোটা সমস্তই এতক্ষণে নবতারা সরিয়ে নিয়ে গেছে। ভোর নাগাদ খানা-তল্লাসী হবে,—আর্টিস্ট স্বয়ং সশরীরে,—তার খেনো মদের বোতল আর তার সেই ভাঙ্গা বেহালাখানা—অপূর্ব্ববাবু, আপনার সেই বেহালাটার ওপর একটু দাবী আছে, না? এই বলিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, এ ছাড়া ভয়ানক কিছু আর পুলিশ সাহেবের হাতে পড়বে না। কাল নটা-দশটা আন্দাজ বাসায় ফিরে রাঁধা-বাড়া খাওয়া-দাওয়া সেরে বোধ করি একটুখানি ঘুম দেবারও সময় পাবে ভারতী। রাত্রি দুটো-তিনটে নাগাদ দেখা পাবে—কিছু খাবার-দাবার রেখো।

ভারতী অবাক হইয়া রহিল। মনে মনে বলিল, এমন একান্ত সজাগ না হইলে কি এই মরণ-যজ্ঞে কেহ সঙ্গে আসিতে চাহিত? মুখে কহিল, তোমার চোখে কিছু

এড়ায় না, তুমি সকলের ভাল-মন্দই চিন্তা কর। সংসারে আমার আপনার কেউ নেই, তোমার পথের দাবী থেকে আমাকে বিদায় দিও না দাদা।

অন্ধকারের মধ্যেই ডাক্তার বারংবার মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ভগবানের কাজ থেকে বিদায় দেবার অধিকার কারও নেই, কিন্তু এর ধারা তোমাকে বদলে নিতে হবে।

ভারতী কহিল, তুমিই বদলে দিয়ো।

ডাক্তার এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, সহসা ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, ভারতী, আর আমার সময় নেই, আমি চললাম। এই বলিয়া অন্ধকার পথে মুহূর্তে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

২০

গাড়ি চলিবার উপক্রম করিতেই ভারতী অপূর্ব্বর বাসার ঠিকানা বলিয়া দিতে মুখ বাড়াইয়া কহিল, দেখো গাড়োয়ান, ত্রিশ নম্বর।

তাহার কথা শেষ না হইতেই গাড়োয়ান বলিয়া উঠিল, আই নো।

গাড়ির পরিসর ছোট বলিয়া দুজনে ঘেঁষাঘেঁসি বসিয়াছিল, গাড়োয়ানের মুখের ইংরাজী কথায় অপূর্ব্বর সমস্ত দেহ যে শিহরিয়া উঠিল ভারতী তাহা স্পষ্ট অনুভব করিল। ইহার পরে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া ঘড়র্ ঘড়র্ ছড়র্ ছড়ং করিয়া ভাড়াটে গাড়ি চলিতেই লাগিল, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন কথাই হইল না। অন্ধকার নিঃস্তব্ধ নিশীথে গাড়ির চাকা ও পথের পাথরের সংঘর্ষে যে কঠোর শব্দ উঠিতে লাগিল, তাহাতে অপূর্ব্বর সর্ব্বাঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে কাঁটা দিয়া কেবলই ভয় হইতে লাগিল, পাড়ার কাহারও ঘুম ভাঙ্গিতে আর বাকি থাকিবে না এবং সহরের সমস্ত পুলিশ ছুটিয়া আসিল বলিয়া। কিন্তু কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না, গাড়ি আসিয়া বাসার দরজায় থামিল। ভারতী ভিতর হইতে গাড়ির দরজা খুলিয়া দিয়া অপূর্ব্বকে নামিতে ইঙ্গিত করিয়া নিজেও তাহার পিছনে পিছনে নামিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কত ভাড়া?

গাড়োয়ান একটুখানি হাসিয়া কহিল, নট এ পাই। পরক্ষণেই বার দুই মাথা নাড়িয়া বলিল, গুড নাইট টু ইউ! এই বলিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া দিয়া সোজা বাহির হইয়া গেল।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, তেওয়ারী আছে ত?

আছে।

উপরে উঠিয়া দ্বারে করাঘাত করিয়া অপূর্ব্ব তেওয়ারীর ঘুম ভাঙাইল; কপাট খুলিয়া তেওয়ারী দীপালোকে প্রথমেই দেখিতে পাইল ভারতীকে। কাল অপূর্ব্ব বাসায় ফিরিয়াছিল প্রায় ভোরবেলায়, আজ ফিরিয়াছে রাত্রি শেষ করিয়া। সঙ্গে আছে ভারতী। তাই বুঝিতে তেওয়ারীর বাকি কিছুই রহিল না; ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল এবং একটা কথাও না কহিয়া সে দ্রুতবেগে নিজের বিছানায় গিয়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। এই মেয়েটিকে তেওয়ারী ভালবাসিত, একদিন তাহাকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া খ্রীষ্টান হওয়া সত্ত্বেও মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু, কিছুদিন হইতে ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে অপূর্ব্বর সম্বন্ধে নানা প্রকার অসম্ভব দুশ্চিন্তা তেওয়ারীর মনে উঠিতেছিল—এমন কি জাতি-নাশ পর্য্যন্তও! সেই সর্ব্বনাশের প্রকট মূর্ত্তি আজ যেন তেওয়ারীর মানসপটে একেবারে মুদ্রিত হইয়া গেল। তাহাকে এমন করিয়া শুইয়া পড়িতে দেখিয়া কেবল অভ্যাস-বশতঃই অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, দোর দিলিনি তেওয়ারী?

তাহার মুহ্যমান উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত লক্ষ্য কিছুই করে নাই, কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছিল ভারতী। সে-ই তাড়াতাড়ি জবাব দিল, আমি বন্ধ করে দিচ্চি।

অপূর্ব্ব শোবার ঘরে আসিয়া দেখিল, খাটের উপর শয্যা তেমনি গুটানো রহিয়াছে, পাতা হয় নাই। বস্তুতঃ বারান্দায় বসিয়া পথ চাহিয়া থাকিতেই আজ তেওয়ারীর সমস্ত সন্ধ্যাটা গিয়াছে, বিছানা করার কথা মনেও পড়ে নাই। কিন্তু সে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ভারতী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি আরাম কেদারাটায় একটুখানি বসুন, আমি এক মিনিটে সব ঠিক করে দিচ্চি।

চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া অপূর্ব্ব পুনশ্চ ডাকিল, এক গেলাস জল্ দে তেওয়ারী।

তাহার পাশের টুলের উপরেই খাবার জলের কুঁজা ও গেলাস ছিল, বিছানা পাতিতে পাতিতে তাহা দেখাইয়া দিয়া ভারতী বলিল, ঘুমন্ত মানুষকে আর কেন তুলবেন অপূর্ব্ববাবু, আপনি নিজেই একটু ঢেলে নিন।

অপূর্ব্ব হাত বাড়াইয়া কুঁজাটা তুলিতে গিয়া তুলিতে পারিল না; তখন উঠিয়া আসিয়া কোনমতে জল গড়াইয়া লইয়া এক নিশ্বাসে তাহা পান করিয়া পুনরায় বসিতে যাইতেছিল, ভারতী মানা করিয়া কহিল, আর ওখানে না, একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়ুন।

অপূর্ব্ব শান্ত বালকের ন্যায় নিঃশব্দে আসিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল।

ভারতী মশারী ফেলিয়া ধারগুলা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিতেছিল, অপূর্ব্ব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় শোবে?

আমি? ভারতী কিছু আশ্চর্য্য হইল। কারণ, এইরূপ ঘটনা নূতনও নয় এবং এ ঘরের কোথায় কি আছে তাহাও অবিদিত নয়। এই অনাবশ্যক প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু আরাম চৌকিটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, সকাল হতে আর ঘণ্টা-দুই মাত্র দেরি আছে। ঘুমোন।

অপূর্ব্ব হাত বাড়াইয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, না ওখানে নয়, তুমি আমার কাছে বোস।

আপনার কাছে? বাস্তবিকই ভারতীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অপূর্ব্ব আর যাহাই হোক, এ সকল ব্যাপারে কখনও আত্মবিস্মৃত হইত না। এমন কতদিন কত উপলক্ষ্যেই ত তাহারা একঘরে রাত্রি যাপন করিয়াছে, কিন্তু মর্য্যাদাহানিকর একটা কথা, একটা ইঙ্গিতও কোনদিন তাহার আচরণে প্রকাশ পায় নাই।

অপূর্ব্ব কহিল, এই দেখ, এরা আমার হাত ভেঙে দিয়েচে। কেন তুমি এদের মধ্যে আমাকে টেনে আনলে? তাহার কথার শেষ দিকটা অকস্মাৎ কান্নায় রুদ্ধ হইয়া গেল। ভারতী মশারীর একটা দিক তুলিয়া দিয়া তাহার কাছে বসিল, পরীক্ষা করিয়া দেখিল, বহুক্ষণ ধরিয়া শক্ত বাঁধনের ফলে হাতের স্থানে স্থানে কালশিরা পড়িয়া ফুলিয়া আছে। চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতেছিল, ভারতী আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া লইয়া সাহস দিয়া বলিল, কিছু ভয় নেই, তোয়ালে ভিজিয়ে আমি ভাল করে জড়িয়ে দিচ্চি, দু-এক দিনেই সমস্ত ভাল হয়ে যাবে। এই বলিয়া সে উঠিয়া গিয়া স্নানের ঘর হইতে একটা গামছা ভিজাইয়া আনিল এবং সমস্ত নীচের হাতটা বাঁধিয়া দিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

অপূর্ব্ব অশ্রুবিকৃত-স্বরে বলিল, কাল জাহাজ থাকলে আমি কালই চলে যেতুম।

ভারতী কহিল, বেশ ত পরশুই যাবেন। একটা দিনের মধ্যে আপনার কোন অমঙ্গল হবে না।

অপূর্ব্ব ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিতে লাগিল, গুরুজনের কথা না শুনলেই এই সব ঘটে। মা আমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেছিলেন।

মা বুঝি আপনাকে আসতে দিতে চাননি?

না, একশবার মানা করেছিলেন, কিন্তু আমি শুনিনি। তার ফল হ'ল এই যে, কতকগুলো ভয়ানক লোকের একেবারে চিরকালের জন্য বিষ-দৃষ্টিতে পড়ে

রইলুম। সে যা হবার হবে, দুর্গা দুর্গা বলে পরশু একবার জাহাজে উঠতে পারলে হয়। এই বলিয়া সে সহসা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। কিন্তু সেই সঙ্গে যে ইহা অপেক্ষাও শতগুণ গভীর নিশ্বাস আর একজনের হৃদয়ের মূল পর্য্যন্ত নিঃশব্দে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। আর একটা দিনও যেন না অপূর্ব্বর বিলম্ব ঘটে, দুর্গা দুর্গা বলিয়া একবার সে জাহাজে উঠিতে পারিলে হয়! বর্ম্মায় আসা তাহার সর্ব্বাংশেই বিফল হইয়াছে, বাড়ি গিয়া এ দেশের জন-কয়েকের বিষ-দৃষ্টির কথাই শুধু তাহার চিরদিন স্মরণে থাকিবে, কিন্তু সকল চক্ষুর অন্তরালে একজনের কুণ্ঠিত দৃষ্টির প্রতি বিন্দু হইতেই যে নীরবে অমৃত ঝরিয়াছে, একটা দিনও হয়ত সে কথা তাহার মনে পড়িবে না।

অপূর্ব্ব কহিতে লাগিল, এ বাড়িতে পা দিয়েই তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া হ'ল, কোর্টে জরিমানা পর্য্যন্ত হয়ে গেল, যা জন্মে কখনো আমার হয়নি। এর থেকেই আমার চৈতন্য হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হ'ল না।

ভারতী চুপ করিয়া ছিল, চুপ করিয়াই রহিল। অপূর্ব্ব নিজেও একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া তাহার দুরদৃষ্টের সূত্র ধরিয়া বলিল, তেওয়ারী আমাকে বার বার সাবধান করেছিল,—বাবু ওরা এক জাত, আমরা এক জাত, এ সব করবেন না। কিন্তু কপালে দুর্ভোগ থাকলে কে খণ্ডাবে বল? চাকরি সেই গেল,—পাঁচশ' টাকা মাইনে এ বয়সে কটা লোক পায়? তা' ছাড়া এ হাত আমি লোকের সুমুখে বার করব কি করে?

ভারতী আস্তে আস্তে বলিল, ততদিনে হাতের দাগ ভাল হয়ে যাবে। ইহার বেশি কথা মুখ দিয়া তাহার বাহির হইল না। মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল, সে হাত আর চলিতে চাহিল না এবং এই অত্যন্ত সাধারণ তুচ্ছ লোকটাকে সে মনে মনে ভালবাসিয়াছে মনে করিয়া নিজের কাছেই যেন সে লজ্জায় মরিয়া গেল। এ কথা দলের অনেকেই জানিয়াছে, আজ অপূর্ব্বর প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া তাহাদের কাছে অপরাধী এবং সুমিত্রার চক্ষে সে ছোট হইয়া গেছে, কিন্তু এই অতি তুচ্ছ মানুষটাকে হত্যা করিবার অসম্মান ও ক্ষুদ্রতা হইতে সে যে তাহাদের রক্ষা করিতে পারিয়াছে ইহাই মনে করিয়া এখন তাহার গর্ব্ব বোধ হইল।

অপূর্ব্ব বলিল, দাগ সহজে যাবে না! কেউ জিজ্ঞাসা করিলে যে কি জবাব দেব জানিনে। কিন্তু শ্রোতার নিকট হইতে সায় না পাইয়া আপনিই কহিতে লাগিল, সকলে ভাববে কাজ চালাতে আমি পারলুম না। তাই ত লোকে বলে বাঙালীর ছেলেরা বি. এ. এম. এ. পাশ করে বটে, কিন্তু বড় চাকরি পেলে রাখতে

পারে না। আমার কলেজের ছেলেরা আমাকে ছি ছি করতে থাকবে, আমি উত্তর দিতে পারব না।

যা হোক কিছু একটা বানিয়ে বলে দেবেন। আচ্ছা আপনি ঘুমোন, এই বলিয়া ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

আরও একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দাও না ভারতী!

না, আমি বড় ক্লান্ত।

তবে থাক্, থাক্। রাতও আর নেই।

ভারতী পাশের ঘরে আসিয়া দেখিল, আলোটা তখনও মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে এবং তেওয়ারী তেমনি চাদর মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। অদূরে ভাঙা-গোছের একখানা ডেক চেয়ার পড়িয়াছিল তাহাতেই আসিয়া সে উপবেশন করিল। অপূর্ব্বর ঘরে ভাল আরাম চৌকি ছিল, কিন্তু ঐ লোকটিকে সুমুখে রাখিয়া একই ঘরের মধ্যে রাত্রি যাপন করিতে আজ তাহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইল। ডেক চেয়ারটায় কোনমতে একটু হেলান দিয়া পড়িয়া মনের মধ্যে যে তাহার কি করিতে লাগিল তাহার সীমা নাই। ইতিপূর্ব্বে এই ঘরের মধ্যেই সে একাধিকবার কঠিন ধাক্কা খাইয়াছে, কিন্তু আজিকার সহিত তাহার তুলনা হয় না। ভারতীর প্রথমেই মনে হইল, কি করিয়া এবং কাহার অপরিসীম করুণায় অপূর্ব্ব সুনিশ্চিত ও প্রত্যাসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে আজ রক্ষা পাইল, অথচ রাত্রিটাও প্রভাত হইল না, এতবড় কথাটা সে ভুলিয়াই গেল! তাহার পরম বন্ধু তলওয়ারকরের প্রতি, এবং বিশেষ করিয়া ওই ডাক্তার লোকটির প্রতি যে কি অপরিসীম অপরাধ করিয়াছে সে কথাই তাহার মনে নাই। সেখানে বড় চাকরি ও হাতের দাগটাই তাহার সমস্ত স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে! সেইখানে বসিয়া হঠাৎ ভারতীর চোখে পড়িল, সুমুখের খোলা জানালার ফাঁক দিয়া ভোরের আলো দেখা দিয়াছে। সেই মুহূর্ত্তে উঠিয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিল এবং কদর্য্য অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত স্থানে মাতালের নেশা কাটিয়া গেলে সে যেমন করিয়া মুখ ঢাকিয়া পলায়ন করে, ঠিক তেমনি করিয়া সে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

২১

পরদিন অপরাহ্নবেলায় সকল কথা, সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিয়া ভারতী পরিশেষে কহিল, অপূর্ব্ববাবু যে মস্ত লোক এ ভুল আমি একদিনও করিনি, কিন্তু তিনি যে এত সামান্য, এত তুচ্ছ—এ ধারণাও আমার ছিল না।

ভারতীর ঘরে খাটের উপর বসিয়া সব্যসাচী ডাক্তার একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিলেন, তাহার প্রতি চাহিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন, কিন্তু আমি জানতাম। লোকটা এত তুচ্ছ না হলে কি এতবড় ভালবাসা তোমার এত তুচ্ছ কারণেই যায়? যাক বাঁচা গেল ভাই, কাকে কি ভেবে মিথ্যে দুঃখ পাচ্ছিলে বইত নয়!

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র, বিশেষ করিয়া মেঝের উপরে ছড়ানো পুস্তকের রাশি, চাহিয়া দেখিলেই বুঝা যায় এ-ঘরে ইতিপূর্ব্বে পুলিশ তদন্ত হইয়া গেছে। সেইগুলা সব গুছাইতে গুছাইতে ভারতী কথা কহিতেছিল। সে হাতের কাজ বন্ধ করিয়া সবিস্ময়ে চোখ তুলিয়া বলিল, তুমি তামাসা করচ দাদা?

না।

নিশ্চয়।

ডাক্তার কহিলেন, আমার মত ভয়ানক লোক, যে বোমা পিস্তল নিয়ে কেবল মানুষ খুন করে বেড়ায়, তার মুখে তামাসা?

ভারতী কহিল, আমি ত বলিনে, তুমি মানুষ খুন করে বেড়াও! ও-কাজ তুমি পারোই না। কিন্তু তামাসা ছাড়া কি হতে পারে বল ত? ঘণ্টা দুই-তিনের মধ্যে যে সব ভুলে গিয়ে মনে রাখলে শুধু হাতের দাগ আর পাঁচশ' টাকার চাকরি, তার চেয়ে অধম, ক্ষুদ্র ব্যক্তি আর ত আমি দেখতে পাইনে। তুমি বলছিলে এ আমার মোহ। ভাল, তাই যদি হয়, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, এ মোহ আমার চির-দিনের মত কেটে যাক, আমি সমস্ত দেহ-মন দিয়ে তোমার দেশের কাজে লেগে যাই।

ডাক্তারের ওষ্ঠাধর চাপা হাসিতে বিকশিত হইয়া উঠিল, কহিলেন, তোমার মুখের ভাবটা যে মোহ কাটার মতই তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু মুস্কিল এই যে, কণ্ঠস্বরে তার আভাসটুকু পর্য্যন্ত নেই। তা সে যাই হোক, ভারতী, তোমাকে দিয়ে আমার দেশের কাজ কিন্তু এক তিলও হবে না। তার চেয়ে তোমার অপূর্ব্ববাবুই ঢের ভাল। দেনা-পাওনার চুল-চেরা বিচার করতে করতে বোঝা-পড়া একদিন তোমাদের হয়ে যেতেও পারে। বরঞ্চ, তাই করগে।

ভারতী কহিল, তার মানে দেশকে আমি ভালবাসতে পারব না?

ডাক্তার হাসিমুখে কহিলেন, অনেক পরীক্ষা না দিলে কিন্তু ঠিক করে কিছুই বলা যায় না ভাই।

ভারতী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সহসা জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, এই তোমাকে আজ বলে রাখলাম দাদা, সমস্ত পরীক্ষাতেই আমি উত্তীর্ণ হতে পারবো। তোমার কাজের মধ্যে এত স্বার্থ, এত সংশয়, এতবড় ক্ষুদ্রতার স্থান নেই।

তাহার উত্তেজনায় ডাক্তার হাসিলেন, পরে ক্রীড়াচ্ছলে নিজের ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, হা আমার পোড়া কপাল! দেশ মানে কি বুঝে রেখেচ খানিকটা মস্ত বড় মাটি, নদ-নদী, আর পাহাড়? একটিমাত্র অপূর্ব্বকে নিয়েই জীবনে ধিক্কার জন্মে গেল, বৈরাগী হতে চাও, আর সেখানে কেবল শত সহস্র অপূর্ব্বই নয়, তার দাদারাও বিচরণ করেন। আরে পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিসম্পাতই তো হোলো কৃতঘ্নতা! যাদের সেবা করবে তারাই তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে, প্রাণ যাদের বাঁচবে, তারাই তোমাকে বিক্রী করে দিতে চাইবে। মূঢ়তা আর অকৃতজ্ঞতা প্রতি পদক্ষেপে তোমায় ছুঁচের মত বিঁধবে। শ্রদ্ধা নেই, স্নেহ নেই, সহানুভূতি নেই, কেউ কাছে ডাকবে না, কেউ সাহায্য করতে আসবে না, বিষধর সাপের মত তোমাকে দেখে লোকে দূরে সরে যাবে। দেশকে ভালবাসার এই আমাদের পুরস্কার, ভারতী, এর বেশি দাবী করবার কিছু যদি থাকে ত সে শুধু পরলোকে। এতবড় ভয়ানক পরীক্ষা তুমি কিসের জন্যে দিতে যাবে বোন? বরঞ্চ, আশীর্ব্বাদ করি অপূর্ব্বকে নিয়ে তুমি সুখী হও, আমি নিশ্চয় জানি, তার সকল দ্বিধা, সকল সংস্কার ছাপিয়ে তোমার মূল্য একদিন তার চোখে পড়বেই পড়বে।

ভারতীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তে নীরবে নতমুখে থাকিয়া প্রবল চেষ্টায় তাহা নিবারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো না বলেই কোনোমতে আমাকে বিদায় করে দিতে চাও দাদা!

তাহার এই একান্ত সরল নিঃসঙ্কোচ প্রশ্নের এমনি সোজা উত্তরে বোধ হয় ডাক্তারের মুখে হাসি আসিল না, হাসিয়া বলিলেন, তোমার মত লক্ষ্মী মেয়ের মায়া কি সহজে কেউ কাটাতে পারে বোন? কিন্তু কাল স্বচক্ষেই ত দেখতে পেলে এর মধ্যে কত লুকোচুরি, কত হিংসে, কত মর্ম্মান্তিক ক্রোধ জড়িয়ে রয়েচে। তোমার পানে চাইলেই মনে হয় এ-সবের জন্যে তুমি নও, এর মধ্যে টেনে এনে তোমাকে ভাল কাজ হয়নি। শুধু তোমার কাছে কাজ আদায়ের আমার একটা দিন আছে, যেদিন ছুটি নেবার আমার তলব এসে পৌঁছবে।

ভারতী এবার আর তাহার চোখের জল বারণ করিতে পারিল না। কিন্তু তখনই হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, তুমিও আর এদের মধ্যে থেকো না দাদা।

তাহার কথা শুনিয়া ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, এবার কিন্তু বড় বোকার মত কথা হয়ে গেল ভারতী।

ভারতী অপ্রতিভ হইল না, কহিল, তা জানি, কিন্তু এরা সবাই যে ভয়ঙ্কর নির্দ্দয়।

আর আমি?

তুমিও ভারি নিষ্ঠুর।

সুমিত্রাকে কি রকম মনে হল ভারতী?

এই প্রশ্ন শুনিয়া ভারতীর মাথা হেঁট হইয়া গেল। লজ্জায় উত্তর দিতে সে পারিল না, কিন্তু উত্তরের জন্য তাগিদও আসিল না। কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। বেশিক্ষণ নয়, কিন্তু এইটুকু মাত্র মৌনতার অবকাশ পথ দিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য মানুষটির ততোধিক আশ্চর্য্য হৃদয়ের রহস্যাবৃত তলদেশে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল।

কিন্তু পরক্ষণেই ডাক্তার সমস্ত ব্যাপারটাকে চাপা দিয়া ফেলিলেন। সহসা ছেলেমানুষের মত মাথা নাড়িয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, অপূর্ব্বকে তুমি বড় অবিচার করেচ ভারতী। এতবড় মারাত্মক কাণ্ড এর ভেতর আছে সে বেচারা বোধ করি কল্পনাও করেনি। বাস্তবিক বলচি তোমাকে, এত ছোট, হীন সে কখনো নয়। চাকুরি করতে বিদেশে এসেচে, বাড়িতে মা আছে, ভাই আছে, দেশে বন্ধুবান্ধব আছে, সাংসারিক উন্নতি করে দশজনের একজন হবে এই তার আশা। লেখাপড়া শিখেচে, ভদ্রলোকের ছেলে, পরাধীনতার লজ্জা সে অনুভব করে। আরো দশজন বাঙালীর ছেলের মত সত্য সত্যই সে স্বদেশের কল্যাণ প্রার্থনা করে। তাই তুমি বললে যখন পথের দাবীর সভ্য হও, দেশের কাজ করো, সে বললে বহুৎ আচ্ছা! তোমার কথা শুনলে যে তার কখনো মন্দ হবে না এইটুকুই কেবল সে নিঃসংশয়ে বোঝে। এই বিদেশে সকল আপদ-বিপদে তুমিই তার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু সেই তুমিই যে হঠাৎ তাকে মরণের মধ্যে ঠেলে দেবে সে তার কি জানতো বল?

ভারতী অশ্রু গোপন করিতে মুখ নীচু করিয়া কহিল, কেন তুমি তার জন্যে এত ওকালতি কোরচ দাদা, তিনি তার যোগ্য নন। যে সব কথা তাঁর মুখ থেকে কাল শুনেচি, তারপরেও তাকে শ্রদ্ধা করা আর উচিত নয়।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, অনুচিত কাজই না হয় জীবনে একটা করলে। এই বলিয়া একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি ত চোখে দেখনি, ভারতী, কিন্তু আমি দেখেচি। তারা যখন তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধলে সে অবাক হয়ে রইল। তারা জিজ্ঞাসা করলে তুমি এই সমস্ত বলেচ? সে ঘাড় নেড়ে বললে, হাঁ। তারা বললে, এর শাস্তি—তোমাকে মরতে হবে। প্রত্যুত্তরে সে কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে

চেয়ে রইল। আমি ত জানি তার বিহ্বল দৃষ্টি তখন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তাই তোমাকে আনতে পাঠিয়েছিলাম বোন। এখন যাই কেন না সে বলে থাক, ভারতী, এ ধাক্কা বোধ হয় আজও অপূর্ব্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ভারতী আর আপনাকে সংবরণ করিতে পারিল না, ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, কেন আমাকে তুমি এই সব শোনাচ্ছ দাদা? তোমার চেয়ে কারও আশঙ্কা বেশি নয়, তাঁর আচরণে বেশি বিপদে তোমার চেয়ে কেউ পড়েনি। তবুও কেবল আমার মুখ চেয়ে তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি ঘরে বাইরে শত্রু তৈরি করলে!

ইস্? তাই বই কি?

তবে কিসের জন্যে তাঁকে বাঁচাতে গেলে বল ত?

বাঁচাতে গেলাম অপূর্ব্বকে? আরে ছি! আমি বাঁচাতে গেলাম ভগবানের এই অমূল্য সৃষ্টিটিকে। যে বস্তু তোমাদের মত এই দুটি সামান্য নরনারীকে উপলক্ষ্য করে গড়ে উঠেচে তার কি দাম আছে নাকি যে, ব্রজেন্দ্রের মত বর্ব্বরগুলোকে দেব তাই নষ্ট করে ফেলতে? শুধু এই ভারতী, শুধু এই! নইলে মানুষের প্রাণের মূল্য আছে না কি আমাদের কাছে? একটা কানাকড়িও না! এই বলিয়া ডাক্তার হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ভারতী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কি হাসো দাদা, তোমার হাসি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। আমার এমন ইচ্ছে করে যে, তোমাকে আঁচল চাপা দিয়ে কোন বনে-জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে চিরকাল লুকিয়ে রেখে দি। যারা ধরে তোমাকে ফাঁসি দেবে তারাই কি তোমার দাম জানে? তারা কি টের পাবে জগতের কি সর্ব্বনাশ তারা করলে? নিজের দেশের লোকই তোমাকে খুনে, ডাকাত, রক্তপিপাসু—কত কথাই না বলে? কিন্তু আমি ভাবি, বুকের মধ্যে এত স্নেহ এত করুণা নিয়ে তুমি কেমন করে এর মধ্যে আছ!

এবার ডাক্তার আর একদিকে চাহিয়া রহিলেন, সহসা জবাব দিতে পারিলেন না। তারপর মুখ ফিরাইয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এখন সেই স্বচ্ছন্দ সুন্দর হাসিটি মুখে ফুটিল না। কথা কহিলেন, কিন্তু সেই সহজ কণ্ঠস্বরে কোথা হইতে একটা অপরিচিত ভার চাপিয়া আসিল, কহিলেন, নিষ্ঠুরতা দিয়ে কি কখনো—আচ্ছা থাক্ সে কথা। তোমাকে একটা গল্প বলি। নীলকান্ত যোশী বলে একটি মারহাট্টা ছেলেকে তুমি দেখোনি, কিন্তু তোমাকে দেখে পর্য্যন্ত কেবলি আমার তাকেই মনে পড়ে। রাস্তা দিয়ে মড়া নিয়ে যেতে দেখলে তার চোখ দিয়ে জল পড়তো। একদিন রাত্রে কলম্বোর একটা পার্কের মধ্যে আমরা দুজনে বেড়া ডিঙিয়ে

আশ্রয় নিই। গাছতলার একটা বেঞ্চের উপর শুতে গিয়ে দেখি আর একজন শুয়ে আছে। মানুষের সাড়া পেয়ে সে জল জল করতে লাগলো, চারিদিকে ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরিয়েছে,—দেশলাই জেলে তার মুখের পানে তাকিয়েই বোঝা গেল, কলেরা। নীলকান্ত তার শুশ্রূষায় লেগে গেল। ফর্সা হয়ে আসে, বললাম, যোগী, লোকটা সন্ধ্যার অন্ধকারে যেমন করেই হোক পেয়াদাদের দৃষ্টি এড়িয়ে এই বাগানটায় রয়ে গেছে, কিন্তু সকালে তা হবে না। ওয়ারেণ্টের আসামী আমরা,—এ তো মরবেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও যে যেতে হবে। চল, সরি! নীলকান্ত কাঁদতে লাগলো, বললে, এ অবস্থায় একে কি করে ফেলে যাবো ভাই—তার চেয়ে বরঞ্চ তুমি যাও, আমি অনেক বুঝালাম, কিন্তু যোগীকে নড়াতে পারলাম না।

ভারতী সভয়ে কহিল, কি হ'ল তারপরে?

ডাক্তার কহিলেন, লোকটা বিবেচক ছিল, ভোর হবার পূর্ব্বেই চোখ বুঝলেন। তাই সে-যাত্রায় নীলকান্তকে নড়াতে পারলাম। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, সিঙ্গাপুরে যোগীর ফাঁসি হয়। পণ্টনের সিপাইদের নাম বলে দিলে ফাঁসিটা তার মাপ হ'তো—গভর্ণমেণ্ট থেকে অনেক প্রকার চেষ্টাই হয়েছিল, কিন্তু যোগী সেই যে ঘাড় নেড়ে বললে, আমি জানিনে, তার আর বদল হ'ল না। অতএব, রাজার আইনে তার ফাঁসি হল। অথচ, যাদের জন্যে সে প্রাণ দিলে, তাদের সে ভাল করে চিনতও না। এখনও সেই সব ছেলে এদেশেই জন্মায় ভারতী, তা নইলে বাকী জীবনটা তোমার আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকতেই হয়ত রাজি হয়ে পড়তাম।

প্রত্যুত্তরে ভারতী শুধু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। ডাক্তার কহিলেন, নরহত্যা আমার ব্রত নয় ভাই, তোমাকে সত্যিই বলচি, ও আমি চাইনে।

চাইতে না পারো, কিন্তু প্রয়োজন হলে?

প্রয়োজন হলে? কিন্তু ব্রজেন্দ্রের প্রয়োজন এবং সব্যসাচীর প্রয়োজন ত এক নয় ভারতী।

ভারতী বসিল, সে আমি জানি। আমি তোমার প্রয়োজনের কথাই জিজ্ঞাসা করচি দাদা।

প্রশ্ন শুনিয়া ডাক্তার ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। মনে হইল যেন উত্তর দিতে তিনি দ্বিধা বোধ করিতেছেন। তাহার পরে কতকটা যেন অন্যমনস্কের মত ধীরে ধীরে বলিলেন, কে জানে কবে আমার সেই পরম প্রয়োজনের দিন আসবে! কিন্তু, থাক্ ভারতী, এ তুমি জানতে চেয়ো না। তার চেহারা তুমি কল্পনাতেও সইতে পারবে না, বোন।

ভারতী এ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, কহিল, এ ছাড়া কি আর পথ নেই?

না।

তাঁহার মুখের এই সংশয়লেশহীন অকুণ্ঠিত উত্তর শুনিয়া ভারতী হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর 'না' সে সত্যই সহ্য করিতে পারিল না। ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, এ ছাড়া আর পথ নেই, এমন কিন্তু হতেই পারে না দাদা।

ডাক্তার মৃচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, না, পথ আছে বই কি! আপনাকে ভোলাবার অনেক রাস্তা আছে ভারতী, কিন্তু সত্যে পৌছবার আর দ্বিতীয় পথ নেই।

ভারতী স্বীকার করিতে পারিল না। শান্ত, মৃদু কণ্ঠে কহিল, দাদা, তুমি অশেষ জ্ঞানী। এই একটিমাত্র লক্ষ্য স্থির রেখে তুমি পৃথিবী ঘুরেবেড়িয়েচ, তোমার অভিজ্ঞতার অন্ত নেই। তোমার মত এত বড় মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি। আমার মনে হয় কেবল তোমার সেবা করেই আমি সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিতে পারি। তোমার সঙ্গে তর্ক সাজে না; কিন্তু বল আমার অপরাধ নেবে না।

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, কি বিপদ! অপরাধ নেব কিসের জন্য?

ভারতী তেমনি স্নিগ্ধ সবিনয়ে কহিতে লাগিল, আমি ক্রীশ্চান, শিশুকাল থেকে ইংরাজকেই আত্মীয় জেনে, বন্ধু জেনে বড় হয়ে উঠেচি, আজ তাদের প্রতিমন ঘৃণায় পূর্ণ করে তুলতে আমার ভারি কষ্ট হয়। কিন্তু তুমি ছাড়া এ কথা আমি কারও সুমুখেই বলতে পারিনে। অথচ, তোমাদেরই মতই আমি ভারতবর্ষের,—বাঙলা দেশের মেয়ে। আমাকে তুমি অবিশ্বাস করো না।

তাহার কথা শুনিয়া ডাক্তার আশ্চর্য্য হইলেন। সস্নেহে ডান হাতখানি তাহার মাথার উপরে রাখিয়া কহিলেন, এ আশঙ্কা কেন ভারতী? তুমি ত জানো তোমাকে আমি কত স্নেহ করি, কত বিশ্বাস করি।

ভারতী বলিল, জানি। আর তুমিও কি আমার ঠিক এই কথাই জান না দাদা? তোমার ভয় নেই, ভয় তোমাকে দেখানো যায় না, শুধু সেইজন্যেই কেবল তোমাকে বলতে পারিনি, এ বাড়িতে আর তুমি এসো না, কিন্তু এও জানি, আজকে রাত্রির পরে আর কখনো,–না না, তা নয়, হয়ত, অনেকদিন আর দেখা হবে না। সেদিন যখন তুমি সমস্ত ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ করলে, তখন প্রতিবাদ আমি করিনি, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নিরন্তর এই প্রার্থনাই করেচি, এত বড় বিদ্বেষ যেন না তোমার অন্তরের সমস্ত সত্য আচ্ছন্ন করে রাখে। দাদা, তবুও আমি তোমাদেরই।

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, হাঁ আমি জানি, তুমি আমাদেরই।

তা'হলে এ পথ তুমি ছাড়।

ডাক্তার চমকিয়া উঠিলেন, কোন পথ?

বিপ্লবীদের এই নির্ম্মম পথ।

কেন ছাড়তে বল?

ভারতী কহিল, তোমাকে মরতে দিতে আমি পারব না। সুমিত্রা পারে, কিন্তু আমি পারিনে। ভারতের মুক্তি আমরা চাই—অকপটে, অসঙ্কোচে, মুক্তকণ্ঠে চাই। দুর্ব্বল, পীড়িত, ক্ষুধিত ভারতবাসীর অন্নবস্ত্র চাই। মানুষ্য-জন্ম নিয়ে মানুষের একমাত্র কাম্য স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধি করতে চাই। ভগবানের এতবড় সত্যে উপস্থিত হবার এই নিষ্ঠুর পথ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই, এ আমি কোনমতেই ভাবতে পারিনে। পৃথিবী ঘুরে তুমি শুধু এই পথের খবরটাই জেনে এসেচ, সৃষ্টির দিন থেকে স্বাধীনতার তীর্থযাত্রী শত সহস্র লোকের পায়ে এ পথের চিহ্নটাই হয়ত তোমার চোখে স্পষ্ট হয়ে পড়েচে, কিন্তু বিশ্ব-মানবের একান্ত শুভ বুদ্ধি তার অনন্ত বুদ্ধির ধারা কি এমনই নিঃশেষ হয়ে গেছে যে এই রক্ত-রেখা ছাড়া আর কোন পথের সন্ধান কোনদিন তার চোখে পড়বে না? এমন বিধান কিছুতেই সত্য হ'তে পারে না। দাদা, মনুষ্যত্বের এতবড় পরিপূর্ণতা তুমি ছাড়া আর কোথাও আমি দেখিনি,—নিষ্ঠুরতার এই বারংবার চলা-পথে তুমি আর চলো না। দুয়ার হয়ত আজও রুদ্ধ আছে, তাই তুমি আমাদের জন্যে খুলে দাও—এ জগতের সবাইকে ভালবেসে আমরা তোমাকে অনুসরণ করে চলি।

ডাক্তার ম্লান-মুখে একটুখানি হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর ভারতীর মাথার 'পরে হাত রাখিয়া বার-দুই ধীরে ধীরে চাপড়াইয়া কহিলেন, আমার আর সময় নেই ভাই, আমি চললাম।

কোন উত্তর দিয়ে গেলে না, দাদা?

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু কহিলেন, ভগবান যেন তোমার ভাল করেন।—এই বলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেলেন।

২২

জলপথে শত্রু-পক্ষীয় জাহাজের গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে নদীর ধারে, সহরের শেষ প্রান্তে একটি ছোট রকমের মাটির কেল্লা আছে, এখানে সিপাহী-শান্ত্রী অধিক থাকে না, শুধু ব্যাটারি চালনা করিবার জন্য কিছু গোরা গোলন্দাজ ব্যারাকে বাস করে। ইংরাজের এই নির্ব্বিঘ্ন শান্তির দিনে এখানে বিশেষ কড়া-কড়ি ছিল না। নিষেধ আছে, অন্যমনস্ক পথিক কেহ তাহার সীমানার মধ্যে গিয়া পড়িলে তাড়া করিয়াও আসে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। ইহারই একধারে গাছ-পালার মধ্যে পাথরে বাঁধানো একটা ঘাটের মত আছে, হয়ত কোন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর আগমন উপলক্ষ্যে ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, কিন্তু এখন ইহার কাজও নাই, প্রয়োজনও নাই। ভারতী মাঝে মাঝে একাকী আসিয়া এখানে বসিত। কেল্লার রক্ষণাবেক্ষণের ভার যাহাদের প্রতি ছিল তাহাদের কেহ যে দেখে নাই তাহা নহে, সম্ভবতঃ স্ত্রীলোক বলিয়া এবং ভদ্র স্ত্রীলোক বলিয়াই আপত্তি করিত না। বোধ করি এইমাত্র সূর্য্যাস্ত হইয়া থাকিবে, কিন্তু অন্ধকার হইতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। নদীর কতক অংশে, এবং পরপারবর্ত্তী গাছপালার উপরে শেষ স্বর্ণাভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, দলে দলে পাখীর সারি এদিক হইতে ওদিকে উড়িয়া চলিয়াছে,—কাকের কালো দেহে, বকের সাদা পালকে, ঘুঘুর বিচিত্র পাণ্ডুর সর্ব্বাঙ্গে আকাশের রাঙা আলো মিশিয়া হঠাৎ যেন তাহাদিগকে কোন অজানা দেশের জীব করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি অনুসরণ করিয়া ভারতী নির্নিমেষচক্ষে চাহিয়া রহিল। কি জানি, কোথায় ইহাদের বাসা, কিন্তু সে অলক্ষ্য আকর্ষণ কাহারও এড়াইয়া যাইবার জো নাই। এই কথা মনে করিয়া দুই চক্ষু তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া চাহিয়া দেখিল দূর বৃক্ষশ্রেণীর সোনার দীপ্তি নিবিয়া আসিতেছে এবং মাথার উপরে গাছপালা নদীতে দীর্ঘতর ছায়াপাত করিয়া জল কালো করিয়া আনিয়াছে এবং তাহারই মধ্য হইতে অন্ধকার যেন সুদীর্ঘ জিহ্বা মেলিয়া সম্মুখের সমস্ত আলোক নিঃশব্দে লেহন করিয়া লইতেছে।

সহসা নদীর ডানদিকের বাঁক হইতে একখানি ক্ষুদ্র শাম্পান নৌকা সুমুখে উপস্থিত হইল। নৌকায় মাঝি ভিন্ন অন্য আরোহী ছিল না। সে চট্টগ্রামী মুসলমান। ক্ষণকাল ভারতীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার চট্টগ্রামের দুর্ব্বোধ্য মুসলমানী বাঙ্লায় কহিল, আম্মা, ওপারে যাবে? এক আনা পয়সা দিলেই পার করে দিই।

ভারতী হাত নাড়িয়া কহিল, না, ওপারে আমি যাবো না।

মাঝি বলিল, আচ্ছা, দুটো পয়সা দাও, চল।

ভারতী কহিল, না বাপু, তুমি যাও! বাড়ি আমার এপারে, ওপারে যাবার আমার দরকার নেই।

মাঝি গেল না, একটু হাসিয়া কহিল, পয়সা না হয় নাই দেবে, চল তোমাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি। এই বলিয়া সে ঘাটের একধারে নৌকা ভিড়াইতে উদ্যত হইল। ভারতী ভয় পাইল, গাছ-পালার মধ্যে স্থানটা অন্ধকার এবং নির্জ্জন। দীর্ঘদিন এদেশে থাকার জন্য ইহাদের ভাষা বলিতে না পারিলেও ভারতী বুঝিত। এবং ইহাও জানিত চট্টগ্রামের এই মুসলমান মাঝি-সম্প্রদায় অতিশয় দুর্বৃত্ত। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, তুমি যাও বলচি এখান থেকে, নইলে পুলিশ ডাকবো।

তাহার উচ্চ কণ্ঠ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে বোধ হয় চট্টগ্রামী মুসলমান এবার ভয় পাইয়া থামিল। ভারতী চাহিয়া দেখিল লোকটার বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ পার হইয়াছে, কিন্তু সখ যায় নাই। পরণে লতা-পাতা ফুল-কাটা লুঙ্গী, কিন্তু তেলে ও ময়লায় অত্যন্ত মলিন। গায়ে মূল্যবান মিলিটারী ফ্রক কোট, জরির পাড়, কিন্তু যেমন নোংরা তেমনি জীর্ণ। বোধহয় কোন পুরাতন জামা-কাপড়ের দোকান হইতে কেনা। মাথায় বেলদার নেকড়ার টুপি, কপাল পর্য্যন্ত টানা। এই মূর্ত্তির প্রতি রোষদৃপ্তচক্ষে চাহিয়া ভারতী কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দাদা, চেহারা যাই হোক, কিন্তু গলার আওয়াজটাকে পর্য্যন্ত বদলে মুসলমান করে ফেলেচ।

মাঝি কহিল, যাবে না, পুলিশ ডাকবে?

ভারতী কহিল, পুলিশ ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেওয়াই উচিত। অপূর্ব্ববাবুর ইচ্ছেটা আর অপূর্ণ রাখি কেন!

মাঝি কহিল, তার কথাই বলচি। এসো জোয়ার আর বেশি নেই, এখনো কোশ দুই যেতে হবে।

ভারতী নৌকায় উঠিল, ঠেলিয়া দিয়া ডাক্তার পাকা মাঝির মতই দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। যেন দুইখানা দাঁড় টানাই তাঁহার পেশা। কহিলেন, লামা জাহাজ চলে গেল দেখলে?

ভারতী কহিল, হ্যাঁ।

ডাক্তার কহিলেন, অপূর্ব্ব এই দিকেই ফার্স্ট'ক্লাস ডেকে দাঁড়িয়েছিল দেখতে পেলে?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

ডাক্তার কহিলেন, তার বাসায় কিংবা আফিসে আমার যাবার জো ছিল না, তাই জেটির একধারে শাম্পান বেঁধে আমি ওপরে দাঁড়িয়েছিলাম। হাত তুলে সেলাম করতেই—

ভারতী ব্যাকুল হইয়া কহিল, কার জন্যে কিসের জন্যে এতবড় ভয়ানক কাজ করতে গেলে দাদা? প্রাণটা কি তোমার একেবারেই ছেলেখেলা।

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না একেবারেই না। আর গেলাম কিসের জন্যে? ঠিক সেইজন্যে যে জন্যে তুমি চুপটি করে এখানে একলা বসে আছ বোন।

ভারতী উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন কিছুতেই চাপিতে পারিল না। কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, কখ্খনো না। এখানে আমি এমনি এসেচি—প্রায় আসি। কারও জন্যে আমি কখ্খনো আসিনি। তোমাকে চিনতে পারলেন?

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, না, একেবারেই না। এ বিদ্যে আমার খুব ভাল করেই শেখা,—এ দাড়ি-গোঁফ ধরা সহজ কর্ম্ম নয়, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে ছিল অপূর্ব্ববাবু যেন আমাকে চিনতে পারেন। কিন্তু এত ব্যস্ত যে তার সময় ছিল কই?

ভারতী নীরবে চাহিয়া ছিল, সেই অত্যন্ত উৎসুক মুখের প্রতি চাহিয়া ক্ষণকালের জন্য ডাক্তার নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, তারপরে কি হ'ল।

ডাক্তার বলিলেন, বিশেষ কিছুই না।

ভারতী চেষ্টা করিয়া একটু হাসিয়া কহিল, বিশেষ কিছু যে হয়নি সে শুধু আমার ভাগ্য। চিনতে পারলেই তোমায় ধরিয়ে দিতেন, আর সে অপমান এড়াবার জন্যে আমাকে আত্মহত্যা করতে হ'তো। চাকরি যাক, কিন্তু প্রাণটা বাঁচলো? এই বলিয়া সে দূর পরপারে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া নিশ্বাস মোচন করিল।

ডাক্তার নীরবে নৌকা বাহিয়া চলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া ভারতী সহসা মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কি ভাবচ দাদা? বল ত দেখি?

বলব? তুমি ভাবছো এই ভারতী মেয়েটি আমার চেয়ে ঢের বেশি মানুষ চিনতে পারে। নিজের প্রাণ বাঁচাতে কোন শিক্ষিত লোকই যে এত বড় হীনতা স্বীকার করতে পারে,—লজ্জা নেই, কৃতজ্ঞতা নেই, মায়াদয়া নেই,—খবর দিল না, খবর নেবার এতটুকু চেষ্টা করলে না,—ভয়ের তাড়নায় একেবারে জন্তুর মত ছুটে পালিয়ে গেল, এ কথা আমি কল্পনা করতেও পারিনি, কিন্তু ভারতী একেবারে নিঃসংশয়ে জেনেছিল! ঠিক এই না? সত্যি ব'লো।

ডাক্তার ঘাড় ফিরাইয়া নিরুত্তরে দাঁড় টানিয়া চলিতে লাগিলেন, কিছুই বলিলেন না।

আমার দিকে একবার চাও না দাদা।

ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই ভারতীর দুই ঠোঁট থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কহিল, মানুষ হয়ে মনুষ্য-জন্মের কোথাও কোন বালাই নেই, এমন কি করে হয় দাদা? এই বলিয়া সে দাঁত দিয়া জোর করিয়া তাহার ওষ্ঠাধারের কম্পন নিবারণ করিল, কিন্তু দুই চোখের কোন বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ডাক্তার সায় দিলেন না, প্রতিবাদ করিলেন না, সান্ত্বনার একটি বাক্যও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কেবল পলকের জন্য যেন মনে হইল তাঁহার সুর্মাটানা চোখের দীপ্তি ঈষৎ স্তিমিত হইয়া আসিল।

ইরাবতীর এই ক্ষুদ্র শাখানদী অগভীর ও অপ্রশস্ত বলিয়া স্টীমার বা বড় নৌকা সচরাচর চলিত না। জেলেদের মাছ ধরার পানসি কিনারায় বাঁধা মাঝে মাঝে দেখা গেল, কিন্তু লোকজন কেহ ছিল না। মাথার উপরে তারা দেখা দিয়াছে, নদীর জল কালো হইয়া উঠিয়াছে, নির্জ্জন ও পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে ডাক্তারের সতর্ক চালিত দাঁড়ের সামান্য একটুখানি শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ কোথাও ছিল না। উভয় তীরের বৃক্ষশ্রেণী যেন সম্মুখে এক হইয়া মিশিয়াছে। তাহারই ঘনবিন্যস্ত শাখা-পল্লবের অন্ধকার অভ্যন্তরে সজল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভারতী নীরবে স্থির হইয়া বসিয়াছিল। তাহাদের শাম্পান যে কোন্ ঠিকানায় চলিয়াছিল ভারতী জানিত না, জানিবার মত উৎসুক সচেতন মনের অবস্থাও তাহার ছিল না, কিন্তু সহসা প্রকাণ্ড একটা গাছের অন্তরালে গুল্ম-লতা-পাতা-সমাচ্ছন্ন অতি সঙ্কীর্ণ খাদের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র তরী প্রবেশ করিল দেখিয়া সে চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

ডাক্তার কহিলেন, আমার বাসায়।

সেখানে আর কে থাকে?

কেউ না।

কখন আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবে?

পৌঁছে দেব? আজ রাত্রির মধ্যে যদি না দিতে পারি কাল সকালে যেয়ো।

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, না দাদা, সে হবে না। তুমি আমাকে যেখান থেকে এনেচ সেখানে ফিরে রেখে এস।

কিন্তু আমার যে অনেক কথা আছে ভারতী!

ভারতী ইহার জবাব দিল না, তেমনি মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইয়া বলিল, না, আমাকে তুমি ফিরে রেখে এস।

কিন্তু কিসের জন্য ভারতী? আমাকে কি তোমার বিশ্বাস হয় না?

ভারতী অধোমুখে নিরুত্তর হইয়া রহিল।

ডাক্তার কহিলেন, এমন কত রাত্রি ত তুমি একাকী অপূর্ব্বর সঙ্গে কাটিয়েচ, সে কি আমার চেয়েও তোমার বেশি বিশ্বাসের পাত্র?

ভারতী তেমনি নির্ব্বাক হইয়াই রহিল, হাঁ না কোন কথাই কহিল না। খালের এই স্থানটা যেমন অন্ধকার তেমনি অপ্রশস্ত। দু'ধারের গাছের ডাল মাঝে মাঝে তাহার গায়ে আসিয়া ঠেকিতে লাগিল। এদিকে নদীতে ভাটার উল্টা টান শুরু হইয়া গেছে,—ডাক্তার খোলের মধ্যে হইতে লণ্ঠন বাহির করিয়া জালিয়া সম্মুখে রাখিলেন এবং দাঁড় রাখিয়া দিয়া একটা সরু বাঁশ হাতে লইয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিলেন, আজ যেখানে তোমাকে নিয়ে যাচ্চি ভারতী, দুনিয়ায় কেউ নেই সেখান থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু আমার মনের কথা বুঝতে বোধ হয় তোমার আর বাকী নেই? এই বলিয়া তিনি হাঃ হাঃ করিয়া যেন জোর করিয়া হাসিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাঁহার মুখের চেহারা ভারতী দেখিতে পাইল না, কিন্তু তাঁহার হাসির স্বরে কে যেন অকস্মাৎ তাহার ভিতর হইতে তাহাকে ধিক্কার দিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া নিঃশঙ্ককণ্ঠে কহিল, তোমার মনের কথা বুঝতে পারি এত বুদ্ধি আমার নেই। কিন্তু তোমার চরিত্রকে আমি চিনি। একলা থাকা আমার উচিত নয় বলেই ওকথা বলেচি দাদা, আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

ডাক্তার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া স্বাভাবিক শান্তকণ্ঠে কহিলেন, ভারতী, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হয়। তুমি আমার বোন, আমার দিদি, আমার মা—এ বিশ্বাস নিজের 'পরে না থাকলে এ পথে আমি আসতাম না। কিন্তু তোমার মূল্য দিতে পারে এ সংসারে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। এর শতাংশের এক অংশও অপূর্ব্ব যদি কোনদিন বোঝে ত জীবনটা তার সার্থক হয়ে যাবে। দিদি, সংসারের মধ্যে তুমি ফিরে যাও,—আমাদের ভেতরে আর তুমি থেকো না। কেবল তোমার কথাটাই বলবার জন্যে আজ অপূর্ব্বর সঙ্গে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। আজ একটা কথাও না বলিয়া অপূর্ব্ব চলিয়া গেছে। চাকরি করিতে বর্ম্মায় আসিয়াছিল, মাঝে ক'টা দিনেরই বা পরিচয়!

সে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহার দেশ আছে, সমাজ আছে, বাড়ি-ঘর আত্মীয়-স্বজন কত কি! আর অস্পৃশ্য ক্রীশ্চানের মেয়ে ভারতী! দেশ নাই, গৃহ নাই, মা-বাপ নাই, আপনার বলিতে কোথাও কেহ নাই। এ পরিচয় যদি সাজ

হইয়াই থাকে ত অভিযোগের কি-ই বা আছে! ভারতী তেমনি নিঃশব্দেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, কেবল অন্ধকারে দুই চক্ষু বাহিয়া তাহার অবিরল জল পড়িতে লাগিল।

অনতিদূরে গাছপালার মধ্যে হইতে সামান্য একটু আলো দেখা গেল। ডাক্তার দেখাইয়া কহিলেন, ঐ আমার বাসা। এই বাঁকটা পেরোলেই তার দোরগোড়ায় গিয়ে উঠবো। খুব ফ্রি ছিলাম, কি একরকম মায়ায় জড়িয়ে গেলাম, ভারতী, তোমার জন্যেই আমার ভাবনা। কোনো একটা নিরাপদ আশ্রয় পেয়েচ শুধু এইটুকু যদি যাবার আগে দেখে যেতে পারতাম!

ভারতী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। বলিল, আমি ত ভালই আছি, দাদা।

ডাক্তারের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। এই বস্তুটা এতই অসাধারণ যে, ভারতীর কানে গিয়া তাহা বিঁধিল। কহিলেন, কোথায় ভাল আছ ভাই? আমার লোক এসে বললে তুমি ঘরে নেই। ভাবলাম জেটির উপরে কোথাও এক জায়গায় তোমাকে পাবো, পেলাম না বটে, কিন্তু তখনি নিশ্চয় মনে হ'ল এই নদীর ধারে কোথাও-না-কোথাও দেখা তোমার মিলবেই। দুর্ভাগ্য তোমার আনন্দই শুধু চুরি করে পালায়নি, ভারতী, তোমার সাহসটুকু পর্য্যন্ত নষ্ট করে দিয়ে গেছে।

এ কথার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া ভারতী নীরব হইয়া রহিল। ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, সেদিন রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে আমাকে বিছানা ছেড়ে দিয়ে তুমি নীচে শুলে। হেসে বললে, দাদা, তুমি কি আবার মানুষ যে তোমাকে আমার লজ্জা বা ভয়? তুমি ঘুমোও। কিন্তু আজ আর সে সাহস নেই। বিশেষ নির্ভর করবার লোক অপূর্ব্ব নয়, তবু সে কাছেই ছিল বলে কালও হয়ত এ আশঙ্কা তোমার মনেও হ'তো না। আশ্চর্য্য এই যে তোমার মত মেয়েরও নির্ভর স্বাধীনতাকে তার মত একটা অক্ষম লোকেও না কত সহজেই ভেঙে দিয়ে যেতে পারে!

ভারতী মৃদুকণ্ঠে কহিল, কিন্তু উপায় কি দাদা?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, উপায় হয়ত নেই। কিন্তু আমি ভাবছি বোন, চরিত্রকে তোমার সন্দেহ করতে আজ কেউ কাছে নেই বলে তোমার নিজের মনটাই যদি অহরহ তোমাকে সন্দেহ করে বেড়ায় তুমি বাঁচবে কি করে? এমন করে ত কারও প্রাণ বাঁচে না ভারতী।

এমন করিয়া ভারতী আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই। তাহার সময় ছিলই বা কই! তাহার শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না, কিন্তু সে নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, আমি আর একটি মেয়েকে জানি, সে জাতে রুশ। কিন্তু তার কথা থাক্। কবে তোমাদের আবার দেখা হবে আমি জানিনে, কিন্তু

মনে হয় যেন একদিন হবে। বিধাতা করুন, হোক। তোমার ভালবাসার তুলনা নেই, সেখান থেকে অপূর্ব্বকে কেউ সরাতে পারবে না, কিন্তু নিজেকে তার গ্রহণ-যোগ্য করে রাখবার আজ থেকে এই যে জীবনব্যাপী অতি-সতর্ক সাধনা শুরু হবে, তার প্রতিদিনের অসম্মানের গ্লানি মনুষ্যত্বকে যে তোমার একেবারে খর্ব্ব করে দেবে ভারতী! হায় রে! এমন চিরশুদ্ধ হৃদয়ের মূল্য যেখানে নেই, সেখানে এমনি করে বোঝাতে হয়! পদ্মফুল চিবিয়ে না খেয়ে যারা তৃপ্তি মানে না, দেহের শুদ্ধতা দিয়ে এমনি করেই কান মলে তার কাছে দাম আদায় হয়। হবেও হয়ত। কি জানি, কপালে বাঁচবার মিয়াদ ততদিন আমার আছে কি না, কিন্তু যদি থাকে দিদি, বোন বলে গর্ব্ব করবার তখন সব্যসাচীর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে তাহলে কি করতে বল? তুমিই ত আমাকে বারংবার বলেচ সংসারের মধ্যে ফিরে যেতে।

কিন্তু মাথা হেঁট করে যেতে ত বলিনি।

ভারতী বলিল, কিন্তু মেয়েমানুষের উঁচু মাথা ত সবাই পছন্দ করে না দাদা।

ডাক্তার বলিলেন, তবে যেয়ো না।

ভারতী ম্লানমুখে হাসিয়া বলিল, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো দাদা, যাওয়া আমার হবে না। সমস্ত পথ নিজের হাতে বন্ধ করে কেবল একটি পথ খুলে রেখেছিলাম, সেও আজ বন্ধ হয়ে গেছে এ তো তুমি নিজের চোখেই দেখে এসেচ। এখন, যে পথ আমাকে দেখিয়ে দেবে সেই পথেই চলবো; কেবল এইটুকু মিনতি আমার রেখো, তোমাদের ভয়ঙ্কর পথে আমাকে তুমি ডেকো না। ভগবানের মত দুষ্প্রাপ্য বস্তু পাবারও এত রাস্তা বেরিয়েচে, শুধু তোমার লক্ষ্যে পৌঁছিবারই রক্তপাত ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই? আমার একান্ত মনের বিশ্বাস মানুষের বুদ্ধি একেবারে শেষ হয়ে যায় নি, কোথাও-না-কোথাও অন্য পথ আছেই আছে। এখন থেকে তারই সন্ধানে আমি পথে বার হবো। ভয়ানক দুঃখ যে কি সে-রাত্রে আমি টের পেয়েছি, যেদিন তোমরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলে।

ডাক্তার হাসিলেন, কহিলেন, এই আমার বাসা। এই বলিয়া ক্ষুদ্র নৌকা জোর করিয়া ডাঙ্গায় ঠেলিয়া দিয়া অবতরণ করিলেন এবং লণ্ঠন হাতে তুলিয়া লইয়া পথ দেখাইয়া কহিলেন, জুতো খুলে নেমে এসো। পায়ে একটু কাদা লাগবে।

ভারতী নিঃশব্দে নামিয়া আসিল। গোটা-চারেক মোটা মোটা সেগুন কাঠের খুঁটির উপর পুরাতন ও প্রায় অব্যবহার্য্য তক্তা মারিয়া একটা কাঠের বাড়ি খাড়া করা হইয়াছে। জোয়ারের জল সরিয়া গিয়া সমস্ত তলাটা একহাঁটু পাঁক পড়িয়াছে, লতা-পাতা, গাছ-পালা পচার দুর্গন্ধে বাতাস পর্য্যন্ত ভারী হইয়া উঠিয়াছে, সুমুখের

হাত দুই পরিসর পথটুকু ছাড়া চারদিক কেয়া ও দেনো গাছের এমনি দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঘেরিয়া আছে যে, শুধু সাপ-খোপ বাঘ-ভালুক নয়, একপাল হাতী লুকাইয়া থাকিলেও দেখিবার জো নাই। ইহার ভিতরে যে মানুষ বাস করিতে পারে তাহা চোখে না দেখিলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু এই লোকটির কাছে সকলই সম্ভব। ভাঙা কাঠের সিঁড়ি ও দড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতে একটি সাত-আট বছরের ছেলে আসিয়া যখন দ্বার খুলিয়া দিল, তখন ভারতী বিস্ময়ে বাক্যহীন হইয়া রহিল। ভিতরে পা বাড়াইতেই দেখিতে পাইল মেঝের উপর চাটাই পাতিয়া শুইয়া একজন অল্পবয়স্কা বর্মী স্ত্রীলোক, তিন-চারটি ছেলেমেয়ে যে যেখানে পড়িয়া, ইহাদেরই একজন ঘরের মধ্যে বোধ হয় একটা অপকর্ম্ম করিয়া রাখিয়াছে,—খুব সম্ভব অনাবশ্যক বোধেই তাহা পরিষ্কৃত হয় নাই ·· একটা দুঃসহ দুর্গন্ধে গৃহের বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মেঝের সর্ব্বত্র ছড়ানো ভাত, মাছের কাঁটা এবং পিঁয়াজ-রসুনের খোলা, নিকটেই গোটা-দুই-তিন কালি-মাখা ছোট-বড় মাটির হাঁড়ি, ছেলেগুলো হাত ডুবাইয়া খাবলাইয়া ভাত-তরকারী খাইয়াছে তাহা চাহিলেই বুঝা যায়; ইহারই পাশ দিয়া ভারতী ডাক্তারের পিছু পিছু আর একটা ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোথাও কোন আসবাবের বালাই নাই, মেঝের উপর চাটাই পাতা, একধারে একটা সতরঞ্চি গুটান ছিল, ডাক্তার স্বহস্তে ঝাড়িয়া তাহা পাতিয়া দিয়া ভারতীকে বসিতে দিলেন। ভারতী নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া দেখিল সেই পরিচিত প্রকাণ্ড বোঁচকাটি ডাক্তারের একপাশে রহিয়াছে। অর্থাৎ সত্য সত্যই ইহার এই ঘরটিই বর্ত্তমান বাসস্থান। ও-ঘর হইতে বর্মী স্ত্রীলোকটি কি একটা জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার বর্মী ভাষাতেই তাহার জবাব দিলেন। অনতিকাল পরেই সেই ছেলেটা সানকিতে করিয়া দু-চাঙড় ভাত, পেয়ালায় ঝোল এবং পাতায় করিয়া খানিকটা মাছ-পোড়া আনিয়া একধারে রাখিয়া দিয়া গেল। নৌকার লণ্ঠনটি ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহারই আলোকে এই সকল খাদ্যবস্তুর প্রতি চাহিবামাত্রই ভারতীর গা বমি-বমি করিয়া উঠিল।

ডাক্তার কহিলেন, তোমারও বোধ হয় ক্ষিধে পেয়েচে, কিন্তু এ-সব—

ভারতীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, কিন্তু সে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না, না, কিছুতে না। সে ক্রীশ্চান মেয়ে, জাতিভেদ মানে না, কিন্তু যেখান হইতে যেভাবে এই সকল আনীত হইল তাহা ত সে আসিবার পথেই চোখে দেখিয়া আসিয়াছে।

ডাক্তার কহিলেন, আমার কিন্তু ক্ষিদে পেয়েচে ভাই, আগে পেটটা ভরিয়ে নিই। এই বলিয়া তিনি হাত ধুইয়া স্মিতমুখে আহারে বসিয়া গেলেন। ভারতী

চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, ঘৃণায় ও অপরিসীম ব্যথায় মুখ ফিরাইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতর হইতে কান্না যেন সহস্রধারে ফাটিয়া পড়িতে চাহিল। হায়রে দেশ! হায়রে মুক্তির পিপাসা! জগতে কিছুই ইহারা আর আপনার বলিয়া অবশিষ্ট রাখে নাই। এই গৃহ, এই খাদ্য, এই ঘৃণিত সংস্রব, এমনি করিয়া এই বন্য পশুর জীবন-যাপন, ক্ষণকালের জন্য মৃত্যুও ভারতীর অনেক সুসহ বলিয়া মনে হইল। সে হয়ত অনেকেই পারে, কিন্তু এই যে দেহ-মনের অবিশ্রাম নির্য্যাতন, আপনাকে আপনি স্বেচ্ছায় পলে পলে এই যে হত্যা করিয়া চলার দুঃসহ সহিষ্ণুতা, স্বর্গে-মর্ত্ত্যে কোথাও কি ইহার তুলনা আছে! অধীনতার বেদনা কি ইহাদের এ-জীবনের আর সমস্ত বেদনা-বোধই একেবারে ধুইয়া দিয়াছে! কিছুই কোথাও বাকি নাই। তাহার অপূর্ব্বকে মনে পড়িল। তাহার চাকরির শোক, তাহার বন্ধু-মহলে হাতের কালশিরার লজ্জা,—ইহারাই ত মাতার সহস্রকোটি সন্তান! ইহারাই ত দেশের মেরু-মজ্জা, খাইয়া পরিয়া পাশ করিয়া, চাকরিতে কৃতকার্য্য হইয়া যাহাদের একটানা জীবন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরম নিরাপদে কাটিতেছে। আর ওই যে লোকটি একান্ত তৃপ্তিতে নির্ব্বিকার-চিত্তে বসিয়া ভাত গিলিতেছে—ভারতীর মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল, হিমাচলের কাছে সহস্র খণ্ড উপলের তিলার্দ্ধ বেশি তাহারা নয়। আর তাহাদেরই একজনকে ভালবাসিয়া, তাহারই ঘরে গৃহণীপণার বঞ্চিত দুঃখে আজ সে বুক ফাটিয়া মরিতেছে। অকস্মাৎ ভারতী জোর করিয়া বলিয়া উঠিল, দাদা, তোমার নির্দ্দিষ্ট ওই রক্তারক্তির পথ কিছুতেই ভাল নয়। অতীতের যত নজিরই তুমি দাও—যা অতীত, যা বিগত, সে-ই চিরদিন শুধু অনাগতের বুক চেপে তাকে নিয়ন্ত্রিত করবে, মানব-জীবনে এ বিধান কিছুতেই সত্য নয়। তোমার পথ নয়, কিন্তু তোমার এই সকল বিসর্জ্জন-দেওয়া দেশের সেবাই আমি আজ থেকে মাথায় তুলে নিলাম। অপূর্ব্ববাবু সুখে থাকুন, তাঁর জন্যে আর আমি শোক করিনে, আমার বাঁচবার মন্ত্র আজ আমি চোখে দেখতে পেয়েচি।

ডাক্তার সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া ভাতের ডেলার মধ্যে হইতে অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হ'ল ভারতী?

২৩

হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া ডাক্তার তাঁহার বোঁচকার উপরে চাপিয়া বসিলেন। পূর্ব্বোক্ত ছেলেটি মস্ত মোটা একটা বর্ম্মী সিগার টানিতে টানিতে ঘরে ঢুকিল এবং কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া নাক-মুখ দিয়া অপর্য্যাপ্ত ধূম উদ্গীরণ করিয়া চুরুটটি ডাক্তারের হাতে দিয়া প্রস্থান করিল। ভারতীর মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন অনুভব করিয়া ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, অমনি পেলে আমি সংসারে কিছুই বাদ দিতে ভালবাসিনে ভারতী। অপূর্ব্বর কাকাবাবু আমাকে যখন রেঙ্গুনের জেটিতে প্রথম গ্রেপ্তার করেন, তখন পকেট থেকে আমার গাঁজার কলকে বার হয়ে পড়েছিল। নইলে, বোধ হয় ছুটি পেতাম না। এই বলিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

ভারতী এ ঘটনা শুনিয়াছিল, কহিল, সে আমি জানি এবং হাজার ছুটি পেলেও যে ওটা তুমি খাও না তা-ও জানি। কিন্তু এ বাড়িটি কার দাদা?

আমার।

আর এই বর্ম্মী মেয়েটি এবং শিশুগুলি?

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, না ওঁরা আমার একটি মুসলমান বন্ধুর সম্পত্তি। আমারি মত ফাঁসি-কাঠের আসামী, কিন্তু সে অন্য বাবদে। সম্প্রতি স্থানান্তরে গেছেন, পরিচয় ঘটবার সুযোগ হবে না।

ভারতী কহিল, পরিচয়ের জন্য আমি ব্যাকুল নই; কিন্তু সর্ব্বদিক থেকে তুমি যে স্বর্গপুরীতে এসে আশ্রয় নিয়েচ, তার থেকে আমাকে বাসায় রেখে এসো দাদা, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসচে।

ডাক্তার হাসিমুখে জবাব দিলেন, এ স্বর্গপুরী যে তোমার সইবে না, সে তোমাকে আনবার পূর্ব্বেই আমি জানতাম। কিন্তু তোমাকে বলবার আমার যত কথা ছিল, সে তো এই স্বর্গপুরী ছাড়া প্রকাশ করবারও আর দ্বিতীয় স্থান নেই ভারতী। আজ তোমাকে একটুখানি কষ্ট পেতেই হবে।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি শীঘ্রই আর কোথাও যাবে?

ডাক্তার কহিলেন, হ্যাঁ। উত্তর এবং পূর্ব্বের দেশগুলো আর একবার ঘুরে আসতে হবে। ফিরতে হয় ত বছর দুই লাগবে। কিন্তু আজ তুমি নানারকমে এত ব্যথা পেয়েচ বোন, যে সকল কথা বলতে আমার লজ্জা হয়। কিন্তু আজকের রাত্রির পরে আর যে সহজে তোমাকে দেখা দিতে পারবো সে ভরসাও করিনে।

কথা শুনিয়া ভারতী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কহিল, তুমি কি তা'হলে কালই চলে যাচ্ছো?

ডাক্তার মৌন হইয়া রহিলেন। ভারতী মনে মনে বুঝিল ইহার আর পরিবর্ত্তন নাই। তারপরে এই রাত্রিটুকু অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই এ দুনিয়ায় সে একেবারে একাকী। খোঁজ করিবারও কেহ থাকিবে না!

ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, হাঁটা-পথে আমাকে দক্ষিণ চীনের ক্যানটনের ভিতর দিয়ে এগোতে হবে। আর ও-পথে কর্ম্ম-সূত্রে যদি না আমেরিকায় গিয়ে পড়ি ত প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলো ঘুরে আবার এই দেশেতেই এসে আশ্রয় নেব। তারপরে আগুন যদি না জ্বলে, আমি এইখানেই রইলাম ভারতী। একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর ফিরতে যদি না-ই পারি বোন, বোধ হয় খবর একটা পাবেই।

এই মানুষটির শান্তকণ্ঠের সহজ কথাগুলি কতই সামান্য, কিন্তু ইহার ভয়ঙ্কর চেহারা ভারতীর চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, হাঁটা-পথে চীনদেশে যাওয়া যে কত ভয়ানক সে আমি শুনেচি। কিন্তু তুমি মনে মনে হেসো না দাদা, আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাইনি, কতটুকু তোমাকে আমি চিনি। কিন্তু, বেরিয়েই যদি যাও, এইখানেই আবার কেন ফিরে আসতে চাও? তোমার নিজের জন্মভূমিতে কি তোমার কাজ নেই?

ডাক্তার কহিলেন, তাঁরই কাজের জন্যে আমি এদেশ ছেড়ে সহজে যাবো না। মেয়েরা এ দেশের স্বাধীন, স্বাধীনতার মর্ম্ম তারা বুঝবে। তাদের আমার বড় প্রয়োজন। আগুন যদি কখনো এদেশে জ্বলেছে দেখতে পাও, যেখানেই থাকো ভারতী, এই কথাটা আমার তখন স্মরণ ক'রো, এ আগুন মেয়েরাই জ্বেলেচে। কথাটা আমার মনে থাকবে ত?

এই ইঙ্গিত ভারতী বুঝিল, কহিল, কিন্তু তোমার পথের পথিক ত আমি নই!

ডাক্তার কহিলেন, তা আমি জানি। কিন্তু পথ তোমার যাই কেন না হোক, বড় ভাইয়ের কথাটা স্মরণ করতে ত দোষ নেই,—তবু ত দাদাকে মাঝে মাঝে মনে পড়বে!

ভারতী কহিল, বড় ভাইকে মনে পড়বার আমার অনেক জিনিস আছে। কিন্তু এমনি করেই বুঝি তোমার বিপথে মানুষকে তুমি টেনে আনো দাদা। আমাকে কিন্তু তা পারবে না। এই বলিয়া সহসা সে উঠিয়া পড়িল এবং গুটানো সতরঞ্চিটা ঝাড়িয়া পাতিয়া দিয়া বাঁশের আলনা হইতে কম্বল বালিশ প্রভৃতি পাড়িয়া লইয়া স্বহস্তে শয্যা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, অপূর্ব্ববাবুর জাহাজের চাকা আজ আমাকে যে পথের সন্ধান দিয়ে গেছে, এ জীবনে সেই আমার

একটিমাত্র পথ! আবার যেদিন দেখা হবে, এ কথা তুমিও সেদিন স্বীকার করবে।

ডাক্তার ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন হঠাৎ এ আবার কি শুরু করে দিলে ভারতী? ঐ ছেঁড়া কম্বলটুকু কি আমি নিজে পেতে নিতে পারতাম না? এর ত কোন দরকার ছিল না।

ভারতী কহিল, তোমার ছিল না বটে, কিন্তু আমার ছিল। যার জন্যে যখনই বিছানা পাতি দাদা, তোমার ওই ছেঁড়া কম্বলটুকু আর কখনো ভুলব না। মেয়েমানুষের জীবনে এরও যদি না দরকার থাকে ত কিসের আছে বলে দিতে পারো?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, এর জবাব আমি দিতে পারলাম না বোন, তোমার কাছে আমি হার মানচি। কিন্তু তুমি ছাড়া নিজের পরাজয় আমাকে কোন দিন কোন মেয়েমানুষের কাছেই স্বীকার করতে হয়নি।

ভারতী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, সুমিত্রাদিদির কাছেও না?

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না।

শয্যা প্রস্তুত হইলে ডাক্তার তাঁহার বোঁচকার আসন ছাড়িয়া বিছানায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। ভারতী অদূরে মেঝের উপর বসিয়া ক্ষণকাল অধোমুখে নীরবে থাকিয়া কহিল, যাবার পূর্ব্বে আর একটি কথা যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ছোট বোনের অপরাধ মাপ করবে?

করব।

তবে বল সুমিত্রাদিদি তোমার কে? কোথায় তাঁকে তুমি পেলে?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া ডাক্তার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পরে মৃদু হাসিয়া কহিলেন, ও যে আমার কে, এ জবাব সে নিজে না দিলে আর জানবার উপায় নেই। কিন্তু, যেদিন ওকে চিনতাম না বললেও চলে, সেদিন নিজেই আমি স্ত্রী বলে ওর পরিচয় দিয়েছিলাম। সুমিত্রা নাম আমারই দেওয়া,—আজ সেইটেই বোধ করি ওর নজির।

ভারতী গভীর কৌতূহলে স্থির হইয়া চাহিয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, শুনেচি, ওর মা ছিল নাকি ইহুদী মেয়ে, কিন্তু বাপ ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ। প্রথমে সার্কাসের দলের সঙ্গে জাভায় যান, পরে সুরাভায়া রেলওয়ে স্টেশনে চাকরি করতেন। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন সুমিত্রা মিশনারিদের স্কুলে লেখাপড়া শিখতো, তিনি মারা যাবার পরে বছর পাঁচ-ছয়ের ইতিহাস আর তোমার শুনে কাজ নেই।

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, না দাদা, সে হবে না, তুমি সমস্ত বল।

ডাক্তার কহিলেন, আমিও সমস্ত জানিনে ভারতী, শুধু এইটুকু জানি যে, মা,

মেয়ে, দুই মামা, একটি চীনে এবং জন-দুই মাদ্রাজী মুসলমান মিলে এঁরা জাভায় লুকানো আফিঙ গাঁজা আমদানি-রপ্তানীর ব্যবসা করতেন। তখনও কিছুই জানিনে কি করেন, শুধু দেখতে পেতাম বাটাভিয়া থেকে সুরাভায়ার পথে রেল গাড়িতে সুমিত্রাকে প্রায়ই যাওয়া-আসা করতে। অতিশয় সুশ্রী বলে অনেকের মত আমারও দৃষ্টি পড়েছিল। এই পর্য্যন্তই। কিন্তু হঠাৎ একদিন পরিচয় হয়ে গেল তেগ স্টেশনের ওয়েটিংরুমে। বাঙালীর মেয়ে বলে তখনই কেবল প্রথম খবর পেলাম।

ভারতী বলিল, সুন্দরী বলে আর সুমিত্রাদিদিকে ভুলতে পারলে না—দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, সে যাই হোক, একদিন জাভা ছেড়ে কোথায় চলে গেলাম ভারতী,—বোধ হয় ভুলেও গিয়েছিলাম,—কিন্তু বছর খানেক পরে অকস্মাৎ বেঙকুলান শহরের জেঠিতে দেখা সাক্ষাৎ। এক তোরঙ্গ আফিঙ, চারিদিকে পুলিশ আর তার মাঝে সুমিত্রা। আমাকে দেখে চোখ দিয়ে তার জল পড়তে লাগলো, এ সন্দেহ আর রইল না যে আমাকে তাকে বাঁচাতেই হবে। আফিঙের সিন্দুকটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে একেবারে স্ত্রী বলে তার পরিচয় দিলাম। এতটা সে ভাবেনি, সুমিত্রা চমকে গেল। সুমাত্রার ঘটনা বলে সুমিত্রা নামটাও আমারই দেওয়া। নইলে তার সাবেক নাম ছিল, রোজ দাউদ। তখন বেঙকুলানের মামলা-মকর্দ্দমা পাদাঙ শহরে হোতো, আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন পল ক্রুগার, তাঁর বাড়িতে সুমিত্রাকে নিয়ে এলাম। মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সুমিত্রাকে খালাস দিলেন বটে, কিন্তু, সুমিত্রা আর আমাকে খালাস দিতে চাইলে না!

ভারতী হাসিয়া কহিল, খালাস কোনদিন পাবেও না দাদা।

ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ তাদের দলের লোক খবর পেয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগলো, বন্ধু ক্রুগারও দেখতে পেলাম সৌন্দর্য্যে চঞ্চল হয়ে উঠছেন, অতএব তাঁর জিম্মাতে রেখেই একদিন চুপি চুপি সুমাত্রা ছেড়ে সরে পড়লাম।

ভারতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, এদের মাঝে তাঁকে একলা ফেলে রেখে? উঃ,—তুমি কি নিষ্ঠুর দাদা!

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ, অনেকটা অপূর্ব্বর মত। আবার বছর খানেক কেটে গেল। তখন সেলিবিস দ্বীপে ম্যাকেসার সহরে একটি ছোট্ট অখ্যাত হোটেলে বাস করছিলাম, একদিন সন্ধ্যার সময় ঘরে ঢুকে দেখি সুমিত্রা বসে। তার পরণে হিন্দু মেয়েদের মত তসরের শাড়ি আর এই প্রথম আজ আমাকে সে হিন্দু মেয়ের মতই হেঁট হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। বললে, আমি সমস্ত ছেড়ে চলে এসেচি, সমস্ত অতীত মুছে ফেলে দিয়েচি, আমাকে তোমার কাজে ভর্ত্তি করে নাও, আমার চেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর তুমি আর পাবে না।

ভারতী নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল, তার পরে ?

ডাক্তার কহিলেন, পরের ঘটনা শুধু এইটুকুই বলতে পারি ভারতী, সুমিত্রার বিরুদ্ধে নালিশ করবার আমি আজও কোন হেতু পাইনি। যে একুশ বছরের সমস্ত সংস্কার একদিনে মুছে ফেলে আসতে পারে, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বড় নিষ্ঠুর।

ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার কেবলই ইচ্ছা করিতে লাগিল জিজ্ঞাসা করে, হোক নিষ্ঠুর, কিন্তু তাঁকে তুমি কতখানি ভালবাসো ? কিন্তু লজ্জায় এ কথা সে কিছুতেই মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না। অথচ ওই আশ্চর্য্য রমণীর গোপন অন্তরের অনেক ইতিহাসেরই আজ সে সন্ধান পাইল। তাহার নির্ম্মম মৌনতা, কঠোর ঔদাসীন্য—কিছুরই অর্থ বুঝিতে যেন আর তাহার বাকী রহিল না।

হঠাৎ একটা অতর্কিত দীর্ঘশ্বাস ডাক্তারের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ায় মুহূর্ত্ত-কালের জন্য তিনি লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ওই মুহূর্ত্তের জন্যই। সুদীর্ঘ সাধনায় দেহ ও মনের প্রতি বিন্দুটির উপরেই অসামান্য অধিকার এতদিন তিনি বৃথাই অর্জ্জন করেন নাই। পরক্ষণেই তাঁহার শান্ত কণ্ঠ ও সহজ হাস্যমুখ ফিরিয়া আসিল, বলিলেন, তারপরে সুমিত্রাকে নিয়ে আমাকে ক্যানটনে চলে আসতে হ'ল।

ভারতী হাসি গোপন করিয়া ভালমানুষের মত মুখ করিয়া কহিল, চলে না-ই আসতে দাদা, কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল বল ? আমরা ত কেউ দিইনি !

ডাক্তার হাসিমুখে ক্ষণকাল নীরব হইয়া থাকিয়া বলিলেন, মাথার দিব্যি যে ছিল না তা নয়, কিন্তু ভেবেছিলাম সে-কথা আর কেউ জানবে না, কিন্তু, তোমাদের দোষ এই যে শেষ পর্য্যন্ত না শুনলে আর কৌতূহল মেটে না। আবার না বললে এমন সব কথা অনুমান করতে থাকবে যে তার চেয়ে বরঞ্চ বলাই ভাল।

ভারতী কহিল, আমিও তাই বলচি দাদা। ঐটুকু তুমি বলে ফেল।

ডাক্তার কহিলেন, ব্যাপারটা এই যে সুমিত্রা আমার হোটেলেই একটা দোতলার ঘর ভাড়া নিলে। আমি অনেক নিষেধ করলাম, কিন্তু কিছুতেই শুনলে না। যখন বললাম, আমাকে তাহলে অন্যত্র যেতে হবে, তখন তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। বললে, আমাকে আপনি আশ্রয় দিন। পরদিনই ব্যাপারটা বোঝা গেল। সেই দাউদের দল দেখা দিলেন। জন-দশেক লোক, একজন অর্দ্ধেক আরবি, অর্দ্ধেক নিগ্রো ছোটখাটো একটা হাতীর মত, অনায়াসে সুমিত্রাকে স্ত্রী বলে দাবী করে বসলো।

ভারতী কহিল, আবার তোমারই সাক্ষাতে! তোমাদের দুজনের বোধ করি খুব ঝগড়া বেঁধে গেল ?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ। সুমিত্রা অস্বীকার করে বারবার বলতে লাগল সমস্তই মিথ্যে, সমস্তই একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র। অর্থাৎ, তারা তাকে চোরাই আফিঙ বেচার কাজে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত দ্বীপ-গুলোতেই এদের ঘাঁটি আছে—এদের একটা প্রকাণ্ড দুর্বৃত্তের দল। এরা না পারে এমন কাজ নেই। বুঝলাম সুমিত্রা কেন আমার কাছ থেকে যেতে চায়নি এবং তার চেয়েও বেশি বুঝলাম যে এ সমস্যার সহজে মীমাংসা হবে না। তাদের কিন্তু বিলম্ব সয় না, সদ্যসদ্যই একটা রফা করে সুমিত্রাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। বাধা দিলাম, পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব ভয় দেখালাম, তারা চলে গেল, কিন্তু রীতিমত শাসিয়ে গেল যে তাদের হাত থেকে আজও কেউ নিস্তার পায়নি। কথাটা নেহাৎ তারা মিথ্যে বলে যায়নি।

ভারতী শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া কহিল, তারপর?

ডাক্তার কহিলেন, রাত্রিটা সাবধান হয়ে রইলাম। তারা যে সদলবলে ফিরে এসে আক্রমণ করবে তা জানতাম।

ভারতী ব্যগ্র হইয়া কহিল, তখনি তোমরা পালিয়ে গেলে না কেন? পুলিশে খবর দিলে না কেন? ডচ্ গভর্ণমেণ্টের পুলিশ-পাহারা বলে কি কিছু নেই না কি?

ডাক্তার কহিলেন, না থাকার মধ্যেই। তা ছাড়া থানা-পুলিশ করা আমার নিজেরও খুব নিরাপদ নয়। যাই হোক, রাত্রিটা কিন্তু নিরাপদেই কাটলো। এখানে সমুদ্রের কিনারা বয়ে যাবার অনেক ব্যবসা-বাণিজ্যের নৌকা পাওয়া যায়, পরদিন সকালেই একটা ঠিক করে এলাম, কিন্তু সুমিত্রার হল জ্বর—সে উঠতে পারলে না। অনেক রাত্রে দোর খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল, জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, হোটেল ওয়ালা কবাট খুলে দিয়েচে এবং জন দশ-বারো লোক বাড়িতে ঢুকচে। তাদের ইচ্ছে ছিল আমার দরজাটা কোনমতে আটকে রেখে তারা পাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে সুমিত্রার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

ভারতী নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কহিল, তারপর? তোমরা পালালে কোথা দিয়ে?

ডাক্তার বলিলেন, তার আর সময় হল কই? কিন্তু তাদের আগেই আমি দোর খুলে উপরে যাওয়ার সিঁড়িটা আটকে ফেললাম।

ভারতী পাংশুমুখে জিজ্ঞাসা করিল, একলা? তারপরে?

ডাক্তার বলিলেন, তার পরের ঘটনাটা অন্ধকারে ঘটলো, সঠিক বিবরণ দিতে পারব না। তবে নিজেরটা জানি। একটা গুলি এসে বাঁ কাঁধে বিঁধলো, আর একটা লাগলো ঠিক হাঁটুর নীচে। সকাল হলে পুলিশ এলো, পাহারা এলো, গাড়ি এলো, ডুলি এলো, জন-ছয়েক লোককে তুলে নিয়ে গেল,—হোটেল-ওয়ালা

এঞ্জাহার দিলে ডাকাত পড়েছিল। ইংরাজ রাজত্ব হলে কতদূর কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু সেলিবিসের আইন-কানুন বোধ হয় আলাদা, লোকগুলোর নিশানদিহি যখন হল না, তখন পুঁতে-টুঁতে ফেললে বোধ হয়।

বিবরণ শুনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে ক্ষণকাল ভারতীর বাকরোধ হইয়া রহিল, পরে শুষ্ক বিবর্ণ মুখে অস্ফুটকণ্ঠে কহিল. পুঁতে-টুঁতে ফেললে কি? তোমার হাতে কি তবে এত-গুলো মানুষ মারা গেল নাকি?

ডাক্তার কহিলেন, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। নইলে নিজের হাতেই তারা মারা গেল ধরতে হবে।

আর ভারতী কথা কহিল না, শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ডাক্তার নিজেও কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন, তারপরে কতক নৌকায় কতক ঘোড়ার গাড়িতে, কতক স্টীমারে মিনাডো সহরে এসে পৌঁছালাম এবং সেখানে থেকে নাম ধাম ভাঁড়িয়ে একটা চীনা জাহাজে চড়ে কোন মতে দুজনে ক্যানটনে এসে উপস্থিত হলাম। কিন্তু আর বোধ হয় তোমার শুনতে ইচ্ছে করচে না? ঠিক না ভারতী? কেবলি মনে হচ্চে দাদার হাতেও মানুষের রক্ত মাখানো?

অন্যমনস্ক ভারতী তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবে না দাদা?

এখনি যাবে?

হাঁ, আমাকে তুমি দিয়ে এসো।

তবে চল। এই বলিয়া তিনি মেঝের একখানা তক্তা সরাইয়া কি একটা বস্তু লুকাইয়া পকেটে লইলেন। ভারতী বুঝিল তাহা গাদা পিস্তল। পিস্তল তাহারও আছে এবং সুমিত্রার উপদেশ মত সে-ও ইতিপূর্ব্বে গোপনে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইয়াছে, কিন্তু ইহা যে মানুষ মারিবার যন্ত্র; এ চৈতন্য আজ যেন তাহার প্রথম হইল। আর ঐ যেটা ডাক্তারের পকেটে রইল, হয়ত কত নরহত্যাই উহা করিয়াছে এই কথা মনে করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নৌকায় উঠিয়া ভারতী ধীরে ধীরে বলিল, তুমি যাই কেননা কর, তুমি ছাড়া আমার আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় আশ্রয় নেই। যতদিন না আমার মন ভাল হয় আমাকে তুমি ফেলে যেতে পারবে না দাদা। বল যাবে না?

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা, তাই হবে বোন, তোমার কাছে ছুটি নিয়েই আমি যাবো।

২৪

নদীপথের সমস্তক্ষণ ভারতীর মন কত-কি ভাবনাই যে ভাবিতে লাগিল তাহার নির্দ্দেশ নাই। অধিকাংশই এলো-মেলো—শুধু যে চিন্তাটা মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাকে সব চেয়ে বেশি ধাক্কা দিয়া গেল সে সুমিত্রার ইতিবৃত্ত। তাহার প্রথম যৌবনের দুর্ভাগ্যময় অপরূপ কাহিনী। সুমিত্রাকে বন্ধু বলিয়া ভাবিবার দুঃসাহস কোন মেয়ের পক্ষেই সহজ নয়, তাহাকে ভালবাসিতে ভারতী পারে নাই, কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে তাহার অসাধারণ শ্রেষ্ঠতার জন্য হৃদয়ের গভীর ভক্তি তাহাকে অর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন যত অপরাধই অপূর্ব্ব করিয়া থাক্, নারী হইয়া অবলীলাক্রমে তাহাকে হত্যা করার আদেশ দেওয়ায় ভক্তি তাহার অপরিসীম ভয়ে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল,—বলির পশু রক্ত-মাখা খড়্গের সম্মুখে যেমন করিয়া অভিভূত হইয়া পড়ে,—তেমনি। অপূর্ব্বকে ভারতী যে কত ভালবাসিত সুমিত্রার তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল না, ভালবাসা যে কি বস্তু সেও তাহার অবিদিত নয়, তথাপি আর একজনের প্রাণাধিকের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা দিতে নারী হইয়া নারীর তিলার্দ্ধ বাধে নাই। বেদনার আগুনে বুকের ভিতরটা যখন তাহার এমনি করিয়া হু হু করিয়া জ্বলিতে থাকিত, তখন সে আপনাকে আপনি এই বলিয়া বুঝাইত যে কর্ত্তব্যের প্রতি এতবড় নির্ম্মম নিষ্ঠা না থাকিলে পথের-দাবীর কর্ত্রী করিত তাহাকে কে? যাহাদের নিজের জীবনের মূল্য নাই, রাজদ্বারে রাজার আইনে যে-সকল প্রাণ বাজেয়াপ্ত হইয়া গেছে তাহারা নির্ভর করিত তবে কিসে? তাহার জন্ম, তাহার শিক্ষা, তাহার কৈশোর ও যৌবনের বিচিত্র ইতিহাস, তাহার আসক্তির অনতিবর্ত্তনীয় দৃঢ় সংসক্তি তাহার কর্ত্তব্যবোধ, তাহার পাষাণ হৃদয় সকলের সঙ্গেই আজ ভারতী সঙ্গতি দেখিতে লাগিল। নারী বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড অভিমান ভারতীর ছিল, আজ সে যেন আপনা আপনিই একেবারে বাহুল্য হইয়া গেল। আর তাহাকে সে নিজের স্বজাতি বলিয়া ভাবতেই পারিল না। আজ তাহার মনে হইল, স্নেহের দিক দিয়া, সুমিত্রার কাছে দাবী করিবার, ভিক্ষা জানাইবার মত পরিহাস পৃথিবীতে যেন আর দ্বিতীয় নাই।

নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিতেই একজন গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। ডাক্তারের হাত ধরিয়া ভারতী নীচের সিঁড়িতে পা দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ লোকটার প্রতি চোখ পড়িতেই সে সভয়ে পা তুলিয়া লইল।

ডাক্তার মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, ও আমাদের হীরা সিং, তোমাকে পৌঁছে দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে? কেয়া সিংজী, খবর সব ভালো?

হীরা সিং বলিল, সব আচ্ছা।

আমিও যেতে পারি নাকি?

হীরা কহিল, আপকো কঁহি যানা দুনিয়ামে কই রোক সকৃতা? এই বলিয়া সে একটু হাসিল।

বুঝা গেল পুলিশের লোক ভারতীর বাসার প্রতি নজর রাখিয়াছে, ডাক্তারের যাওয়া নিরাপদ নয়।

ভারতী হাত ছাড়িল না, চুপি চুপি কহিল, আমি যাবো না দাদা।

কিন্তু তোমার ত পালিয়ে থাকবার দরকার নেই ভারতী।

ভারতী তেমনি আস্তে আস্তে বলিল, দরকার থাকলেও আমি পালাতে পারবো না। কিন্তু এর সঙ্গে যাবো না।

ডাক্তার আপত্তির কারণ বুঝিলেন। অপূর্ব্বর বিচারের দিন এই হীরা সিংই তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, কিন্তু তুমি ত জানো ভারতী, পাড়াটা কত খারাপ, এত রাত্রে একলা যাওয়া ত তোমার চলে না। আর আমি যে—

ভারতী ব্যাকুলকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না দাদা, তুমি আমাকে পৌছে দেবে, আমি ত এখনও পাগল হইনি যে—

এই বলিয়া সে অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানেই থামিয়া গেল। কিন্তু এত রাত্রে ও পাড়ায় একাকী যাওয়াও যে অসম্ভব, এ সত্যই বা তাহার চেয়ে বেশি কে জানিত? হাত ছাড়িয়া নৌকা হইতে নামিবার কিছুমাত্র লক্ষণ না দেখিয়া ডাক্তার স্নেহার্দ্রস্বরে আস্তে আস্তে বলিলেন, আমার ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তোমাকে আমার নিজেরই লজ্জা করে। কিন্তু যাবে দিদি আর এক জায়গায়? আমাদের কবির ওখানে? সে নদীর ঠিক আর পারেই থাকে। যাবে?

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, কবি কে দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, আমাদের ওস্তাদজী; বেহালা-বাজিয়ে,—

ভারতী খুশী হইয়া কহিল, তাঁকে কি ঘরে পাওয়া যাবে? আর মদ জুটে থাকে ত অজ্ঞান হয়েই হয়ত আছেন।

ডাক্তার কহিলেন, আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু আমার গলা শুনলেই তার নেশা কেটে যায়। তাছাড়া কাছেই নবতারা থাকেন—হয়ত তোমাকেও দুটো খাইয়ে দিতেও পারব।

ভারতী ব্যস্ত হইয়া বলিল, রক্ষে কর দাদা, এই শেষ রাত্রিতে আর আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা করো না, কিন্তু তাই চলো যাই, সকাল হলেই আমরা ফিরে আসবো।

ডাক্তার পুনরায় নৌকা ভাসাইয়া দিলে হীরা সিং অন্ধকারে পুনরায় যেন মিলাইয়া গেল। ভারতী কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, দাদা, এই লোকটিকে পুলিশে এখনও সন্দেহ করে নি ?

ডাক্তার কহিলেন, না। ও টেলিগ্রাফ অফিসের পিয়ন, মানুষের জরুরি তার বিলি করে বেড়ায়, তাই ওকে দিনরাত্রি কোন সময়ে কোনখানেই বে-মানান দেখায় না।

সেইমাত্র জোয়ার শুরু হইয়াছে, খাড়ি হইতে বাহির হইয়া বড় নদীতে কতকটা উজাইয়া না গেলে ও-পারের যথাস্থানে নৌকা ভিড়ানো শক্ত, এইজন্য কিনারা ঘেঁসিয়া ধীরে ধীরে অত্যন্ত সাবধানে লগি ঠেলিয়া যাওয়ার পরিশ্রম অনুভব করিয়া ভারতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, থাকগে, কাজ নেই দাদা আমার ওখানে গিয়ে। তার চেয়ে বরঞ্চ চল, তোমার বাড়িতেই ফিরে যাই। জোয়ারের টানে আধঘণ্টাও লাগবে না।

ডাক্তার কহিলেন, কেবল সেজন্য নয় ভারতী, ওর সঙ্গে দেখা করাও আমার বিশেষ প্রয়োজন।

প্রত্যুত্তরে ভারতী উপহাসভরে হাসিয়া বলিল, ওর সঙ্গে কোন মানুষের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে এ তো আমার সহজে বিশ্বাস হয় না দাদা ?

ডাক্তার ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা কেউ ওকে জানো না ভারতী, ওর মত সত্যকার গুণী সহসা কোথাও তুমি পাবে না। ওই ভাঙা বেহালাটি মাত্র পুঁজি করে ও যায়নি এমন জায়গা নেই। তাছাড়া ও ভারি পণ্ডিত। কোথায় কোন্ বইয়ে কি আছে ও ছাড়া জেনে নেবার আমার আর দ্বিতীয় লোক নেই। ওকে আমি যথার্থ ভালবাসি।

ভারতী মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া কহিল, তাহলে ওঁকে তুমি মদ ছাড়াবার চেষ্টা করো না কেন ?

ডাক্তার কহিলেন, আমি কাউকে কোন কিছু ছাড়াবারই ত চেষ্টা করিনে ভারতী একটুখানি চুপ করিয়া বলিলেন, তাছাড়া ও কবি, ও গুণী, ওদের জাত আলাদা। ওদের ভাল-মন্দ ঠিক আমাদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু তাই বলে দুনিয়ার ভাল-মন্দের বাঁধা আইন ওকে মাপ করে চলে না। ওর গুণের ফল তারা সবাই মিলে ভোগ করে, শুধু দোষের শাস্তিটুকু সহ্য করে ও নিজে। তাই মাঝে মাঝে ও বেচারা যখন ভারি দুঃখ পায়, তখন আর একটি লোক যে মনে মনে তার অংশ নেয়, সে আমি।

ভারতী কহিল, তুমি সকলের জন্যই দুঃখ বোধ কর দাদা, তোমার মন মেয়েদের

চেয়েও কোমল। কিন্তু তোমার গুণাকে তুমি বিশ্বাস কর কি করে? উনি মাতাল হয়ে ত সমস্তই ব'লে ফেলতে পারেন।

ডাক্তার কহিলেন, ওই জ্ঞানটুকুই ওর বাকী থাকে। আর একটা সুবিধা এই যে, ওর কথাই বিশেষ কেউ বিশ্বাসও করে না।

ভারতী কহিল, ওর নাম কি দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, অতুল, সুরেন, যখন যা মনে আসে। আসল নাম শশিপদ ভৌমিক।

আমার মনে হয় উনি নবতারার বড় বাধ্য।

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন, বলিলেন, আমারও মনে হয়। এই বলিয়া তিনি পরপারের জন্য নৌকার মুখ ফিরাইলেন। স্রোত ও দাঁড়ের প্রবল আকর্ষণে ক্ষুদ্র তরণী অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে এপারে আসিয়া ঠেকিল। চারিদিকেই সাহেব কোম্পানীর বড় বড় কাঠের মাড় স্তূপাকার করা, তাহার ফাঁকে ফাঁকে জোয়ারের জল ঢুকিয়া দূরবর্ত্তী জাহাজের তীব্র আলোকে ঝিক ঝিক করিতেছে ইহারই একটা ফাঁকের মধ্যে ডিঙি প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া ডাক্তার ভারতীর হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িলেন। পিচ্ছিল কাঠের উপর দিয়া সাবধানে পা টিপিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটা সঙ্কীর্ণ পথ পাওয়া গেল, আশে-পাশে ছোট-বড় ডোবা, লতা-গুল্ম ও কাঁটাগাছে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহারই একধার দিয়া এই পথ অন্ধকার বনের মধ্যে যে কোথায় গিয়াছে তাহার নির্দ্দেশ নাই। ভারতী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, ও-পারের এমনি একটা ভয়ঙ্কর স্থান থেকে আর একটা তেমনি ভয়ানক জায়গায় নিয়ে এলে। বাঘ-ভালুকের মত এ-ছাড়া কি তোমরা আর কোথাও থাকতে জানো না? আর কিছু ভয় না কর সাপের ভয়টা ত করতে হয়?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, সাপ বিলাত থেকে আসেনি দিদি—তাদের ধর্ম্মজ্ঞান আছে, বিনা অপরাধে কামড়ায় না।

মন্তব্য শুনিয়া ভারতীর আর এক দিনের কথা মনে পড়িল। সেদিনও তাঁহার এমনি সহাস্য কণ্ঠস্বরে ইউরোপের বিরুদ্ধে কি অপরিসীম ঘৃণাই প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি পুনশ্চ কহিলেন, আর বাঘ-ভালুক বোন? কতদিনই ভাবি, এই ভারতবর্ষে মানুষ না থেকে যদি কেবল বাঘ-ভালুকই থাকতো! হয়ত বিদেশ থেকে শিকার করতে এরা আসতো, কিন্তু এমন অহর্নিশি রক্তশোষণের জন্য কামড়ে পড়ে থাকত না।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। সমস্ত জাতি-নির্ব্বিশেষে কাহারও এতখানি বিদ্বেষ তাহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিত। বিশেষ করিয়া এই মানুষটির এতবড় বিশাল বক্ষতল হইতে যখন গরল উছলিয়া উঠিত, তখন দুই চক্ষু তাহার জলে পরিপূর্ণ হইয়া

যাইত। নিজের মনে প্রাণপণে বলিতে থাকিত, ইহা কখনও সত্য নয়, কিছুতে সত্য নয়। এমন হইতেই পারে না।

কিছুক্ষণ হইতে একটা অপূর্ব্ব সুস্বর মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাদের কানে লাগিতেছিল, সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার বলিলেন, ওস্তাদজী আমাদের জেগে আছেন এবং সজ্ঞানে আছেন,—এমন বেহালা তুমি কখনো শোননি ভারতী।

আরও কয়েক পা অগ্রসর হইয়া ভারতী স্তব্ধ হইয়া থামিল। কোথায় কোন অন্ধকারের বুক চিরিয়া কত কান্নাই যেন ভাসিয়া আসিতেছে। তাহার আদি-অন্ত নাই, এ সংসারে তাহার তুলনা হয় না। মিনিট দুয়ের জন্য ভারতীর যেন সংজ্ঞা রহিল না। ডাক্তার তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়া কহিলেন, চল।

ভারতী চকিত হইয়া কহিল, চল। আমি কখনো এমন ভাবিনি, কখনো এমন শুনিনি।

ডাক্তার আস্তে আস্তে বলিলেন, পৃথিবীতে আমার অগম্য ত স্থান নেই, এর চেয়ে ভাল আমিও কখনো শুনেচি মনে হয় না। একটু হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু পাগলার হাতে পড়ে ঐ বেহালা বেচারার দুর্দ্দশার অবধি নেই। আমি বোধ হয়, ওকে দশবার উদ্ধার করে দিয়েচি। এখনো শুনচি অপূর্ব্বর কাছে পাঁচ টাকায় বাঁধা আছে।

ভারতী কহিল, আছে। ওঁর নাম করে টাকাটা আমি তাঁকে পাঠিয়ে দেব।

গাছ-পালার আড়ালে একখানা দোতলা কাঠের বাড়ি। একতলাটা পাঁক, জোয়ারের জল এবং দেনো গাছে দখল করিয়াছে, সুমুখে একটা কাঠের সিঁড়ি এবং তারই সর্ব্বোচ্চ ধাপে একটা তোরণের মত করিয়া তাহাতে মস্ত বড় একটা রঙীন চীনা লণ্ঠন ঝুলিতেছে। ভিতরের আলোকে স্পষ্ট পড়া গেল তাহার গায়ে বড় বড় কালো অক্ষরে ইংরাজীতে লেখা,—শশি-তারা লজ।

ভারতী বলিল, বাড়ির নাম রাখা হয়েচে শশি-তারা লজ? লজ তো বুঝলাম, শশি-তারা কি?

ডাক্তার মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, বোধ হয় শশিপদর শশী এবং নবতারার তারা এক ক'রে শশি-তারা লজ হয়েচে।

ভারতীর মুখ গম্ভীর হইল, কহিল, এ ভারি অন্যায়। এ সব তুমি প্রশ্রয় দাও কি করে?

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, তোমার দাদাটিকে তুমি কি সর্ব্বশক্তিমান মনে কর? কে কার লজের নাম শশি-তারা রাখবে, কে কার প্যালেসের নাম অপূর্ব্ব-ভারতী রাখবে, সে আমি ঠেকাব কি করে?

ভারতী রাগ করিয়া বলিল, না দাদা, এ সব নোংরা কাণ্ড তুমি বারণ ক'রে দাও। নইলে আমি ওঁর ঘরে যাবো না।

ডাক্তার কহিলেন, শুনচি ওদের শীঘ্র বিয়ে হবে।

ভারতী ব্যাকুল হইয়া বলিল, বিয়ে হবে কি করে, ওর যে স্বামী বেঁচে আছে?

ডাক্তার কহিলেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে মরতে কতক্ষণ দিদি? শুনেচি ব্যাটা মরেচে দিন পনর হ'ল।

ভারতী অতিশয় বিরক্তি সত্বেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, ও হয়ত মিছে কথা। তাছাড়া, এক বছর অন্ততঃ ওদের ত থামতেই হবে, নইলে সে যে ভারি বিশ্রী দেখাবে।

তাহার উৎকণ্ঠা দেখিয়া ডাক্তার মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, বেশ, বলে দেখবো। তবে, থামলে বিশ্রী দেখাবে, কি না থামলে বিশ্রী দেখাবে সেইটেই চিন্তার কথা।

এই ইঙ্গিতের পরে ভারতী লজ্জায় নীরব হইয়া রহিল। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে ডাক্তার চাপা গলায় বলিতে লাগিলেন, পাগলাটার জন্যেই কষ্ট হয়, শুনেচি ঐ স্ত্রীলোক-টাকে নাকি ও যথার্থই ভালবাসে। আর কাউকে যদি ভালবাসত! সহসা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কিন্তু সংসারের ভাল-মন্দের ফরমাস, বন্ধুগণের অভিরুচি,—এসব অতি তুচ্ছ কথা ভারতী! কেবল এইটুকু কামনা করি ওর ভালবাসার মধ্যে যদি সত্য থাকে ত সেই সত্যই যেন ওকে উদ্ধার করে দেয়।

ভারতী চমকিয়া উঠিল। এবং তেমনি চাপাকণ্ঠেই সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, সংসারে তা কি হয় দাদা?

ডাক্তার অন্ধকারেই একবার মুখ ফিরিয়া চাহিলেন। তাহার পরে নিঃশব্দ পদে উঠিয়া গুণীর বন্ধ দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ডাক শুনিয়া বেহালা থামিল। খানিক পরে ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া শশিপদ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তারকে সে সহজেই চিনিল, কিন্তু আঁধারে ঠাওর করিয়া ভারতীকে চিনিতে পারিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল,—অ্যাঁ? আপনি! ভারতী? আসুন, আসুন, আমার ঘরে আসুন। এই বলিয়া সে দুই হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল। তাহার আনন্দদীপ্ত মুখের অকপট আহ্বানে, তাহার অকৃত্রিম উচ্ছ্বসিত সমাদরে ভারতীর সমস্ত ক্রোধ জল হইয়া গেল। শশী বিছানার কোন এক নিভৃত স্থান হইতে একটা খাম বাহির করিয়া ভারতীর হাতে দিয়া কহিল, খুলে পড়ুন। পরশু দশ হাজার টাকার ড্রাফট আসচে—নট্ এ পাই লেস্! বলতাম না? আমি জোচ্চর! আমি মিথ্যাবাদী! আমি মাতাল! কেমন, হল ত? দশ হাজার। নট্ এ পাই লেস!

এই দশ হাজার টাকার ড্রাফট সম্বন্ধে একটা পুরাতন ইতিহাস আছে, তাহা এইখানে বলা প্রয়োজন। তাহার বন্ধু-বান্ধব, শত্রু-মিত্র, পরিচিত-অপরিচিত এমন কেহ ছিল না যে অচির ভবিষ্যতে একটা মোটা টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা শশীর মুখ হইতে শুনে নাই। কেহ বড় বিশ্বাস করিত না, বরঞ্চ ঠাট্টা-তামাসাই করিত, কিন্তু ইহাই ছিল ওস্তাদজীর মূলধন! ইহারই উল্লেখ করিয়া সে একান্ত অসঙ্কোচে লোকের কাছে ধার চাহিত। এবং শীঘ্রই একদিন সুদে-আসলে পরিশোধ করিয়া দিবে তাহা শপথ করিয়া বলিত। এই অত্যন্ত অনিশ্চিত অর্থাগমের উপর তাহার কত আশা-ভরসাই না জড়াইয়া ছিল! বছর পাঁচ-সাত পূর্ব্বে তাহার বিত্তশালী মাতামহ যখন মারা যান তখন সে মাসতুতো ভায়েদের সঙ্গে সম্পত্তির একটা অংশ পাইয়াছিল। এতদিন এইটাই তাহাদের কাছে বিক্রি করিবার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, মাসখানেক পূর্ব্বে তাহা শেষ হইয়াছে। খামের মধ্যে কলিকাতার এক বড় এটর্ণির চিঠি ছিল, টাকাটা দুই-একদিনের মধ্যে পাওয়া যাইবে তিনি লিখিয়া জানাইয়াছেন।

ভারতী চিঠি পড়িয়া শেষ করিলে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশ হাজার টাকার কথা ছিল না শশী?

শশী হাত নাড়িয়া বলিল, আহা, দশ হাজার টাকাই কি সোজা নাকি? তাছাড়া নিজের মাসতুতো ভাই,—সম্পত্তি ত একরকম আপনার ঘরেই রইল ডাক্তারবাবু, আর ঠিক সেই কথাই ত মেজদা লিখে জানিয়েছেন। কি রকম লিখেছেন একবার—এই বলিয়া মেজদার চিঠির জন্যে উঠিবার উপক্রম করিতে ডাক্তার বাধা দিয়া বলিল, থাক্ থাক্, মেজদার চিঠির জন্য আমাদের কৌতূহল নেই। ভারতীকে বলিলেন, এই রকম একটা ক্ষেপা মাসতুতো ভাই আমাদের থাকলে—এই বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

শশী খুশী হইল না, সে প্রাণপণে প্রমাণ করিতে লাগিল যে, সম্পত্তিটা একপ্রকার বিক্রি না করিয়াই এতগুলো টাকা পাওয়া গেল, এবং সে কেবল তার মেজদার মত আদর্শ পুরুষ সংসারে ছিল বলিয়া।

ভারতী মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, সে ঠিক কথা অতুলবাবু, মেজদাকে না দেখেই তাঁর চরিত্র আমার হৃদয়ঙ্গম হয়েচে। ও আর সপ্রমাণ করবার প্রয়োজন নেই।

শশী তৎক্ষণাৎ কহিল, কাল কিন্তু আমাকে আর দশটা টাকা দিতে হবে। তাহলে সেদিনের দশ, কালকের দশ আর অপূর্ব্ববাবুর দরুন সাড়ে আট টাকা—পুরোপুরি ত্রিশ টাকাই পরশু-তরশু দিয়ে দেব। নিতে হবে, না বলতে পারবেন না কিন্তু।

ভারতী হাসিতে লাগিল। শশী কহিতে লাগিল, ড্রাফটটা এলেই ব্যাঙ্কে জমা করে দেব। মাতাল, জোচ্চোর, স্পেণ্ডথ্রিফট্ যা মুখে এসেচে লোকে বলেচে, কিন্তু এবার দেখবো। আসলে হাত পড়বে না, কেবল সুদের টাকাতে সংসার চালিয়ে দেবো, বরঞ্চ বাঁচবে দেখবেন, পোস্ট অফিসেও একটা একাউণ্ট খুলতে হবে,—ঘরে কিন্তু রাখা চলবে না। চাই কি বছর পাঁচেকের মধ্যে একটা বাড়ি কিনতেও পারবো। আর কিনতেই ত হবে,—সংসার ঘাড়ে পড়ল কিনা। সহজ নয়ত আজকালকার বাজারে।

ভারতীর মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তার হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু সে মুখ গম্ভীর করিয়া আর একদিকে চাহিয়া রহিল।

শশী কহিল, মদ ছেড়ে দিয়েচি শুনেচেন বোধ হয়?

ডাক্তার কহিলেন, না।

শশী কহিল, হাঁ একেবারে। নবতারা প্রতিজ্ঞে করিয়ে নিয়েছেন।

এই লইয়া উহাদের আলোচনা দীর্ঘ হইতে পারিত, কিন্তু একজনের সকৌতুক প্রশ্নমালায় ও অপরের উৎসাহদীপ্ত উত্তর দানের ঘটায় ভারতী বিপন্ন হইয়া উঠিল। সে কোনটাতেই যোগ দিতে পারিতেছে না দেখিয়া ডাক্তার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া আসল কথা পাড়িলেন। কহিলেন, শশী, তুমি ত তাহলে এখান থেকে আর শীঘ্র নড়তে পারচ না।

শশী বলিল, নড়া? অসম্ভব।

ডাক্তার কহিলেন, বেশ, আমাদের তাহলে এখানে একটা স্থায়ী আড্ডা রইল।

শশী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, সে কি করে হতে পারে? আপনার সঙ্গে ত আর আমি সম্বন্ধ রাখতে পারব না। লাইফ আমার রিস্ক করা করা যায় না।

ডাক্তার ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, আমাদের ওস্তাদের আর যা দোষই থাক্, চক্ষুলজ্জা আছে এ অপবাদ অতি বড় শত্রুতেও দেবে না। পার যদি এই বিদ্যেটা ওর কাছে শিখে নাও ভারতী।

প্রত্যুত্তরে শশীর পক্ষ লইয়া ভারতী অত্যন্ত ভালমানুষের মত বলিল, কিন্তু মিথ্যে আশা দেওয়ার চাইতে স্পষ্ট বলাই ত ভাল। আমি পারিনে, কিন্তু অতুলবাবুর কাছে এ বিদ্যে শিখে নিতে পারলে আজ ত আমার ছুটি হয়ে যেতো দাদা।

তাহার কণ্ঠস্বরের শেষ দিকটা হঠাৎ যেন কেমন ভারি হইয়া গেল। শশী মনোনিবেশ করিল না, করিলেও হয়ত তাৎপর্য্য বোধ করিত না, কিন্তু ইহার নিহিত অর্থ যাঁহার বুঝিবার তাঁহার বিলম্ব হইল না।

মিনিট-দুই সকলে মৌন হইয়া রহিলেন। প্রথম কথা কহিলেন ডাক্তার,

বলিলেন, শশী, দিন-দুয়ের মধ্যে আমি যাচ্ছি। হাঁটা-পথে চীনের মধ্য দিয়ে প্যাসিফিকের সব আইল্যাণ্ডগুলোই আর একবার ঘুরব। বোধ হয় জাপান থেকে আমেরিকাতেও যাবো। কবে ফিরবো জানিনে, ফিরবই কিনা তাই বা কে জানে,—কিন্তু হঠাৎ যদি কখনো ফিরি শশী, তোমার বাড়িতে বোধহয় আমার স্থান হবে না?

শশী ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল, তাহার পরে তাহার নিজের মুখ ও কণ্ঠশব্দ আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হবে। আমার বাড়িতে আপনার স্থান চিরকাল হবে।

ডাক্তার কৌতুকভরে কহিলেন, সে কি কথা শশী, আমাকে স্থান দেওয়ার চেয়ে বড় বিপদ মানুষের আর আছে কি?

শশী মুহূর্ত্ত চিন্তা না করিয়া বলিল, সে জানি, আমার জেল হবে। তা হোকগে! এই বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে ভারতীকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, এমন বন্ধু আর নেই। ১৯১১ সালে জাপানের টোকিও সহরে বোমা ফেলার জন্যে যখন কোটোকুর সমস্ত দলবলের প্রাণদণ্ড হল, ডাক্তার তখন তার খবরের কাগজের ইংলিশ সাব-এডিটর। বাসার সুমুখের দিকটা পুলিশে ঘিরেচে, আমি কাঁদতে লাগলাম, উনি বললেন, মরলে চলবে না শশী, আমাদের পালাতে হবে। পিছনের জানালা থেকে দড়ি বেঁধে আমাকে নামিয়ে দিয়ে নিজেও নেমে পড়লেন,—ডাক্তারবাবু, উঃ—মনে আছে আপনার? এই বলিয়া সে বিগত স্মৃতির তাড়নায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, আছে বৈ-কি।

শশী কহিল, থাকার ত কথা। কিন্তু আ-কিম সাহায্য না করলে সেবার ভবলীলা আমাদের সাঙ্গ হত ডাক্তারবাবু। সাংহাই বোটে আর পা দিতে হত না। উঃ—ঐ বেঁটে ব্যাটাদের মত বজ্জাত আর ভু-ভারতে নেই? আমি ত আর সত্যিই আপনাদের বোমার দলে ছিলাম না-বাসায় থাকতাম, বেহালা শিখতাম। কিন্তু সে কি কথা শুনতো? শয়তান ব্যাটাদের না আছে আইন, না আছে আদালত! ধরতে পারলেই আমাকে ঠিক জবাই করে ছাড়ত। আজ যে এই কথা কইচি, চলে-ফিরে বেড়াচ্চি সে কেবল ওঁরই কৃপায়। এই বলিয়া সে চোখের ইঙ্গিতে তাহাকে দেখাইয়া দিল। কহিল, এমন বন্ধু দুনিয়ায় নেই ভারতী, এমন দয়া-মায়াও সংসারে দেখিনি।

ভারতীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, কহিল, তোমার সমস্ত কাহিনী একদিন আমাদের গল্প করে শোনাও না দাদা। ভগবান তোমাকে এত বুদ্ধি দিয়েছিলেন,

শুধু কি এই অমূল্য প্রাণটার দাম বোঝবার বুদ্ধিটুকুই দিতে ভুলেছিলেন! সেই জাপানীদের দেশেই তুমি আবার যেতে চাও?

শশী কহিল, আমিও ঠিক সেই কথাই বলি ভারতী। বলি, অতবড় স্বার্থপর, লোভী, নীচাশয় জাতির কাছে কোন প্রত্যাশাই করবেন না। তারা কোন দিন আপনাকে কোন সাহায্যই করবে না।

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, কোমরে সেই দড়ি বাঁধার ঘটনাও শশী ভুললে না, জাপানীদের সে এ জীবনে মাপ করতেও পারলে না। কিন্তু এই তাদের সমস্তটুকু নয় ভারতী, এতবড় আশ্চর্য্য জাতও পৃথিবীতে আর নেই। শুধু আজকের কথা নয়, প্রথম দৃষ্টিতেই তারা সাদা চামড়াকে চিনেছিল। আড়াইশ বৎসর আগে যে জাত আইন করতে পেরেছিল, চন্দ্র সূর্য্য যতদিন বিদ্যমান থাকবে খ্রীষ্টান যেন না তাদের রাজ্যে ঢোকে এবং সে যেন তার চরম শাস্তি ভোগ করে, সে-জাত যাই কেননা করে থাক তারা আমার নমস্য!

বক্তার দুইচক্ষু এক নিমিষেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। সেই বজ্রগর্ভ ভয়ঙ্কর দৃষ্টির সম্মুখে শশী যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল, সে সভয়ে বারবার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, সে ঠিক! সে ঠিক!

ভারতীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, তাহার বুকের মধ্যেটা যেন অভূতপূর্ব্ব অব্যক্ত আবেগে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল আজ এই গভীর নিশীথে, আসন্ন বিদায়ের প্রাক্কালে এক মুহূর্ত্তের জন্য এই লোকটির সে স্বরূপ দেখিতে পাইল।

ডাক্তার নিজের বক্ষদেশে আঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, কি বলছিলে ভারতী, এর মূল্য বোঝবার মত বুদ্ধি ভগবান আমাকে দেননি? মিছে কথা! শুনবে আমার সমস্ত ইতিহাস? ক্যানটনের একটা গুপ্তসভার মধ্যে সুনিয়াৎ সেন আমাকে একবার বলেছিলেন—

ভারতী হঠাৎ ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, কারা যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠচে—

ডাক্তার কান খাড়া করিয়া শুনিলেন, পকেট হইতে ধীরে-সুস্থে পিস্তল বাহির করিয়া কহিলেন, এই অন্ধকারে আমাকে বাঁধতে পারে পৃথিবীতে কেউ নেই। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল।

কেবল বিচলিত হইল না শশী। সে মুখ তুলিয়া কহিল, আজ নবতারাদের একবার আসার কথা ছিল, বোধ হয়—

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, বোধ হয় নয়, তিনিই। অত্যন্ত লঘু পদ। কিন্তু সঙ্গে তাঁর 'দের'টা আবার কারা?

শশী বলিল, আপনি জানেন না? আমাদের প্রেসিডেণ্ট এসেচেন যে। বোধ হয়—

ভারতী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে প্রেসিডেণ্ট? সুমিত্রা-দিদি?

শশী মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে দ্বার খুলিতে অগ্রসর হইল। ভারতী ডাক্তারের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, এতক্ষণে যেন সে তাহার এখানে আসিবার হেতু বুঝিয়াছে। আজ রাত্রিটা বৃথায় যাইবে না, প্রত্যাসন্ন বিক্ষেপের মুখে পথের দাবীর শেষের মীমাংসা আজ অনিবার্য্য। হয়ত আইয়ার আছে, তলওয়ারকর আছে, কি জানি হয়ত নিরাপদ বুঝিয়া ব্রজেন্দ্রও সহর ছাড়িয়া আসিয়া এই বনেই আশ্রয় লইয়াছে! ডাক্তার তাহার অভ্যাস ও প্রথামত পিস্তল গোপন করিলেন না, সেটা বাঁ হাতে তেমনি ধরাই রহিল। তাঁহার শান্ত মুখের উপর ভিতরের কোন কথাই পড়া গেল না সত্য, কিন্তু ভারতীর মুখ অধিকতর পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।

২৫

একে একে ঘরের মধ্যে যাহারা প্রবেশ করিলেন, তাঁহারা সকলেই সুপরিচিত। ডাক্তার মুখ তুলিয়া কহিলেন, এস। কিন্তু সেই মুখের ভাবেই ভারতীর মনে হইল, অন্ততঃ আজিকার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

সুমিত্রার খবর তিনি জানিতেন, কিন্তু ইতিমধ্যে সকলেই যে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া এপারে আসিয়া একত্রিত হইয়াছে এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না। ইহা কিছুতেই আকস্মিক ব্যাপার নহে, সুতরাং তাহার অজ্ঞাতসারে কোন একটা গূঢ় পরামর্শ যে হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আগন্তুকের দল মেঝের উপরে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন, কাহারও আচরণে লেশমাত্র বিস্ময় বা চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না; স্পষ্টই বুঝা গেল, ভারতীর সম্বন্ধে না হোক, ডাক্তারের আসার কথা তাহারা যেমন করিয়াই হোক আগে হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন। অপূর্ব্বর ব্যাপার লইয়া দলের মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদ ঘটিবে ঐ আশঙ্কা ভারতীর ছিল, হয়ত আজই ইহার একটা কঠিন বুঝা-পড়া হইয়া যাইবে, ইহাই মনে করিয়া ভারতীর বুকের ভিতরটায় যেন কাঁপুনি শুরু হইল।

সুমিত্রার মুখ শুষ্ক এবং বিষণ্ণ। ভারতীর সহিত সে কথা কহিল না, ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিল না। ব্রজেন্দ্র তাঁহার গেরুয়া রঙের মস্ত পাগড়ী খুলিয়া হাতের

মোটা লাঠিটা চাপা দিয়া পাশে রাখিল, এবং নিজের বিরাট বপু কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়া আরাম করিয়া বসিল। তাহার গোলাকার চক্ষের হিংস্র দৃষ্টি একবার ভারতীর ও একবার ডাক্তারের মুখের 'পরে যেন পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রামদাস তলওয়ারকর নীরব ও স্থির, ব্যারিস্টার কৃষ্ণ আইয়ার সিগারেট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন এবং সকলের হইতে দূরে গিয়া বসিল নবতারা। কিছুর সঙ্গেই যেন তাহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই, আজ ভারতীকে সে চিনিতে পারিল না। মুখে কাহারও হাসি নাই, বাক্য নাই, সর্ব্বনাশা ঝড়ের পূর্ব্বাহ্নের মত এই নিশীথ সম্মিলন কিয়ৎকালের জন্য একান্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

সেদিনের ভয়ানক রাত্রির মত আজও ভারতী উঠিয়া আসিয়া ডাক্তারের অত্যন্ত সন্নিকটে ঘেঁসিয়া বসিল। ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের সবাইকে ভারতী ভয় করতে শুরু করেচে, শুধু ভয় নেই ওর আমাকে।

এইরূপ মন্তব্যের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না এবং ভারতী ভিন্ন বোধ হয় কেহ দেখিতেও পাইল না যে সুমিত্রা চোখের ইঙ্গিতে ব্রজেন্দ্রকে নিষেধ করিতেছে। কিন্তু ফল হইল না। হয় সে ইহার অর্থ বুঝিল না, না হয় গ্রাহ্য করিল না। তাহার কর্কশ ভাঙাগলার স্বরে সকলকে চকিত করিয়া বলিয়া উঠিল, আপনার স্বেচ্ছাচারের আমরা নিন্দা করি এবং তীব্র প্রতিবাদ করি। অপূর্ব্বকে যদি কখনো আমি পাই ত তার—

এই অসম্পূর্ণ পদ ডাক্তার নিজেই পূর্ণ করিয়া বলিলেন, তার প্রাণ নেবে। এই বলিয়া তিনি বিশেষ করিয়া সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা সবাই কি এই লোকটিকে সমর্থন কর? সুমিত্রা মাথা নীচু করিয়া রহিল এবং অন্য কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, ভাবে মনে হয় তোমরা সমর্থন কর। এবং ইতিমধ্যে তোমাদের আলোচনাও হয়ে গেছে—

ব্রজেন্দ্র কহিল, হাঁ, হয়ে গেছে এবং এর প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক মনে করি।

ডাক্তার তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আমিও তাই মনে করি, কিন্তু তার পূর্ব্বে একটা প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, খুব সম্ভব অত্যন্ত ক্রোধের বশেই তোমাদের তা মনে ছিল না। আহমেদ দুরাণী ছিল আমাদের সমস্ত উত্তর চীনের সেক্রেটারী, অমন নির্ভীক, কর্ম্মদক্ষ লোক আমাদের দলে আর ছিল না। ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়া রাজ্য আত্মসাৎ করে নেবার মাসখানেক পরেই সে মাঞ্চুরিয়ার কোন একটা রেল স্টেশন ধরা পড়ে। সাংহাইয়ে তার ফাঁসি হয়। সুমিত্রা, দুরাণীকে তুমি দেখেছিলে না।

সুমিত্রা মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

ডাক্তার কহিলেন, আমি তখন ছিতায় ভাঙা দল পুনর্গঠনে ব্যস্ত, একটা খবর পর্য্যন্ত পেলাম না যে, আমার একখানা হাত ভেঙে গেল। অথচ তার বিপক্ষে আদালতে বিচারের তামাসা যখন পুরোদমে চলেছিল তখন রক্ষা করা তাকে এক-বিন্দু কঠিন ছিল না। আমাদের অধিকাংশ লোক তখন ঐখানেই বাস করছিল। তবুও এতবড় দুর্ঘটনা ঘটলো কেন জানো? ফয়জাবাদের মথুরা দুবে তখন অতি তুচ্ছ অবিচার-কুবিচারের পুনঃ পুনঃ অভিযোগে দলের মন একেবারে বিষ করে তুলেছিল। দুরাণীর মৃত্যুতে সবাই যেন পরিত্রাণ পেলে। আমি ফিরে আসার পরে ক্যানটনের মিটিঙে যখন সকল ব্যাপার জানা গেল তখন দুরাণীও নেই, মথুরাও টাইফয়েড জ্বরে মরেচে। প্রতিকারের কিছুই আর ছিল না, কিন্তু ভবিষ্যতের ভয়ে সে রাত্রে গুপ্ত-সভা অতিশয় কঠিন দুটো আইন পাশ করে। কৃষ্ণ আইয়ার, তুমি ত উপস্থিত ছিলে, তুমিই বল!

কৃষ্ণ আইয়ারের মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল, কহিল, আপনি কাকে ইঙ্গিত করচেন আমি ত বুঝতে পারচিনে ডাক্তার।

ডাক্তার লেশমাত্র ইতস্তত না করিয়া বলিলেন, ব্রজেন্দ্রকে। একটা আইনে এই ছিল, আমার আড়ালে আমার কাজের আলোচনা চলবে না,—

ব্রজেন্দ্র বিদ্রূপের স্বরে প্রশ্ন করিলেন আলোচনাও চলবে না।

ডাক্তার উত্তর দিলেন, না, আড়ালে চলবে না। কিন্তু চলে তা জানি। তার কারণ, সেদিনকার ক্যানটনের সভায় উপস্থিত যাঁরা ছিলেন দুরাণীর মৃত্যুতে তাঁরা যতটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, আমি ততটা হইনি, সুতরাং এ বস্তু চলেও আসচে, আমিও অবহেলা করেই আসচি। কিন্তু দ্বিতীয়টা গুরুতর অপরাধ, ব্রজেন্দ্র।

ব্রজেন্দ্র তেমনি উপেক্ষাভরে কহিল, সেটা প্রকাশ করে বলুন।

ডাক্তার কহিলেন, প্রকাশ করেই বলচি। আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা মারাত্মক অপরাধ। দুরাণীর মৃত্যুর পরে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া আমার দরকার।

ব্রজেন্দ্র কঠিন হইয়া উঠিল, বলিল, সাবধান হওয়া দরকার অপরেরও ঠিক এমনি থাকতে পারে। জগতে প্রয়োজন শুধু আপনারই একচেটে নয়। এই বলিয়া সে সকলের দিকে চাহিল, কিন্তু সকলেই মৌন হইয়া রহিল, কেহই তাহার জবাব দিল না।

ডাক্তার নিজেও অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, এর শাস্তি হচ্ছে চরম দণ্ড! ভেবেছিলাম যাবার পূর্ব্বে আর কিছু করব না, কিন্তু

ব্রজেন্দ্র, তোমার আপনারই সবুর সইল না। পরের প্রাণ নিতে ত তুমি সদাই প্রস্তুত, কিন্তু নিজের বেলা কিরকম মনে হয় ?

ব্রজেন্দ্রের মুখ কালো হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল সে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া দম্ভভরে কহিয়া উঠিল, আমি এনার্কিস্ট, আমি রেভোলিউশনারি, প্রাণ আমার কাছে কিছুই নয়,—দিতেও পারি, নিতেও পারি।

ডাক্তার শান্তকণ্ঠে বলিলেন, তাহলে আজ রাত্রে সেটা দিতে হবে,—কিন্তু বেল্ট থেকে ওটা টেনে বার করবার সময় হবে না ব্রজেন্দ্র, আমার চোখ আছে,—তোমাকে আমি চিনি। এই বলিয়া তিনি পিস্তল সমেত বাঁ হাত তুলিয়া ধরিলেন ; ভারতী ব্যাকুল হইয়া সেই হাতটা তাঁহার চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেই তিনি ডান হাত দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া শুধু বলিলেন, ছিঃ।

ঘরের মধ্যে চক্ষের নিমিষে যেন একটা বজ্রপাত ঘটিয়া গেল।

সুমিত্রার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, বলিল, নিজেদের মধ্যে এ সব কি বলুন ত ?

তলওয়ারকর এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কথাও কহে নাই, এখন সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার দলের সকল নিয়ম আমি জানিনে। আপনার সঙ্গে মতভেদের শাস্তি কি এখানে মৃত্যু ? অপূর্ব্ববাবু বেঁচে গেছেন এতে আমি মনে মনে খুশীই হয়েচি, কিন্তু আপনার অন্যায় তাতে কম হয়নি, এ সত্য বলতে আমি বাধ্য।

কৃষ্ণ আইয়ার ঘাড় নাড়িয়া ইহাতে সায় দিল। ব্রজেন্দ্রর কণ্ঠস্বরে আর উপহাসের স্পর্দ্ধা ছিল না, কিন্তু সে অনেকের সহানুভূতিতে বল পাইয়া বলিল, একজনের প্রাণ যাওয়া যখন চাই, তখন আমারই না হয় যাক। আমি প্রস্তুত।

সুমিত্রা বলিল, ট্রেটরের বদলে যদি একজন ট্রায়েড কমরেডের রক্তই তোমার প্রয়োজন, তখন আমিও ত দিতে পারি ডাক্তার।

ডাক্তার স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, এই উচ্ছ্বাসের সহসা কোন জবাব দিবার চেষ্টা করিলেন না। মিনিট-দুই পরে নিজের মনেই একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, সে সব বহুকালের কথা, তখন কোথায়ই বা তোমরা ? এই ট্রায়েড কমরেডটিকে তখন থেকেই আমি জানি সে যাক। টোকিওর একটা হোটেলে বসে সুনিয়াৎ সেন একদিন বলেছিলেন নৈরাশ্য সহ্য করার শক্তি যার যত কম সে যেন এ রাস্তা থেকে ততদিন দূরে দূরেই চলে। অতএব, এ আমার সইবে। কিন্তু ব্রজেন্দ্র, তোমাকে আমি মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা করিনি। আমাকে অন্যত্র যেতে হচ্চে, কিন্তু ডিসিপ্লিন ভেঙে গেলে ত আমার চলবে না। সুমিত্রাকে যদি তোমার দলেই পাও, আই উইশ ইউ গুড লাক্। কিন্তু আমার পক্ষ তুমি ছাড়। সুরাভায়ায়

একবার এ্যাটেম্পট্ করেচ, পরশু আর একবার করেচ, কিন্তু এর পরে ইফ উই মিট—ইউ নো?

সুমিত্রা উদ্বেগচকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সব কথার মানে। এ্যাটেম্পট করার অর্থ?

ডাক্তার এ প্রশ্ন কানেও তুলিলেন না, কহিলেন, কৃষ্ণ আইয়ার, আই অ্যাম সরি!

আইয়ার মুখ অবনত করিল, কিন্তু উত্তর দিল না। ডাক্তার পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন, ভারতীর হাত ধরিয়া একটুখানি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, এইবার চল তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আমি যাই। ওঠ।

ভারতী স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বসিয়াছিল, ইঙ্গিতমাত্র নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, শুধু দ্বারের কাছ হইতে একবার সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, গুড নাইট!

এই বিদায় বাণীর কেহ প্রত্যুত্তর দিল না, অভিভূতের ন্যায় সকলে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ভারতী নীচে নামিয়া গেলে, ডাক্তার উপরের দিকে চোখ রাখিয়া যখন ধীরে ধীরে নামিতেছিলেন, অকস্মাৎ কপাট খুলিয়া শশী মুখ বাহির করিয়া বলিল, কিন্তু আমার যে আপনাকে ভয়ানক প্রয়োজন ডাক্তার। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে নামিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, রুদ্ধশ্বাসে কহিল, আমি ত মানুষের মধ্যেই নই ডাক্তারবাবু, কোনদিন আপনার কোন কাজে লাগবার শক্তিই আমার নেই, কিন্তু আপনার ঋণ আমি চিরদিন মনে করে রাখবো। এ আমি ভুলব না।

ডাক্তার সস্নেহে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া বলিলেন, কে বলে তোমাকে মানুষ নয়, শশী? তুমি কবি, তুমি গুণী, তুমি সকল মানুষের বড়। আর আমার কাছে তোমার ঋণ যদি কিছু সত্যিই থাকে, সে তো না তোলাই ভাল।

শশী, বলিল, না, আমি ভুলব না! কিন্তু, যেখানেই থাকুন, যা কিছু আমার আছে সমস্তই আপনার—এ কথা কিন্তু আপনিও ভুলতে পাবেন না।

উভয়ে ভারতীর কাছে আসিয়া পৌঁছিতে সে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি দাদা?

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, অসময়ে ওর ত কোন বিপদই ছিল না, কিন্তু হঠাৎ সময়টা ভাল হয়ে পড়াতেই ওর মহা চিন্তা হয়েচে, পাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ আর মনে না থাকে! তাই ছুটে বলতে এসেচে, ওর যা কিছু সমস্ত আমার।

ভারতী বলিল; তাই নাকি শশীবাবু?

শশী চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার সকৌতুক স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, মনে থাকবে হে শশী, থাকবে। এ বস্তু জগতে এত সুন্দর নয় যে কেউ সহজে ভোলে।

শশী কহিল, আপনি কবে যাবেন? তার আগে কি আর দেখা হবে না?

ডাক্তার বলিলেন, ধরে রাখো দেখা হবেই না। কিন্তু তুমি ত আমার বয়সে ছোট, আমি আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছ তুমি যেন সুখী হতে পারো।

শশী সবিনয়ে কহিল, আসচে শনিবারটা পর্য্যন্ত কি থাকতে পারেন না?

ভারতী কহিল, শনিবারে যে ওঁদের বিয়ে।

ডাক্তার মুখ টিপিয়া হাসিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। সম্মুখে নদী, কাঠের মাড়ের পাশে ক্ষুদ্র তরণী শেষ ভাঁটায় কাদার উপরে কাত হইয়া পড়িয়াছে। সোজা করিয়া ভারতীকে সযত্নে তুলিয়া দিয়া তিনি নিজেও উঠিয়া বসিলেন। শশী বলিল, শনিবারটা আপনাকে থেকে যেতে হবে। জীবনে অনেক ভিক্ষে দিয়েচেন, এটিও আমাকে দিন। ভারতী, আপনাকেও সেদিন আসতে হবে।

ভারতী মৌন হইয়া রহিল। ডাক্তার বলিলেন, ও আসবে না শশী, কিন্তু আমি যদি থেকে যেতে পারি অন্ধকারে গা ঢেকে এসে তোমাদের একবার আশীর্ব্বাদ করে যাবো, আমি কথা দিয়ে যাচ্চি। আর যদি না আসি, নিশ্চয় জেনো সব্যসাচীর পক্ষেও তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যেখানেই থাকি, সেদিন তোমার জন্য এই প্রার্থনাই করব, বাকি দিনগুলো যেন তোমার সুখে কাটে। এই বলিয়া তিনি হাতের লগি দিয়া কাঠের স্তূপে সজোরে ঠেলা দিতেই ছোট নৌকা কাদার উপর দিয়া পিছলাইয়া নদীর জলে গিয়া পড়িল।

জোয়ার তখনও আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু ভাঁটার টানে ঢিলা পড়িয়া আসিয়াছে। সেই মন্দীভূত স্রোতে উচ্চ তীরভূমির অন্ধকার ছায়ার নীচে দিয়া তাহার ক্ষুদ্র তরণী ধীরে ধীরে পিছাইয়া চলিতে লাগিল। ও-পারের জন্য পাড়ি দিতে তখনও বিলম্ব ছিল, ডাক্তার হাতের দাঁড় যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিলেন।

শ্রান্ত ভারতী তাঁহার ক্রোড়ের উপর কনুই রাখিয়া হেলান দিয়া বসিয়া বলিল, আজ একলা থাকলে আমি এমন কান্না কাঁদতাম যে নদীর জল বেড়ে যেতো। দাদা, ভবিষ্যতে সকলেরই সুখী হবার অধিকার আছে, নেই কি কেবল তোমার? শশীবাবু অতবড় বিশ্রী কাজ করতে উদ্যত, তাকেও তুমি মন খুলে আশীর্ব্বাদ করে এলে, শুধু কেউ নেই পৃথিবীতে সুখী হও বলে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবার? তুমি গুরুজন হও আর যাই হও, তোমাকেও আজ আমি ঠিক ওই বলে আশীর্ব্বাদ করব, যেন তুমিও ভবিষ্যতে সুখী হতে পারো।

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, ছোটর আশীর্ব্বাদ খাটে না। উল্টো ফল হয়।

ভারতী বলিল, মিছে কথা। তা ছাড়া আমি শুধু ছোট নয়, আর একদিক দিয়ে তোমার বড়! যাবার আগে তুমি সমস্ত লণ্ড ভণ্ড করে দিয়ে সুমিত্রাদিদির সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে রেখে যেতে চাও সে আমি হতে দেব না। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিতে লাগিল, তুমি বলবে সুমিত্রাকে ত তুমি ভালবাস না। নাই বাসলে। তোমাদের পুরুষমানুষের ভালবাসার কতটুকু দাম দাদা, যা আজ আছে কাল নেই? অপূর্ব্ববাবুও আমাকে ভালবাসতে পারেননি, কিন্তু আমি ত পেরেচি। আমার পারাই যা কিছু সব। বোলতার মধু সঞ্চয়ের শক্তি নেই বলে ঝগড়া করতে যাবো কার সঙ্গে? কিন্তু আজ তোমাকে বলচি দাদা, এই বিশ্ব-বিধানের প্রভু যদি কেউ থাকেন নারী-হৃদয়ের এত বড় প্রেমের ঋণ শুধতে তাঁকে আমার হাতে এনে অপূর্ব্ববাবুকে সঁপে দিতে হবেই হবে। এই বলিয়া ভারতী কিছু একটা উত্তরের আশায় ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, দাদা, তুমি মনে মনে হাসচো?

কই, না।

নিশ্চয়। নইলে তুমি জবাব দিলে না কেন? এই বলিয়া সে অন্ধকারে যতদূর পারা যায় সব্যসাচীর মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

ডাক্তার হেঁট হইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া এইবার হাসিলেন, বলিলেন, জবাব দেবার কিছু ছিল না ভারতী। তোমার বিশ্ব-বিধানের প্রভুটিকে যদি এই জবরদস্তিই মেনে চলতে হ'তো, তোমার সুমিত্রাদিদির কি হতো জানো? ব্রজেন্দ্রের হাতেই নিজেকে সর্ব্বপ্রকারে সঁপে দিয়ে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে হতো।

ভারতী বিশেষ চমকিত হইল না। আজিকার ব্যাপারের পরে এই সন্দেহই তাহার মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, ব্রজেন্দ্র কি তাঁকে তোমার চেয়ে,—আমি বলচি, এত বেশি ভালবাসেন?

ডাক্তার সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। তারপরে কহিলেন, বলা একটু কঠিন। এ যদি নিছক একটা আকর্ষণই হয় ত মানুষের সমাজে তার তুলনা হয় না। লজ্জা নেই, সরম নেই, সম্ভ্রম নেই,—হিতাহিত বোধলুপ্ত জানোয়ারের উন্মত্ত আবেগ যে চোখে না দেখেচে সে তার মনের পরিচয় পাবে না। ভারতী তোমার দাদার এই হাত দুটো বলে কোন বস্তু যদি সংসারে না থাকতো সুমিত্রার আত্মহত্যা ছাড়া বোধ হয় আর কোন পথ খোলা থাকত না। তোমার বিশ্ব-বিধানের প্রভুটিও এতদিন এদের খাতির না করে পারেননি। এই বলিয়া তিনি ভারতীর আনত মাথার 'পরে হাত দুটি রাখিয়া ধীরে ধীরে চাপড়াইতে লাগিলেন।

এতক্ষণে ভারতী শঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, দাদা এত জেনেও তুমি এঁরই

হাতে সুমিত্রাকে ফেলে রেখে যেতে চাচ্ছো? এত বড় নিষ্ঠুর তুমি হতে পারো আমি ভাবতেই পারিনে।

ডাক্তার কহিলেন, তাই ত আজ যাবার আগে সমস্ত চুকিয়ে দিয়ে যেতে চেয়েছিলাম,—কিন্তু সুমিত্রাই ত হতে দিলে না।

ভারতী সভয়ে প্রশ্ন করিল, হতে দিলে না কি রকম? তুমি কি সত্যিই ব্রজেন্দ্রকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে নাকি?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হ্যাঁ, সত্যিই চেয়েছিলুম। ইতিমধ্যে পুলিশের লোকে যদি না তাকে জেলে পাঠায় ত ফিরে এসে একদিন আমাকেই এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতী তাঁহার ক্রোড়ের উপর হেলান দিয়া বসিয়া ছিল, এই কথার পর উঠিয়া বসিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে যে অন্তরের মধ্যে একটা কঠিন আঘাত পাইল ডাক্তার তাহা বুঝিলেন, কিন্তু কোন কথা না কহিয়া পরপারের জন্য প্রস্তুত হইয়া পার্শ্বে রক্ষিত দাঁড় দুটা দুই হাতে টানিয়া লইলেন।

অনেকক্ষণ পরে ভারতী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দাদা, আমি যদি তোমার সুমিত্রা হোতাম এমনি করে কি আমাকে ফেলে যেতে পারতে?

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, কিন্তু তুমি ত সুমিত্রা নও ; তুমি ভারতী। তাই তোমাকে আমি ফেলে যাবো না, কাজের জন্য রেখে যাবো।

ভারতী ব্যগ্র হইয়া কহিল, রক্ষে কর দাদা, তোমাদের এই সব খুনোখুনি রক্তারক্তির মধ্যে আমি আর নেই। তোমার গুপ্ত-সমিতির কাজ আমাকে দিয়ে আর হবে না।

ডাক্তার বলিলেন, তার মানে এঁদের মত তুমিও আমাকে ত্যাগ করে যেতে চাচ্ছো?

এই উক্তি শুনিয়া ভারতী ক্ষোভে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কহিল, এত বড় অন্যায় কথা তুমি আমাকে বলতে পারো দাদা? তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো, কিন্তু আমি নিজে থেকে তোমাকে ত্যাগ করে গেছি, এ কথা মনে হলে কি একটা দিনের জন্যেও বাঁচতে পারি তুমি ভাবো? আমি তোমারই কাজ করে যাবো, যত দিন না তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে ছুটি দাও! একটুখানি থামিয়া কহিল, কিন্তু আমি ত জানি, মানুষ খুন করে বেড়ানোই তোমার আসল কাজ নয়, তোমার কাজ মানুষকে মানুষের মত করে বাঁচানো। তোমার সেই কাজে আমি লেগে থাকবো এবং সেই ভেবেই ত তোমাদের মধ্যে আমি এসেছিলাম।

ডাক্তার এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়টানা বন্ধ রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, সে কাজটা আমার কি?

ভারতী বলিল, আমাদের পথের দাবীর ত কোন প্রয়োজন ছিল না গুপ্ত-সমিতি হয়ে ওঠা! কারখানার মজুর-মিস্ত্রিদের অবস্থা ত আমি নিজের চোখেই দেখে এসেচি। তাদের পাপ, তাদের কুশিক্ষা, তাদের পশুর মত অবস্থা,—এর একবিন্দু প্রতিকারও যদি সারাজীবনে করতে পারি, তার চেয়ে বড় সার্থকতা আমার আর কি হতে পারে? সত্যি বলো দাদা, একি তোমারই কাজ নয়?

ডাক্তার তখনই কোন জবাব দিলেন না, বহুক্ষণ নীরবে কত কি যেন চিন্তা করিয়া সহসা দাঁড় দুটো জল হইতে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, কিন্তু তোমার এ কাজ নয় ভারতী, তোমার অন্য কর্ত্তব্য আছে। এ কাজ সুমিত্রার—তাই তার 'পরেই আমি এ ভার ন্যস্ত করে রেখেচি।

তখন নদীতে ভাঁটা শেষ হইয়া মোহনায় জোয়ার আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সাগরের স্ফীত জলবেগ এখনও এতদূরে আসিয়া পৌঁছে নাই,—সেই স্তব্ধপ্রায় নদী-বক্ষে তাঁহার ক্ষুদ্র তরণী মন্থর-মন্দ গতিতে ভাসিয়া চলিতে লাগিল, ডাক্তার তেমনি শান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, তোমাকে বলাই ভাল ভারতী, জনকতক কুলি-মজুরের ভাল করার জন্যে পথের দাবী আমি সৃষ্টি করিনি। এর ঢের বড় লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের মুখে হয়ত একদিন এদের ভেড়া-ছাগলের মতই বলি দিতে হবে,—তার মধ্যে তুমি থেকো না বোন, সে তুমি পারবে না।

ভারতী চমকিয়া উঠিয়া কহিল, এসব তুমি কি বলচ দাদা? মানুষকে বলি দেবে কি!

ডাক্তার তেমনি শান্তস্বরে বলিলেন, মানুষ কোথায়? জানোয়ার বই ত নয়!

ভারতী ভীত হইয়া কহিল, মানুষের সম্বন্ধে তুমি ঠাট্টা করেও অমন কথা মুখে এনো না বলচি। সকল সময়ে সব কথা তোমার বোঝা যায় না—বুঝতেও পারিনে, তা মানি; কিন্তু তোমার মুখের কথার চেয়ে তোমাকে ঢের বেশী বুঝি দাদা, মিথ্যে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করো না।

ডাক্তার বলিলেন, না ভারতী, মিথ্যে নয়, তোমাকে সত্যি ভয় দেখাবার চেষ্টা করচি, যেন আমার যাবার পরে আর তুমি কারখানার কুলি-মজুরদের ভাল-করার মধ্যে না থাকো। এমন করে এদের ভালো করা যায় না,—এদের ভাল-করা যায় শুধু বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। এবং সেই বিপ্লবের পথে চালনা করার জন্যেই আমার পথের দাবীর সৃষ্টি। বিপ্লব শান্তি নয়। হিংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়,—এই তার বর, এই তার অভিশাপ। একবার ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ। হাঙ্গেরীতে তাই হয়েচে, রুশিয়ায় বার বার এমনি ঘটেছে, ৪৮ সালের জুন

মাসের বিপ্লব ফরাসীদের ইতিহাসে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। কুলি-মজুরদের রক্তে সেদিন সহরের সমস্ত রাজপথ একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছিল। এই ত সেদিনের জাপান, —সেদেশেও দিন-মজুরের দুঃখের ইতিহাস একবিন্দু বিভিন্ন নয়। মানুষের চলবার পথ মানুষ কোন দিন নিরুপদ্রবে ছেড়ে দেয় না ভারতী।

ভারতী শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, সে আমি জানিনে, কিন্তু ওই সব ভয়ানক উৎপাত কি তুমি এদেশেও টেনে আনবে নাকি? যাদের একফোঁটা ভাল করবার জন্যে আমরা অহর্নিশি পরিশ্রম করেছি, তাদেরই রক্ত দিয়ে কারখানার রাস্তায় নদী বহাতে চাও না কি?

ডাক্তার অবলীলাক্রমে কহিলেন, নিশ্চয় চাই? মহামানবের মুক্তি সাগরে মানবের রক্তধারা তরঙ্গ তুলে ছুটে যাবে সেই ত আমার স্বপ্ন। এতকালের পর্ব্বতপ্রমাণ পাপ তবে ধুয়ে যাবে কিসে? আর সেই ধোয়ার কাজে তোমার দাদার দু' ফোঁটা রক্তের যদি প্রয়োজন হয় ত আপত্তি করব না ভারতী।

ভারতী কহিল, ততটুকু তোমাকে চিনি দাদা। কিন্তু দেশের মধ্যে এই অশান্তি ঘটিয়ে তোলবার জন্যেই এতবড় ফাঁদ পেতে বসে আছো? এর চেয়ে বড় আদর্শ তোমার নেই।

ডাক্তার বলিলেন, আজও ত খুঁজে পাইনি বোন। অনেক ঘুরেচি, অনেক পড়েছি, অনেক ভেবেচি। কিন্তু তোমাকে ত আমি আগেও বলেচি, ভারতী, অশান্তি ঘটিয়ে তোলা মানেই অকল্যাণ ঘটিয়ে তোলা নয়। শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করেচে জানো? পরের শান্তি হরণ করে যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যামন্ত্রের ঋষি। বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত নরনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে করে তাদের এমন করে তুলেচে যে, আজ তারাই অশান্তির নামে চমকে উঠে ভাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল! বাঁধা গরু অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেচ? সে দাঁড়িয়ে মরে তবু সেই জীর্ণ দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে মনিবের শান্তি নষ্ট করে না। তাই ত হয়েচে, তাই ত আজ দীন-দরিদ্রের চলার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে! তবুও তাদের অট্টালিকা প্রাসাদ চূর্ণ করার কাজে তাদেরি সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে যদি আমরাও আজ অশান্তি বলে কাঁদতে থাকি ত পথ পাবো কোথায়? না ভারতী, সে হবে না। ও প্রতিষ্ঠান যত প্রাচীন, যত পবিত্র, যত সনাতনই হোক, মানুষের চেয়ে বড় নয়,—আজ সে-সব আমাদের ভেঙে ফেলতে হবে। ধুলো ত উড়বেই, বালি ত ঝরবেই, ইট পাথর খসে মানুষের মাথায় পড়বেই ভারতী, এই ত স্বাভাবিক।

ভারতী বলিল, তাও যদি হয় দাদা, শান্তির পথ ছেড়ে দিয়ে আগে থেকেই অশান্তির পথে পা বাড়াবো কেন?

ডাক্তার বলিলেন, তার কারণ, শান্তির পথ ঐ সনাতন, পবিত্র ও সুপ্রাচীন সভ্যতার সংস্কার দিয়ে এঁটে বন্ধ করা আছে বলে। কেবল ঐ বিপ্লবের পথটাই আজও খোলা আছে।

ভারতী প্রশ্ন করিল, আমরা যেদিন কারখানার কারিকরদের সঙ্ঘবদ্ধ করে নিরুপদ্রব ধর্ম্মঘট করবার আয়োজন করেছিলাম সেও কি তবে তাদের মঙ্গলের জন্যে নয়? তুমি চলে গেলে পথের দাবীর সে প্রচেষ্টাও কি আমাদের বন্ধ করে দিতে হবে?

ডাক্তার বলিলেন, না। কিন্তু সে কর্ত্তব্য তোমার নয়, সুমিত্রার। তোমার কাজ আলাদা। ভারতী, ধর্ম্মঘট বলে একটা বস্তু আছে, কিন্তু নিরুপদ্রব-ধর্ম্মঘট বলে কোথাও কিছু নেই। সংসারে কোন ধর্ম্মঘটই কখনো সফল হয় না, যতক্ষণ না পিছনে তার বাহুবল থাকে। শেষ পরীক্ষা তাকেই দিতে হয়।

ভারতী বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কাকে দিতে হবে? শ্রমিককে?

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ। তুমি জানো না, কিন্তু সুমিত্রা ভাল করেই জানে যে ধনীর আর্থিক ক্ষতি এবং দরিদ্রের অনশন একবস্তু নয়। তার উপায়হীন, কর্ম্মহীন দিনগুলো দিনের পর দিন তাকে উপবাসের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী পুত্র পরিবার ক্ষুধায় কাঁদতে থাকে,—তাদের অবিশ্রান্ত ক্রন্দন অবশেষে একদিন তাকে পাগল করে তোলে,—তখন পরের অন্ন কেড়ে খাওয়া ছাড়া জীবনধারণের আর সে পথ খুঁজে পায় না। ধনী সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করেই স্থির হয়ে থাকে। অর্থ-বল, সৈন্য-বল, অস্ত্র-বল সবই তার হাতে,—সে-ই ত রাজশক্তি। সেদিন সে আর অবহেলা করে না—তোমার ঐ সনাতন শান্তি ও পবিত্র শৃঙ্খলার জয়জয়কার হোক, সেদিন নিরন্ন নিরস্ত্র দরিদ্রের রক্তে নদী বহে যায়।

ভারতী রুদ্ধশ্বাসে কহিল, তার পরে?

ডাক্তার বলিলেন, তার পরে আবার একদিন সেসব পীড়িত, পরাভূত ক্ষুধাতুর শ্রমিকের দল এসে সেই হত্যাকারীর দ্বারেই হাত পেতে দাঁড়ায়। ভিক্ষা পায়।

ভারতী কহিল, তার পরে?

ডাক্তার বলিলেন, তারও পরে? তারপরে আবার একদিন সে দলবদ্ধ হয়ে পূর্ব্ব অত্যাচারের প্রতিকারের আশায় ধর্ম্মঘট করে বসে, তখন আবার সেই পুরাতন কাহিনীর পুনরাভিনয় হয়।

ভারতীর মন মুহূর্ত্তকালের জন্য একেবারে নিরাশায় ভরিয়া গেল, ধীরে ধীরে কহিল, তবে ধর্ম্মঘটে লাভ কি দাদা ?

ডাক্তারের চোখের দৃষ্টি অন্ধকারেও জলিয়া উঠিল, কহিলেন, লাভ ? এই ত পরম লাভ ভারতী ! এই ত আমার বিপ্লবের রাজপথ ! বস্ত্রহীন, অন্নহীন, জ্ঞানহীন দরিদ্রের পরাজয়টাই সত্য হল, আর তার বুক জুড়ে যে বিষ উপচে উছলে ওঠে, জগতে সে শক্তি সত্য নয় ? সেই ত আমার মূলধন। কোথাও কোন দেশে নিছক বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব বাধানো যায় না, ভারতী, একটা কিছু অবলম্বন তার চাই-চাই, সেই ত আমার অবলম্বন। যে মূর্খ একথা জানে না, শুধু মজুরির কম বেশি নিয়ে ধর্ম্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদেরও সর্ব্বনাশ করে, দেশেরও করে।

ভারতী সহসা কহিল, নৌকা বোধ হয় আমাদের অনেকখানি পেছিয়ে এসেচে দাদা।

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, সে দিকেও চোখ আছে দিদি, কোথায় যেতে হবে তা ভুলিনি।

ভারতী কহিল, কেন যে এর মধ্যে থেকে আমাকে তুমি বিদায় দিতে চাও এতক্ষণে তা বুঝেছি ; আমি ভারী দুর্ব্বল। হয়ত তাঁরই মতই দুর্ব্বল। আমি কিছু নয়,—আজও তোমার সমস্ত ভরসা সেই সুমিত্রাদিদির 'পরেই। কিন্তু এ কথা আমি কিছুতে মানবো না যে, এ ছাড়া আর পথ নেই, মানুষের সমস্ত খোঁজাই একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। একজনের মঙ্গলের জন্য আর একজনের অমঙ্গল করতেই হবে,—এ আমি কোনমতেই চরম সত্য বলে নেব না,—তুমি বললেও না।

সে আমি জানি বোন।

ভারতী কহিল, কিন্তু তোমার কাজ ছেড়েই বা আমি যাই কি করে ? থাকবো কি নিয়ে ? ফিরে যদি আর না এসো আমি বাঁচবো কি করে ?

সেও আমি জানি।

ভারতী বলিল, জান তুমি সব। তবে ?

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। উত্তর না পাইয়া ভারতী ধীরে ধীরে বলিল, বিপ্লব যে কি, কেন এর এত প্রয়োজন মনের মধ্যে আমি ধারণাই করতে পারিনি। তবু তোমার মুখ থেকে যখন শুনি বুকের ভেতরটায় কেমন যেন কাঁদতে থাকে। মনে হয় মানুষের দুঃখের ইতিহাস তুমি কতই না চোখে দেখেচ। নইলে এমন করে তোমাকে পাগল করেচে কিসে ? আচ্ছা, যাবার সময় কি আমাকে তুমি সঙ্গে নিতে পারো না দাদা ?

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তুমি ক্ষেপেচ ভারতী ?

ক্ষেপেচি? তাই হবে। একটুখানি থামিয়া বলিল, মনে হয় আমি যেন তোমার কাজের বাধা। তাই, যেন কোথায় আমাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে যাচ্চো। কিন্তু আমি কি দেশের কোন ভাল কাজেই লাগতে পারিনে? এমন সুযোগ কি কোথাও কিছু নেই?

ডাক্তার বলিলেন, দেশে ভাল কাজ করার অসংখ্য অবকাশ আছে ভারতী, কিন্তু সুযোগ নিজে তৈরি করে নিতে হয়।

ভারতী আদর করিয়া বলিল, আমি পারিনে দাদা, তুমি তৈরি করে দিয়ে যাও।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার হাসিমুখ সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল, অন্ধকারে ভারতী তাহা দেখিতে পাইল না। কহিলেন, দেশের মধ্যে ছোট-বড় এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যারা দেশের ঢের ভাল কাজ করে। আর্ত্তের সেবা, নর-নারীর পুণ্যসঞ্চয়ে প্রবৃত্তি দান করা, লোকের জ্বর ও পেটের অসুখে ঔষধ যোগানো, জল-প্লাবনে সাহায্য ও সান্ত্বনা দেওয়া—তাঁরাই তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবে ভারতী, কিন্তু আমি বিপ্লবী। আমার মায়া নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই,—পাপ-পুণ্য আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস। ওই-সব ভাল কাজ আমার কাছে ছেলেখেলা। ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটিমাত্র সাধনা। এই আমার ভাল, এই আমার মন্দ,—এ ছাড়া এ জীবনে আর আমার কোথাও কিছু নেই। ভারতী, আমাকে আর তুমি টেনো না।

ভারতী অন্ধকারে একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়াছিল, রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

২৬

আজ শনিবার শশী ও নবতারার বিবাহের দিন। শশীর সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা এই ছিল যে, রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া কোন এক সময়ে যেন ডাক্তার ভারতীকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া আজ তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া যান! পঞ্চমীর খণ্ডচন্দ্র সেইমাত্র গাছের আড়ালে ঢলিয়া পড়িয়াছে, ভারতী একখানা কালো ব্যাপারে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাহার সেই জনশূন্য ঘাটের একধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার নৌকায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, ভারতী আরোহণ করিয়া বলিল, কত কি-যে ভাবতে ভাবতে আসছিলাম তার ঠিকানা নেই। জানি, আমাকে না বলে তুমি কিছুতেই চলে যাবে না, তবু ত ভয় ঘোচে না। ক'দিনই বা কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন কত যুগ

তোমাকে দেখতে পাইনি, দাদা। আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে চীনদের দেশে চলে যাবো তা বলে রাখচি।

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, আমিও বলে রাখচি তুমি নিশ্চয়ই ওরকম কিছু করবার চেষ্টা করবে না। এই বলিয়া তিনি ভাঁটার টানে নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, এইটুকু ত বেশ যাওয়া যাবে, কিন্তু বড় নদীতে পড়ে উল্টো স্রোত ঠেলে পৌঁছতে আজ আমাদের ঢের দেরি হবে।

ভারতী কহিল, হলই বা! এমনি কি শুভকর্ম্মে যোগ দিতে চলেচ যে সময় বয়ে গেলে ক্ষতি হবে? আমার ত যাবার ইচ্ছেই ছিল না,—শুধু তুমি যাচ্চো বলেই যাওয়া। কি বিশ্রী নোঙরা কাণ্ড বল ত!

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, শশীর নবতারার সঙ্গে বিয়ে অনেকের সংস্কারে বাধে, হয়ত বা দেশের আইনেও বাধে। কিন্তু সে দোষ ত শশীর নয়, আইন করা না-করার জন্য দায়ী যারা, অপরাধ তাদের। আমার একমাত্র ক্ষোভ শশী আর কাউকে যদি ভালবাসতো ভারতী।

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, শশীবাবু না-হয় আর কাউকে ভালবাসলেন, কিন্তু সে বাসবে কেন? ওর মত মানুষকে সজ্ঞানে কোন মেয়েমানুষ ভালবাসতে পারে এ তো আমি ভাবতেই পারিনি। আচ্ছা তুমিই বল, পারে দাদা?

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন, বলিলেন, ওকে ভালবাসা শক্ত বই কি। তাই ত রয়ে গেলাম তাকে আশীর্ব্বাদ করব বলে। মনে সত্যকার শুভকামনার যদি কোন শক্তি থাকে শশী যেন তার ফল পায়।

তাঁর কণ্ঠস্বরের আকস্মিক গভীরতায় ভারতী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শশীবাবুকে তুমি বাস্তবিক ভালোবাসো, না দাদা?

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ।

কেন?

তোমাকেই বা কেন এত ভালবাসি তারই কি কারণ দিতে পারি দিদি? বোধ হয় এমনিই।

ভারতী আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দাদা, তোমার কাছে কি তবে আমরা দুজনে এক? কিন্তু পরক্ষণেই সহাস্যে বলিল, তবু ত নিজের দামটা এতদিনে টের পেলাম। চল, আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে এখন খুশী হয়ে তাদের আশীর্ব্বাদ—না, না, প্রণাম করে আসি গে।

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, চল।

জোয়ারের আশায় নদীর এপারে কোথাও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা নিরাপদ নহে,

তাই ভাঁটা ঠেলিয়া কষ্ট করিয়াই চলিতে হইল। খাড়ির মুখে একখানা জাপানী জাহাজ কিছুদিন হইতে বাঁধা ছিল, সেই স্থানটা নিঃশব্দে পার হইয়া ভারতী কথা কহিল। বলিল, এই কয়দিন থেকে থেকে কেবলি মনে হ'তো, দাদা, সমুদ্রের যেমন তল নেই, তোমার তেমনি তল নেই। স্নেহ বল, ভালবাসা বল; কিছুই তোমাতে ভর দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সবই যেন কোথায় তলিয়ে চলে যায়।

ডাক্তার বলিলেন, প্রথমতঃ সমুদ্রের তল আছে, সুতরাং, উপমা তোমার এ ক্ষেত্রে অচল।

ভারতী কহিল, এই নিয়ে বোধ হয় তোমাকে একশ'বার বললাম যে, তুমি ছাড়া দুনিয়ায় আমার আর আপনার কেউ নেই,—তুমি চলে গেলে আমি দাঁড়াবো কোথায়? কিন্তু এ কথা তোমার কানেই পৌঁছল না। আর পৌঁছবে কি করে দাদা, হৃদয় ত নেই। আমি ঠিক জানি একবার চোখের আড়াল হলে তুমি নিশ্চয় আমাকে ভুলে যাবে।

ডাক্তার বলিলেন; না। তোমাকে নিশ্চয় মনে থাকবে।

ভারতী প্রশ্ন করিল, কি আশ্রয় করে আমি সংসারে থাকবো?

ডাক্তার বলিলেন, ভাগ্যবতী মেয়েরা যা আশ্রয় করে থাকে। স্বামী, ছেলেপুলে, বিষয়-আশয়, ঘরদোর—

ভারতী রাগ করিয়া বলিল, আমি যে অপূর্ব্ববাবুকে একান্তভাবেই ভালবেসেছিলাম এ সত্য তোমার কাছে গোপন করিনি; তাঁকে পেলে একদিন যে আমার সমস্ত জীবন ধন্য হয়ে যেতো এ কথাও তুমি জানো,—তোমার কাছে কিছু লুকানোও যায় না,—কিন্তু তাই বলে আমাকে তুমি অপমান করবে কিসের জন্যে?

ডাক্তার আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, অপমান! অপমান ত তোমাকে আমি এতটুকু করিনি ভারতী।

সহসা অশ্রু-আভাসে ভারতীর কণ্ঠ ভারী হইয়া উঠিল, কহিল, না, করনি বই কি! তুমি জানো কত শত-সহস্র বাধা, তুমি জানো তিনি আমাকে গ্রহণ করতেই পারেন না,—তবুও তুমি এইসব বলবে?

ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, এই ত মেয়েদের দোষ। তারা নিজেরা একদিন যা বলে, অপরে তাই আর একদিন উচ্চারণ করলেই তারা তেড়ে মারতে আসে। সেদিন সুমিত্রার কথায় বললে সে কাকে যেন একদিন পায়ের তলায় টেনে এনে ফেলবে, আজ আমি তারই পুনরাবৃত্তি করায় কান্নায় গলা তোমার বুঁজে এলো!

ভারতী চোখ মুছিয়া বলিল, না, তুমি কখ্‌খনো এসব কথা আমাকে বলতে পাবে না।

ডাক্তার কহিলেন, বেশ, বলব না। কিন্তু এ যাত্রা বেঁচে যদি ফিরে আসি বোন, এই আমারই পায়ের কাছে গলায় আঁচল দিয়ে স্বীকার করতে হবে,—দাদা, আমার কোটী কোটী অপরাধ হয়েচে.—নিশ্চয় তুমি হাত গুনতে জানো, নইলে আমার সৌভাগ্যের এতবড় সত্যি কথা তখন বলেছিলে কি করে!

ভারতী ইহার উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া তিনি পুনশ্চ কথা কহিলেন। এবার কোথা দিয়ে যেন কণ্ঠস্বরে তাঁহার অপরূপ সুর মিশিল, বলিলেন, সে-রাত্রে সুমিত্রার কথা যখন বলছিলে, ভারতী, আমি জবাব দিতে পারিনি। এ পথের পথিক নই আমি, তোমার মুখে সুমিত্রার কাহিনীতে গায়ে আমার বার বার কাঁটা দিয়ে উঠেছিলো! দুনিয়া ঘুরে অনেক বস্তরই হদিস্ পেয়েচি, পেলাম না শুধু নর-নারীর প্রেমের তত্ত্ব! দিদি, অসম্ভব বলে শব্দটা বোধ হয় সংসারে কেবল এদেরই অভিধানে লেখে না!

এ কথায় ভারতী লেশমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। উদাস নিঃস্পৃহ-স্বরে বলিল, তোমার বাক্যই সত্য হোক, দাদা, ও শব্দটা তোমাদের অভিধান থেকে যেন মুছে যায়। সুমিত্রাদিদির অদৃষ্ট যেন একদিন প্রসন্ন হয়। একটুখানি থামিয়া বলিল, আমি অনেক ভেবে দেখেচি, আমার নিজের কিন্তু ওতে আর আনন্দ নেই, ও আমি আর কামনাও করিনে। এই বলিয়া সে পুনরায় ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, অপূর্ব্ববাবুকে আমি যথার্থই ভালবাসি। ভাল হোক, মন্দ হোক, তাঁকে আর আমি ভুলতে পারবো না। কিন্তু তাই বলে তাঁর স্ত্রী হয়ে তাঁর ঘর-সংসার না করতে পেলেই জীবন আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে কিসের জন্যে? এ আমার শোকের কথা নয় দাদা, তোমাকে অকপটে যথার্থই বলচি আমাকে তুমি শান্ত-মনে আশীর্ব্বাদ করে পথ দেখিয়ে দিয়ে যাও,—তোমার মত আমিও পরের কাজেই এ জন্মটা আমার সার্থক করে তুলব! নাও না দাদা, তোমার নিরাশ্রয় ছোট বোনটিকে সাথী করে।

ডাক্তার নিঃশব্দে তরী বাহিয়া চলিলেন, এতবড় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের উত্তর দিলেন না। অন্ধকারে তাঁহার মুখের চেহারা ভারতী দেখিতে পাইল না, সে এই নীরবতায় আশান্বিত হইয়া উঠিল। এবার তাহার কণ্ঠস্বরে সস্নেহ অনুনয়ের নিবিড় বেদনা যেন উপচিয়া পড়িল. বলিল, নেবে দাদা সঙ্গে? তুমি ছাড়া এ আঁধারে যে এক ফোঁটা আলোও আর কোথাও দেখতে পাইনে।

ডাক্তার ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, অসম্ভব ভারতী। তোমার কথায় আজ আমার জোয়াকে মনে পড়ে; তোমারই মত তার অমূল্য জীবন অকারণ নষ্ট হয়ে গেছে। ভারতে স্বাধীনতা ছাড়া আমার নিজের আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নেই, কিন্তু মানব-জীবনে এর চেয়ে বৃহত্তর কাম্য আর নেই এমন ভুলও আমার কোনদিন হয়নি।

স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ—এরা আরও বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্যই ত স্বাধীনতা, নইলে এর মূল্য ছিল কোথা? এর জন্যে তোমাকে আমি হত্যা করতে পারব না বোন, তোমার মধ্যে যে হৃদয় স্নেহে, প্রেমে, করুণায়, মাধুর্য্যে এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেচে, সে আমার প্রয়োজনকে অতিক্রম করে বহু উর্দ্ধে চলে গেছে,—তার নাগাল আমি হাত বাড়িয়ে পাব না।

ভারতীর সর্ব্বাঙ্গ পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সব্যসাচীর গভীর অন্তরের একটা অপরূপ মূর্ত্তি সে যেন সহসা চক্ষে দেখিতে পাইল। ভক্তি ও আনন্দে বিগলিত হইয়া কহিল, আমিও তাই ভাবি দাদা, তোমার অজানা সংসারে কি আছে! আর তাই যদি হোলো, কি হেতু তুমি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে আছ? দেশে বিদেশে গুপ্ত সমিতি সৃষ্টি করে বেড়ানো তোমার কিসের জন্যে। মানবের চরম কল্যাণ ত কোনদিনই এর মধ্যে থেকে হতে পারবে না।

ডাক্তার বলিলেন, ঠিক তাই। কিন্তু চরম কল্যাণের ভার আমরা বিধাতার হাতে ছেড়ে দিয়ে ক্ষুদ্র মানবের সাধ্যের মধ্যে যে সামান্য কল্যাণ তারই চেষ্টাতে নিযুক্ত আছি। নিজের দেশের মধ্যে স্বাধীনভাবে কথা কওয়া, স্বাধীনভাবে চলে-ফিরে বেড়ানোর অতি তুচ্ছ অধিকার—এর অধিক সম্প্রতি আর আমরা কিছুই চাইনে ভারতী।

ভারতী কহিল, সে ত সবাই চায়, দাদা। কিন্তু তার জন্যে নরহত্যার ষড়যন্ত্র কিসের জন্যে বল ত? কি তার প্রয়োজন? কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়া সে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কারণ, এ অভিযোগ শুধু রূঢ় নয়, অসত্য।

তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত চিত্তে কহিল, আমাকে মাপ কর দাদা, এ মিথ্যে আমি শুধু রাগের উপরেই বলে ফেলেচি। আমাকে তুমি ফেলে যাবে—এ যেন আমি ভাবতেই পারচিনে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তা আমি জানি।

ইহার পরে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। এই সময়ে কিছুদিন হইতে 'স্বদেশী আন্দোলন' ভারতবর্ষব্যাপী হইয়া উঠিয়াছিল। ভক্তিভাজন নেতৃবৃন্দ দেশোদ্ধারকল্পে আইন বাঁচাইয়া যে সকল জ্বালাময়ী বক্তৃতা অবকাশ মত দিয়া বেড়াইতেছিলেন তাহারই সারাংশ সংবাদপত্র-স্তম্ভে মাঝে মাঝে পাঠ করিয়া ভারতী সশ্রদ্ধবিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠিত। বিগত রাত্রে এমনি ধারা কি একটা রোমাঞ্চকর রচনা খবরের কাগজে পাঠ করিয়া অবধি তাহার মধ্যে উত্তেজনার তপ্ত বাতাস সারাদিন ধরিয়া আজ বহিয়া ফিরিতেছিল। তাহাই স্মরণ করিয়া কহিল, আমি জানি ইংরাজ রাজত্বে তোমার স্থান নেই। কিন্তু সমস্ত দুনিয়াই ত তাদের নয়।

সেখানে গিয়ে তোমরা ত সরল, প্রকাশ্য ভাবেই তোমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির চেষ্টা করতে পারো।

প্রশ্ন করিয়া ভারতী উত্তরের আশায় কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, অন্ধকারে তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছিনে বটে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারচি মনে মনে তুমি হাসচো। কিন্তু তুমি এবং তোমার বিভিন্ন দলগুলিই ত শুধু নয়, আরও যাঁরা দেশের কাজে -- তাঁরা প্রবীণ, বিজ্ঞ, রাজনীতিতে যাঁরা,—আচ্ছা দাদা, কালকের বাঙলা খবরের কাগজটা—

বক্তব্য শেষ হইল না,—ডাক্তার হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, রক্ষে কর ভারতী, আমাদের সঙ্গে তুলনা করে পূজনীয়গণের অমর্য্যাদা কোরো না।

ভারতী কহিল, বরঞ্চ, তুমিই তাদের বিদ্রূপ করচ।

ডাক্তার সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, মোটেই না। তাঁদের আমি ভক্তি করি এবং তাঁদের দেশোদ্ধারের বক্তৃতা আমাদের চেয়ে সংসারে কেউ বেশি উপভোগ করে না।

ভারতী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, পথ তোমাদের এক না হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য ত একই।

ডাক্তার ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিলেন, এতক্ষণ হাসছিলাম সত্যি, এবার কিন্তু রাগ করব ভারতী। পথ আমাদের এক নয় এটা জানা কথা, কিন্তু লক্ষ্য যে আমাদের তার চেয়েও অধিক স্বতন্ত্র এ কি তুমিও এতদিন বোঝনি? পৃথিবীর বহু জাতিই স্বাধীন,—তার চেয়ে বড় গৌরব মানব-জন্মের আর নেই, সেই স্বাধীনতার দাবী করা, চেষ্টা করা ত ঢের দূরের কথা, তার কামনা করা, কল্পনা করাও ইংরেজের আইনে ভারতবাসীর রাজদ্রোহ। আমি সেই অপরাধেই অপরাধী। চিরদিন পরাধীন থাকাটাই এ দেশের আইন। সুতরাং, আইনের বাইরে এই সব প্রবীণ পূজ্য ব্যক্তিরা ত কোনদিন কোন কিছুই দাবী করেন না। চীনাদের দেশে মাঞ্চু-রাজাদের মত এদেশেও যদি ইংরাজ আইন করে দিত—সবাইকে আড়াই হাত টিকি রাখতে হবে, তবে টিকির বিরুদ্ধে এঁরা কোনমতেই বে-আইনি প্রার্থনা করতেন না। এঁরা এই বলে আন্দোলন করতেন যে, আড়াই হাত আইনের দ্বারা দেশের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে, এতে দেশের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে, অতএব, একে সওয়া দু'হাত করে দেওয়া হোক। এই বলিয়া তিনি নিজের রসিকতায় উৎফুল্ল হইয়া অকস্মাৎ অট্টহাস্যে নদীর অন্ধকার নীরবতা বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন।

হাসি থামিলে ভারতী কহিল, তুমি যাই কেন না বল, তারাও যে দেশের নমস্য

নেন এ-কথা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না। আমি সকলের কথাই বলচিনে, কিন্তু সত্য সত্যই যাঁরা রাষ্ট্রনীতিবিদ্ —যথার্থই যাঁরা দেশের শুভাকাঙ্খী, তাঁদের সকল শ্রমই ব্যর্থ শ্রম এ-কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করা কঠিন। মত এবং পথ বিভিন্ন বলেই কাউকে ব্যঙ্গ করা সাজে না।

তাহার কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করিয়া ডাক্তার চুপ করিলেন। পিছন হইতে একটা ষ্টিম লঞ্চ যথেষ্ট সাড়া-শব্দ করিয়া তাঁদের ক্ষুদ্র তরণীকে রীতিমত দোল দিয়া বাহির হইয়া গেলে সব্যসাচী ধীরে ধীরে বলিলেন, ভারতী, তোমাকে ব্যথা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, তোমার নমস্যগণকে উপহাস করাও আমার অভিপ্রায় নয়। তাঁদের রাজনীতিবিদ্যার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধেও আমার ভক্তিও কম নেই, কিন্তু কি জানো দিদি, গৃহস্থ গরুকে যখন খাটো করে বাঁধে, তখন তার সেই ছোট্ট দড়িটুকুর মধ্যে নীতি একটিমাত্রই থাকে। আমি সেইটুকু মাত্রই জানি। গরুর একান্ত নাগালের বাইরে খাদ্যবস্তুর প্রতি প্রাণপণে গলা এবং জিভ বাড়িয়ে লেহন করার চেষ্টার মধ্যে অবৈধতা কিছুমাত্র নেই, এমন কি অত্যন্ত আইনসঙ্গত। উৎসাহ দেবার মত হৃদয় থাকলে দিতেও পারো, রাজার নিষেধ নেই, কিন্তু বৃষের এই আন্তরিক প্রবল উদ্যম বাইরে থেকে যারা দেখে, তাদের পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন।

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দাদা, তুমি ভারি দুষ্টু। বলিয়াই আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, কিন্তু এ আমি ভেবে পাইনে, প্রাণ যার অহর্নিশি সরু সুতোয় ঝুলচে সে কি করে হাসি-তামাসা করে পরের কথা নিয়ে!

ডাক্তার সহজকণ্ঠে বলিলেন, তার কারণ, এ সমস্যার মীমাংসা পূর্ব্বেই হয়ে গেছে ভারতী, যেদিন বিপ্লবের কাজে যোগ দিয়েচি। আর আমার ভাববারও নেই, নালিশ করবারও নেই। আমি জানি আমাকে হাতে পেয়েও যে রাজশক্তি ছেড়ে দেয়, হয় সে অক্ষম উন্মাদ, নয় তার ফাঁস দেবার দড়িটুকু পর্য্যন্ত নেই!

ভারতী বলিল, তাই ত আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই দাদা। আমি উপস্থিত থাকতে তোমার প্রাণ নিতে পারে সংসারে এমন কেউ নেই। এ আমি কোনমতেই হতে দেব না। বলিতে বলিতেই গলা তাহার চক্ষের পলকে ভারি হইয়া আসিল।

ডাক্তার টের পাইলেন। নিঃশব্দে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, নৌকায় জোয়ার লেগেচে, ভারতী, পৌঁছতে আর আমাদের দেরি হবে না।

প্রত্যুত্তরে ভারতী শুধু কহিল, মরুকগে। কিছুই আমার ভাল লাগচে না। মিনিট দুই পরে জিজ্ঞাসা করিল, এতবড় রাজশক্তিকে তোমরা গায়ের জোরে টলাতে পারো একি তুমি সত্যিই বিশ্বাস করো দাদা?

দ্বিধাহীন উত্তর আসিল, করি, এবং সমস্ত মন দিয়ে করি। এতবড় বিশ্বাস না থাকলে এতবড় ব্রত আমার অনেকদিন পূর্ব্বেই ভেঙে যেত।

ভারতী বলিল, তাই বোধ হয় ধীরে ধীরে তোমার কাজ থেকে আমাকে বার করে দিচ্ছ,—না দাদা?

ডাক্তার স্মিতহাস্যে বলিলেন, না, তা নয় ভারতী। কিন্তু, বিশ্বাসই ত শক্তি, বিশ্বাস না থাকলে সংশয়ে যে কর্ত্তব্য তোমার পদে পদে ভারাতুর হয়ে উঠবে। সংসারে তোমার অন্য কাজ আছে বোন—কল্যাণকর, শান্তিময় পথ, যা তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস কর,—তাই তুমি করগে।

অপরিসীম স্নেহবশেই যে এই লোকটি তাহার একান্ত বিপদসঙ্কুল বিপ্লব-পন্থা হইতে তাহাকে দূরে অপসারিত করিতে চাহিতেছে তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিয়া ভারতীর সজল চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল। অলক্ষ্যে, অন্ধকারে ধীরে ধীরে মুছিয়া বলিল, দাদা, আমার কথায় কিন্তু রাগ করতে পাবে না। এতবড় রাজশক্তি, কত সৈন্যবল, কত উপকরণ, যুদ্ধের কত বিচিত্র ভয়ানক আয়োজন, তার কাছে তোমার বিপ্লবী-দল কতটুকু? সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের চেয়েও ত তোমরা ছোট। এর সঙ্গে তোমরা শক্তি পরীক্ষা করতে চাও কোন্ যুক্তিতে? প্রাণ দিতে চাও দাও গে—কিন্তু এতবড় পাগলামি আমি ত সংসারে আর দ্বিতীয় দেখতে পাইনে। তুমি বলবে, তবে কি দেশের উদ্ধার হবে না? প্রাণের ভয়ে সরে দাঁড়াবো? কিন্তু তা আমি বলিনে। তোমার কাছ থেকে, তোমার চরিত্র হতে জননী জন্মভূমি যে কি সে আমি চিনেচি। তাঁর পদতলে সর্ব্বস্ব দিতে পারার চেয়ে বড় সার্থকতা মানুষের যে আর নেই তোমাকে দেখে এ যদি না আজও শিখতে পেরে থাকি ত আমার চেয়ে অধম নারীজন্মে কেউ জন্মায়নি। কিন্তু, নিছক আত্ম-হত্যা করেই কোন্ দেশ কবে স্বাধীন হয়েচে? কোন মতে তোমার ভারতী যে কেবল বেঁচে থাকতেই চায় এতবড় ভুল ধারণা করেও আমার সম্বন্ধে তুমি রেখো না দাদা।

ডাক্তার নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই ত!

তাই ত কি?

তোমার সম্বন্ধে ভুল হয়েচে বটে। এই বলিয়া ডাক্তার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, বিপ্লব মানেই, ভারতী, কাটা-কাটি রক্তারক্তি নয়। বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্ত্তন! সৈন্যবল, বিরাট যুদ্ধোপকরণ এ সবই আমি জানি। কিন্তু শক্তি পরীক্ষা ত আমাদের লক্ষ্য নয়। আজ যারা শত্রু, কাল তারা বন্ধু হতেও ত পারে। নীলকান্ত শক্তি পরীক্ষা করতে যায়নি, তাদের মিত্র করতে গিয়েই প্রাণ দিয়েছিল। হায়রে নীলকান্ত! কেবা তার নাম জানে!

অন্ধকারে ভারতী স্পষ্ট বুঝিতে পারিল দেশের বাহিরে, দেশের কাজে যে ছেলেটি লোকচক্ষুর অগোচরে নিঃশব্দে প্রাণ দিয়েচে তাহাকে স্মরণ করিয়া এই নির্ব্বিকার পরম সংযত মানুষটির গভীর হৃদয় ক্ষণিকের জন্য আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। অকস্মাৎ যেন তিনি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, কি বলেছিলে ভারতী, গোস্পদ? তাই হবে হয়ত। কিন্তু যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জনপদ ভস্মসাৎ করে ফেলে, আয়তনে সে কতটুকু জানো? সহর যখন পোড়ে সে আপনার ইন্ধন আপনি সংগ্রহ করে দগ্ধ হয়। তার ছাই হবার উপকরণ তারই মধ্যে সঞ্চিত থাকে, বিশ্ব-বিধানের এ নিয়ম কোন রাজশক্তিই কোনদিন ব্যত্যয় করতে পারে না।

ভারতী বলিল, দাদা, তোমার কথা শুনলে গা কাঁপে। রাজশক্তিকে যে তুমি দগ্ধ করতে চাও, তার ইন্ধন ত আমাদেরই দেশের লোক। এতবড় লঙ্কাকাণ্ডের কল্পনায় কি তোমার মনে করুণাও জাগে না?

প্রত্যুত্তরে লেশমাত্র দ্বিধা নাই, ডাক্তার স্বচ্ছন্দে কহিলেন, না। প্রায়শ্চিত্ত কথাটা কি শুধু মুখেরই কথা? পূর্ব্ব পিতামহগণের যুগান্ত-সঞ্চিত পাপের অপরিমেয় স্তূপ নিঃশেষ হবে কিসে বলতে পারো? করুণার চেয়ে ন্যায়ধর্ম্ম ঢের বড় বস্তু ভারতী।

ভারতী ব্যথা পাইয়া বলিল, এ তোমার সেই পুরানো কথা দাদা। ভারতের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে তুমি যে কত নিষ্ঠুর হতে পারো তা যেন আমি ভাবতেই পারিনে। রক্তপাত ছাড়া আর কিছু যেন মনে তোমার জাগতেই পায় না! রক্তপাতের জবাব যদি রক্তপাতই হয়, তাহলে তারও ত জবাব রক্তপাত? এবং তারও ত জবাবে এই একই রক্তপাত ছাড়া আর কিছু মেলে না। এ প্রশ্নোত্তর ত সেই আদিম কাল থেকে হয়ে আসচে। তবে কি মানবের সভ্যতা এর চেয়ে বড় উত্তর কোনদিন দিতে পারব না? দেশ গেছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় সেই মানুষ ত আজও আছে। মানুষে মানুষে কি হানা-হানি না ক'রে কোন মতেই পাশাপাশি বাস করতে পারে না?

ডাক্তার কহিলেন, ইংরাজের একজন বড় কবি বলেচেন, পশ্চিম ও পূর্ব্ব কোন দিন মিলতে মিশতে পারে না।

ভারতী রুষ্ট হইয়া কহিল, ছাই কবি। বলুকগে সে। তুমি পরম জ্ঞানী, তোমাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেচি, আরও জিজ্ঞাসা করছি, হোক তারা পশ্চিমের, হোক তারা ইয়োরোপের মানুষ, কিন্তু তবু ত মানুষ? মানুষের সঙ্গে মানুষ কি কিছুতেই বন্ধুত্ব করতে পারে না? দাদা, আমি ক্রীশ্চান, ইংরাজের কাছে আমি বহু ঋণে ঋণী, তাদের অনেক সদ্গুণ আমি নিজের চোখে দেখেচি—তাদের এত মন্দ ভাবতে আমার বুকে শূল বেঁধে। কিন্তু আমাকে তুমি ভুল বুঝো না দাদা, আমি বাঙালী ঘরেরই মেয়ে,—

—তোমার বোন। বাঙলার মাটি, বাঙলার মানুষকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসি। কে জানে, যে-জীবন তুমি বেছে নিয়েচ, হয়ত আজই আমাদের শেষ দেখা। আজ আমাকে তুমি শান্ত মনে এই জবাবটি দিয়ে যাও, যেন এরই দিকে চোখ রেখে আমি সারাজীবন মুখ তুলে সোজা চলে যেতে পারি। বলিতে বলিতে শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর কান্নার ভারে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

ডাক্তার নীরবে তরী বাহিতে লাগিলেন। বিলম্ব দেখিয়া ভারতীর মনে হইল, বোধ হয় তিনি ইহার উত্তর দিতে চান না। সে হাত বাড়াইয়া নদীর জলে চোখ মুখ ধুইয়া ফেলিল, অঞ্চল দিয়া বার বার ভাল করিয়া মুছিয়া পুনরায় কি একটা প্রশ্ন করিতেছিল, ডাক্তার কথা কহিলেন। স্নিগ্ধ মৃদু কণ্ঠ, কোথাও লেশমাত্র উত্তেজনা বা বিদ্বেষের আভাস নেই, যেন কাহার কথা কে বলিতেছে এমনি শান্ত সহজ। ভারতীর সেই প্রথম পরিচয় দিনের স্কুলের নিরীহ নির্ব্বোধ মাস্টার মহাশয়টিকে মনে পড়িল। অশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণ, ব্যাকরণও তেমনি,—ভারতী কষ্টে হাসি চাপিয়া আলাপ করিয়াছিল। পরে তাই লইয়া রাগ করিয়া সে ডাক্তারকে অনেকদিন অনেক তিরস্কার করিয়াছে! সেই নিরুৎসুক নিঃস্পৃহকণ্ঠে কহিলেন, এক রকমের সাপ আছে ভারতী, তারা সাপ খেয়েই জীবন ধারণ করে। দেখেচ ?

ভারতী বলিল, না, দেখিনি, শুনেচি।

ডাক্তার বলিলেন, পশুশালায় আছে। এবার কলকাতায় গিয়ে অপূর্ব্বকে হুকুম কোরো সে দেখিয়ে আনবে।

বার বার ঠাট্টা করো না দাদা, ভাল হবে না বলচি।

না, ভাল হবে না, আমিও তাই বলচি। পাশাপাশি বাস করাটা ঠিক ঘটে ওঠে না বটে, কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠভাবে একজনের জঠরের মধ্যে আর একজন বেশ নিরাপদেই স্থান পায়। বিশ্বাস না হয় জু'র অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার বলিলেন, তুমি তাদের সমধর্ম্মাবলম্বী, তাদের কাছে অশেষ ঋণে ঋণী, তাদের অনেক সদ্‌গুণ চোখে দেখেচ—দেখেচ তাদের বিশ্বগ্রাসী বিরাট ক্ষুধার পরিমাণ? এদেশের মালিক তারা,—মালিকানার তারিখ মনে আছে ত? আজ বৃটিশ-সম্পদের তুলনা হয় না। কত জাহাজ, কত কলখারখানা, কত শত সহস্র ইমারত। মানুষ মারবার উপকরণ আয়োজনের আর অন্ত নেই। তার সমস্ত অভাব, সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন মিটিয়েও ইংরেজ ১৮১০ সাল থেকে সত্তর বছরের মধ্যে কেবল বাইরে দিয়েছিল ঋণ তিন হাজার কোটী টাকা। জানো এই বিরাট ঐশ্বর্য্যের উৎস কোথায়? আপনাকে তুমি বাঙলাদেশের মেয়ে বলছিলে না? বাঙলার মাটি, বাঙলার জল-বায়ু,

বাংলার মানুষ তোমার প্রাণাধিক প্রিয় না? এই বাঙলার দশ লক্ষ নর-নারী প্রতি বছর শুধু ম্যালেরিয়া জ্বরে মরে। এক একটা যুদ্ধ জাহাজের দাম জানো? এর একটার খরচে কেবল দশ লক্ষ মায়ের চোখের জল চিরদিনের তরে মোছানো যায়। ভেবেচ কখনো এ কথা? দেখেচ কখনো বুকের মধ্যে মায়ের মূর্ত্তি। শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, ধর্ম্ম গেল, জ্ঞান গেল, নদীর বুক বুজে মরুভূমি হয়ে উঠেচে, চাষা পেট পুরে খেতে পায় না, শিল্পী বিদেশীর দুয়ারে মজুরি করে,—দেশে জল নেই, অন্ন নেই, গৃহস্থের সর্ব্বোত্তম সম্পদ সে গোধন নেই,—দুধের অভাবে শিশুদের শুকিয়ে মরতে দেখেচ ভারতী?

ভারতী চীৎকার করিয়া থামাইতে চাহিল, কিন্তু গলা দিয়া তাহার শুধু একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল মাত্র।

সব্যসাচীর সেই ধীর সংযত কণ্ঠস্বর কোন এক সময়ে অন্তর্হিত হইয়াছিল। বলিলেন, তুমি ক্রীশ্চান, মনে পড়ে একদিন কৌতূহলবশে ইয়োরোপের ক্রীশ্চান সভ্যতার স্বরূপ জানতে চেয়েছিলে? সেদিন ব্যথা দেবার ভয়ে বলিনি, কিন্তু আজ তার উত্তর দেব। তোমাদের কেতাবে কি আছে জানিনে, শুনেচি ভাল কথা ঢের আছে, কিন্তু বহুদিন এক সঙ্গে বসবাস করে এর সত্যকার চেহারা আর আমার এতটুকু অগোচর নেই। লজ্জাহীন উলঙ্গ স্বার্থ এবং পশু-শক্তির একান্ত প্রাধান্যই এর মূল মন্ত্র। সভ্যতার নাম দিয়ে দুর্ব্বল, অক্ষমের বিরুদ্ধে এতবড় মুষল মানুষের বুদ্ধি আর ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কার করেনি। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখ ইয়োরোপের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে কোন দুর্ব্বল জাতিই আজ আর আত্মরক্ষা করতে পারেনি। দেশের মাটি, দেশের সম্পদ থেকে ছেলেরা বঞ্চিত হয়েচে কোন অপরাধে জানো ভারতী? একমাত্র শক্তিহীনতার অপরাধে। অথচ ন্যায়ধর্ম্মই সকলের বড় এবং বিজিতের অশেষ কল্যাণের জন্যেই এই স্বাধীনতার শৃঙ্খল তার পায়ে পরিয়ে সেই পঙ্গুর সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব বহন করাই ইয়োরপীয় সভ্যতার চরম কর্ত্তব্য,—এই পরম অসত্য লেখায় বক্তৃতায় মিশনারির ধর্ম্মপ্রচারে ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকে অবিশ্রান্ত প্রচার করাই তোমাদের ক্রীশ্চান সভ্যতার রাজনীতি।

ভারতী মিশনারির হাতে মানুষ, অনেকের মহৎ চরিত্র সে যথার্থ-ই চোখে দেখিয়াছে; বিশেষতঃ তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি এইরূপ অহেতুক আক্রমণে সে ব্যথা পাইয়া বলিল, দাদা, যে জন্যেই হোক তোমার শান্ত বুদ্ধি আজ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ক্রীশ্চান-ধর্ম্ম প্রচার করতে যাঁরা এদেশে এসেচেন তাঁদের সম্বন্ধে তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশি জানি। তাঁদের প্রতি তুমি আজ নিরপেক্ষ সুবিচার করতে

পারচ না। ইয়োরোপীয় সভ্যতা কি তোমাদের কোন ভাল করে নি? সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন—

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, চড়কের সময় পিঠ ফোঁড়া, সন্ন্যাসীদের খাঁড়ার ওপর লাফানো, ডাকাতি, ঠগি, বর্গির হাঙ্গামা, গোঁড় বা খাসিয়াদের আসামের নরবলি,—আর যে মনে পড়চে না ভারতী—

ভারতী কথা কহিল না।

ডাক্তার বলিলেন, রোসো, আরও দুটো স্মরণ হয়েচে। বাদশাদের আমলে গৃহস্থের বৌ-ঝি ঘরে রাখা যেত না -নবাবেরা মেয়েদের পেট চিরে ছেলে-মেয়ে দেখতো,—হায় রে হায়, এমনি করে বিদেশীর লেখা ইতিহাস সামান্য এবং তুচ্ছ বস্তুকে বিপুল, বিরাট তৈরী করে দেশের প্রতি দেশের লোকের চিত্ত বিমুখ করে দিয়েচে! মনে আছে আমার ছেলেবেলায় স্কুলের পড়ার বইয়ে একবার পড়েছিলাম বিলেতে বসে আমাদের কল্যাণ ভেবে ভেবেই কেবল রাজমন্ত্রীর চোখের নিদ্রা এবং অন্ন বিস্বাদ হয়ে গেছে! এই সত্য ছেলেদের কণ্ঠস্থ করতে হয় এবং উদরান্নের দায়ে শিক্ষকদের কণ্ঠস্থ করাতে হয়। সভ্য রাজ্যতন্ত্রের এই রাজনীতি ভারতী। আজ অপূর্ব্বকে দোষ দেওয়া বৃথা!

অপূর্ব্বর লাঞ্ছনায় মনে মনে ভারতী লজ্জিত হইল, কষ্ট হইল, কহিল, তুমি যা বলচো তা সত্য হতে পারে, হয়ত, কোথাও কেউ অতি ভক্ত রাজকর্ম্মচারী এমনিই করেচে, কিন্তু এতবড় সাম্রাজ্যের অসত্যই কখনো মূলনীতি হতে পারে না। এর ওপরে ভিত্তি করে এই বিপুল প্রতিষ্ঠান একটা দিনের তরেও স্থির থাকতে পারে না। তুমি বলবে কালের পরিমাণে এ কটা দিন? এমনি সাম্রাজ্য ত ইতিপূর্ব্বেও ছিল, সে কি চিরস্থায়ী হয়েচে? তোমার কথা যদি যথার্থ হয়, এও চিরস্থায়ী হবে না। কিন্তু এই শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত রাজ্য, যত নিন্দেই কর না কেন, এর ঐক্য, এর শান্তি থেকে কি কোন শুভ লাভই হয়নি? প্রতীচ্যের সভ্যতার কাছে কৃতজ্ঞ হবার কি কোন হেতুই পাওনি? স্বাধীনতা তোমরা ত বহুদিন হারিয়েচ, ইতিমধ্যে রাজশক্তির পরিবর্ত্তন হয়েচে সত্য কিন্তু তোমাদের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হয়নি। ক্রীশ্চান বলে আমাকে তুমি উল্টো বুঝো না দাদা, কিন্তু নিজেদের সমস্ত অপরাধ বিদেশীর মাথায় তুলে দিয়ে গ্লানি করাই যদি তোমার স্বদেশপ্রেমের আদর্শ হয়, সে আদর্শ তোমার হাত থেকেও আমি নিতে পারব না। এত বিদ্বেষ হৃদয়ের মধ্যে পুরে তুমি ইংরাজের ক্ষতি করতেও পারো, কিন্তু তাতে ভারতবাসীর কল্যাণ হবে না এ সত্য নিশ্চয় জেনো।

তাহার সহসা উচ্ছ্বসিত তীক্ষ্ণস্বর নিস্তব্ধ নদীবক্ষে আহত হইয়া সব্যসাচীর কানে

পশিয়া তাঁহাকে চমকিত করিয়া দিল। ভারতীর এই রূপ অপরিচিত, মনোভাব অপ্রত্যাশিত। তথাপি যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সভ্যতার ঘনিষ্ঠ প্রভাবের মধ্যে সে বালিকা বয়স হইতে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই আঘাতে চঞ্চল ও অসহিষ্ণু হইয়া সে এই যে নির্ভীক প্রতিবাদ করিয়া বসিল, তাহা যত কঠিন ও প্রতিকূল হৌক, সব্যসাচীর চক্ষে তাহাকে যেন নব মর্য্যাদা দান করিল।

তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ভারতী বলিল, কই জবাব দিলে না দাদা? এত-বড় হিংসের আগুন বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে তুমি আর যাই কর দেশের ভালো করতে পারবে না।

ডাক্তার কহিলেন, তোমাকে ত অনেকবার বলেচি দেশের ভালো যাঁরা করবেন তাঁরা চাঁদা তুলে দিকে দিকে অনাথ-আশ্রম, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বেদান্ত-আশ্রম, দরিদ্র-ভাণ্ডার প্রভৃতি নানা হিতকর কার্য্য করচেন, মহৎ লোক তাঁরা, আমি তাঁদের ভক্তি করি,—কিন্তু দেশের ভালো করার ভার আমি নিইনি, আমি স্বাধীন করার ভার নিয়েচি। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, আমার বুকের আগুন নেভে শুধু দুটো জিনিস দিয়ে। এক নিজের চিতাভস্মে, আর নেভে যে দিন শুনবো ইয়োরোপের ধর্ম্ম, সভ্যতা, নীতি সমুদ্রের অতল গর্ভে ডুবেচে।

ভারতী স্তব্ধ হইয়া রহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, এই বিষকুম্ভের পরিপূর্ণ সওদা নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে ইয়োরোপ যখন প্রথম ব্যাসাত করতে এসেছিল, তখন চিনতে পেরেছিল কেবল জাপান। তাই আজ তার সৌভাগ্য, তাই আজ সে ইয়োরোপের সমকক্ষ সম্রান্ত মিতা! কিন্তু চিনতে পারেনি ভারত, চিনতে পারেনি চীন, তখন স্পেনের রাজ্য পৃথিবীময়, ক্ষুদ্র জাপান স্পেনের এক নাবিককে জিজ্ঞাসা করে, এত রাজ্য হল তোমাদের কি করে? নাবিক বললে, অতি সহজে, যে দেশ আত্মসাৎ করতে চাই, সেখানে নিয়ে যাই প্রথমে মাল, হাতে পায়ে পড়ে ব্যবসার জন্যে দেশের রাজার কাছে চেয়ে নিই এক ফোঁটা জমি। তার পরে আনি মিশনারী, তারা যত না করে ক্রীশ্চান, তার বেশি করে সে দেশের ধর্ম্মকে গালিগালাজ। লোকে ক্ষেপে উঠে হঠাৎ ফেলে দু-একটাকে মেরে। তখন আসে আমাদের কামান-বন্দুক, আসে আমাদের সৈন্য-সামন্ত। আমাদের সভ্য দেশের মানুষ-মারা কল যে অসভ্য দেশের চেয়ে কত শ্রেষ্ঠ তা অচিরেই প্রমাণিত করে দিই। শুনে জাপান বললে, প্রভু! আপনারা তাহলে গা তুলুন, আমাদের আর ব্যবসাতে কাজ নেই। এই বলে তাদের বিদায় দিয়ে নিজেদের দেশের মধ্যে আইন জারি করে দিলে,—চন্দ্র সূর্য্য যতদিন উদয় হবে ক্রীশ্চান যেন না আর আমাদের দেশে পা দেয়। দিলে তার প্রাণদণ্ড।

তাহার ধর্ম্ম ও ধর্ম্মযাজকের প্রতি এই তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতে ভারতী বিষণ্ণ হইয়া বলিল, এ কথা তোমার কাছে আমি পূর্ব্বেও শুনেছি, কিন্তু যে জাপানীদের তুমি ভক্তি কর, তারা কি?

ডাক্তার কহিলেন, ভক্তি করি? মিছে কথা। ওদের আমি ঘৃণা করি। কোরিয়ানদের বার বার প্রতিশ্রুতি এবং অভয় দিয়েও বিনা দোষে মিথ্যা অজুহাতে তাদের রাজাকে বন্দী করে ১৯১০ সালে যখন কোরিয়া রাজ্য আত্মসাৎ করে নিল তখন আমি সাংহাইয়ে। সে দিনের সে সব অমানুষিক অত্যাচার ভোলবার নয়, ভারতী। আর অভয় কি শুধু একা জাপানই দিয়েছিল? ইয়োরোপও দিয়েছিল। শক্তিমানের বিরুদ্ধে ইংরাজ কথা কইলে না। এ্যাঙলো-জাপানী—সন্ধি-সূত্রে আমরা আবদ্ধ! এবং সেই কথাই আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সভাপতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বললেন, প্রতিশ্রুতি তা কি! যে অক্ষম, শক্তিহীন জাতি আত্মরক্ষা করতে পারে না তাদের রাজ্য যাবে না ত যাবে কাদের? ঠিকই হয়েচে? এখন আমরা যাবো তাদের উদ্ধার করতে! অসম্ভব! পাগলামী! এই বলিয়া সব্যসাচী এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিলেন, আমিও বলি ভারতী,—অসম্ভব, অসঙ্গত, পাগলামি। প্রবল দুর্ব্বলের সম্পদ কেন ছিনিয়ে নেবে না, এ কথা যে সভ্য ইয়োরোপের নৈতিক-বুদ্ধি ভাবতেই পারে না।

ভারতী নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, আঠারো শতাব্দের শেষের দিকে ব্রিটিশ দূত লর্ড ম্যাকর্টনি এলেন চৈনিক দরবারে কিঞ্চিৎ ব্যবসার সুবিধে করে নিতে। মাঞ্চুরাজ শিন্‌লুঙ ছিলেন তখন সমস্ত চীনের সম্রাট, অত্যন্ত দয়ালু, দূতের বিনীত আবেদনে খুশী হয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, দেখ বাপু, আমাদের স্বর্গীয় সাম্রাজ্যে অভাব কিছুরই নেই, কিন্তু তুমি এসেচ অনেক দূর থেকে, অনেক দুঃখ সয়ে। আচ্ছা ক্যানটন সহরে ব্যবসা কর, স্থান দিচ্ছি, তোমাদের ভাল হবে। রাজ-আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হোলো না, ভালই হলো। পঞ্চাশ বছর পেরুল না চীনের সঙ্গে ইংরাজের প্রথম যুদ্ধ বাধলো।

ভারতী বিস্মিত হইয়া কহিল, কেন দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, চীনেরই অন্যায়। বেয়াদপ হঠাৎ বলে বসলো, আফিঙ খেয়ে খেয়ে চোখ কান আমাদের বুঁজে গেল, বুদ্ধিশুদ্ধি আর নেই, দয়া করে জিনিসটার আমদানি বন্ধ কর।

তারপরে?

তার পরের ইতিহাস খুব ছোট। বছর দুয়ের মধ্যে পুনশ্চ আফিঙ খেতে রাজি হয়ে, আরও পাঁচখানা বন্দরে শতকরা পাঁচটাকা মাত্র শুল্কে বাণিজ্যের মঞ্জুরি

পরোয়ানা দিয়ে এবং সর্ব্বশেষে হংকং বন্দর দক্ষিণা প্রদান করে বেয়াল্লিশ সালে যজ্ঞ সমাধা হল। ঠিকই হয়েচে। এত সস্তায় আফিঙ পেয়েও যে মূর্খ খেতে আপত্তি করে তার এমনি প্রায়শ্চিত্ত হওয়াই উচিত।

ভারতী বলিল, এ তোমার গল্প।

ডাক্তার কহিলেন, তা হোক, গল্পটা শুনতে ভালো। আর এই না দেখে ফ্রান্সের ফরাসী সভ্যতা বললে, আমার ত আফিঙ নেই, কিন্তু, খাসা মানুষ-মারা কল আছে। অতএব, যুদ্ধং দেহি। হল যুদ্ধ। ফরাসী চীন সাম্রাজ্যের আনাম প্রদেশটা কেড়ে নিলে। আর যুদ্ধের খরচা, অধিকতর বাণিজ্যের সুবিধে ট্রিটিপোর্ট ইত্যাদি ইত্যাদি —এসব তুচ্ছ কাহিনী থাক্।

ভারত কহিল, কিন্তু দাদা, তালি কি একহাতে বাজে? চীনের অন্যায় কি কিছুই ছিল না?

ডাক্তার বলিলেন, থাকতে পারে। তবে তামাসা এই যে, ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যায় বোধটা অপরের ঘর চড়াও হয়েই হয়, তাঁদের নিজেদের দেশের মধ্যে ঘটতে দেখা যায় না।

তারপরে?

বলচি। জার্ম্মান সভ্যতা দেখলেন, বা রে বাঃ, এ ত ভারি মজা। আমি যে ফাঁকে পড়ি। তিনি এক হাজার মিশনারি এনে লেলিয়ে দিলেন। '৯৭ সালে তাঁরা যখন তোমাদের প্রভু যীশুর মহিমা শান্তি ও ন্যায়ধর্ম্ম প্রচারে ব্যাপৃত, তখন একদল চীনে ক্ষেপে উঠে পরম ধার্ম্মিক জন-দুই প্রচারকের মুণ্ডু ফেললে কেটে। অন্যায়! চীনেরই অন্যায়। অতএব গেল স্যান্টুঙ প্রদেশ জার্ম্মানির উদর বিবরে! তারপর এল বক্সার-বিদ্রোহ। ইয়োরোপের সমস্ত সভ্যতা এক হয়ে তার যে প্রতিশোধ নিলে, হয়ত, কোথাও তার তুলনা নেই। তার অপরিমেয় খেসারতের ঋণ কতকালে যে চীনেরা শোধ দেবে তা যীশুখৃষ্টই জানেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সিংহ, জারের ভালুক, জাপানের সূর্য্যদেব—কিন্তু আর না বোন, গলা আমার শুকিয়ে আসচে। দুঃখের তুলনায় একা আমরা ছাড়া বোধ হয় এদের আর সঙ্গী নেই। সম্রাট শিন্লুঙের নির্ব্বাণ লাভ হোক, তার আশীর্ব্বাদের বহর আছে!

ভারতী মস্ত বড় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ভারতী!

কি দাদা?

চুপচাপ যে?

তোমার গল্পের কথাটাই ভাবচি। আচ্ছা দাদা, এইজন্যেই কি চীনেদের দেশে

তোমার কার্য্যক্ষেত্র বেছে নিয়েচ? যারা শত অত্যাচারে জর্জ্জরিত, তাদের উত্তেজিত করে তোলা কঠিন নয়, কিন্তু একটা কথা কি ভেবে দেখচ? এইসব নিরীহ, অজ্ঞান চাষাভূষোর দুঃখ এমনিই ত যথেষ্ট, তার উপরে আবার কাটাকাটি রক্তারক্তি বাধিয়ে দিলে ত সে দুঃখের আর অবধি থাকবে না।

ডাক্তার কহিলেন, নিরীহ চাষাভূষোর জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই ভারতী, কোন দেশেই তারা স্বাধীনতার কাজে যোগ দেয় না! বরঞ্চ, বাধা দেয়! তাদের উত্তেজিত করবার মত পণ্ডশ্রমের সময় নেই আমার। আমার কারবার শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভদ্র-সন্তানদের নিয়ে। কোনদিন যদি আমার কাজে যোগ দিতে চাও ভারতী, এ কথাটা ভুলো না আইডিয়ার জন্যে প্রাণ দিতে পারার মত প্রাণ, শান্তিপ্রিয়, নির্ব্বিরোধী নিরীহ কৃষকদের কাছে আশা করা বৃথা। তারা স্বাধীনতা চায় না, শান্তি চায়। যে শান্তি অক্ষম, অশক্তের,—সেই পঙ্গুর জড়ত্বই তাদের ঢের বেশি কামনার বস্তু।

ভারতী ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, আমিও তাই চাই দাদা, আমাকে বরঞ্চ এই জড়ত্বের কাজেই তুমি নিযুক্ত করে দাও, তোমার পথের দাবীর ষড়যন্ত্রের বাষ্পে নিশ্বাস আমার রুদ্ধ হয়ে আসচে।

সব্যসাচী হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা।

ভারতী থামিতে পারিল না, তেমনি ব্যগ্র উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, ঐ একটা আচ্ছার বেশি আর কি কিছুই বলবার নেই দাদা?

কিন্তু আমরা যে এসে পড়েচি ভারতী, একটুখানি সাবধানে বোসো দিদি, যেন আঘাত না লাগে—এই বলিয়া ডাক্তার ক্ষিপ্রহস্তে হাতের দাঁড় দিয়া ধাক্কা মারিয়া তাঁহার ছোট্ট নৌকাখানিকে অন্ধকার তীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। তাড়া-তাড়ি উঠিয়া আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে নামাইতে নামাইতে বলিলেন, জলকাদা নেই বোন, কাঠ পাতা আছে, পা দাও।

অন্ধকারে অজানা ভূ-পৃষ্ঠে হঠাৎ পা ফেলিতে ভারতীর দ্বিধা হইল, কিন্তু পা দিয়া সে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, দাদা, তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করার মত নির্ব্বিঘ্ন স্বস্তি আর নেই—

কিন্তু অপর পক্ষ হইতে এ মন্তব্যের উত্তর আসিল না। উভয়ে অন্ধকারে কিছুদূর অগ্রসর হইলে ডাক্তার বিস্ময়ের কণ্ঠে কহিলেন, কিন্তু ব্যাপার কি বল ত? এ কি বিয়ে-বাড়ি? না আছে আলো, না আছে চীৎকার—না শোনা যায় বেহালার সুর,—কোথাও গেল নাকি এরা?

আরও কিছুদূর আসিয়া চোখে পড়িল, সিঁড়ির উপরের সেই চিত্র-বিচিত্র

কাগজের লণ্ঠন। ভারতী আশ্বস্ত হইয়া কহিল, ঐ যে সেই চীনে-আলো। এর মধ্যেই খরচের হুঁশিয়ারিটা শশি-তারার দেখবার বস্তু, এই বলিয়া সে হাসিল।

দুজনে সিঁড়ি বাহিয়া নিঃশব্দে উপরে উঠিতেই খোলা দরজার সম্মুখে প্রথমেই চোখে পড়িল—শশী মন দিয়া কি একখানা কাগজ পড়িতেছে। ভারতী আনন্দিত কলকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, শশীবাবু, এই যে আমরা এসে পড়েচি,—খাবার বন্দোবস্ত করুন। নবতারা কই? নবতারা! নবতারা!

শশী মুখ খুলিয়া কহিল, আসুন। নবতারা এখানে নেই।

ডাক্তার স্মিতমুখে কহিলেন, গৃহিণী-শূন্য গৃহ কি রকম কবি? ডাকো তাকে, আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাক্, নইলে দাঁড়িয়ে থাকবো। হয়ত যাবোও না।

শশী বিষণ্ণভাবে বলিল, নবতারা এখানে নেই ডাক্তার। তারা সব বেড়াতে গেছে।

সহসা তাহার মুখের চেহারায় ভীত হইয়া ভারতী প্রশ্ন করিল, কোথায় বেড়াতে গেলো? আজকের দিনে? কি চমৎকার বিবেচনা!

শশী বলিল, তারা বিয়ের পরে রেঙ্গুনে বেড়াতে গেছে। না না, আমার সঙ্গে নয়,—সেই যে আহমেদ,—ফর্সা মতন,—চমৎকার দেখতে,—কুট সাহেবের মিলের টাইম-কিপার,—দেখেচেন না? আজ দুপুরবেলা তারই সঙ্গে নবতারার বিয়ে হয়েচে। সমস্ত তাদের ঠিক ছিল, আমাকে বলেনি।

আগন্তুক দুজনে বিস্ময়-বিস্ফারিতচক্ষে চাহিয়া রহিলেন, বল কি শশী?

শশী উঠিয়া গিয়া ঘরের একটা নিভৃত স্থান হইতে একটা ন্যাকড়ার থলি আনিয়া ডাক্তারের পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া কহিল, টাকা পেয়েচি ডাক্তার। নবতারাকে পাঁচ হাজার দেব বলেছিলাম, দিয়ে দিয়েচি। বাকী আছে সাড়ে চার হাজার, পঞ্চাশ টাকা আমি নিলাম কিন্তু—

ডাক্তার কহিলেন, এই টাকা কি আমাকে দিচ্চ?

শশী কহিল, হাঁ। আর কি হবে? আপনি নিন। কাজে লাগবে।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, তাকে কবে টাকা দিলেন?

শশী কহিল, কাল টাকা পেয়েই তাকে দিয়ে এসেচি।

নিলে?

শশী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ। আহমেদ ত মোটে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়। তারা একটা বাড়ি কিনবে।

নিশ্চয় কিনবে। এই বলিয়া ডাক্তার সহাস্যে ফিরিয়া দেখিলেন, চোখে আঁচল দিয়া ভারতী বারান্দার একদিকে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে।

শশী কহিল, প্রেসিডেণ্ট আপনাকে একবার দেখা করতে বলেচেন। তিনি সুরাভায়ায় চলে যাচ্চেন।

ডাক্তার বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না, তবু প্রশ্ন করিলেন, কবে যাবেন?

শশী কহিল, বললেন ত শীঘ্রই। তাঁকে লোক এসেচে নিতে।

কথা ভারতীর কানে গেল, সে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সুমিত্রাদিদি কি সত্যই চলে যাবেন বলেচেন শশীবাবু?

শশী বলিল, হাঁ সত্যি। তাঁর মায়ের খুড়োর অগাধ সম্পত্তি। সম্প্রতি মারা গেছেন—ইনি ছাড়া উত্তরাধিকারী আর কেউ নেই। তাঁর না গেলেই নয়।

ডাক্তার কহিলেন, না গেলেই যখন নয়, তখন যাবেন বই কি।

শশী ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, অনেক খাবার আছে, খাবেন কিছু? কিন্তু ভারতীর ইতস্ততঃ করিবার পূর্ব্বেই ডাক্তার সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়, -চল, কি আছে দেখিগে। এই বলিয়া তিনি শশীর হাত ধরিয়া একপ্রকার জোর করিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া গেলেন। যাবার পথে শশী আস্তে আস্তে বলিল, আর একটা খবর আছে ডাক্তার, অপূর্ব্ববাবু ফিরে এসেচেন।

ডাক্তার বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, সে কি শশী, কে বললে তোমাকে?

শশী কহিল, কাল বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একেবারে মুখোমুখি দেখা। তার মা নাকি বড় পীড়িত।

২৭

শশী অতিশয়োক্তি করে নাই। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল খাদ্যবস্তুর অত্যন্ত বাহুল্যে ঘরের দক্ষিণ ধারটা একেবারেই ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। ছোট-বড় ডেকচি, প্লেট, কাগজের ঠোঙা, মাটির বাসন পরিপূর্ণ করিয়া নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্যসম্ভার দোকানদার ও হোটেলওয়ালার দল নিজেদের রুচি ও মর্জ্জি মত ওপার হইতে এপারে অবিশ্রাম সরবরাহ করিয়া স্তূপাকার করিয়াছে—অভাব বা ত্রুটি কিছুরই ঘটে নাই, ঘটিয়াছে কেবল সেগুলি উদারসাৎ করিবার লোকের! ডাক্তার ক্ষণকালমাত্র নিরীক্ষণ করিয়াই সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তোফা! তোফা! চমৎকার! শশী কি হিসেবী লোক দেখেচ ভারতী, কে কি খাবে না-খাবে সমস্ত চিন্তা করে দেখেচে। বহুৎ আচ্ছা!

ভারতী অন্যদিকে চাহিয়া রহিল এবং শশী হাসিবার একটুখানি বিফল চেষ্টা করিল মাত্র। কোন দিক হইতে কোন সাড়া না পাইয়াও ডাক্তারের উল্লাস অকস্মাৎ অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িল, হাঃ হাঃ হাঃ! গৃহস্থের জয়জয়কার হোক,—শশী! কবি! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ভারতী আর সহিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া সজলচক্ষে রুষ্ট দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, তোমার মনের মধ্যে কি একটু দয়া-মায়াও নেই দাদা? কি কোরচ বল ত?

বাঃ! যাঁদের কল্যাণে আজ ভাল ভাল জিনিস পেট পুরো খাবো,—তাদের একটু আশীর্ব্বাদ—বাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

ভারতী রাগ করিয়া বারান্দায় চলিয়া গেল। মিনিট-দুই পরে শশী গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিলে সে প্লেটে করিয়া মাংস, পোলাও, ফল-মূল, মিষ্টান্নাদি সযত্নে সাজাইয়া ডাক্তারের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া কৃত্রিম কুপিতস্বরে কহিল, নাও, এবার নাও, দশ হাত বার করে রাক্ষসের মত খাও। হাসি বন্ধ হোক, পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে যাবে।

ডাক্তার নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আহা! উপাদেয় খাদ্য! এর স্বাদ গন্ধও ভুলে গেছি।

কথাটা ভারতীর বুকে গিয়া বিঁধিল। তাহার সে রাত্রের শুকনা ভাত ও পোড়া-মাছের কথা মনে পড়িল।

ডাক্তার আহারে নিযুক্ত হইয়া কহিলেন, কবিকে দিলে না ভারতী।

এই যে দিচ্ছি, এই বলিয়া সে প্লেট সাজাইয়া আনিয়া শশীর কাছে রাখিয়া দিয়া ডাক্তারের সম্মুখে বসিয়া বলিল, কিন্তু সমস্ত খেতে হবে দাদা, ফেলতে পারবে না।

নাঃ—কিন্তু, তুমি খাবে না?

আমি? কোন মেয়েমানুষ এ সব খেতে পারে? তুমিই বল?

কিন্তু রেঁধেচে যেন অমৃত।

ভারতী কহিল, এর চেয়ে ভাল অমৃত রেঁধে আমি রোজ রোজ তোমাকে খাওয়াতে পারি দাদা।

ডাক্তার বাঁ হাতটা নিজের কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, কি করবে দিদি, অদৃষ্ট! যাকে খাওয়াবার কথা, সে এসব খাবে না, যে খাবে, তাকে একদিনের ওপর দুদিন খাওয়াবার চেষ্টা করিলেই সুখ্যাতিতে তোমার দেশ ভরে যাবে। ভগবানের এমনি উল্টো বিচার! কি বল কবি, ঠিক না? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

এবার ভারতী নিজেও হাসিয়া ফেলিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সম্বরণ

করিয়া লজ্জিত হইয়া বলিল, তোমার দুষ্টুমির জ্বালায় না হেসে পারা যায় না, কিন্তু এ তোমার ভারি অন্যায়। তার পরে পেট পুরে খেয়ে দেয়ে টাকার থলিটিও নিয়ে চলে যাবে না কি?

ডাক্তার মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া কহিলেন, নিশ্চয় নিশ্চয়,—অর্দ্ধেকটা ত গেছে নবতারার বাড়ি তৈরীর খাতায়, বাকীটা কি রেখে যাবো আহমেদ-আবদুল্লা সাহেবের গাড়ি-জুড়ি কিনতে? তামাসা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করতে নেহাৎ মন্দ পরামর্শ দাওনি ভারতী। কি বল শশী? হাঃ হাঃ হাঃ—

ভারতী বলিল, দাদা, তোমাকে হাসি-ঠাট্টা করতে আগেও দেখেচি বটে, কিন্তু এমন ক্ষ্যাপার মত হাসতে আর কখনো দেখিনি।

ডাক্তার জবাব দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া সহসা কিছু বলিতে পারিলেন না। ভারতী পুনশ্চ কহিল, নর-নারীর ভালবাসা কি তোমারি মত সকলের উপহাসের বস্তু যে, তাসের ছক্কা-পাঞ্জা হারার মত এর হারজিতে অট্টহাসি করা ছাড়া আর কিছুই করবার নাই? স্বাধীনতা পরাধীনতা ছাড়া মানুষের ব্যথা পাবার কি দুনিয়ায় কিছুই তুমি ভাবতে পারবে না? দেখ ত একবার শশীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে। একটা বেলার মধ্যে উনি কি হয়ে গেছেন। অপূর্ব্ববাবু যখন চলে গেলেন সেদিন, আমাকে উপলক্ষ্য করেও হয়ত তুমি এমনি করেই হেসেচ।

না, না, সে হ'ল—

ভারতী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না না বলচো কিসের জন্য দাদা? শশীবাবু তোমার স্নেহের পাত্র, তুমি এই ভেবে খুশী হয়ে উঠেচ যে, নির্ব্বোধ তাঁকে ফাঁদের মধ্যে ফেলে নবতারা অনেক দুঃখ দিত। ভবিষ্যতের সেই দুঃখের হাত থেকে তিনি এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু ভবিষ্যতই কি মানুষের সব? আজকের এই একটিমাত্র দিন যে ব্যথার ভার তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎকে ডিঙিয়ে গেল এ তুমি কি করে জানবে বল? তুমি ত কখনো ভালবাসোনি!

শশী অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে কোন মতে বলিতে চাহিল যে তাহারই অন্যায়, তাহারই ভুল, সাংসারিক সাধারণ বুদ্ধি না থাকার জন্যই—

ভারতী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, লজ্জা কিসের শশীবাবু? এ ভুল কি সংসারে একা আপনিই করেচেন? আপনার শতগুণ ভুল আমি করিনি? তারও সহস্র গুণ বেশি ভুল করে যে দুর্ভাগিনী নিঃশব্দে এ দেশ ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যেতে উদ্যত হয়েচে, তাকে কি ডাক্তার চেনেন না? নবতারা ঠকিয়েচে? ঠকাক না। তবু ত আমাদেরই বঞ্চনার গান গেয়ে জগতের অর্দ্ধেক কাব্য অমর হয়ে আছে।

ডাক্তার বিস্মিতচক্ষে তাহার প্রতি চাহিলেন, কিন্তু ভারতী গ্রাহ্য করিল না। বলিতে লাগিল শশীবাবু সাংসারিক বুদ্ধি আপনার কম। কিন্তু আমার ত কম ছিল না? সুমিত্রাদিদির বুদ্ধির তুলনাই হয় না। অথচ, কিছুই ত কারও কাজে লাগেনি। এ শুধু পরাভূত হল, দাদা, তোমার বুদ্ধির কাছে। যে চিরদিন অজেয়, পথ যার কখনো বাধা পায়নি, সেও তোমারই পাষাণ দ্বারে কেবল আছাড় খেয়ে খান খান হয়ে পড়ে গেল,—প্রবেশ করার এতটুকু পথ পেলে না!

ডাক্তার এ অভিযোগের উত্তর দিলেন না, শুধু তাহার মুখপানে চাহিয়া একটুখানি হাসিলেন। ভারতী বলিল, শশীবাবু, আমি আপনার প্রতি মহা অপরাধ করেচি, আজ তার ক্ষমা চাই—

শশী বুঝিতে পারিল না, কিন্তু কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। ভারতী নিমেষমাত্র মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিল, একদিন দাদার কাছে বলেছিলাম, কোন মেয়েমানুষেই কোনদিন আপনাকে ভালবাসতে পারে না। সেদিন আপনাকে আমি চিনিনি। আজ মনে হচ্ছে অপূর্ব্ববাবুকে যে ভালবেসেছিল সে আপনাকে পেলে ধন্য হয়ে যেতো। সবাই আপনাকে উপেক্ষা করে এসেচে, শুধু একটি লোক করেনি, সে এই ডাক্তার।

ডাক্তার অধোমুখে এক টুকরা মাংস হইতে হাড় পৃথক করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, মুখ তুলিবার অবকাশ পাইলেন না। ভারতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দাদা, মানুষকে চিনে নিতে তোমার ভুল হয় না, তাই সেদিন দুঃখ করে আমার কাছে বলেছিলে, শশী যদি আর কাউকে ভালবাসত। কিন্তু এক দিনও কি তুমি আমাকে সাবধান করে বলে দিতে পারতে না, ভারতী, এতবড় ভুল তুমি করো না! পুরুষের দুই আদর্শ তোমরা দুজনে আমার সুমুখে বসে,—আজ আমার বিতৃষ্ণার আর অবধি নেই।

ডাক্তার মাংসখণ্ড মুখে পুরিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অপূর্ব্ব কি বললে শশী?

জবাব দিল ভারতী। কহিল, মা পীড়িত। চিকিৎসার প্রয়োজন, অতএব টাকা চাই। ফিরে এসে লুকিয়ে গোলামি করলে কেউ জানতে পারবে না। ভয় তলওয়ারকরকে, ভয় ব্রজেন্দ্রকে। কিন্তু, কাকা পুলিশ-কর্ম্মচারী,—সে ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে। তুমি আমিও বোধ হয় এখন আর বাদ যাবো না। ক্ষুদ্র! লোভী! সঙ্কীর্ণ-চিত্ত ভীরু! ছি!

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, যথার্থ ভাল না বাসলে এমন প্রাণ খুলে যশোগান করা যায় না। কবি, এবার তোমার পালা। বাগ্দেবীকে স্মরণ করে তুমি এবার নবতারার গুণকীর্ত্তন শুরু কর,—আমরা অবহিত হই।

ভারতী চকিত হইয়া কহিল, দাদা, তুমি আমাকে তিরস্কার করলে?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই হবে হয়ত।

অভিমানে, ব্যথায়, ক্রোধে ভারতীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, তুমি কখ্খনো আমায় বকতে পাবে না। ভেবেচ সবাই শশীবাবুর মত মুখ বুঁজে সইতে পারে? তুমি কি জানো কি হয় মানুষের? উচ্ছ্বসিত বেদনায় কণ্ঠস্বর তাহার অবরুদ্ধ হইয়া আসিল, কহিল, তিনি ফিরে এসেচেন, এবার আমাকে তুমি কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাও দাদা,—আমি এ কোন্ দুর্ভাগ্যের পায়ে আমার সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে বসে আছি। বলিতে বলিতে মেঝের উপর মাথা রাখিয়া ভারতী ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিল।

ডাক্তার স্মিতমুখে নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। তাঁর নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া মনে হয় না যে, এই সকল প্রণয় উচ্ছ্বাস তাঁহাকে লেশমাত্র বিচলিত করিয়াছে। মিনিট পাঁচ-সাত পরে ভারতী উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া চোখ মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, আর তোমাদের কিছু দেব?

ডাক্তার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বলিলেন, বামুনের ছেলে, কিছু ছাঁদা বেঁধে দাও, দিন দুই যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

ময়লা রুমালটা ফিরাইয়া দিয়া ভারতী খোঁজ করিয়া একখানা ধোয়া তোয়ালে বাহির করিল এবং রকমারি খাদ্যবস্তুর একটি পুঁটুলি বাঁধিয়া ডাক্তারের পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, এই ত হল বামুনের ছেলের ছাঁদা। আর ঐ টাকার ছোট্ট থলিটি?

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, ওটি হল বামুনের ছেলের ভোজন দক্ষিণা।

ভারতী বলিল, অর্থাৎ তুচ্ছ বিবাহ ব্যাপারটা ছাড়া আসল দরকারি কাজগুলো সমস্তই নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হল।

অকস্মাৎ হাঃ হাঃ—করিয়া আরম্ভ করিয়াই ডাক্তার সজোরে হাত দিয়া নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়া হাসি থামাইলেন, গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কি যে ভগবানের অভিশাপ, ভারতী, হাসতে গেলেই মুখ দিয়ে আমার অট্টহাসি ছাড়া আর কিছু বার হতেই চায় না। অট্টকান্না কাঁদবার জন্যে তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে এলে আজ মুখ দেখানোই ভার হতো।

দাদা, আবার জ্বালাতন করচ?

জ্বালাতন করচি! আমি ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করচি।

ভারতী রাগ করিয়া আর একদিকে মুখ ফিরাইল, জবাব দিল না।

শশী বরাবর চুপ করিয়াই ছিল, এতক্ষণে কথা কহিল। অকস্মাৎ অতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, আপনি যদি রাগ না করেন ত একটা কথা বলতে পারি। কেউ কেউ ভয়ানক সন্দেহ করে যে, আপনার সঙ্গেই একদিন ভারতীর বিবাহ হবে।

ডাক্তার মুহূর্ত্তের জন্য চমকিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করিয়া উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলেন, বল কি হে শশী, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, এমন সুদিন কি কখনো এতবড় দুর্ভাগার অদৃষ্টে হবে? এ যে স্বপ্নের অতীত, কবি!

শশী কহিল, কিন্তু অনেকে ত তাই ভাবেন।

ডাক্তার কহিলেন, হায়! হায়! অনেকে না ভেবে যদি একটি মাত্র লোক একটি পলকের জন্যও ভাবতেন।

ভারতী হাসিয়া ফেলিল। মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দুর্ভাগ্যর ভাগ্য ত একটি পলকেই বদলাতে পারে দাদা। তুমি হুকুম করে যদি বল, ভারতী, কালই আমাকে তোমার বিয়ে করতে হবে, আমি তোমায় দিব্যি করে বলচি, বলব না যে আর একটা দিন সবুর কর।

ডাক্তার কহিলেন, কিন্তু অপূর্ব্ব বেচারা যে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ফিরে এল, তার উপায়টা কি হবে?

ভারতী বলিল, তাঁর কনে-বৌ দেশে মজুত আছে, তাঁর জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তিনি বুক ফেটে মারা যাবেন না।

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাও, তোমার ভরসা ত কম নয় ভারতী!

ভারতী কহিল, তোমার হাতে পড়ব তার আর ভয়টা কিসের?

ডাক্তার শশীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, শুনে রেখো কবি। ভবিষ্যতে যদি অস্বীকার করে তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

ভারতী বলিল, কাউকে সাক্ষী দিতে হবে না দাদা, আমি তোমার নাম নিয়ে এত বড় শপথ কখনো অস্বীকার কোরব না। শুধু তুমি স্বীকার করলেই হয়।

ডাক্তার কহিলেন, আচ্ছা দেখে নেবো তখন।

দেখো। এই বলিয়া ভারতী হাসিয়া কহিল, দাদা, আমিই বা কি, আর সুমিত্রাই বা কি,—স্বর্গের ইন্দ্রদেব যদি উর্ব্বশী মেনকা রম্ভাকে ডেকে বলতেন, সেকালের মুনি-ঋষিদের বদলে তোমাদের একালের সব্যসাচীর তপস্যা ভঙ্গ করতে হবে ত আমি নিশ্চয় বলচি দাদা, মুখে কালি মেখে তাদের ফিরে যেতে হ'তো। রক্ত-মাংসের হৃদয় জয় করা যায়, কিন্তু পাথরের সঙ্গে কি চলে। পরাধীনতার আগুনে পুড়ে সমস্ত বুক তোমার একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে?

ডাক্তার মৃচকিয়া হাসিলেন। ভারতীর দুইচক্ষু শ্রদ্ধা ও স্নেহে অশ্রুসজল হইয়া কহিল, এ বিশ্বাস না থাকলে কি এমন করে তোমাকে আত্মসমর্পণ করতে পারতাম? আমি ত নবতারা নই। আমি জানি, আমার সমস্ত ভুল হয়ে গেছে,—কিন্তু এ জীবনে সংশোধনের পথও আর নেই। একদিনের জন্যেও যাঁকে মনে মনে—

ভারতীর চোখ দিয়া পুনরায় জল গড়াইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, দাদা, ফেরবার সময় হয়নি? তাঁটার দেরি কত?

ডাক্তার দেওয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, এখনো দেরি আছে বোন। তাহার পরে ধীরে ধীরে ডান হাত বাড়াইয়া ভারতীর মাথার উপরে রাখিয়া কহিলেন, আশ্চর্য্য! এত দুর্দ্দশাতেও এ অমূল্য রত্নটি আজও বাঙলার খোয়া যায়নি। থাক্ না নবতারা, তবু ত ভারতীও আমাদের আছে। শশী, সমস্ত পৃথিবীতে এর আর জোড়া মেলে না! এমন সহস্র সব্যসাচীরও সাধ্য নেই তুচ্ছ অপূর্ব্বকে আড়াল করে দাঁড়ায়। ভাল কথা শশী, মদের বোতল কই?

প্রশ্ন শুনিয়া শশী যেন কিছু লজ্জিত হইল, কিনিনি ডাক্তার। ও আমি আর খাবো না।

ভারতী বলিল, তোমার মনে নেই দাদা, নবতারা ওকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন?

শশী তাহারই সায় দিয়া কহিল, সত্যিই নবতারার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মদ আর খাবো না। এ সত্য আমি ভাঙবো না ডাক্তার।

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, কিন্তু বাঁচবে কি করে শশী? মদ গেল, নবতারা গেল, যথাসর্ব্বস্ব-বিক্রি-করা টাকা গেল, একসঙ্গে এত সইবে কেন?

শশীর মুখের দিকে চাহিয়া ভারতী ব্যথা পাইল, কহিল, তামাসা করা সহজ দাদা, কিন্তু সত্যি সত্যি একবার ভেবে দেখ দিকি?

ডাক্তার বলিলেন, ভেবে দেখেই ত বলচি ভারতী! এই টাকাটার উপরে যে শশীর কতখানি আশা-ভরসা ছিল তা আমার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না। ওর পরিচিত এমন একটা লোকও নেই যে, এ বিবরণ শোনেনি! তার পরে এলো নবতারা। ছ-সাতমাস ধরে সেই ছিল ওর ধ্যান-জ্ঞান। আর মদ? সে তো শশীর সুখ-দুঃখে একমাত্র সাথী। কাল সবই ছিল, আজ ওর জীবনের যা-কিছু আনন্দ, যা কিছু সান্ত্বনা একদিনে একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে যেন ওকে ত্যাগ করে গেল। শুধু কারও বিরুদ্ধে ওর বিদ্বেষ নেই—নালিশ নেই,—এমন কি আকাশের পানে চেয়ে

একবার সজল চক্ষে বলতে পারলে না যে, ভগবান! আমি কারও মন্দ চাইনে, কিন্তু তুমি সত্যির যদি হও ত এর বিচার কোরো?

ভারতীর মুখ দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, তাই তোমার এত স্নেহ।

ডাক্তার বলিলেন, শুধু স্নেহ নয়, শ্রদ্ধা। শশী সাধু লোক, সমস্ত অন্তরখানি যেন গঙ্গাজলের মত শুদ্ধ নির্ম্মল। ভারতী, আমি চলে গেলে বোন, একে একটু দেখো। তোমার হাতেই শশীকে আমি দিয়ে গেলাম, ও দুঃখ পাবে, কিন্তু দুঃখ কখনো কাউকে দেবে না।

শশী লজ্জা ও কুণ্ঠায় আরক্ত হইয়া উঠিল। ইহার কিছু পরে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বোধ করি কথার অভাবেই তিনজনেই নীরব হইয়া রহিলেন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু এখন থেকে কি করবে কবি? তোমার বাকী রইল ত কেবল ওই বেহালাখানি। আগের মত আবার দেশে দেশে বাজিয়ে বেড়াবে?

এবার শশী হাসিমুখেই বলিল, আপনার কাজে আমাকে ভর্ত্তি করে নিন,—বাস্তবিকই আমি আর মদ খাবো না।

তাহার কথা এবং কথা বলার ভঙ্গি দেখিয়া ভারতী হাসিল। ডাক্তার নিজেও হাসিলেন, স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, না কবি, ওতে তোমার আর ভর্ত্তি হয়ে কাজ নেই। তুমি আমার এই বোনটির কাছে থেকো, তাতেই আমার ঢের বড় কাজ হবে।

শশী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া সঙ্কোচের সহিত কহিল, আগে আমি কবিতা লিখতে পারতাম ডাক্তার—হয়ত এখনও পারি।

ডাক্তার খুশী হইয়া কহিলেন, তাও বটে! আর তাতেই যে আমার মস্ত কাজ হবে কবি।

শশী কহিল, আমি আবার আরম্ভ করব। চাষাভুষা, কুলি-মজুরদের জন্যেই এবার শুধু লিখব।

কিন্তু তারা ত পড়তে জানে না কবি?

শশী কহিল, নাই জানলে, তবু তাদের জন্যেই আমি লিখবো।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, সেটা অস্বাভাবিক হবে এবং অস্বাভাবিক জিনিস টিকবে না। অশিক্ষিতের জন্যে অন্নসত্র খোলা যেতে পারে কারণ, তাদের ক্ষুধা-বোধ আছে কিন্তু সাহিত্য পরিবেশন করা যাবে না। তাদের সুখ-দুঃখের বর্ণনা করার মানেই তাদের সাহিত্য নয়। কোনদিন যদি সম্ভব হয়, তাদের সাহিত্য তারাই

করে নেবে,—নইলে তোমার গলায় লাঙলের গান লাঙলধারীর গীতিকাব্য হয়ে উঠবে না। এ অসম্ভব প্রয়াস তুমি করো না কবি।

শশী ঠিক বুঝিতে পারিল না, সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তবে আমি কি করব?

ডাক্তার বলিলেন, তুমি আবার বিপ্লবের গান কোরো। যেখানে জন্মেচ, যেখানে মানুষ হয়েচ, শুধু তাদেরই—সেই শিক্ষিত ভদ্র জাতের জন্যেই।

ভারতী বিস্মিত হইল, ব্যথিত হইল, কহিল, দাদা, তুমিও জাত মানো? তোমার লক্ষ্যও সেই কেবল ভদ্র জাতির দিকে?

ডাক্তার বলিলেন, আমি ত বর্ণাশ্রমের কথা বলিনি ভারতী, সেই জোর-করা জাতিভেদের ইঙ্গিত ত আমি করিনি। সে বৈষম্য আমার নেই, কিন্তু শিক্ষিত অশিক্ষিতের জাতিভেদ, সে ত আমি না মেনে পারিনে! এই ত সত্যকার জাতি,—এই ত ভগবানের হাতে-গড়া সৃষ্টি! ক্রীশ্চান বলে কি তোমাকে ঠেলে রাখতে পেরেচি দিদি। তোমার মত আপনার জন আমার কে আছে?

ভারতী শ্রদ্ধা-বিগলিত চক্ষে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, কিন্তু তোমার বিপ্লবের গান ত শশীবাবুর মুখে সাজবে না দাদা! তোমার বিদ্রোহের গান, তোমার গুপ্ত সমিতির—

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন, না, আমার গুপ্ত সমিতির ভার আমার 'পরেই থাক্ বোন্—ও বোঝা বইবার মত জোর—না না, সে থাক্—সে শুধু আমার! এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল যেন আপনাকে সামলাইয়া লইলেন। কহিলেন, তোমাকে ত বলেচি ভারতী, বিপ্লব মানেই শুধু রক্তারক্তি কাণ্ড নয়,—বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্ত্তন। রাজনৈতিক বিপ্লব নয়,—সে আমার। কবি, তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন, ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কার, সমস্ত ভেঙে চুরে ধ্বংস হয়ে যাক,—আর কিছু না পারো শশী, কেবল এই মহাসত্যই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে দাও—এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই—তারপরে থাক্ দেশের স্বাধীনতার বোঝা আমার এই মাথায়? কে?

শশী কান খাড়া করিয়া বলিল, সিঁড়িতে পায়ের যেন শব্দ—

ডাক্তার চক্ষের পলকে পকেটের মধ্যে হাত পুরিয়া দিয়া নিঃশব্দে দ্রুতপদে অন্ধকার বারান্দায় বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু ক্ষণেক পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, ভারতী, সুমিত্রা আসচেন।

২৮

এই নিশীথ রাত্রে সুমিত্রার আগমন সংবাদ যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অপ্রীতিকর। ভারতী কুণ্ঠিত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে সে প্রবেশ করিতে ডাক্তার সহজকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, বোস। তুমি কি একলা এলে নাকি?

সুমিত্রা বলিল, হাঁ। ভারতীর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভালো আছো ভারতী?

এই মিনিটখানেক সময়ের মধ্যেই ভারতী কত কি যে ভাবিতেছিল তাহার সীমা নাই। সেদিনকার মত আজিও যে সুমিত্রা তাহাকে গ্রাহ্য করিবে না ইহাই সে নিশ্চিত জানিত, কিন্তু শুধু এই কুশল প্রশ্নে নয়, তাঁহার কণ্ঠস্বরের স্নিগ্ধ কোমলতায় ভারতী সহসা যেন চাঁদ হাতে পাইল। অহেতুক কৃতজ্ঞতায় অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া বলিল, ভাল আছি দিদি। আপনি ভাল আছেন? আজ আর তাহাকে তুমি বলিয়া ডাকিতে ভারতীর সাহস হইল না।

হাঁ, আছি, বলিয়া জবাব দিয়া সুমিত্রা একধারে উপবেশন করিল। কথোপকথন বেশি করা তাহার প্রকৃতি নয়,—একটা স্বাভাবিক ও শান্ত গাম্ভীর্যের দ্বারা চিরদিনই সে ব্যবধান রাখিয়া চলিত, আজও সে রীতির ব্যত্যয় হইল না। ইহা প্রচ্ছন্ন ক্রোধ বা বিরক্তির পরিচায়ক নহে তাহা জানিয়াও কিন্তু ভারতীর নিজ হইতে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে ভরসা হইল না।

ডাক্তার কথা কহিলেন। বলিলেন, শশীর মুখে শুনলাম, তুমি প্রচুর বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে জাভায় ফিরে যাচ্ছ।

সুমিত্রা কহিল, হাঁ, আমাকে নিয়ে যাবার জন্য লোক এসেচে।

কবে যাবে?

প্রথম স্টিমারেই—শনিবারে।

ডাক্তার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, যাক, এবারে তাহলে তুমি বড়লোক হলে।

সুমিত্রা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, কহিল, হাঁ, সমস্ত পেলে তাই বটে।

ডাক্তার বলিলেন, পাবে। এটর্ণির পরামর্শ ছাড়া কাজ করো না। আর, একটু সাবধানে থেকো। যাঁরা তোমাকে নিতে এসেছেন, তাঁরা পরিচিত লোক ত?

সুমিত্রা বলিল, হাঁ, তাঁরা বিশ্বাসী লোক, সকলকেই আমি চিনি।

তাহলে ত কথাই নেই, এই বলিয়া ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ শশী কথা কহিল; বলিল, এ হল মন্দ নয়

ডাক্তার। যে তিনজন বাঙালী মহিলাকে আপনি নিলেন—নবতারা গেলেন, স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট যেতে উদ্যত, শুধু ভারতী—

ডাক্তার সহাস্তে বলিলেন, তোমার দুশ্চিন্তার হেতু নেই, কবি, ভারতীও মহাজনের পন্থা অনুসরণ করবেন তা এক প্রকার স্থির হয়ে গেছে।

প্রত্যুত্তরে ভারতী শুধু ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল, কিন্তু জবাব দিল না।

ডাক্তারের পরিহাসের মধ্যে যে ব্যথা আছে শশী ইহাই অনুমান করিয়া কহিল, আপনাকেও শীঘ্র চলে যেতে হচ্চে। তাহলেই দেখুন, আপনার পথের দাবীর এ্যাক্‌টিভিটি বর্ম্মায় অন্ততঃ শেষ হয়ে গেল। কে আর চালাবে! এই বলিয়া শশী গভীর নিশ্বাস মোচন করিল। তাহার এই দীর্ঘশ্বাস অকৃত্রিম এবং যথার্থই বেদনায় পূর্ণ, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ডাক্তারের মুখের 'পরে ইহার লেশমাত্র প্রতিবিম্ব পড়িল না। তেমনি হাসিমুখে কহিলেন, ও কি কথা কবি? এতকাল এত দেখে শুনে শেষে তোমারই মুখে সব্যসাচীর এই সার্টিফিকেট! তিনজন মহিলা চলে যাবেন বলে পথের দাবী শেষ হয়ে যাবে? মদ ছেড়ে দিয়ে কি এই হ'ল নাকি? তার চেয়ে তুমি বরঞ্চ আবার ধরো।

কথাটা তামাসার মত শুনাইলেও যে তামাসা নয় তাহা বুঝিয়াও ভারতী ঠিকমত বুঝিতে পারিল না। কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল, সুমিত্রা নতনেত্রে নিঃশব্দে বসিয়া আছে। তখন সে মুখ তুলিয়া ডাক্তারের মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, দাদা, আমার ত আর বোঝবার জন্তে মদ ধরবার আবশ্যক নেই, কিন্তু তবু ত বুঝতে পারলাম না। নবতারা কিছুই নয়, আর আমি তার চেয়েও অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সুমিত্রা দিদি—যাঁকে তুমি নিজে থেকে প্রেসিডেণ্টের আসন দিয়েচ,—তিনি চলে গেলেও কি তোমার পথের দাবীতে আঘাত লাগবে না? সত্যি কথা বোলো দাদা, সুদ্ধমাত্র কাউকে লাঞ্ছনা করবার জন্তেই রাগ করে যেন বোলো না! এই বলিয়া সে চোখাচোখি হইবার নিঃসন্দিগ্ধ ভরসায় পলকমাত্র সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু অন্যত্র অপসারিত করিল। চোখে চোখে মিলল না, সুমিত্রা সেই যে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া ছিল, ঠিক তেমনি নির্ব্বাক নতমুখে মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন, তাহার পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, আমি রাগ করে বলিনি ভারতী, সুমিত্রা অবহেলার বস্তু নয়। কিন্তু তুমি হয় ত জানো না, কিন্তু নিজে সুমিত্রা ভালরূপেই জানেন যে এ সকল ব্যাপারে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ গণনা করতে নেই। তাছাড়া প্রাণ যাদের এমন অনিশ্চিত তাদের মূল্য স্থির হবে কি দিয়ে বল ত? মানুষ ত যাবেই। যত বড় হোক, কারও অভাবকেই যেন না আমরা সর্ব্বনাশ বলে ভাবি, একজনের স্থান যেন জলস্রোতের মত আর

একজন স্বচ্ছন্দে এবং অত্যন্ত অনায়াসেই পূর্ণ করে নিতে পারে এই শিক্ষাই ও আমাদের প্রথম এবং প্রধান শিক্ষা ভারতী।

ভারতী কহিল, কিন্তু এ তো আর সংসারে সত্যই ঘটে না। এই যেমন তুমি। তোমার অভাব কেউ কোনদিন পূর্ণ করতে পারে এ-কথা তো আমি ভাবতে পারিনে দাদা।

ডাক্তার বলিলেন, তোমার চিন্তার ধারা স্বতন্ত্র ভারতী। আর, এই যেদিন টের পেয়েছিলাম, সেই দিন থেকেই তোমাকে আর আমি দলের মধ্যে টানতে পারিনি। কেবল মনে হয়েচে, জগতে তোমার অন্য কাজ আছে।

ভারতী বলিল, আর কেবলই আমার মনে হয়েচে আমাকে অযোগ্য জ্ঞানে তুমি দূরে সরিয়ে দিতে চাচ্চো। যদি আমার অন্য কাজ থাকে, আমি তারই জন্যে এখন থেকে সংসারে বার হবো, কিন্তু আমার প্রশ্নের ত জবাব হল না দাদা। আসলে কথাটা তুচ্ছ। তোমার অভাব জলস্রোতের মতই পূর্ণ হতে পারে কি না? তুমি বোলচ পারে—আমি বলচি, পারে না। আমি জানি পারে না, আমি জানি মানুষ শুধু জলস্রোত নয়,—তুমি ত নও-ই।

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া সে পুনশ্চ কহিল, কেবল এই কথাটাই জানবার জন্যে তোমাকে আমি পীড়াপীড়ি করতাম না। কিন্তু যা নয়, যা নিজে জানো তুমি সত্য নয়, তাই দিয়ে আমাকে ভোলাতে চাও কেন?

ডাক্তার হঠাৎ উত্তরে দিতে পারিলেন না, উত্তরের জন্য ভারতী অপেক্ষাও করিল না। কহিল, এদেশে আর তোমার থাকা চলে না,—তুমিও যাবার জন্যে পা তুলে আছো। আবার তোমাকে ফিরে পাওয়া যে কত অনিশ্চিত এ-কথা ভাবতেও বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকে, তাই ও আমি ভাবিনে, তবুও এ সত্য ত প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব না করে পারিনে। এ ব্যথার সীমা নেই, কিন্তু তার চেয়েও আমার বড় ব্যথা তোমাকে এমন করে পেয়েও পেলাম না! আজ আমার কত দিনের কত প্রশ্নই মনে হচ্ছে দাদা, কিন্তু যখনি জিজ্ঞাসা করেচি তুমি সত্য বলেচ, মিথ্যা বলেচ, সত্যে-মিথ্যায় জড়িয়ে দিয়ে বলেচ,—কিন্তু কিছুতেই সত্য জানতে দাওনি; তোমার পথের দাবীর সেক্রেটারী আমি, তবু যে তোমার কাজের পদ্ধতিতে আমার এতটুকু আস্থা ছিল না, এ-কথা তোমাকে ত আমি একটা দিনও লুকোইনি। তুমি রাগ করোনি, অবিশ্বাস করোনি,—হাসিমুখে শুধু বার বার সরিয়ে দিতে চেয়েচ। অপূর্ব্ববাবুর জীবন-দানের কথা আমি ভুলিনি। মনে হয়, আমার ছোট্ট জীবনের কল্যাণ কেবল তুমিই নির্দ্দেশ করে দিতে পারো। দোহাই দাদা, যাবার পূর্ব্বে

আর নিজেকে গোপন করে যেয়ো না—তোমার, আমার, সকলের যা পরম সত্য তাই আজ অকপটে প্রকাশ কর।

এই অদ্ভুত অনুনয়ের অর্থ না বুঝিয়া শশী ও সুমিত্রা উভয়েই বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল এবং তাহাদেরই উৎসুক চোখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভারতী নিজের ব্যাকুলতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠিল। এই লজ্জা ডাক্তারের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি সহাস্যে কহিলেন, সত্য, মিথ্যা, এবং সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে ত সবাই বলে ভারতী, আমার আর বিশেষ দোষ হ'ল কি? তাছাড়া লজ্জা যদি পাবার থাকে ত সে আমার, কিন্তু লজ্জা পেলে যে তুমি!

ভারতী নত মুখে নীরব হইয়া রহিল। সুমিত্রা ইহার জবাব দিয়া কহিল, লজ্জা যদি তোমারই না-ই থাকে ডাক্তার! কিন্তু মেয়েরা সত্যি কথাটাও মুখের উপর স্পষ্ট করে বলতে লজ্জা বোধ করে। কেউ কেউ বলতেই পারে না।

এই মন্তব্যটি যে কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কিসের জন্য বলা হইল তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না, কি যে শ্রদ্ধা ও সম্মান তাঁহার প্রাপ্য বোধ হয় তাহাই অপর সকলকে নিরুত্তর করিয়া রাখিল। মিনিট দুই-তিন এমনি নিঃশব্দে কাটিলে ডাক্তার ভারতীকে পুনরায় লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ভারতী, সুমিত্রা বললেন, আমার লজ্জা নেই, তুমি দোষ দিলে আমি সুবিধামত সত্য ও মিথ্যা দুই-ই বলি। আজও তেমনি কিছু বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করে দিতে পারতাম, যদি না এর সঙ্গে আমার পথের দাবীর সম্বন্ধ থাকতো। এর ভাল-মন্দ দিয়েই আমার সত্য-মিথ্যা নির্দ্ধারিত হয়। এই আমার নীতিশাস্ত্র, এই আমার অকপট মূর্ত্তি!

ভারতী অবাক হইয়া কহিল, বল কি দাদা, এই তোমার নীতি, এই তোমার অকপট মূর্ত্তি?

সুমিত্রা বলিয়া উঠিল, হাঁ, ঠিক এই! এই ওঁর যথার্থ স্বরূপ। দয়া নেই, মায়া নেই, ধর্ম্ম নেই—এই পাষাণ মূর্ত্তি আমি চিনি ভারতী।

তাঁহার কথাগুলা যে ভারতী বিশ্বাস করিল তাহা নয়, কিন্তু সে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ডাক্তার কহিলেন, তোমরা বল চরম সত্য, পরম সত্য,—এই অর্থহীন নিষ্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহা মূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এতবড় যাদুমন্ত্র আর নেই। তোমরা ভাবো মিথ্যাকেই বানাতে হয়, সত্য, শাশ্বত, সনাতন, অপৌরুষেয়? মিছে কথা। মিথ্যার মতই একে মানব-জাতি অহরহ সৃষ্টি করে চলে। শাশ্বত, সনাতন নয়,—এর জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। আমি মিথ্যা বলিনে, আমি প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করি।

এ পরিহাস নয়, সব্যসাচীর অন্তরের উক্তি। ভারতী যেন ফ্যাকাশে হইয়া গেল, অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, এই কি তোমার পথের দাবীর নীতি?

ডাক্তার জবাব দিলেন, ভারতী, পথের দাবী আমার তর্কশাস্ত্রের টোল নয়—এ আমার পথ চলার অধিকারের জোর। কে কবে কোন্ অজানা প্রয়োজনে নীতিবাক্য রচনা করে গেল পথের দাবীর সেই হবে সত্য, আর এর তরে যার গলা ফাঁসির দড়িতে বাঁধা, তার হৃদয়ের বাক্য হবে মিথ্যা? তোমার পরম সত্য কি আছে জানিনে, কিন্তু পরম মিথ্যা যদি কোথাও থাকে ত সে এই!

উত্তেজনায় সুমিত্রার চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, কিন্তু এই ভয়ানক কথা শুনিয়া ভারতী শঙ্কায় ও সংশয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল।

কবি!

আজ্ঞে।

শশীর কি ভক্তি দেখেচ? এই বলিয়া ডাক্তার হাসিলেন, কিন্তু এ হাসিতে কেহ যোগ দিল না। ডাক্তার দেয়ালের ঘড়ির প্রতি চাহিয়া কহিলেন, জোয়ার শেষ হতে আর দেরি নেই, আমার যাবার সময় হয়ে এল। তোমার তারা-বিহীন শশি-তারা লজে আর আসার সময় পাবো না।

শশী কহিল, কালই আমি এ বাসা ছেড়ে দেব।

কোথায় যাবে?

শশী কহিল, আপনার আদেশমত ভারতীর কাছে গিয়ে থাকবো।

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, দেখেচ ভারতী, শশি আমার আদেশ অমান্য করে না। ও বাসাটার নাম কি দেবে কবি? শশি-ভারতী লজ? বার-তিনেক ফসকাতে ত আমিই দেখলাম, এবারে হয়ত লাগতেও পারে। ভারতী লোক ভাল। ওর শরীরে দয়া-মায়া আছে।

এত কষ্টেও ভারতী হাসিয়া ফেলিল। সুমিত্রা হাসি-মুখে মাথা নত করিল।

ডাক্তার বলিলেন, তোমার টাকার থলিটি কিন্তু সঙ্গে নিলাম। ভারতীর কাছে রেখে যাবো, ও একটা বাড়ি কিনবে।

ভারতী বলিল, দাদা, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া কি তোমার থামবে না?

শশী বলিল, টাকা আপনি নিন ডাক্তার, আপনাকে আমি দিলাম। আমার দেশের বাড়ি-ঘর সর্ব্বস্ব বেচা টাকা যেন দেশের কাজেই লাগে।

ডাক্তার হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। বলিলেন, টাকা আমার আছে, শশী, এখন আর দরকার নেই। তা ছাড়া, আর বোধ হয় টাকার অভাব হবে না। এই বলিয়া তিনি স্মিতমুখে সুমিত্রার প্রতি চাহিলেন।

সুমিত্রার দুই চক্ষে কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মুখে সে কিছুই বলিল না, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া এই কথাটাই ফুটিয়া বাহির হইল, সবই ত তোমার, কিন্তু সে কি তুমি ছোঁবে?

ডাক্তার দৃষ্টি অপসারিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে থাকিয়া ডাকিলেন, কবি!

বলুন।

ব্রাহ্মণ ভোজনটা একটু আগাম সেরে নিলাম বলে তুমি দুঃখ ক'রো না। কারণ, শুভক্ষণ যখন সত্যি এসে পৌঁছবে তখন দ্বিতীয়বার আর আমি ফুরসৎ পাবো না। কিন্তু সেদিন আসবে। নানাবিধ সুখাদ্যে পরিতৃপ্ত হয়ে আজ তোমাকে বর দিলাম, তুমি সুখী হবে। কিন্তু দুটি কাজ তুমি কখনো ক'রো না। মদ খেয়ো না, আর রাজনীতিক বিপ্লবের মধ্যে যেয়ো না। তুমি কবি, তুমি দেশের বড় শিল্পী—রাজনীতির চেয়ে তুমি বড় এ কথা ভুলো না।

শশী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, আপনি যাতে আছেন, আমি তার মধ্যে থাকলে দোষ হবে,—আমি কি আপনার চেয়েও বড়?

ডাক্তার কহিলেন, বড় বই কি! তোমার পরিচয়ই ত জাতির সত্যকার পরিচয়। তোমরা ছাড়া এর ওজন হবে কি দিয়ে? একদিন এই স্বাধীনতা-পরাধীনতার সমস্যার মীমাংসা হবেই,—এর দুঃখ-দৈনন্দিন কাহিনী সেদিন জনশ্রুতির অধিক মূল্য পাবে না, কিন্তু তোমার কাজের মূল্য নিরূপণ করবে কে? তুমিই ত দিয়ে যাবে দেশের সমস্ত বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ধারাকে মালার মত গেঁথে।

সুমিত্রা মৃদুহাস্যে বলিল, কবে গাঁথবেন সে উনিই জানেন, কিন্তু তুমি কথা গেঁথে-গেঁথে যে মূল্য ওঁর এখনি বাড়িয়ে দিলে, ভারতী সামলাবে কি করে?

শুনিয়া সবাই হাসিল, ডাক্তার কহিলেন, শশী হবে আমাদের জাতীয় কবি। হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, খ্রীষ্টানের নয়,—শুধু আমার বাঙলা দেশের কবি। সহস্র নদ-নদী প্রবাহিত আমার বাঙলা দেশ, আমার সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা মাঠের পরে মাঠে-ভরা বাঙলা দেশ। মিথ্যা রোগের দুঃখ নেই, মিথ্যা দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নেই, বিদেশী শাসনের সুদুঃসহ অপমানের জ্বালা নেই, মনুষ্যত্ব-হীনতার লাঞ্ছনা নেই,—তুমি হবে শশী, তারই চারণ কবি, পারবে না ভাই?

ভারতীর সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, শশী ভ্রাতৃ সম্বোধনের মাধুর্য্যে বিগলিত হইয়া বলিল, ডাক্তার, চেষ্টা করলে আমি ইংরাজিতেও কবিতা লিখতে পারি। এমন কি—

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না না, ইংরাজি নয়, ইংরাজি নয়,—শুধু বাঙলা, শুধু এই সাত কোটি লোকের মাতৃভাষা! শশী, পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাই

আমি জানি, কিন্তু সহস্র দলে বিকশিত এমন মধু দিয়ে ভরা ভাষা আর নেই! আমি অনেক সময় ভাবি ভারতী, এমন অমৃত এদেশে কবে কে এনেছিল?

ভারতীর চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল, সে কহিল, আর আমি ভাবি দাদা, দেশকে এতখানি ভালবাসতে তোমাকে কে শিখিয়েছিল। কোথাও যেন এর আর সীমা নেই!

ইহারই প্রতিধ্বনি তুলিয়া শশী উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিয়া উঠিল, এই বিগত গৌরবের গানই হবে আমার গান, এই ভালবাসার সুরই হবে আমার সুর। নিজের দেশকে বাঙলা দেশের লোকে যেন আবার তেমনি করে ভালবাসতে পারে—এই শিক্ষাই হবে আমার শিক্ষা দেওয়া।

ডাক্তার বিস্মিত চোখে মুহূর্ত্তকাল শশীর প্রতি চাহিয়া সুমিত্রার মুখের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া অবশেষে উভয়েই হাসিলেন। কিন্তু এই হাসির মর্ম্ম অপর দুইজনে উপলব্ধি না করিতে পারিয়া দুইজনেই অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। ডাক্তার কহিলেন, আবার তেমনি করে ভালবাসবে কি? তুমি যে ভালবাসার ইঙ্গিত করচ শশী, সে ভালবাসা বাঙালী কস্মিনকালে বাঙলা দেশকে বাসেনি। তার তিলার্দ্ধ থাকলেও কি বাঙালী বিদেশীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এই সাত কোটি ভাইবোনকে অবলীলাক্রমে পরের হাতে সঁপে দিতে পারতো? জননী জন্মভূমি ছিল শুধু কথার কথা? মুসলমান বাদশার পায়ের তলায় অঞ্জলি দেবার জন্যে হিন্দু মানসিংহ হিন্দু প্রতাপাদিত্যকে জানোয়ারের মত করে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। আর তাকে রসদ যুগিয়ে পথ দেখিয়ে এনেছিল বাঙালী! বর্গীরা দেশ লুট করতে আসত, বাঙালী লড়াই করত না, মাথায় হাঁড়ি দিয়ে জলে বসে থাকতো। মুসলমান দস্যুরা মন্দির ধ্বংস করে দেবতাদের নাক কান কেটে দিয়ে যেতো, বাঙালী ছুটে পালাত, ধর্ম্মের জন্যে গলা দিত না। সে বাঙালী আমাদের কেউ নয়, কবি, গৌরব করার মত তাদের কিছু ছিল না। তাদের আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে চলবো—তাদের ধর্ম্ম, তাদের অনুশাসন, তাদের ভীরুতা, তাদের দেশদ্রোহিতা, তাদের সামাজিক রীতিনীতি,—তাদের যা কিছু সমস্ত। সেই ত হবে তোমার বিপ্লবের গান, সেই ত হবে তোমার দেশ-প্রেম!

শশী বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল, এই উক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না।

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, তাদের কাপুরুষতায় আমরা বিশ্বের কাছে হেয়, স্বার্থপর-তার ভারে দায়গ্রস্ত, পঙ্গু! শুধু কি কেবল দেশ? যে ধর্ম্ম তারা আপনারা মানতো না, যে দেবতাদের 'পরে তাদের নিজেদের আস্থা ছিল না, তাদেরই দোহাই দিয়ে সমস্ত জাতির আপাদ-মস্তক যুক্তিহীন বিধি-নিষেধের সহস্র পাকে বেঁধে দিয়ে গেছে।

এ অধীনতা অনেক দুঃখের মূল।

শশী ধীরে ধীরে কহিল, এসব আপনি কি বলচেন?

ভারতীর ক্ষোভের অবধি রহিল না, বলিল, দাদা, আজ আমি ক্রীশ্চান, কিন্তু তাঁরা আমারও পূর্ব্বপিতামহ। তাদের আর যা দোষ থাক, ধর্ম্ম-বিশ্বাসে প্রবঞ্চনা ছিল,—এরকম অন্যায় কটূক্তি তুমি কোরো না।

সুমিত্রা চুপ করিয়াই শুনিতেছিল, এখন কথা কহিল। ভারতীর প্রতি চাহিয়া বলিল, কারও সম্বন্ধেই কটূক্তি করা অন্যায়, কিন্তু অশ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করাও অন্যায়, এমন কি তিনি পূর্ব্বপিতামহ হলেও। এতে মিষ্টতা থাকতে পারে, কিন্তু যুক্তি নেই ভারতী, যা কুসংস্কার তাকে পরিত্যাগ করতে শেখো।

ভারতী নির্ব্বাক হইয়া রহিল। ডাক্তার শশীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কোন বস্তু কেবলমাত্র প্রাচীনতার জোরেই সত্য হয়ে ওঠে না, কবি। পুরাতনের গুণগান করতে পারাই বড় গুণ নয়। তাছাড়া, আমরা বিপ্লবী, পুরাতনের মোহ আমাদের জন্যে নয়। আমাদের দৃষ্টি, আমাদের গতি, আমাদের লক্ষ্য শুধু সুমুখের দিকে। পুরাতনের ধ্বংস করেই ত শুধু আমাদের পথ করতে হয়! এর মধ্যে মায়া-মমতার অবকাশ কই? জীর্ণ, মৃত পথ জুড়ে থাকলে আমরা পথের দাবীর পথ পাবো কোথায়?

ভারতী কহিল, আমি কেবল তর্কের জন্যেই তর্ক করচিনে, আমি সত্যই তোমার কাছ থেকে আমার জীবনের পথ খুঁজে বেড়াচ্চি। তুমি পুরাতনের শত্রু, কিন্তু কোন একটা সংস্কার বা রীতিনীতি কেবলমাত্র প্রাচীন হয়েচে বলেই কি তা নিষ্ফল, বৃথা এবং পরিত্যাজ্য হয়ে যাবে? মানুষের তা হলে অসংশয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে কার 'পরে দাদা?

ডাক্তার বলিলেন, এতখানি ভারসহ বস্তু দুনিয়ায় কি আছে তা জানিনে। তবে এ কথা জানি, ভারতী, বয়সের সঙ্গে একদিন সমস্ত জিনিসই প্রাচীন, জীর্ণ এবং অকেজো, সুতরাং পরিত্যাজ্য হয়ে ওঠে। প্রত্যহ মানুষেই এগিয়ে যাবে, আর তার পিতামহের প্রতিষ্ঠিত সহস্র বর্ষের প্রাচীন রীতিনীতি একই স্থানে অচল হয়ে থাকবে, এমন হলে হয়ত ভাল হয়, কিন্তু তা হয় না। শুধু একটা বিপদ হয়েচে এই যে, কেবলমাত্র বছরের সংখ্যা দিয়েই কোন একটা সংস্কারের প্রাচীনতা নিরূপণ করা যায় না। না হলে তুমিও আজ আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে, দাদা, যা কিছু পুরাতন, যা কিছু জীর্ণ সমস্ত নির্ব্বিচারে নির্ম্মম হয়ে ধ্বংস করে ফেলো, আবার নূতন মানুষ নূতন জগতের প্রতিষ্ঠা হোক।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, নিজে তুমি পারো?

কি পারি, বোন?

যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু পবিত্র, সমস্ত নির্ম্মম-চিত্তে ধ্বংস করে ফেলতে?

ডাক্তার বলিলেন, পারি। সেই ত আমাদের ব্রত। পুরাতন মানেই পবিত্র নয় ভারতী। মানুষ সত্তর বছরের প্রাচীন হয়েচে বলেই সে দশ বছরের শিশুর চেয়ে বেশি পবিত্র হয়ে ওঠে না। তোমার নিজের দিকেই চেয়ে দেখ, মানুষের অবিশ্রাম চলার পথে ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত সকল দিকেই মিথ্যে হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কেউ ত আর সে আশ্রম অবলম্বন করে নেই। থাকলে তাকে মরতে হবে। সে যুগের সে বন্ধন আজ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। তবুও তাকেই পবিত্র মনে করে কে জানো ভারতী? ব্রাহ্মণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই নিরতিশয় পবিত্র জ্ঞানে কারা আঁকড়ে থাকতে চায় জানো? জমিদার। এর স্বরূপ বোঝা ত শক্ত নয় বোন! যে সংস্কারের মোহে অপূর্ব্ব আজ তোমার মত নারীকেও ফেলে দিয়ে যেতে পারে তার চেয়ে বড় অসত্য আর আছে কি? আর শুধু কি অপূর্ব্বর বর্ণাশ্রম? তোমার ক্রীশ্চান ধর্ম্মও আজ তেমনি অসত্য হয়ে গেছে, ভারতী, এর প্রাচীন মোহ তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

ভারতী ভীত হইয়া বলিল, যে ধর্ম্মকে ভালবাসি, বিশ্বাস করি, তাকেই তুমি ত্যাগ করতে বল দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, বলি। কারণ সমস্ত ধর্ম্মই মিথ্যা—আদিম দিনের কুসংস্কার। বিশ্ব-মানবতার এতবড় পরম শত্রু আর নেই।

ভারতী বিবর্ণমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিল, দাদা, যেখানেই থাকো, তোমাকে আমি চিরদিন ভালবাসবো, কিন্তু এই যদি তোমার সত্যকার মত হয়, আজ থেকে তোমার আমার পথ একেবারে বিভিন্ন। একটা দিনও আমি ভাবিনি, এত বড় পাপের পথই তোমার পথের দাবীর পথ।

ডাক্তার মুচকিয়া একটুখানি হাসিলেন।

ভারতী কহিল, আমি নিশ্চয় জানি তোমার এই দয়াহীন নিষ্ঠুর ধ্বংসের পথে কিছুতেই কল্যাণ নেই। আমার স্নেহের পথ, করুণার পথ, ধর্ম্মবিশ্বাসের পথ,—সেই পথই আমার শ্রেয়ঃ, সেই পথই আমার সত্য।

তাই তো তোমাকে আমি টানতে চাইনি ভারতী। তোমার সম্বন্ধে ভুল করেছিলেন সুমিত্রা, কিন্তু আমার ভুল একটা দিনও হয়নি। তোমার পথেই তুমি চলগে। স্নেহের আয়োজন, করুণার প্রতিষ্ঠান জগতে অনেক খুঁজে পাবে, পাবে না শুধু পথের দাবী, পাবে না শুধু—বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের দৃষ্টি পলকের জন্য যেন জ্বলিয়াই নিবিয়া গেল। কণ্ঠস্বর স্থির, গম্ভীর। ভারতী ও সুমিত্রা উভয়েই বুঝিল, সব্যসাচীর এই শান্ত মুখশ্রী, এই সংযত, অচঞ্চল ভাষাই সবচেয়ে ভীষণ।

তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, তোমাকে ত বহুবার বলেচি, ভারতী, কল্যাণ আমার কাম্য নয়, আমার কাম্য স্বাধীনতা। প্রতাপ চিতোরকে যখন জনহীন অরণ্যে পরিণত করেছিলেন, তখন, সমস্ত মাড়বারে তার চেয়ে অকল্যাণের মূর্ত্তি আর কোথাও ছিল না—সে আজ কত শতাব্দের কথা—তবু সেই অকল্যাণই আজও সহস্র কল্যাণের চেয়ে বড় হয়ে আছে। কিন্তু থাক্ এ-সব নিষ্ফল তর্ক, যা আমার ব্রত তার কাছে কিছুই আমার অসত্য, অকল্যাণ নেই।

ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তর্ক এবং মতভেদ অনেকদিন ত অনেকবারই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এমনধারা নয়। আজ তাহার সমস্ত মন যেন বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

ডাক্তার ঘড়ির দিকে চাহিলেন, তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পরে সেই স্নিগ্ধ, সহজ হাসিমুখে কহিলেন, কিন্তু এদিকে যে নদীতে ফের জোয়ার এসে পড়বার সময় হয়ে এল ভারতী, ওঠো।

ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চল।

ডাক্তার খাবারের পুঁটুলি হাতে করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, সুমিত্রা, ব্রজেন্দ্র কোথায়?

সুমিত্রা উত্তর দিল না, নতমুখে মৌন হইয়া রহিল।

তোমাকে কি পৌঁছে দিয়ে আসবো?

সুমিত্রা ঘাড় নাড়িয়া শুধু বলিল, না।

ডাক্তার কি একটা পুনরায় বলিতে গেলেন, কিন্তু আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া শুধু কহিলেন, আচ্ছা। ভারতীকে কহিলেন, আর দেরি কোরো না দিদি, এস। এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুমিত্রা তেমনি নতমুখে বসিয়া রহিল। ভারতী তাঁহাকে নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া ডাক্তারের অনুসরণ করিল।

২৯

স্বপ্ন-চালিতের ন্যায় ভারতী নৌকায় আসিয়া বসিল এবং নদীপথের সমস্তক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল। রাত্রি বোধ হয় তৃতীয় প্রহর হইবে; আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রালোকে পৃথিবীর অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে, নৌকা আসিয়া সেই ঘাটে ভিড়িল। হাত ধরিয়া ভারতীকে নামাইয়া দিয়া সব্যসাচী নিজে নামিবার উপক্রম করিতে ভারতী বাধা দিয়া কহিল, আমাকে পৌঁছে দিতে হবে না দাদা, আমি আপনিই যেতে পারবো।

একলাটি ভয় করবে না?

করবে। কিন্তু তা' বলে তোমাকে আসতে হবে না।

সব্যসাচী কহিলেন, এইটুকু বই ত নয়, চল না তোমাকে খপ্‌ করে পৌঁছে দিয়ে আসি, বোন। এই বলিয়া তিনি নীচে সিঁড়ির উপরে পা বাড়াইতেই ভারতী হাত-জোড় করিয়া কহিল, রক্ষে কর দাদা, তুমি সঙ্গে গিয়ে ভয় আমার হাজার গুণে বাড়িয়ে দিয়ো না। তুমি বাসায় যাও।

বাস্তবিক, সঙ্গে যাওয়া যে অত্যন্ত বিপজ্জনক তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই ডাক্তার আর জিদ করিলেন না, কিন্তু ভারতী চলিয়া গেলেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই নদীকূলে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বাসায় আসিয়া ভারতী চাবি খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, আলো জ্বালিয়া চারিদিক সাবধানে নিরীক্ষণ করিল, তাহার পরে কোনমতে একটা শয্যা পাতিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। দেহ অবশ, মন অবসন্ন, তন্দ্রাতুর দুই চক্ষু শ্রান্তিতে মুদিয়া রহিল, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া সব্যসাচীর এই কথাই তাহার বারংবার মনে হইতে লাগিল যে, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সত্যোপলব্ধি বলিয়া কোন নিত্যবস্তু নাই। তাহার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে; যুগে যুগে, কালে কালে মানবের প্রয়োজনে তাহাকে নূতন হইয়া আসিতে হয়। অতীতের সত্যকে বর্ত্তমানে স্বীকার করিতেই হইবে এ বিশ্বাস ভ্রান্ত, এ ধারণা কুসংস্কার।

ভারতী মনে মনে বলিল, মানবের প্রয়োজনে, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজনে নূতন সত্য সৃষ্টি করিয়া তোলাই ভারতবাসীর সব চেয়ে বড় সত্য। অর্থাৎ ইহার কাছে কোন পন্থাই অসত্য নয়; কোন উপায়, কোন অভিসন্ধিই হেয় নয়। এই যে কারখানার কদাচারী কুলি-মজুরদের সৎপথে আনিবার উদ্যম, এই যে তাহাদের সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষা দিবার আয়োজন, এই যে তাহাদের নৈশ-বিদ্যালয়,—ইহার

সমস্ত লক্ষ্যই আর কিছু—এ কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া লইতে সব্যসাচীর কোন দ্বিধা, কোন লজ্জা নাই। পরাধীন দেশের মুক্তিযাত্রায় আবার পথের বাচ-বিচার কি? একদিন সব্যসাচী বলিয়াছিলেন, পরাধীন দেশে শাসক এবং শাসিতের নৈতিক বুদ্ধি যখন এক হইয়া দাঁড়ায় তাহার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর দেশের নাই, ভারতী! সেইদিন একথার তাৎপর্য্য সে বুঝিতে পারে নাই, আজ সে অর্থ তাহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। ইহার পরে কখন যে তাহার চৈতন্য নিদ্রায় ও তন্দ্রায় আবিষ্ট হইয়া পড়িল তাহার মনে নাই, কিন্তু মনে পড়িল নিদ্রার ঘোরে সে বার বার আবৃত্তি করিয়াছে, দাদা, অতিমানুষ তুমি, তোমার 'পরে ভক্তি-শ্রদ্ধা স্নেহ আমার চিরদিনই অচল হয়ে থাকবে, কিন্তু তোমার এ বিচার-বুদ্ধি আমি কোন-মতেই গ্রহণ করতে পারব না। জগদীশ্বর করুন, তোমার হাত দিয়েই যেন তিনি স্বদেশের মুক্তি দান করেন, কিন্তু অন্যায়কে কখনও ন্যায়ের মূর্ত্তি দিয়ে দাঁড় করিয়ো না। তুমি পরম পণ্ডিত, তোমার বুদ্ধির সীমা নেই, তর্কে তোমাকে এঁটে ওঠা যায় না,—তুমি সব পারো। বিদেশীর হাতে পরাধীনের লাঞ্ছনা যে কত, দুঃখের সমুদ্রে কত যে আমাদের প্রয়োজন, দেশের মেয়ে হয়ে সে কি আমি জানিনে দাদা? কিন্তু তাই বলে প্রয়োজনকেই যদি সকলের শীর্ষে স্থান দিয়ে দুর্ব্বলচিত্ত মানবের কাছে অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলে সৃষ্টি কর, এ দুঃখের আর কখনো তুমি অন্ত পাবে না।

পরদিন ভারতীর যখন ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা হইয়াছে। ছেলেরা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইয়া নীচে আসিয়া কপাট খুলিতেই জনকয়েক ছাত্র ও ছাত্রী বই-শ্লেট লইয়া ভিতরে ঢুকিল। তাহাদের বসিতে বলিয়া ভারতী কাপড় ছাড়িতে উপরে যাইতেছিল, হোটেলের মালিক সরকার ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, অপূর্ব্ববাবু তোমাকে কাল রাত থেকে খুঁজছেন দিদি।

ভারতী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাতে এসেছিলেন?

ঠাকুর মহাশয় কহিল, হাঁ। আজও সকাল থেকে বসে আছেন, গিয়ে পাঠিয়ে দিগে?

ভারতীর মুখ পলকের জন্য শুষ্ক হইয়া উঠিল, কহিল, আমাকে তাঁর কি দরকার?

ব্রাহ্মণ বলিল, সে তো জানিনে দিদি। বোধ হয় তাঁর মায়ের অসুখের সম্বন্ধেই কিছু বলতে চান।

ভারতী হঠাৎ রুষ্ট হইয়া উঠিল, বলিল, কোথায় তাঁর মায়ের কি অসুখ হয়েচে তার আমি কি কোরব?

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইল। অপূর্ব্ববাবুকে সে ভাল করিয়াই চিনিত, তিনি পদস্থ ব্যক্তি, আগেকার দিনে এই গৃহে তাঁহার যত্ন এবং সমাদরের ত্রুটি ছিল না, সময়ে ও অসময়ে তাহার অনেক মাল মশলা হোটেল হইতে তাহাকেই যোগাইয়া দিতে হইয়াছে। আজ অকস্মাৎ এই উত্তরের সে হেতু বুঝিল না। কহিল, আমি ত সে-সব কিছু জানিনে দিদি, গিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইতেই, ভারতী ডাকিয়া বলিল, সকালে আমার অনেক কাজ, ছেলে-মেয়েরা এসেচে তাদের পড়া বলে দিতে হবে, বলে দাওগে দেখা করবার এখন সময় হবে না।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, তবে দুপুরে কি বৈকালে আসতে বলে দেব?

ভারতী কহিল, না, আমার সময় নেই। এই বলিয়া এ প্রস্তাব এইখানেই বন্ধ করিয়া দিয়া দ্রুতপদে উপরে চলিয়া গেল।

স্নান সারিয়া প্রস্তুত হইয়া যখন সে ঘণ্টাখানেক পরে নীচে নামিয়া আসিল, তখন ছেলে-মেয়েতে ঘর ভরিয়া গিয়াছে ও তাহাদের বিদ্যালাভের ঐকান্তিক উদ্যমে সমস্ত পাড়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে দু'বেলাই পাঠশালা বসিত, এখন লোকের অভাবে নৈশ বিদ্যালয়টা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুমিত্রা নাই, ডাক্তার আত্মগোপন করিয়াছেন, নবতারা অন্যত্র গিয়াছে, শুধু নিজের বাসা বলিয়া সকালবেলাটার কাজ ভারতী চালাইয়া লইতেছিল। প্রাত্যহিক নিয়মে আজও সে পড়াইতে বসিল, কিন্তু কিছুতেই মনসংযোগ করিতে পারিল না। পড়া দেওয়া এবং লওয়া আজ শুধু নিষ্ফল নয়, তাহার আত্ম-বঞ্চনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তবুও কোনমতে এমনি করিয়া ঘণ্টা দুই কাটিলে পড়ুয়ারা যখন গৃহে চলিয়া গেল, তখন কি করিয়া যে সে আজিকার সমস্ত দিন কাটাইবে তাহা কোন মতেই ভাবিয়া পাইল না। আর সকল ভাবনার মাঝে মাঝে আসিয়া অবিশ্রাম বাধা দিয়া যাইতে লাগিল অপূর্ব্বর চিন্তা। তাহাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে অশোভনতা যতই থাক্, তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া যে ঢের মন্দ হইত এ বিষয়ে ভারতীর সন্দেহ ছিল না। কোন একটা অজুহাতে দেখা করিয়া সে পূর্ব্বেকার অস্বাভাবিক সম্বন্ধটাকে আরও বিকৃত করিয়া তুলিতে চায়, না হইলে মায়ের অসুখ যদি, তবে সে এখানে বসিয়া করিতেছে কি? মা তাহার, ভারতীর নয়। তাঁহারই সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদে শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া যাওয়া যে পুত্রের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য তাহা কি পরের সহিত বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে? তাহার মনে পড়িল রোগের সম্বন্ধে অপূর্ব্বর নিদারুণ ভয়। তাহার কোমল চিত্ত বাহির হইতে ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া যত ছট্‌ফট্ করুক, রুগ্নের সেবা করিবার তাহার না আছে শক্তি, না আছে সাহস। এ ভার তাহার প্রতি ন্যস্ত

করার মত সর্ব্বনাশ আর নাই। এ সমস্তই ভারতী জানিত,—সে ইহাও জানিত জননীকে অপূর্ব্ব কতখানি ভালবাসে। মায়ের জন্য করিতে পারে না পৃথিবীতে এমন তাহার কিছুই নাই। তাঁহারই কাছে না যাইতে পারার দুঃখ অপূর্ব্বর কত, ইহাই কল্পনা করিয়া একদিকে যেমন তাহার করুণার উদয় হইল, অন্যদিকে এই অসহ্য ভীরুতার ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। ভারতী মনে মনে বলিল, শুশ্রূষা করিতে পারে না বলিয়াই কি পীড়িতা মায়ের কাছে গিয়া কোন লাভ নাই? এই উপদেশ আমার কাছে অপূর্ব্ব প্রত্যাশা করে নাকি?

এমন করিয়া এই দিক দিয়াই তাহার চিন্তার ধারা অবিশ্রাম প্রবাহিত হইতে লাগিল। মাতার অসুখের সম্বন্ধে অপূর্ব্বর আর কিছু যে জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে, এ ছাড়া অন্য কিছু যে ঘটিতে পারে যাহা তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ রুদ্ধ করিয়াছে, উহার আভাস পর্য্যন্ত তাহার মাথায় প্রবেশ করিল না।

ক্ষুধার লেশমাত্র ছিল না বলিয়া আজ ভারতী রাঁধিবার চেষ্টা করিল না। বেলা যখন তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া তাহার দ্বারে লাগিল। ভারতী উপরের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বিস্ময় ও শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মোট ঘাট গাড়ির ছাদে চাপাইয়া শশী আসিয়া উপস্থিত। গত রাত্রের হাসি-তামাসাকে জগতে যে কোন মানুষই এমন বাস্তবে পরিণত করিয়া তুলিতে পারে, ভারতী বোধ হয় তাহা কল্পনাও করিতে পারিত না। কিন্তু ইহার কাছে অভাবনীয় কিছু নাই। রহস্য একেবারে মূর্ত্তিমান সত্যরূপে সশরীরে আসিয়া হাজির হইল।

ভারতী দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গিয়া কহিল, একি ব্যাপার শশীবাবু?

শশী স্মিতমুখে কহিল, বাসা তুলে দিয়ে এলাম। এবং তৎক্ষণাৎ গাড়োয়ানকে হুকুম করিয়া দিল, সমান সব কুছ্ উপরমে লে যাও—

ভারতী বিরক্তি দমন করিয়া কহিল, উপরে জায়গা কোথায় শশীবাবু?

শশী কহিল, আচ্ছা বেশ, তাহলে নীচের ঘরেই রাখুক।

ভারতী বলিল, নীচের ঘরে পাঠশালা, সেখানেও সুবিধে হবে না।

শশী চিন্তিত হইয়া উঠিল। ভারতী তাহাকে ভরসা দিয়া কহিল, এক কাজ করা যাক শশীবাবু। হোটেলে ডাক্তারের ঘরটা ত আজও খালি পড়ে আছে, আপনি সেখানেই বেশ থাকবেন। খাওয়া-দাওয়ারও কষ্ট হবে না, চলুন।

কিন্তু ঘরের ভাড়া লাগবে ত?

ভারতী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, না, তাও লাগবে না, ছয়মাসের ভাড়া দাদা দিয়ে গেছেন।

শশী খুশী না হইলেও এই ব্যবস্থায় রাজি হইল। সমস্ত জিনিসপত্র সমেত দাদা-ঠাকুরের হোটেলের মধ্যে কবিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতী যখন ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি হইয়াছে। আজ সকল দিক দিয়া তাহার শ্রান্তি ও চিন্তার আর অবধি ছিল না, পাছে শশী কিংবা আর কেহ আসিয়া তাহার নিঃসঙ্গ স্তব্ধতায় বিঘ্ন ঘটায়, এই আশঙ্কায় সে নীচের ও উপরের সমস্ত দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া দিয়া নিজের শোবার ঘরে প্রবেশ করিল।

অভ্যাস মত পরদিন প্রত্যুষে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনাহারের দুর্ব্বলতায় সমস্ত শরীর এমনি অবসন্ন যে শয্যা ত্যাগ করিতেও ক্লেশ বোধ হইল। তৃষ্ণায় বুকের মধ্যেটা শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং দেহধারণের এ দিকটায় অবহেলা করিলে আর চলিবে না, তাহা সে বুঝিল।

খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও যে ভারতী খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সত্যই বাচ-বিচার করিয়া চলিত, এ কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। তথাপি, মনে হয় সে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হইতেও পারে নাই। যে ব্যক্তিকে তাহার জননী বিবাহ করিয়াছিলেন, সে অত্যন্ত অনাচারী ছিল, তাহার সহিত একত্রে বসিয়াই ভারতীকে ভোজন করিতে হইত, তাই বলিয়া পূর্ব্বেকার দিনের অখাদ্য বস্তু কোনদিনও তাহার খাদ্য হইয়া ওঠে নাই। ছোঁওয়া-ছুঁইর বিড়ম্বনা তাহার ছিল না, কিন্তু যেখানে-সেখানে যাহার-তাহার হাতে খাইতেও তাহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইত। মায়ের মৃত্যুর পর হইতে সে খরচের দোহাই দিয়া বরাবর নিজে রাঁধিয়াই খাইত। শুধু অসুস্থ হইয়া পড়িলে বা কাজের ভিড়ে অতিশয় ক্লান্তি বা একান্ত সময়াভাব ঘটিলেই, কদাচিৎ কখনও ঠাকুর মহাশয়ের হোটেল হইতে সাগু, বার্লি, রুটি আনাইয়া খাইত। বিছানা হইতে উঠিয়া সে হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় প্রস্তুত হইল, কিন্তু রান্না করিয়া লইবার মত জোর বা প্রবৃত্তি আজ তাহার ছিল না, তাই হোটেল হইতে রুটি ও কিছু তরকারী তৈরী করিয়া দিবার জন্য ঠাকুর মহাশয়কে খবর পাঠাইল। সোমবারে তাহাদের পাঠশালা বন্ধ থাকিত বলিয়া আজ এ দিকের পরিশ্রম তাহার ছিল না।

অনেক বেলায় ঝি খাবারের থালা হাতে করিয়া আনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিল, বড্ড বেলা হয়ে গেল দিদিমণি—

ভারতী তাহার নিজের থালা ও বাটি আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিল। হিন্দু হোটেলের শুচিতা রক্ষা করিয়া ঝি দূর হইতে সেই পাত্রে রুটি ও তরকারী এবং বাটিতে ডাল ঢালিয়া দিতে দিতে কহিল, নাও বোসো, যা পারো দুটো মুখে দাও।

ভারতী তাহার মুখের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। ঝির

বক্তব্য তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতে লাগিল, ওখান থেকে ফিরে এসে শুনি তোমার অসুখ। একলা হাতে তখন থেকে ধড়ফড় করে মরচি দিদিমণি, কিন্তু এমন কেউ নেই যে দুখানা রুটি বেলে দেয়। আর দেরি ক'রো না, বোসো।

ভারতী মৃদুকণ্ঠে কহিল, তুমি যাও ঝি, আমি বসচি।

ঝি কহিল, যাই। চাকরটা ত সঙ্গে গেল, একলা সমস্ত ধোয়া-মাজা,—যাহোক, ফিরে এসে কুড়িটি টাকা আমার হাতে দিয়ে বাবু কেঁদে ফেলে বললেন, ঝি, শেষ সময়ে তুমি যা করলে মার মেয়ে কাছে থাকলে এমন করতে পারতো না। তিনিও যত কাঁদেন আমিও তত কাঁদি, দিদিমণি! আহা, কি কষ্ট! বিদেশ বিভূঁই কেউ নেই আপনার লোক কাছে,—সমুদ্দুর পথ, টেলিগ্রাফ করলেই ত আর বউ ব্যাটা উড়ে আসতে পারে না—তাদেরই বা দোষ কি!

ভারতীর বুকের ভিতরটা উদ্বেগ ও অজানা আশঙ্কায় হিম হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া শুধু স্থির হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ঝি বলিতে লাগিল, ঠাকুরমশায় ডেকে বললেন, বাবুর মায়ের বড় ব্যামো, তোমাকে যেতে হবে ক্ষান্ত। আমি আর না বলতে পারলুম মা। একে নিমোনিয়া রুগী, তাতে ধর্ম্মশালার ভীড়, জানালা কবাট সব ভাঙা, একটাও বন্ধ হয় না—কি আতন্তর! মারা গেলেন বেলা পাঁচটার সময়, কিন্তু মেসের বাবুদের সব খবর দিতে, ডাকতে হাঁকতে মড়া উঠলো সেই দুটো আড়াইটে রাতে। ফিরে আসতে তাঁদের বেলা হল,—একলাটি সমস্ত ধোয়া মোছা—

এইবার ভারতীর বুঝিতে আর কিছু বাকী রহিল না। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, অপূর্ব্ববাবুর মা মারা গেলেন বুঝি?

ঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ দিদিমণি, তাঁর বর্ম্মায় যেন মাটি কেনা ছিল। সেই যে কথায় কি বলে, না ভাড়া করে যায় সেখানে—এ ঠিক তাই। অপূর্ব্ববাবুও এখান থেকে বেরিয়েচেন, তিনিও ব্যাটার সঙ্গে ঝগড়া করে সেখানে জাহাজে উঠেচেন, সঙ্গে কেবল একজন চাকর। জাহাজেই জ্বর, ধর্ম্মশালায় নেমে একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য। বাড়িতে পা দিয়েই বাবু ফিরতি জাহাজে ফিরে এসে দেখেন মা যায়-যায়। গেলেনও তাই,—কিন্তু দাঁড়িয়ে একদণ্ড কথা কবার জো নেই দিদিমণি, এখনি সবাই আবার বার হবে। আসবো তখন সন্ধ্যাবেলায়,—এই বলিয়া সে গল্প করার প্রলোভন সম্বরণ করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

রুটির থালা তেমনি পড়িয়া রহিল, প্রথমে দুই চক্ষু তাহার ঝাপসা হইয়া উঠিল, তাহার পরে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা গণ্ড বাহিয়া ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে

লাগিল। অপূর্ব্বর মাকে সে দেখেও নাই এবং স্বামী পুত্র লইয়া এ জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পাইয়াছেন—এ ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছু জানিতও না, কিন্তু কতদিন নিজের নিরালা ঘরের মধ্যে সে রাত্রি জাগিয়া এই বর্ষীয়সী বিধবা রমণীর সম্বন্ধে কত কল্পনাই না করিয়াছে! সুখের মাঝে নয় দুঃখের দিনে কখনো যদি দেখা হয় যখন সে ছাড়া আর কেহ তাহার কাছে নাই, তখন ক্রীশ্চান বলিয়া কেমন করিয়া তাহাকে তিনি দূরে সরাইয়া দিতে পারেন—এ কথা জানিবার তাহার ভারি সাধ ছিল। বড় সাধ ছিল দুর্দ্দিনের সেই অগ্নি পরীক্ষায় আপন-পর সমস্যার সে শেষ সমাধান করিয়া লইবে। ধর্ম্মমতভেদই এ-জগতে মানুষের চরম বিচ্ছেদ কি না, এই সত্য যাচাই করিবার সেই পরম দুঃসময়ই ভাগ্যে তাহার আসিয়াছিল, কিন্তু সে গ্রহণ করিতে পারে নাই। এ রহস্য এ জীবনে অমীমাংসিতই রহিয়া গেল।

আর অপূর্ব্ব! সে যে আজ কত বড় নিঃসহায়, কতখানি একা, ভারতীর অপেক্ষা তাহা কে বেশি জানে? হয়ত, মাতার একান্ত মনের আশীর্ব্বাদই তাহাকে কবচের মত অদ্যাবধি রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহা অন্তর্হিত হইল। ভারতী মনে মনে বলিল, এ সকল তাহার আকাশ-কুসুম, তাহার নিগূঢ় হৃদয়ের স্বপ্ন রচনা বই আর কিছু নয়, তবু যে সেই স্বপ্ন তাহার নির্দ্দেশহীন ভবিষ্যতের কতখানি স্নিগ্ধ-শ্যাম শোভায় অপরূপ করিয়া রাখিত সে ছাড়া এ কথাই বা আর কে জানে? কে জানে তাহার চেয়ে বেশি ঘরে-বাহিরে অপূর্ব্ব আজ কিরূপ নিরুপায়, কতখানি সঙ্গিহীন!

এ প্রবাসভূমে হয়ত অপূর্ব্বর কর্ম্ম নাই, হয়ত, আত্মীয়-স্বজন তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, ভীরু, লোভী, নীচাশয় বলিয়া বন্ধুজন মধ্যে সে নিন্দিত,—আর সকল দুঃখের বড় দুঃখ মা আজ তাহার লোকান্তরিত। ভারতীর মনে হইল, পরিচিত কাহারও কাছে অপূর্ব্ব লজ্জায় যাইতে পারে নাই বলিয়াই বোধ হয় সকল লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া সে বারবার তাহারই কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল। উদ্যমের পটুতা, ব্যবস্থার শৃঙ্খলা, কার্য্যের তৎপরতা কিছুই তাহার নাই, অথচ, অতিথিশালার অসহ্য জনতা ও কোলাহল এবং সর্ব্ববিধ অভাব ও অসুবিধার মধ্যে সেই মায়ের মৃত্যু যখন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, তখন একাকী কি করিয়া যে তাহার মুহূর্ত্তগুলি কাটিয়াছে, এই কথা কল্পনা করিয়া চোখের জল তাহার যেন থামিতে চাহিল না। চোখ মুছিতে মুছিতে যে কথা তাহার বহুবার মনে হইয়াছে, সেই কথাই স্মরণ হইল, যেন সকল দুঃখের সূত্রপাত অপূর্ব্বর তাহার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম লইয়াছে। না হইল পিতা ও অগ্রজের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিকূলে যখন সে মাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া শতেক দুঃখ সহিয়াছে, তখন স্বার্থবুদ্ধি তাহাকে সত্য-পথভ্রষ্ট করে নাই

কেন? দুর্ব্বলতা তখন ছিল কোথায়? স্বধর্ম্মাচরণে আস্থা ও প্রগাঢ় নিষ্ঠা সমস্তই যাহার মায়ের মুখ চাহিয়া, সে কি সত্যই এমনি ক্ষুদ্রাশয়? তাহার পূজা-অর্চ্চনা, তাহার গঙ্গাস্নান, তাহার টিকি রাখা,—তাহার সকল কার্য্য, সকল অনুষ্ঠান—হোক না ভ্রান্ত, হোক না মিথ্যা, তবু ত সে সকল বিদ্রূপ, সকল আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া অটল হইয়া ছিল! একি অপূর্ব্বর অস্থিরচিত্ততার এত বড়ই নিদর্শন? আজ তবে সেই লোক বর্ম্মায় আসিয়া এমন হইয়া গেল কিরূপে? এবং এত কাল এতখানি দুর্ব্বলতা তাহার লুকানো ছিল কোনখানে? সব্যসাচীর কাছে উত্তর জানিতে গিয়া কতদিন এই প্রশ্নই তাহার মুখে বাধিয়া গিয়াছে। শুধু ত কৌতূহলবশেই নয়, হৃদয়ের ব্যথার মধ্যে দিয়াই সে কতবার ভাবিয়াছে, এ-সংসারে যাহা কিছু জানা যায়, দাদা ত সমস্তই জানেন, তবে এ সমস্যারও উচ্ছেদ তিনিই করিয়া দিবেন। কেবল সঙ্কোচ ও সরমেই সে অপূর্ব্বর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারে নাই।

ভাবিতে ভাবিতে সহসা নূতন প্রশ্ন তাহার মনে আসিল। কর্ম্মদোষে যখন সবাই অপূর্ব্বর প্রতি বিরূপ তখনও শুদ্ধমাত্র যে লোকটির সহানুভূতি হইতে সে বঞ্চিত হয় নাই, সে সব্যসাচী। কিন্তু, কিসের জন্য? শুধু কি কেবল ভগিনী বলিয়া তাহারই সমবেদনায়? তাঁহার স্নেহ পাইবার মত নিজস্ব কি অপূর্ব্বর কিছুই ছিল না? সত্য সত্যই কি ভারতী এত ক্ষুদ্রেই এত বৃহৎ ভালবাসা সমর্পণ করিয়া বসিয়াছে! সে দুর্দিনে সতর্ক করিবার মত পুঁজি কি কিছুই তাহার ছিল না? হৃদয় কি তাহার এমনি কাঙাল এমনি দেউলিয়া হইয়াই ছিল!

এমনি করিয়া একভাবে বসিয়া ঘণ্টা দুই সময় যখন কোথা দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, ঝি ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন হোটেলে জরুরি কাজের মধ্যে সমস্ত আলোচনা নিঃশেষ করিয়া যাইবার তাহার অবসর ছিল না, এখন একটুখানি ছুটি পাইয়াছে। অপূর্ব্ব ও ভারতীর মাঝখানে যে একটি রহস্যময় মধুর সম্বন্ধ আছে, তাহা আভাসে-ইঙ্গিতে অনেকেই জানিত, ঝিরও অবিদিত ছিল না। তবে, সহসা এমন কি ঘটিল যাহাতে অপূর্ব্বর এতবড় বিপদের দিনেও ভারতী তাহার ছায়া স্পর্শ করিল না? স্ত্রীলোক হইয়া এতবড় সংবাদটা না জানা পর্য্যন্ত ক্ষান্তর মুখে অন্নজল রুচিতেছিল না। তাই সে কোন একটা অছিলায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে অবাক হইল, পরে কহিল, কিছুই তো ছোঁওনি দেখচি।

ভারতী লজ্জা পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, না।

ঝি মাথা নাড়িয়া, কণ্ঠস্বর করুণ করিয়া কহিল, খাওয়া যায় না, দিদিমণি, যে কাণ্ড চোখে দেখে এলুম। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখবে চল, ভাতের থালা আমার যেমন তেমনি পড়ে রয়েচে,—মুখে দিয়েচি কি না-দিয়েচি।

ইহার অবাঞ্ছিত সমবেদনায় ভারতীর সঙ্কোচের অবধি রহিল না। জোর করিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাউকে দিয়ে একখানা গাড়ি ডাকিয়ে দাও না ঝি!

যাবে বুঝি?

হাঁ, একবার দেখি গিয়ে কি হল।

কান্ত বলিল, আজ সকালে ঠাকুর মশাইকে কি সাধ্যি সাধনা। আমি শুনে বলি সে কি কথা! মানুষের আপদ-বিপদে করব না তো আর করব কবে? হাতের কাজ পড়ে রইল. যেমন ছিলুম, তেমনি বেরিয়ে পড়লুম। ভাগ্যি তবু—

সেই সমস্ত পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় ভারতী ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বাধা-দিয়া কহিল, তুমি অসময়ে য়া করেচ তার তুলনা নেই। কিন্তু আর দেরি কোরো না ঝি, গাড়ি একখানা আনিয়ে দাও। আমার যেতে হলে একটু বেলা-বেলি যাওয়াই ভাল। ঘরের কাজ-কর্ম্ম ততক্ষণ সেরে রাখি।

ঝি লোক মন্দ নয়। সে গাড়ি ডাকিতে গেল এবং দুঃসময়ে সাহায্য করিবার আগ্রহে এমন কথাও জানাইল যে ঘরের কাজ-কর্ম্ম আজ না হয় সে-ই করিয়া দিবে। এমন কি খাবার জিনিসগুলো যখন ছোঁয়া যায় নাই, তখন তাহাও পরিষ্কার করিয়া দিতে তাহার বাধা নাই। শেষে কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিলেই চলিবে। বিদেশ বিভুঁয়ে এমন করিতেই হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিনিট-পনেরো পরে গাড়ি আসিয়া পৌছিলে ভারতী সঙ্গে কিছু টাকা লইয়া ঘরে-দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পান্থশালায় আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখনও বেলা আছে। দ্বিতলের একখানা উত্তর ধারের ঘর দেখাইয়া দিয়া হিন্দুস্থানী দরওয়ান জানাইয়া দিল যে, বাঙালীবাবু ভিতরে আছেন; এবং বাঙালী রমণীর কাছে বাঙলা ভাষাতেই প্রকাশ করিয়া জানাইল যে, যেহেতু তিনদিনের বেশি থাকার রুল নাই, অথচ ছয় দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন ম্যানিজার সাবের নুটীশ হইলে তাহার নোকরিতে বহুত গুলমাল হইয়া যাইবে।

ভারতী ইঙ্গিত বুঝিল। অঞ্চল খুলিয়া গুটি-দুই টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া তাহারই নির্দ্দেশমত উপরের ঘরে আসিয়া দেখিল সমস্ত মেঝেটা তখনও জলে থৈ থৈ করিতেছে, জিনিস-পত্র চারিদিকে ছড়ানো এবং তাহারই একধারে একখানা কম্বলের উপরে অপূর্ব্ব উপুড় হইয়া পড়িয়া। নূতন উত্তরীয় বস্ত্রখানা মুখের উপর চাপা দেওয়া,—সে জাগিয়া আছে কিংবা ঘুমাইতেছে তাহা বুঝা গেল না। ভারতী শুনিয়াছিল সঙ্গে চাকর আসিয়াছে. কিন্তু কাছাকাছি কোথাও সে ছিল না, কারণ,

অপরিচিত তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কেহ নিষেধ করিল না। মিনিট পাঁচ-ছয় স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ভারতী ধীরে ধীরে ডাকিল, অপূর্ব্ববাবু!

অপূর্ব্ব উঠিয়া বসিয়া তাহার মুখের প্রতি একবার চাহিল, তারপরে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে স্থিরভাবে থাকিয়া চোখ তুলিয়া সোজা হইয়া বসিল। সদ্য মাতৃ বিয়োগের সীমাহীন বেদনা তাহার মুখের উপরে জমাট হইয়া বসিয়াছে, কিন্তু আবেগের চাঞ্চল্য নেই,—শোকাচ্ছন্ন গভীর দৃষ্টির সম্মুখে এ পৃথিবীর সমস্ত কিছুই যেন তাহার একেবারে মিথ্যা হইয়া গেছে। মাতার পক্ষপুটচ্ছায়া-বাসী যে অপূর্ব্বকে একদিন সে চিনিয়াছিল, এ সে মানুষ নয়। আজ তাহাকে মুখোমুখি দেখিয়া ভারতী বিস্ময়ে এমনি অবাক হইয়া রহিল যে, কোন্ কথা বলিবে, কি বলিয়া ডাকিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু ইহার মীমাংসা করিয়া দিল অপূর্ব্ব নিজে। সে-ই কথা কহিল, বলিল, এখানে বসবার কিছু নেই ভারতী, সমস্তই ভিজে, তুমি বরঞ্চ ঐ তোরঙ্গটার উপরে বোস।

ভারতী উত্তর দিল না, কপাটের চৌকাঠ ধরিয়া নতনেত্রে যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি স্থির হইয়া রহিল। তাহার পরে বহুক্ষণ অবধি দু'জনের কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না।

হিন্দুস্থানী চাকরটা তেল কিনিতে দোকানে গিয়াছিল, সে ঘরে ঢুকিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল, পরে হারিকেন লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

অপূর্ব্ব কহিল, ভারতী বোস।

ভারতী বলিল, বেলা নেই, বসলে সন্ধ্যে হয়ে যাবে যে!

এখ্খুনি যাবে? একটুও বসতে পারবে না?

ভারতী ধীরে ধীরে গিয়া সেই তোরঙ্গটার উপরে বসিয়া এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, মা যে এখানে এসেছিলেন আমি জানতাম না। তাঁকে দেখিনি, কিন্তু বুকের ভেতরটা আমার পুড়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে তুমি আমাকে আর দুঃখ দিয়ো না। বলিতে বলিতে চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িল।

অপূর্ব্ব স্তব্ধ হইয়া রহিল। ভারতী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, সময় হয়েছিল, মা স্বর্গে গেছেন। প্রথমে মনে হয়েছিল, এজন্মে তোমাকে আর আমি মুখ দেখাতে পারবো না, কিন্তু এমন করে তোমাকে ফেলে রেখেই বা আমি থাকবো কি করে? সঙ্গে গাড়ি আছে, ওঠো, আমার বাসায় চল। আবার তাহার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল।

ভারতীর ভয় ছিল অপূর্ব্ব হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ভাঙিয়া পড়িবে, কিন্তু তাহার শুষ্ক চক্ষে জলের আভাস পর্য্যন্ত দেখা দিল না, শান্তস্বরে কহিল, অশৌচের অনেক

হাঙ্গামা ভারতী, ওখানে সুবিধে হবে না। তাছাড়া এই শনিবারের স্টিমারেই আমি বাড়ি যাবো।

ভারতী বলিল, শনিবারের এখনো চার দিন দেরি। মায়ের মৃত্যুর পরে হাঙ্গামা যে একটু থাকে সে আমি জানি, কিন্তু সইতে পারবো না আমি, আর পারবে এই অতিথিশালার লোকে? চল।

অপূর্ব্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ভারতী কহিল, না বললেই যদি এই অবস্থায় ফেলে রেখে তোমাকে যেতে পারতাম, আমি আসতাম না, অপূর্ব্ববাবু। এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, এতদিনের পরে তোমাকে ডেকে বলবার, লজ্জা করে বলবার, আর আমার কিছুই নেই। মায়ের শেষ কাজ বাকী—শনিবারের জাহাজে তোমাকে বাড়ি ফিরে যেতেই হবে এবং তার পরে যে কি হবে সেও আমি জানি। তোমার কোন ব্যবস্থাতেই আমি বাধা দেব না, কিন্তু এ সময়ে এ ক'টা দিনও যদি তোমাকে চোখের ওপর না রাখতে পারি, ত তোমারি দিব্বি করে বলচি, বাসায় ফিরে গিয়ে আমি বিষ খেয়ে মরবো। মায়ের শোক তাতে বাড়বে বই কমবে না, অপূর্ব্ববাবু।

অপূর্ব্ব অধোমুখে মিনিট-দুই চুপ করিয়া রহিল, তাহার পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চাকরটাকে তাহলে ডাকো, জিনিস-পত্রগুলো সব বেঁধে ফেলুক।

জিনিস-পত্র সামান্যই ছিল, গুছাইয়া বাঁধিয়া গাড়িতে তুলিতে আধঘণ্টার অধিক সময় লাগিল না। পথের মধ্যে ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা আসতে পারলেন না?

অপূর্ব্ব কহিল, না. তার ছুটি হোলো না।

এখানকার চাকরি কি ছেড়ে দিয়েচ?

হাঁ, সে এক রকম ছেড়েই দেওয়া।

মার কাজ-কর্ম্ম চুকে গেলে কি এখন বাড়িতেই থাকবে?

অপূর্ব্ব কহিল, না। মা নেই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা দিনও ও-বাড়িতে আমি থাকতে পারবো না। শুনিয়া ভারতীর মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

৩০

পরিত্যক্ত, পতনোন্মুখ, ঘন বনাচ্ছন্ন যে জীর্ণমঠের মধ্যে একদিন অপূর্ব্বর অপরাধের বিচার হইয়াছিল, আজ আবার সেই কক্ষেই পথের দাবী আহূত হইয়াছে। সে দিনের সেই অবরুদ্ধ গৃহতলে যে দুর্জ্জয় ক্রোধ ও নির্ম্মম প্রতিহিংসার অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়াছিল, আজ তাহার স্ফুলিঙ্গমাত্র নাই। সে বাদী নাই, প্রতিবাদী নাই, কাহারো বিরুদ্ধে কাহারো নালিশ নাই, আজ শঙ্কা ও নৈরাশ্যের দুঃসহ বেদনায় সমস্ত সভা নিষ্প্রভ, বিষণ্ন, ম্রিয়মাণ। ভারতীর চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু—সুমিত্রা অধোমুখে নীরব, স্থির। তলওয়ারকর ধরা পড়িয়াছে; রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত দেহে সে জেলের হাসপাতালে,—আজও তাহার ভাল করিয়া জ্ঞান হয় নাই। তাহার স্ত্রী শিশুকন্যা লইয়া পথে পথে ঘুরিয়া অনেক দুঃখে কাল সন্ধ্যায় কে একজন মারহাট্টি ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছে। সুমিত্রা সন্ধান লইয়া তাহার পিতৃগৃহে আজ তার করিয়াছে, কিন্তু এখনও জবাব আসে নাই।

ভারতী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, তলওয়ারকরবাবুর কি হবে দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, হাসপাতাল থেকে যদি বেঁচে ওঠে জেল খাটবে।

ভারতী মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, বলিল, না বাঁচতেও ত পারেন?

ডাক্তার কহিলেন, অন্ততঃ অসম্ভব নয়। তারপরে সুদীর্ঘ কারাবাস।

ভারতী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছোট্টমেয়ে,—তাদের কি হবে?

সুমিত্রা এ কথার জবাব দিয়া কহিল, হয়ত দেশ থেকে তাঁর বাপ এসে নিয়ে যাবেন।

ভারতী বলিল, হয়ত! ধরুন, যদি কেউ না আসেন? যদি কেউ না থাকে?

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, বিচিত্র নয়। সে ক্ষেত্রে মানুষ অকস্মাৎ মারা গেলে তার নিরুপায় বিধবার যে দশা হয়, এদেরও তাই হবে। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আমরা গৃহী নই, আমাদের ধনসম্পদ নেই, বিদেশীর আইনে নিজের জন্মভূমিতে আমাদের মাথা রাখবার ঠাঁই নেই,—বন্য পশুর মত আমরা বনে লুকিয়ে বেড়াই,—সংসারীর দুঃখ মোচন করবার ত আমাদের শক্তি নেই ভারতী।

ভারতী ব্যথিত হইয়া কহিল, তোমাদের নেই, কিন্তু যাঁদের এসব আছে,—আমাদের এ দেশের লোকে কি এঁদের দুঃখ দূর করতে পারে না দাদা?

ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু করবে কেন দিদি? তারা ত এ কাজ

করতে আমাদের বলে না! বরঞ্চ আমরা তাদের স্বস্তির বাধা, আরামের অন্তরায়,—আমাদের তারা সোনার চক্ষে দেখে না। ইংরাজ যখন দম্ভভরে প্রচার করে, ভারত-বর্ষীয়েরা স্বাধীনতা চায় না, পরাধীনতাই কামনা করে, তখন ত তারা নেহাৎ মিথ্যে বলে না! আর যুগ-যুগান্তের অন্ধকারের মধ্যে বসে দুচোখের দৃষ্টি যাদের বন্ধ হয়ে গেছে তাদের বিরুদ্ধেই বা হা-হুতাশ করবার কী আছে ভারতী!

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, বিদেশী রাজার জেলের মধ্যে যদি আজ তলওয়ারকরকে মরতেই হয় পরলোকে দাঁড়িয়ে স্ত্রী-কন্যাকে পথে পথে ভিক্ষে করতে দেখে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়বে, কিন্তু নিশ্চয় জেনো দেশের লোকের বিরুদ্ধে সে ভগবানের কাছেও কখনো একটা নালিশ জানাবে না। আমি তাকে চিনি,—লজ্জায় তার মুখ ফুটবে না।

ভারতী অস্ফুটে কহিল, উঃ!

কৃষ্ণ আইয়ার বাঙলা বলিতে পারিত না, কিন্তু মাঝে মাঝে বুঝিত; সে ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, ইয়েস, ট্রু!

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ, এই ত সত্য! এই ত বিপ্লবীর চরম শিক্ষা! কান্না কার তরে? নালিশ কার কাছে? দাদার যদি ফাঁসি হয়েচে শোনো, জেনো বিদেশীর হুকুমে সে ফাঁসি তার দেশের লোকেই তার গলায় বেঁধে দিয়েচে! দেবেই ত! কসাইখানা থেকে গরুর মাংস গরুতেই ত বয়ে নিয়ে আসে! তার আবার নালিশ কিসের বোন?

ভারতী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল দাদা, এই ত তোমাদের পরিণাম!

ডাক্তারের চোখ জ্বলিয়া উঠিল, কহিলেন, একি তুচ্ছ পরিণাম ভারতী? জানি, দেশের লোকে এর দাম বুঝবে না, হয়ত উপহাসও করবে, কিন্তু যাকে এই ঋণ এক-দিন কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিতে হবে, হাসি তার মুখে কিন্তু সহজে যোগাবে না। এই বলিয়া সহসা নিজেই হাসিয়া কহিলেন, ভারতী, নিজে ক্রীশ্চান হয়ে তুমি তোমার ধর্ম্মের গোড়ার কথাটাই ভুলে গেলে? যীশুখৃষ্টের রক্তপাত কি সংসারে ব্যর্থই হয়েচে ভাবো?

সকলেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, ডাক্তার পুনশ্চ কহিলেন, তোমরা ত জানো বৃথা নরহত্যার আমি কোনদিন পক্ষপাতী নই, ও আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। নিজের হাতে আমি একটা পিঁপড়ে মারতেও পারিনে। কিন্তু প্রয়োজন হলে,—কি বল সুমিত্রা?

সুমিত্রা সায় দিয়া বলিল, সে আমি জানি, নিজের চোখেই ত আমি বার-দুই দেখেচি।

ডাক্তার কহিলেন, দূর থেকে এসে যারা জন্মভূমি আমার অধিকার করেচে, আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্য্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল,—সমস্ত যে কেড়ে নিলে, তারই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আর রইল না আমার ? এ ধর্ম্মবুদ্ধি তুমি কোথায় পেলে ভারতী ? ছি !

কিন্তু আজ ভারতী অভিভূত হইল না, সে প্রবলবেগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, না দাদা, আজকে আমাকে কিছুতেই লজ্জা দিতে পারবে না। এসব পুরানো কথা,—হিংসার পথে যারাই প্রবৃত্তি দেয়, তারাই এমনি করে বলে ! এই শেষ কথা নয়, জগতে এর চেয়েও বড়, ঢের কথা আছে।

ডাক্তার কহিলেন, কি আছে বল শুনি ?

ভারতী উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিয়া উঠিল, আমি জানিনে, কিন্তু তুমি জানো। যে বিদ্বেষ তোমার সত্যবুদ্ধিকে এমন একান্তভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেচে, একবার তাকে ত্যাগ করে শান্তির পথে ফিরে এসো, তোমার জ্ঞান, তোমার প্রতিভার কাছে পরাস্ত মানবে না এমন সমস্যা পৃথিবীতে নেই। জোরের বিরুদ্ধে জোর, হিংসার বদলে হিংসা, অত্যাচারের পরিবর্ত্তে অত্যাচার এ তো বর্ব্বরতার দিন থেকেই চলে আসচে। এর চেয়ে মহৎ কিছু কি বলা যায় না ?

কে বলবে ?

ভারতী অকুণ্ঠিতস্বরে কহিল, তুমি।

ঐটি আমাকে মাপ করতে হবে ভাই। সাহেবদের বুটের তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে শান্তির বাণী আমার মুখ দিয়ে ঠিক বার হবে না, –হয়ত আটকাবে। বরঞ্চ ও-ভার শশীকে দাও, তোমার খাতিরে ও পারবে ! এই বলিয়া ডাক্তার হাসিলেন।

ভারতী ক্ষুন্ন হইয়া কহিল, তুমি ঠাট্টা করলে বটে কিন্তু যাঁদের 'পরে তোমার এত বিদ্বেষ, সেই ইংরেজ মিশনারীদেরই অনেকের কাছে বলে দেখেচি তাঁরা সত্যই আনন্দ লাভ করেন।

ডাক্তার স্বীকার করিয়া কহিলেন, অত্যন্ত স্বাভাবিক ভারতী। সুন্দরবনের মধ্যে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে শান্তির বাণী প্রচার করলে বাঘ ভালুকের খুশী হবারই কথা। তাঁরা সাধু ব্যক্তি।

ভারতী এই বিদ্রূপে কান দিল না, কহিতে লাগিল, আজ ভারতের যত দুর্ভাগ্যই আসুক, চিরদিন এমন ছিল না। একদিন ভারতবাসী সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। সে দিন হিংসা বিদ্বেষ নয়, ধর্ম্ম এবং শান্তিমন্ত্রই এই ভারতবর্ষ থেকে দিকে দিকে প্রচারিত হয়েছিল। আমার বিশ্বাস সেদিন আবার আমাদের ফিরে আসবে।

বহুক্ষণ হইতেই ভারতীর বাক্যে শশীর কবি-চিত্ত শ্রদ্ধায় ও অনুরাগে বিগলিত হইয়া আসিতেছিল। সে গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ভারতীকে আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি ডাক্তার। আমারও বিশ্বাস সে সভ্যতা ভারতের ফিরে আসবেই আসবে।

ডাক্তার উভয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তোমরা ভারতের কোন যুগের সভ্যতার ইঙ্গিত কোরচ আমি জানিনে, কিন্তু সভ্যতার একটা সীমা আছে। ধর্ম্ম অহিংসা ও শান্তির নেশায় তাকে অতিক্রম করে গেলে মরণ আসে। কোন দেবতাই তাকে রক্ষা করতে পারে না। ভারতবর্ষ হূনদের কাছে কবে পরাজয় স্বীকার করেছিল জানো? যখন তারা ভারতবাসী শিশুদের মশালের মত করে জালাতে আরম্ভ করেছিল, নারীর পিঠের চামড়া দিয়ে লড়াইয়ের বাজনা তৈরি করতে শুরু করেছিল। সে অভাবিত নৃশংসতার জবাব ভারতবাসী দিতে শেখেনি। তার ফল কি হল? দেশ গেল, রাজ্য গেল, দেবমন্দির ধ্বংস বিধ্বস্ত হয়ে গেল,—সে অক্ষমতার শাস্তি আজও আমাদের ফুরোয়নি।

ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তুমি কবির শ্লোক প্রায় আবৃত্তি করে বল, গিয়েছে দেশ দুঃখ কি, আবার তোরা মানুষ হ। কিন্তু দেশ ফিরে পাবার মত মানুষ হওয়া কাকে বলে শুনি? ভেবেচ, মানুষ হবার পথ তোমার অবারিত? মুক্ত? ভেবেচ, দেশের দরিদ্র নারায়ণের সেবা আর ম্যালেরিয়ার কুইনিন জুগিয়ে বেড়ানোকেই মানুষ হওয়া বলে? বলে না। মানুষ হয়ে জন্মানোর মর্য্যাদা-বোধকেই মানুষ হওয়া বলে! মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, তোমার বিশেষ অপরাধ নেই ভারতী। ওদের আবহাওয়ার মধ্যেই তুমি প্রতিপালিত, তাই তোমার মনে হয় ইয়োরোপের ক্রীশ্চান সভ্যতার চেয়ে বড় সভ্যতা আর নেই। অথচ, এতবড় মিছে কথাও আর নেই। সভ্যতার অর্থ কি শুধু মানুষ-মারার কল তৈরি করা? দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না,—অতএব আত্মরক্ষার ছলে এর নিত্য নূতন সৃষ্টিরও আর বিরাম নেই। কিন্তু সভ্যতার যদি কোন তাৎপর্য্য থাকে ত সে এই যে, অক্ষম দুর্ব্বলের ন্যায্য অধিকার যেন প্রবলের গায়ের জোরে পরাভূত না হয়। কোথাও দেখেচ এদের এই নীতি, এই ন্যায়ের গৌরব দিতে? একদিন তোমাকে বলেছিলাম পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখতে। স্মরণ আছে সে কথা? মনে আছে আমার মুখে চীনদেশের বক্সার বিদ্রোহের গল্প? সুসভ্য ইয়োরোপীয়ান পাওয়ারের দল ঘর-চড়াও হয়ে তাদের যে প্রতিহিংসা দিলে কোথায় লাগে তার কাছে চেঙ্গিস খাঁ ও নাদির শার বীভৎসতার কাহিনী? সূর্য্যের কাছে দীপের মত সে অকিঞ্চিৎকর। হেতু যত তুচ্ছ এবং যত অন্যায় হোক, লড়াইয়ের ছুতো পেলে এদের আর কিছুই বাধে না। বৃদ্ধ,

শিশু, নারী,—সঙ্কোচ নেই,—যে পাপের সীমা হয় না, ভারতী, সেই বিষাক্ত বাষ্পের নরহত্যাতেও নৈতিক বুদ্ধি এদের বাধা দেয় না। উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে যে-কোন উপায় যে-কিছু পথই এদের সুপবিত্র। কেবল নীতির বাধা, ধর্ম্মের নিষেধ কি শুধু নির্ব্বাসিত পদদলিত আমারই বেলায়।

ভারতী নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। এই সকল অভিযোগের প্রতিবাদের সে কি জানে? যে নির্ম্মম, একান্ত দৃঢ়চিত্ত, শঙ্কাহীন, ক্ষমাহীন বিপ্লবী, জ্ঞান বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের যাহার অন্ত নাই, পরাধীনতার অনির্ব্বাণ অগ্নিতে যাহার সমস্ত দেহ মন অহর্নিশ শিখার মত জ্বলিতেছে, যুক্তি দিয়া তাহাকে পরাস্ত করিবার সে কোথায় কি খুঁজিয়া পাইবে? জবাব নাই, ভাষা তাহার মূক হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার কলুষ-হীন নারী-হৃদয় অন্ধ করুণায় নিঃশব্দে মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুমিত্রা অনেকদিন হইতেই এই সকল বাদ-প্রতিবাদে যোগ দেওয়া বন্ধ করিয়া-ছিল, আজিও সে অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল, শুধু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল কৃষ্ণ আইয়ার। আলোচনার বহু অংশই সে বুঝিতে পারিতেছিল না, এই নীরবতার মাঝখানে সে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের সভার কাজ আরম্ভ হওয়ার আর বিলম্ব কত?

ডাক্তার কহিলেন, কোন বিলম্বই নেই। সুমিত্রা, তোমার জাভায় ফিরে যাওয়াই স্থির?

হাঁ।

কবে?

বোধ হয় এই বুধবারে। গত শনিবারে পারিনি।

পথের দাবীর সংস্পর্শ তুমি ত্যাগ করলে?

সুমিত্রা মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু একটুখানি হাসিলেন। তারপরে পকেট হইতে কয়েক-খানা টেলিগ্রামের কাগজ বাহির করিয়া সুমিত্রার হাতে দিয়া বলিলেন, পড়ে দেখ। হীরা সিং কাল রাতে দিয়ে গেছে।

আইয়ার ঝুঁকিয়া পড়িল, ভারতী প্রজ্বলিত মোমবাতিটা তুলিয়া ধরিল। সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম, ভাষা ইংরাজী, অর্থাৎ স্পষ্ট, কিন্তু সুমিত্রার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। মিনিট-দুই তিন পরে সে মুখ তুলিয়া কহিল, কোডের সমস্ত কথা আমার মনে নেই। আমাদের সাংহাইয়ের জ্যামেকা ক্লাব এবং ক্রুগার তার পাঠিয়েচে, এছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ডাক্তার বলিলেন, ক্রুগার ওয়্যার করেচে ক্যানটন থেকে। সাংহাইয়ের

জ্যামেকা ক্লাব ভোর রাত্রে পুলিশে ঘেরাও করে,—তিনজন পুলিশ আর আমাদের বিনোদ মারা গেছে। দুই ভাই মহতপ ও সূর্য্য সিংহ এক সঙ্গে ধরা পড়েচে। অযোধ্যা হংকঙে—দুর্গা, সুরেশ পেনাঙে—সিঙ্গাপুরের জ্যামেকা ক্লাবের জন্যে পুলিশ সমস্ত সহর তোলপাড় করে বেড়াচ্চে। মোট সুসংবাদটা এই!

খবর শুনিয়া কৃষ্ণ আইয়ার পাণ্ডুর হইয়া গেল। তাঁহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, ড্যান্!

ডাক্তার কহিলেন, ওরা দুভাই যে রেজিমেণ্ট ছেড়ে কবে এবং কেন সাংহাইয়ে এলো জানিনে। সুমিত্রা, ব্রজেন্দ্র বাস্তবিক কোথায় জানো কি?

প্রশ্ন শুনিয়া সুমিত্রা পাথর হইয়া গেল।

জানো?

প্রথমে তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর ফুটিল না, তাহার পরে ঘাড় নাড়িয়া কেবল বলিল, না।

কৃষ্ণ আইয়ার কহিল, সে একাজ করতে পারে আমার বিশ্বাস হয় না।

ডাক্তার হাঁ, না কিছুই বলিলেন না,—নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শশী কহিল, ব্রজেন্দ্র জানে আপনি হাঁটা-পথে বর্ম্মা থেকে বেরিয়ে গেছেন।

ডাক্তার এ কথারও উত্তর দিলেন না, তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

মুখের শব্দ নাই, বাক্য নাই, মূর্ত্তির মত সকলে নিঃশব্দে বসিয়া। সম্মুখে টেলি-গ্রাফের সেই কাগজগুলা পড়িয়া। বাতি পুড়িয়া নিঃশেষ হইতেছিল, শশী আর একটা জ্বালিয়া মেঝের উপর বসাইয়া দিল। মিনিট দশেক এইভাবে কাটিবার পরে প্রথম চেতনার লক্ষণ দেখা দিল আইয়ারের দেহে। সে পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া বাতির আগুনে ধরাইয়া লইয়া ধুঁয়ার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, নাউ ফিনিশ্‌ড্!

ডাক্তার তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন। প্রত্যুত্তরে সিগারেটে পুনশ্চ একটা বড় টান দিয়া শুধু ধূম উদ্গীরণ করিল। শশী মদ খাইত, কিন্তু তামাকের ধুঁয়া সহ্য করিতে পারিত না। এখন সে খামোকা একটা চুরুট ধরাইয়া ঘন ঘন টানিয়া ঘর অন্ধকার করিয়া তুলিল।

আয়ার কহিল, ওয়াস্ট'ল্যাক্। উই মস্ট স্টপ!

শশী কহিল, আমি আগেই জানতাম। কিছুই হবে না, শুধু—

ডাক্তার সহসা প্রশ্ন করিলেন, তুমি কবে যাবে বললে? বুধবারে?

সুমিত্রা মুখ তুলিয়া চাহিল না, মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ।

শশী পুনরায় বলিল, এতবড় পৃথিবী জোড়া শক্তিমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে

বিপ্লবের চেষ্টা করা শুধু নিষ্ফল নয়, পাগলামি। আমি ত বরাবরই বলে এসেচি ডাক্তার, শেষ পর্য্যন্ত কেউ থাকবে না।

আইয়ার কি বুঝিল সেই জানে, মুখ দিয়া অপর্য্যাপ্ত ধূম নিষ্কাশন করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, ট্রু।

ডাক্তার সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আজকের মত সভা আমাদের শেষ হল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল, সকলেই অভিমত ব্যক্ত করিল, করিল না শুধু ভারতী। সে নীরবে ডাক্তারের পাশে আসিয়া তাঁহার ডান হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, দাদা, আমাকে না বলে কোথাও চলে যাবে না বল।

ডাক্তার মুখে কিছুই বলিলেন না, শুধু তাঁহার বজ্রকঠিন মুঠার মধ্যে যে ক্ষুদ্র কোমল হাতখানি ধরা ছিল তাহাতে একটুখানি চাপ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

৩১

পরদিন প্রভাত হইতেই আকাশে ধীরে ধীরে মেঘ জমা হইতেছিল, রাত্রে ফোঁটা-কয়েক জলও পড়িয়াছিল, কিন্তু আজ মধ্যাহ্নকাল হইতে বৃষ্টি এবং বাতাস চাপিয়া আসিল। কাল ভারতী সুমিত্রাকে যাইতে দেয় নাই, কথা ছিল, আজ খাওয়া-দাওয়ার পরে সে বিদায় লইয়া বাসায় যাইবে। কিন্তু এমন দুর্য্যোগ শুরু হইল যে, বাহিরে পা বাড়ানো শক্ত, নদী পার হওয়া ত দূরের কথা। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ও জল উত্তোরোত্তর বাড়িয়া চলিতে লাগিল। শশী হিন্দু হোটেলে থাকে, দুপুরবেলা বেড়াইতে আসিয়াছিল, এখনও ফিরিতে পারে নাই। বেলা কখন শেষ হইল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, জানাও গেল না। ভারতীর উপরের ঘরে জানালা কপাট বন্ধ করিয়া আলো জ্বালিয়া বৈঠক বসিয়াছে। সুমিত্রা আপাদমস্তক চাপা দিয়া আরাম কেদারায় শুইয়া, শশী খাটের উপরে উবু হইয়া বসিয়া, নীচে কম্বলের শয্যায় অপূর্ব্ব এবং তাহারই জলযোগের আয়োজনে মেঝের উপরে বঁটি পাতিয়া বসিয়া ভারতী ফল ছাড়াইতেছে। অনতিদূরে একধারে স্টোভের উপরে মুগের ডালের খিচুড়ি টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে।

অপূর্ব্ব বলিয়াছিল সংসারে তাহার আর রুচি নাই, সন্ন্যাসই তাহার একমাত্র

শ্রেয়ঃ। শশী এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে পারে নাই, সে যুক্তি-সহযোগে খণ্ডন করিয়া বুঝাইতেছিল যে, এরূপ অভিসন্ধি ভাল নহে, কারণ সন্ন্যাসের মধ্যে আর মজা নাই; বরঞ্চ, বরিশাল কলেজে প্রফেসারির আবেদন যদি মঞ্জুর হয় ত গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

অপূর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু কথা কহিল না। ভারতী সমস্তই জানিত, তাই সে-ই ইহার জবাব দিয়া বলিল, জীবনে মজা করে বেড়ান ছাড়া কি মানুষের আর বড় উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, শশীবাবু? পৃথিবীতে সকলের চোখের দৃষ্টিই এক নয়।

তাহার কথা বলার ধরণে শশী অপ্রতিভ হইল। ভারতী পুনশ্চ কহিল, ওঁর মনের অবস্থা এখন ভাল নয়, এ সময়ে ওঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা শুধু নিষ্ফল নয়, অবিহিত। তার চেয়ে বরঞ্চ আমাদের নিজেদের—

আমাদের মনে ছিল না ভারতী।

শশীর মনে না থাকা কিছু বিচিত্র নয়। ইতিমধ্যে অপূর্ব্বর আরও একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে, যাহা ভারতী ব্যতীত অপরে জানিত না। সাংসারিক হিসাবে তাহার ফল ও পরিণাম মাতৃ-বিয়োগের অপেক্ষা বিশেষ কম নহে। জননীর মৃত্যু সংবাদে অপূর্ব্বর দাদা বিনোদবাবু দুঃখ করিয়া তার করিয়াছেন, কিন্তু ইহার অধিক আর কিছু নহে। মা রাগ করিয়া, সম্ভবতঃ অত্যন্ত অপমানিত হইয়াই অবশেষে গঙ্গা-বিহীন ম্লেচ্ছদেশে বর্ম্মায় আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া অপূর্ব্ব দুঃখে ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। যে দুই দিন কলিকাতায় ছিল, বাটীতে খায় নাই, শোয় নাই এবং ফিরিবার মুখে রীতিমত কলহ করিয়াই আসিয়াছিল। তথাপি এত বড় ভয়ানক দুর্ঘটনায় সকলের কনিষ্ঠ হইয়া তাহার নিঃসন্দিগ্ধ ভরসা ছিল, তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য কেহ-না কেহ আসিবেই আসিবে। তেওয়ারী থাকিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু সে-ও নাই, ছুটি লইয়া দেশে গিয়াছে।

বাঙালী পুরোহিত এখানেও আছে, আজই সকালে অপূর্ব্ব ভারতীকে ডাকিয়া কহিয়াছিল, সে কলিকাতায় যাইবে না, যেমন করিয়া পারে মাতৃশ্রাদ্ধ এখানেই সম্পন্ন করিবে।

মাতার আকস্মিক আগমনের হেতু যে ছেলেদের প্রতি দুর্জ্জয় মান-অভিমান,—এ খবর অপূর্ব্ব জানিয়া আসিয়াছিল, শুধু কতখানি যে ক্রীশ্চান-কন্যা ভারতীর কাহিনী সংশ্লিষ্ট ছিল ইহাই জানে নাই। সাংঘাতিক পীড়িতা অচৈতন্য-প্রায় জননীর বলিবার অবকাশ ঘটিল না এবং বিনোদবাবু রাগ করিয়া বলিলেন না।

সহসা মুখের আবরণ সরাইয়া সুমিত্রা উঠিয়া বসিল, কহিল, নীচেকার দরজা খুলে কে যেন ঢুকলো ভারতী।

বাতাস এবং বারিপাতের অবিশ্রাম ঝর ঝর শব্দের মাঝখানে আর কিছুই শুনিতে পাওয়া কঠিন। শঙ্কায় সকলেই চকিত হইয়া উঠিল, ভারতী একমুহূর্ত্ত কান খাড়া করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, না, কেউ নয়। অপূর্ব্ববাবুর চাকরটা শুধু নীচে আছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে সিঁড়িতে পরিচিত পদশব্দে আনন্দ কলরোলে চীৎকার করিয়া উঠিল, আরে এ যে দাদা! এক হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার, এক লক্ষ ওয়েলকম্। হাতের ফল এবং বঁটি ফেলিয়া সিঁড়ির মুখে ছুটিয়া গিয়া বলিল, এক ক্রোর, দশ ক্রোর বিশ ক্রোর, হাজার ক্রোর গুড ইভ্‌নিং দাদা, শীগ্‌গির এসো!

সব্যসাচী ঘরে ঢুকিয়া পিঠের প্রকাণ্ড বোঁচকা নামাইতে নামাইতে সহাস্যে কহিলেন, গুডইভ্‌নিং! গুডইভ্‌নিং! গুডইভ্‌নিং।

ভারতী তাঁহার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, এই দেখ দাদা, তোমার জন্যে খিচুড়ি রাঁধচি। ওভারকোটটা আগে খোলো। ইঃ—জুতো-টুতো সব ভিজে গেছে, দাঁড়াও আগে আমি খুলে দি। এই বলিয়া সে আগে কোট খুলিবে, না হেঁট হইয়া বুটের ফিতা খুলিবে ঠিক করিতে পারিল না। চেয়ারের কাছে টানিয়া আনিয়া জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল, আমি জুতো খুলে দি। আচ্ছা, এই বৃষ্টিতে একটা গাড়ি করে আসতে নেই! হাঁ দাদা, ওবেলা কি খেয়েছিলে? পেট ভরেছিল? ভালো কথা! ঠাকুরমশায়ের হোটেলে আজ মাংস রান্না হয়েচে আমি খবর পেয়েচি, আনবো দাদা ছুটে গিয়ে এক বাটি? খাবে? সত্যি বল।

ডাক্তার হাসিমুখে কহিলেন, আরে, এ আমাকে আজ পাগল করে দেবে না কি!

ভারতী জুতা খুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় তাঁহার হাত দিয়া বলিল, যা ভেবেচি ঠিক তাই। ঠিক যেন নেয়ে উঠেচ এমনি ভিজে। এই বলিয়া সে আলনা হইতে তাড়াতাড়ি তোয়ালে আনিতে গেল।

মিনিট-খানেকের মধ্যে ছেলেমানুষের মত এমনি কাজ করিল যে শশী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, আপনাকে যেন ভারতী দু-দশ বছর পরে দেখতে পেয়েচেন।

ডাক্তার কহিলেন, তার চেয়েও বেশি। এই বলিয়া ভারতীর হাত হইতে তোয়ালে টানিয়া লইয়া কহিলেন, তোর আদরের জ্বালায় আমার প্রাণটা গেল।

প্রাণ গেল? তবে, থাকো বসে। এই বলিয়া ভারতী কৃত্রিম অভিমান করে তাহার ফল ছাড়াইতে ফিরিয়া গিয়া বঁটি লইয়া বসিল। তাহার বন্ধু, সখা,

সহোদরের অধিক আত্মীয় আজিকার এই দুর্য্যোগের মধ্যে তাঁহার অপ্রত্যাশিত, অভাবিত আগমনে স্নেহে, শ্রদ্ধায়, গর্ব্বে ও স্বার্থহীন নিষ্পাপ প্রীতিতে তাহার হৃদয় উপচিয়া পড়িয়াছে,—আপনাকে সে সম্বরণ করিবে কি দিয়া? আতিশয্য যদি হইয়াই থাকে তাহাকে বাধা দিবে কিসে? সুমিত্রা নিঃশব্দে দেখিতেছিল, নীরবে রহিল, কিন্তু ঘৃণা ও নিগূঢ় ঈর্ষায় রচিত যে দুর্ভেদ্য যবনিকা এতদিন তাহার চোখের দৃষ্টিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, অকস্মাৎ অপসারিত হইয়া যতদূর দেখা যায় শুধু অনাবিল সৌহৃদ্যের স্বচ্ছ স্রোতস্বতীই সে এই দুটি নর-নারীর মাঝখানে প্রবাহিত দেখিতে পাইল। মুহূর্ত্তের জন্যও কখনো যে তলায় কলুষ স্পর্শ করিয়াছে, মনে করিতে আজ তাহার মাথা হেঁট হইল। গোপন করিয়া করিবার, লজ্জা করিয়া করিবার ভারতীর কিছুই ছিল না বলিয়াই সে এমন লজ্জাহীনার মত সব্যসাচীর আপনার হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল, এ কথা আজ সুমিত্রা বুঝিল।

এতক্ষণ মানুষটিকে লইয়াই ভারতী ব্যস্ত ছিল, এখন বোঁচকাটির প্রতি তাহার লক্ষ্য পড়িল। উদ্বিগ্ন শঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, এই ঝড়-জলের মধ্যে সহচরটিকে সঙ্গে এনেচ কেন বল ত? কোথায় চলে যাচ্চো না তো? মিথ্যে বলে ঠকাতে পারবে না তা বলে রাখচি দাদা।

ডাক্তার হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের চেহারায় নিজের মুখে আর হাসি আসিল না, তথাপি তামাসার ভঙ্গীতে লঘু করিয়া কহিলেন, যাবো না তো কি রামদাসের মত ধরা পড়ব নাকি?

শশী মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠিক তাই!

ভারতী রাগ করিয়া কহিল, ঠিক তাই! আপনি কি জানেন শশীবাবু, যে মতামত দিচ্চেন!

বাঃ জানিনে?

কিচ্ছু জানেন না!

ডাক্তার হাসিমুখে কহিলেন, ঝগড়া করলে খিচুড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা অপূর্ব্ববাবু, কালকের জাহাজে না গেলে ত আপনি সময় মত পৌঁছতে পারবেন না।

অপূর্ব্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, মায়ের শ্রাদ্ধ আমি এখানেই কোরব ডাক্তার।

এখানে? হেতু?

অপূর্ব্ব মৌন হইয়া রহিল, ভারতীও জবাব দিল না।

ডাক্তার মনে মনে বুঝিলেন কি একটা ঘটিয়াছে, যাহা প্রকাশ করিবার নয়। কহিলেন, বেশ, বেশ। তাহলে ফিরে যাবারই বা দরকার কি? চাকরিটা আপনার আছে না?

অপূর্ব্ব ইহারও উত্তর দিল না। শশী কহিল, অপূর্ব্ববাবু সন্ন্যাস নেবেন।

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, সন্ন্যাস? এ আবার কি কথা!

তাঁহার হাসিতে অপূর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হইল। কহিল, সংসারে যার রুচি নেই, জীবন বিস্বাদ হয়ে গেছে, এ ছাড়া তার আর কি পথ আছে ডাক্তার?

ডাক্তার কহিলেন, এ সব বড় বড় আধ্যাত্মিক ব্যাপার, অপূর্ব্ববাবু, এর মধ্যে অনধিকার চর্চ্চা করতে আমাকে আর প্রলুব্ধ করবেন না, তার চেয়ে বরঞ্চ শশীর মত নিন, ও জানে-শোনে। ইস্কুলে ফেল হয়ে একবার ও বছরখানেক ধরে এক সাধু-বাবার চেলাগিরি করেছিল।

শশী সংশোধন করিয়া বলিল, দেড় বছরের ওপর। প্রায় দু-বছর।

সুমিত্রা ও ভারতী হাসিতে লাগিল। অপূর্ব্বর গাম্ভীর্য্য ইহাতে টলিল না, সে কহিল, মায়ের মৃত্যুর জন্যে আমার নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হয়, ডাক্তার! সে-দিন থেকে আমি নিরন্তর এই কথাই ভেবে আসচি। যথার্থই সংসারে আমার প্রয়োজন নেই, এ আমার কাছে তিক্ত হয়ে এসেচে।

ডাক্তার ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বোধ হয় তাহার হৃদয়ের সত্যকার ব্যথা উপলব্ধি করিলেন, সস্নেহে মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, মানুষের এই দিকটা কখনো আমার ভেবে দেখবার আবশ্যক হয়নি অপূর্ব্ববাবু, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, হয়ত, এ ভুল হবে। তিক্ততার মধ্য দিয়ে সংসার ছেড়ে শুধু হতভাগ্য লক্ষ্মী-ছাড়া জীবন যাপন করা চলে, কিন্তু বৈরাগ্য-সাধনা হয় না। করুণার মধ্যে দিয়ে, আনন্দের মধ্যে দিয়ে না গেলে কি—কিন্তু, ঠিক ত জানিনে—

ভারতী অকস্মাৎ যেন এক নূতন জ্ঞান লাভ করিল। ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুমি ঠিক জানো দাদা, তোমার মুখ দিয়ে কখনো বেঠিক কিছু বার হয় না,—হতে পারে না। এই সত্য।

ডাক্তার বলিলেন, মনে ত তাই হয়। মা মারা গেলেন। কেন এসেছিলেন, কিসের জন্যে আপনি যেতে চান না, কিছুই আমি জানিনে, জানবার কৌতূহলও নেই, কিন্তু কারও আচরণে তিক্ততাই যদি পেয়ে থাকেন, সমস্ত অনাগত কালের তাই শুধু সত্য হ'ল, আর অমৃত যদি কোথায় লাভ হয়ে থাকে, জীবনে তার কোন দাম দেবেন না।

অপূর্ব্ব কহিতে লাগিল, সংসারে দাদা যদি—

ডাক্তার বলিলেন, সংসারে অপূর্ব্বর দাদা বিনোদবাবুই আছেন, ভারতীর দাদা সব্যসাচী কি নেই? সে গৃহে যদি স্থান আপনার নাও থাকে, কলকাতার সেই ছোট্ট বাড়িটুকুই কি বামনের বিশ্বব্যাপী পদতলের ন্যায় পৃথিবীতে কোথাও আপনার

আর ঠাঁই রাখেনি? অপূর্ব্ববাবু, হৃদয়াবেগ দুর্ম্মূল্য বস্তু, কিন্তু চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করতে দিলে এতবড় শত্রু আর মানুষের নেই।

অপূর্ব্ব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু ধর্ম্মসাধনা বা আত্মার মুক্তির কামনায় আমি সংসার ত্যাগ করতে চাইনি ডাক্তার, যদি করি, পরার্থেই কোরব। আমাকে আপনাদের বিশ্বাস করা কঠিন, না করলেও দোষ দেবার নেই, কিন্তু একদিন যে অপূর্ব্বকে আপনারা জানতেন, মায়ের মৃত্যুর পরে সে অপূর্ব্ব আমি আর নেই।

ডাক্তার উঠিয়া আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, তোমার এ কথাটা যেন সত্য হয় অপূর্ব্ব।

অপূর্ব্ব গাঢ় কণ্ঠে বলিল, এখন থেকে আমি দেশের কাজে, দশের কাজে, দীন-দরিদ্রের কাজেই আত্মনিয়োগ করব। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিতে লাগিল, কলকাতায় আমার বাড়ি, সহরেই আমি মানুষ, কিন্তু সহরের সঙ্গে আর আমার কিছুমাত্র সম্বন্ধ রইল না। এখন থেকেই পল্লীসেবাই হবে আমার একমাত্র ব্রত। একদিন কৃষিপ্রধান ভারতের পল্লীই ছিল প্রাণ, পল্লীই ছিল তার অস্থি-মজ্জা-শোণিত। আজ সে ধ্বংসোন্মুখ। ভদ্রজাতি তাদের ত্যাগ করে সহরে এসেচে, সেখান থেকে তাদের অহর্নিশি শাসন করে এবং শোষণ করে। এ ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ—বন্ধন তারা রাখেনি। না রাখুক, কিন্তু চিরদিন যারা এঁদের মুখের অন্ন এবং পরণের বস্ত্র যুগিয়ে দেয়, সেই কৃষককুল আজ নিরন্ন, নিরক্ষর এবং নিরুপায় হয়ে মৃত্যুপথে দ্রুতবেগে চলেচে। এখন থেকে আমি তাদের কল্যাণেই আত্মনিয়োগ কোরব এবং ভারতীও আমাকে প্রাণপণে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি হয়েচেন। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে, আবশ্যক হলে কুটীরে কুটীরে গিয়ে তাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষিত করবার ভার উনি নেবেন। আমার সন্ন্যাস দেশের জন্যে, নিজের জন্যে নয় ডাক্তার।

ডাক্তার বলিলেন, সাধু প্রস্তাব।

তাঁহার মুখ হইতে কেবল এই দুটি কথাই কেহ প্রত্যাশা করে নাই। ভারতী ম্লান হইয়া কহিল, আর একদিক দিয়ে ধরলে এ তো তোমারই কাজ দাদা। এই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষক বড় হয়ে না উঠলে ত কোন কিছুই হবে না।

ডাক্তার কহিলেন, আমি ত প্রতিবাদ করিনি ভারতী।

কিন্তু তোমার উৎসাহও ত নেই দাদা।

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, দরিদ্র কৃষকের ভালো করতে চাও, তোমাদের আমি আশীর্ব্বাদ করি। কিন্তু আমার কাজে সাহায্য কোরচ মনে করবার প্রয়োজন

নেই। চাষারা রাজা হোক, তাদের ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক, কিন্তু সাহায্য তাদের কাছ থেকে আমি আশা করিনে।

অপূর্ব্বর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কারও ভালো করতে হবে বলে আর কারও গায়ে কালি ছড়াতে হবে, তার মানে নেই অপূর্ব্ববাবু। এদের দুঃখ-দৈন্যের মূলে শিক্ষিত ভদ্রজাতি নয়, সে মূল বার করতে হলে তোমাকে আর একদিকে খুঁড়ে দেখতে হবে।

অপূর্ব্ব কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কহিল, কিন্তু এই কি সকলে আজ বলে না?

বলুক। যা ভুল তা তেত্রিশ কোটী লোকে মিথ্যে বললেও ভুল। বরঞ্চ, এই শিক্ষিত ভদ্রজাতির চেয়ে লাঞ্ছিত, অপমানিত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত সমাজ বাংলা দেশে আর নেই। তার উপরে মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে তাদের ভরাডুবি করাতে চাও কেন? পরদেশের সকল যুক্তি এবং সকল সমস্যাই কি নিজের দেশে খাটে ভেবেচ? বাইরের অনাচার যখন পলে পলে সর্ব্বনাশ নিয়ে আসচে, তখন আবার অন্তর্বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে চাও কিসের জন্যে? অসন্তোষে দেশ ভরে গেল,—স্নেহের বাঁধন শ্রদ্ধার বাঁধন চূর্ণ হয়ে এলো কিসের জন্যে জানো? তোমাদের দু-দশজনের দোষে—শিক্ষিতের বিরুদ্ধে শিক্ষিতের অভিযানে। শশী, একদিন তোমাকে আমি এ কাজ করতে নিষেধ করেছিলাম মনে আছে। নিজেদের বিপক্ষে নিজেদের দুর্নাম ঘোষণার মধ্যে একটা নিরপেক্ষ স্পষ্টবাদিতার দম্ভ আছে, এক প্রকার সস্তা খ্যাতিও মুখে মুখে প্রচারিত হয়, কিন্তু এ শুধু ভুল নয়, মিথ্যা। মঙ্গল তাদের তোমরা করগে, কিন্তু অপরের কলঙ্ক রটনা করে নয়, একের প্রতিকূলে অপরকে উত্তেজিত করে নয়—বিশ্বের কাছে তাদের হাস্যাস্পদ করে নয়। সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত সে একদিন এসে পৌঁছবে; কিন্তু আজও তার বিলম্ব আছে।

সকলেই নীরব হইয়া রহিল, শুধু ভারতী ধীরে ধীরে কহিল, কিছু মনে কোরো না দাদা; কিন্তু বরাবরই আমি দেখে এসেচি পল্লীর প্রতি তোমার সহানুভূতি কম, তোমার দৃষ্টি শুধু সহরের উপরে। কৃষকদের প্রতি তুমি সদয় নয়, তোমার দু'চক্ষু আছে কেবল কারখানার কুলি-মজুর-কারিকরদের দিকে। তাই তোমার পথের দাবী খুলেছিলে এদেরই মাঝখানে। আর হৃদয় বলে যদি কোন বালাই তোমার থাকে, সে শুধু ছেয়ে পড়ে আছে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ভদ্র জাতি নিয়ে। এরাই তোমার আশা-ভরসা, এরাই তোমার আপনার জন। বল এ কি মিথ্যা কথা?

ডাক্তার বলিলেন, মিথ্যা নয় বোন, অত্যন্ত সত্য। কতবার ত বলেচি তোমাকে, পথের দাবী চাষা-হিতকারিণী প্রতিষ্ঠান নয়, এ আমার স্বাধীনতা অর্জ্জনের অস্ত্র। শ্রমিক এবং কৃষক এক নয় ভারতী। তাই, পাবে আমাকে কুলি-মজুর-কারিকরের

মাঝখানে, কারখানার ব্যারাকে, কিন্তু পাবে না খুঁজে পাড়াগাঁয়ের চাষার কুটীরে। কিন্তু কথায় কথায় শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যটি যেন ভুলে যেয়ো না দিদি। এই বলিয়া স্টোভের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, দেশোদ্ধার দুদিন দেরি হলে সইবে, কিন্তু তৈরি খিচুড়ি পুড়ে গেলে সইবে না?

ভারতী ছুটিয়া গিয়া হাঁড়ির ঢাকা খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া হাসিমুখে কহিল, ভয় নেই দাদা, বাদল রাতের খিচুড়িভোগ তোমার মারা যাবে না।

কিন্তু বিলম্ব কত?

ভারতী বলিল, মিনিট পনেরো-কুড়ি। কিন্তু তাড়া কিসের বল ত?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, আজ যে তোমাদের কাছে আমি বিদায় নিতে এলাম।

কথা যেমন হোক, তাঁহার হাসিমুখের দিকে চাহিয়া কেহই তাহা বিশ্বাস করিল না। বাহিরে ঝড়-জলের বিরাম নাই, ভারতী ক্ষণিকের জন্য জানালা খুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাপ্‌রে বাপ্। পৃথিবী বোধ হয় ওলট-পালট হয়ে যাবে। বিদায় নেবারই সময় বটে, দাদা! চোখের পলকে তাহার অন্য কথা মনে পড়িল, কহিল, আজ কিন্তু তোমাকে ও ছোট্ট ঘরটিতে শুতে হবে। নিজের হাতে আমি চমৎকার করে বিছানা করে দেব, কেমন? এই বলিয়া সে হৃদয়ের নিগূঢ় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া রান্নার কাজে লাগিল। ডাক্তারের নিকট হইতে যে কোন উত্তরই আসিল না তা তাহা সে লক্ষ্যও করিল না।

যথাসময়ে আহার্য্য প্রস্তুত হইলে, ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, সে হবে না ভারতী, পরিবেশনের অছিলায় তুমি বাকী থাকলে চলবে না। আজ আমরা সকলে একসঙ্গে খেতে বসব।

ভারতী সম্মত হইয়া বলিল, তাই হবে দাদা, চারজনে আমরা গোল হয়ে খেতে বসব।

ডাক্তার কহিলেন, গোল হয়ে খেতে পারি, কিন্তু বুভুক্ষু অপূর্ব্ববাবু না নজর দিয়ে আমাদের হজমে গোল বাধান। সেটা ওঁকে বল।

অপূর্ব্ব হাসিল, ভারতীও হাসিমুখে কহিল, সে ভয় আমাদের থাকতে পারে, কিন্তু তোমার হজমে গোল বাধাবে কে দাদা? ও আগুনে পাহাড়-পর্ব্বত গুঁড়িয়ে দিলেও তা ভস্ম হয়ে যাবে। যে খাওয়া খেতে দেখেচি! এই বলিয়া ভারতী আর একদিনের খাওয়া স্মরণ করিয়া মনে মনে যেন শিহরিয়া উঠিল।

ভোজন-পর্ব্ব আরম্ভ হইল। অন্ন-ব্যঞ্জনের সুখ্যাতিতে এবং লঘু হাস্য-পরিহাসে ঘরের আবহাওয়া যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। খাওয়া যখন পূর্ণ

উদ্যমে চলিতেছে, সহসা রসভঙ্গ করিয়া ফেলিল অপূর্ব্ব। সে কহিল, দিন-দুই পূর্ব্বে খবরের কাগজে একটা সুসংবাদ পড়েছিলাম, ডাক্তার। যদি সত্যি হয় আপনার বিপ্লবের প্রয়াস একেবারে নিরর্থক হয়ে যাবে। ভারত-গভর্ণমেণ্ট তাঁদের শাসনযন্ত্রের আমূল সংস্কার করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েচেন।

শশী চক্ষের পলকে রায় দিল, মিছে কথা! ছল!

ভারতী ঠিক যে বিশ্বাস করিল তাহা নয়, কিন্তু অকৃত্রিম উদ্বেগের সহিত কহিল, ছলনা নাও ত হতে পারে শশীবাবু। যাঁরা নেতা, যাঁরা এই অর্দ্ধশতাব্দকাল ধরে,—না দাদা, তুমি হাসতে পারবে না বলচি!—তাঁদের প্রাণপণ আন্দোলনের কি কোন ফল নেই ভাবো? বিদেশী শাসক হলেও ত তাঁরা মানুষ, ধর্ম্মজ্ঞান এবং নৈতিক বুদ্ধি ফিরে আসা ত একেবারে অসম্ভব নয়!

শশী তেমনি অসঙ্কোচে অভিমত প্রকাশ করিল, অসম্ভব! মিছে কথা! ধাপ্পাবাজী!

অপূর্ব্ব কহিল, অনেকে এই সন্দেহই করেন সত্য।

ভারতী বলিল, সন্দেহ তাঁদের মিথ্যে। ভগবান কি নেই নাকি? এবং পরক্ষণেই অপরিসীম আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল, শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন, অত্যাচার-অনাচারের সংস্কার,—এ সব যদি সত্যই হয়, তোমার বিপ্লবের আয়োজন, বিদ্রোহের সৃষ্টি,—তখন ত একেবারেই অর্থহীন হয়ে যাবে দাদা!

শশী কহিল, নিশ্চয়।

অপূর্ব্ব কহিল, নিঃসন্দেহ!

ভারতী তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, দাদা, তখন এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ছেড়ে আবার শান্ত মূর্ত্তি নেবে বল?

ডাক্তার দেওয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া মনে মনে হিসাব করিয়া কতকটা যেন নিজেকেই কহিলেন, বেশি দেরি নেই আর। তাহার পরে ভারতীকে উদ্দেশ করিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত স্নিগ্ধভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, ভারতী, এ আমার ভয়ঙ্কর কিংবা শান্ত মূর্ত্তি আমি আপনিই জানিনে, শুধু জানি এ জীবনে এ রূপ আমার আর পরিবর্ত্তন হবার নয়। আর তোমার নমস্য নেতাদের,—ভয় নেই দিদি, আজ তাঁদের নিয়ে আমোদ করবার আমার সময়ও নেই, অবস্থাও নয়। বিদেশী শাসনের সংস্কার যে কি, প্রাণপণ আন্দোলনের ফলে কি তারা চান, তার কতটুকু আসল, কতটুকু মেকি,—কি পেলে শশীর ধাপ্পাবাজী হয় না এবং নমস্যগণের কান্না থামে, তার কিছুই আমি জানিনে। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চোখ রাঙিয়ে যখন তাঁরা চরম বাণী প্রচার করে বলেন, আমরা আর ঘুমিয়ে নেই, আমরা জেগেচি। আমাদের আত্মসম্মানে

ভয়ানক আঘাত লেগেচে। হয় আমাদের কথা শোন, নইলে বন্দে মাতরমের দিব্যি করে বলচি তোমাদের অধীনে আমরা স্বাধীন হবই হব। দেখি, কার সাধ্য বাধা দেয়! - এ যে কি প্রার্থনা, এবং কি এর স্বরূপ সে আমার বুদ্ধির অতীত। শুধু জানি, তাঁদের এই চাওয়া এবং পাওয়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই।

একটুখানি থামিয়া বলিলেন, সংস্কার মানে মেরামত,—উচ্ছেদ নয়। গুরুভার যে অপরাধ আজ মানুষের অসহ হয়ে উঠেচে তাকেই সুসহ করা; যে যন্ত্র বিকল হয়ে আসচে মেরামত করে তাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে কৌশল বোধ হয় তারই নাম শাসন-সংস্কার। একটা দিনের জন্যও এ ফাঁকি আমি চাইনি, একটা দিনের জন্যও বলিনি কারাগারের পরিসর আমার আর একটুখানি বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে ধন্য কর। ভারতী, আমার কামনায়, আমার তপস্যায় আত্ম-বঞ্চনার অবসর নেই! এ তপস্যা সাঙ্গ হবার শুধু দুটি মাত্র পথ খোলা আছে - এক মৃত্যু, দ্বিতীয় ভারতের স্বাধীনতা।

তাঁহার এই কথাগুলির মধ্যে নূতন কিছুই ছিল না, তথাপি মৃত্যু ও এই ভয়াবহ সঙ্কল্পের পুনরুল্লেখে ভারতীর বুকের মধ্যে অশ্রু আলোড়িত হইয়া দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। কহিল, কিন্তু একাকী কি করবে দাদা, একে একে সবাই যে তোমাকে ছেড়ে দূরে সরে গেল?

ডাক্তার বলিলেন, যাবেই ত। আমার দেবতা যে ফাঁকি সইতে পারেন না বোন।

ভারতীর মুখে আসিল, সংসারে সবাই ফাঁকি নয় দাদা, হৃদয় পাথর না হয়ে গেলে তা টের পেতে। কিন্তু এ কথা আজ সে উচ্চারণ করিল না।

আহার শেষ হইলে ডাক্তার হাত-মুখ ধুইয়া চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। কেহই লক্ষ্য করিল না যে, তাঁহার চোখের দৃষ্টি কিসের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় ধীরে ধীরে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। এবং একটা কান যে বহুক্ষণ হইতেই সদর দরজায় সজাগ হইয়াছিল তাহা কেহই জানিত না। পথের ধারে কি একটা শব্দ হইল, তাহা আর কেহ প্রায় গ্রাহ্য করিল না, কিন্তু ডাক্তার সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নীচে অপূর্ব্ববাবুর চাকর আছেন না? জেগে আছে? ওহে হনুমন্ত, দোরটা একবার খুলে দাও।

কোথায় কাহার কিরূপ শয্যা প্রস্তুত হইবে তাহাই ভারতী সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া কহিল, কাকে দাদা? কে এসেচেন?

ডাক্তার বলিলেন, হীরা সিং। তার আসার আশায় পথ চেয়ে আছি। বল কবি, কতকটা কাব্যের মত শোনাল না? এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

ভারতী বলিল, এই দুর্য্যোগে তোমার একার কাব্যের জ্বালাতেই আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে আছি। আবার ভগ্নদূত কিসের জন্যে?

শশী কহিল, ভগ্নদূত তুচ্ছ নয় ভারতী, সে না হলে অতবড় মেঘনাদবধ কাব্য রচনাই হোত না।

দেখি, ইনি কোন্ কাব্য রচনা করেন! এই বলিয়া ভারতী উঁকি মারিয়া দেখিল অপূর্ব্বর ভৃত্য বাহিরের কবাট খুলিতে যে ব্যক্তি প্রবেশ করিল সে সত্যই হীরা সিং। ক্ষণেক পরে আগন্তুক উপরে আসিয়া সকলকে অভিবাদন করিল এবং হাতজোড় করিয়া সব্যসাচীকে প্রণাম করিল! পরণে তাহার সেই অতি সুপরিচিত সরকারী উর্দ্দি, সরকারী চাপরাশ, সরকারী মুরাঠা, কোমরে টেলিগ্রাফ পিয়নের চামড়ার ব্যাগ,—এ সমস্তই ভিজিয়া ভারি হইয়া উঠিয়াছে। বিপুল দাড়ি-গোঁফ বহিয়া জল ঝরিতেছে বাঁ হাত দিয়া নিঙড়াইয়া বোধ হয় নিজেকে কিঞ্চিৎ হাল্কা করিবার চেষ্টা করিল এবং তাহারই ফাঁক দিয়া অস্ফুটধ্বনি শুনা গেল, রেডি।

ডাক্তার লাফাইয়া উঠিলেন, থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক উই সরদারজি! কখন?

নাউ। এই বলিয়া সে সকলকে পুনশ্চ অভিবাদন করিয়া নীচে যাইতেছিল, কিন্তু সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কি হয়েচে সরদারজী? কি নাউ?

অথচ সবাই জানিত এই মানুষটির গলায় ছুরি দিলে রক্ত ছুটিবে, কিন্তু বিনা হুকুমে কথা ফুটিবে না। সুতরাং উত্তরের পরিবর্ত্তে তাহার ঘন কৃষ্ণ শ্মশ্রু-গুম্ফ ভেদ করিয়া গুটিকয়েক দাঁত ছাড়া আর যখন কিছু বাহির হইল না, তখন বিস্ময়াপন্ন কেহই হইল না। সবাই জানিত, ইহার নিন্দা-খ্যাতি, মান-অপমান, শত্রু-মিত্র নাই; দেশের কাজে সব্যসাচীকে সে সর্দ্দার মানিয়া এ জীবনের সমস্ত ভালমন্দ, সমস্ত সুখ-দুঃখ বিসর্জ্জন দিয়া কঠোর সৈনিক-বৃত্তি মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। আর তাহার তর্ক নাই, আলোচনা নাই, সময়-অসময়ের হিসাব নাই, কিছু একটা কঠিন কাজের ভার ছিল, কর্ত্তব্য পালন করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। ইহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়া ডাক্তার নিজে যাহা বলিলেন, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

ক্ষতি এবং অনিষ্ট কত যে হইয়াছে দূর হইতে নিরূপণ করা শক্ত! সম্ভবতঃ, যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যতই হোক দুটা কাজ তাঁহাকে করিতেই হইবে। তাঁহাদের জ্যামেকা ক্লাবের যে অংশটা সিঙ্গাপুরে আছে তাহাকে বাঁচাইতেই হইবে। এবং যেখানে হোক এবং যেমন করিয়া হোক, ব্রজেন্দ্রকে তাঁহার খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। নদীর দক্ষিণে সিরিয়মের সন্নিকটে একখানা চীনা জাহাজ মাল বোঝাই করিয়া দেশে চলিয়াছে, কাল অতি প্রত্যূষেই তাহা ছাড়িয়া যাইবে, ইহাতেই কোনমতে একটা স্থান পাওয়া গিয়াছে। সেই সংবাদই হীরা সিং এইমাত্র দিয়া গেল।

শুনিয়া সুমিত্রার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। খুব সম্ভব, ব্রজেন্দ্র এখন সিঙ্গাপুরে এবং যে ব্যক্তি তাহার সন্ধানে চলিল, তাহার দৃষ্টি হইতে স্বর্গে মর্ত্ত্যে কোথাও তাহার পরিত্রাণ নাই। তখন বিশ্বাসঘাতকতার শেষ বিচারের সময় আসিবে। ইহার দণ্ড যে কি তাহা দলের মধ্যে কাহারও অবিদিত নহে, সুমিত্রাও জানে। ব্রজেন্দ্র তাহার কিছুই নহে এবং অপরাধ যদি সে করিয়াই থাকে শাস্তি তাহার হোক, কিন্তু যে কারণে সুমিত্রা অকস্মাৎ এমন হইয়া গেল, তাহা ব্রজেন্দ্রের দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া নহে, তাহা এই যে, ব্রজেন্দ্র পতঙ্গ নহে। সে আত্মরক্ষা করিতে জানে। শুধু তাহার পকেটের সুগুপ্ত পিস্তল নহে, তাহার মত ধূর্ত্ত, কৌশলী ও একান্ত সতর্ক ব্যক্তি সংসারে বিরল। তাহার মস্ত ভুল এই হইয়াছে যে, ডাক্তার হাঁটা-পথে বর্ম্মা ত্যাগ করিয়া গেছেন এই কথা সে যাবার পূর্ব্বে নিশ্চয় বিশ্বাস করিয়া গেছে। এখন কোন মতে যদি সে ডাক্তারের খোঁজ পায় ত বধ করিবার যত কিছু অস্ত্র তাহার তূণে আছে প্রয়োগ করিতে মুহূর্ত্তের দ্বিধাও করিবে না। বস্তুতঃ জীবন মরণ সমস্যায় অপরের বলিবারই বা কি আছে!

কিছুই নাই। শুধু হীরা সিং-এর শান্ত মৃদু দুটি শব্দ 'নাউ' এবং 'রেডি' তাহাদের সকলের কানের মধ্যেই সহস্রগুণ ভীষণ হইয়া সহস্র দিক দিয়া আঘাত প্রতিঘাত করিয়া ফিরিতে লাগিল। ভারতীর মনে পড়িল তাহাদের মৌলমিনের বাটীতে একদিন জন্মতিথি উৎসবের পরিপূর্ণ আনন্দের মাঝখানে অতিথি এবং সর্ব্বোত্তম বন্ধু রেভারেণ্ড লরেন্স আহারের টেবিলে হৃদরোগে মারা গিয়েছিলেন। আজিও ঠিক তেমনি অকস্মাৎ হীরা সিং ঘরে ঢুকিয়া মৃত্যুদূতের ন্যায় একমুহূর্ত্তে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

হঠাৎ শশী কথা বলিয়া উঠিল। মুখ দিয়া ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সব যেন ফাঁকা হয়ে যাচ্চে ডাক্তার।

কথাটা সাদা এবং নিতান্তই মোটা। কিন্তু সকলের বুকের উপর যেন মুগুরের ঘা মারিল।

ডাক্তার হাসিলেন। শশী কহিল, হাসুন আর যাই করুন, সত্যি কথা! আপনি কাছে নেই মনে হলে সমস্ত যেন ব্ল্যাঙ্ক,—ফাঁকা ঝাপসা হয়ে আসে। কিন্তু আপনার প্রত্যেকটি হুকুম আমি মেনে চলবো।

যথা?

যথা, মদ খাবো না, পলিটিক্সে মিশবো না, ভারতীর কাছে থাকবো এবং কবিতা লিখবো।

ডাক্তার ভারতীর মুখের দিকে একবার চাহিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। তখন রহস্যভরে প্রশ্ন করিলেন, চাষাড়ে কবিতা লিখবে না কবি?

শশী কহিল, না। তাদের কাব্য তারা লিখতে পারে লিখুক, আমি লিখচিনে। আপনার সে-কথা আমি অনেক ভেবে দেখেচি। এবং এ উপদেশও কখনো ভুলব না যে, আইডিয়ার জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে পারে শুধু শিক্ষিত ভদ্র সন্তান, অশিক্ষিত কৃষকে পারে না। আমি হব তাদেরই কবি।

ডাক্তার বলিলেন, তাই হোয়ো! কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয়, কবি, মানবের গতি এইখানেই নিশ্চল হয় থাকবে না। কৃষকের দিনও একদিন আসবে, যখন তাদের হাতেই জাতির সকল কল্যাণ-অকল্যাণের ভার সমর্পণ করতে হবে।

শশী কহিল, আসুক সেদিন। তখন, স্বচ্ছন্দ, শান্ত চিত্তে সব দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দিয়েই আমরা ছুটি নেব। কিন্তু আজ না। আজ আত্ম-বলিদানের গুরুভার তারা বইতে পারবে না।

ডাক্তার উঠিয়া আসিয়া তাহার কাঁধের উপর ডান হাত রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না।

অপূর্ব্ব এতক্ষণ নিঃশব্দে স্থির হইয়া শুনিতেছিল, ইহাদের কোন আলোচনাতেই কথা কহে নাই। কিন্তু শশীর শেষের দিকের মন্তব্য তাহার ভারি খারাপ ঠেকিল। যে কৃষকের মঙ্গলোদ্দেশে আত্মনিয়োগের সংকল্প সে স্থির করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে এই সকল অভিমতে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল, মদ খাওয়া খারাপ, বেশ, উনি ছেড়ে দিন, কাব্য-চর্চ্চা ভালো তাই করুন; কিন্তু কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষের কৃষককুল কি এমনি তুচ্ছ, এতই অবহেলার বস্তু? এবং এরাই যদি বড় হয়ে না ওঠে, আপনাদের বিপ্লবই বা করবে কে? এবং করবেই বা কেন? আর পলিটিক্স! যথার্থ বলচি ডাক্তার, কৃষকের কল্যাণে সন্ন্যাস-ব্রত যদি আমি না নিতাম, আজ স্বদেশের রাজনীতিই হোতো আমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য।

ডাক্তার ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সহসা প্রসন্ন স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাস্যে তাহার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন, আমি কায়মনে প্রার্থনা করি তোমার সদুদ্দেশ্য যেন সফল হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রও তাচ্ছিল্যের সামগ্রী নয়। দেশের ও দশের কল্যাণে বৈরাগ্যই যদি গ্রহণ করে থাকো, কারো সঙ্গেই তোমার বিরোধ বাধবে না। আমি শুধু এই কথাই বলি, অপূর্ব্ববাবু, সকলে কিন্তু সকল কাজের যোগ্য হয় না!

অপূর্ব্ব স্বীকার করিয়া বলিল, আমার চেয়ে এ শিক্ষা আর কার বেশি হয়েছে ডাক্তার, আপনি দয়া না করলে বহুদিন পূর্ব্বেই ত এই ভ্রমের চরম দণ্ড আমার

হয়ে যেতো। এই বলিয়া পূর্ব্ব স্মৃতির আঘাতে তাহার সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

শশী এ ঘটনা জানিত না, জানানো কেহ আবশ্যক বিবেচনাও করে নাই। অপূর্ব্বর কথাটাকে সে প্রচলিত বিনয় ও শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শনের অতিরিক্ত কিছুই মনে করিল না। কহিল, ভ্রম ত করে অনেকেই, কিন্তু দণ্ডভোগ করে চলে যে নিজের জন্মভূমি। আমি ভাবি, ডাক্তার, আপনার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কে আছে? কার এতখানি জ্ঞান? জাতি ও দেশ নির্ব্বিশেষে কার কতখানি রাষ্ট্রতন্ত্রের অভিজ্ঞতা? কার এতখানি ব্যথা? অথচ, কিছুই কাজে এলো না। চায়নার আয়োজন নষ্ট হয়ে গেল, পিনাঙের গেল, বর্ম্মার কিছুই রইল না, সিঙ্গাপুরেরও যাবে নিশ্চয়,—এক কথায়, আপনার এতকালের সমস্ত চেষ্টাই ধ্বংস হবার উপক্রম হয়েচে। শুধু প্রাণটাই বাকী, সেও কোন দিন যায়!

ডাক্তার মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিলেন। শশী কহিল, হাসুন আর যাই করুন, এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্চি।

ডাক্তার তেমনি হাসিমুখে প্রশ্ন করিলেন, দিব্যচক্ষে আর কিছু দেখতে পাও না কবি?

শশী বলিল, তাও পাই। তাই ত আপনাকে দেখলেই মনে হয়, নিরুপদ্রব, শান্তিময় পথে যদি আমাদের সত্যকার পথের দাবী সূচ্যগ্র মাত্রও খোলা থাকতো!

অপূর্ব্ব বলিয়া উঠিল, বাঃ। একই সঙ্গে একেবারে দুই উল্টো কথা।

সুমিত্রা হাসি গোপন করিতে মুখ ফিরাইল, ডাক্তার নিজেও হাসিয়া বলিলেন, তার কারণ, ওঁর মধ্যে দুটো সত্তা আছে অপূর্ব্ববাবু। একজন শশী, আর একজন কবি। এই জন্যই একের মুখের কথা অপরের মনের কথায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে এমন বেসুরার সৃষ্টি করে। একটু থামিয়া বলিলেন, বহু মানবের মধ্যেই এমনি আর একজন নিভৃতে বাস করে। সহজে তাকে ধরা যায় না। তাই মানুষের কথার ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব মাত্রই তার কঠোর বিচার করলে অবিচারের সম্ভাবনাই থাকে বেশি। অপূর্ব্ববাবু, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু পারেননি সুমিত্রা। ভারতী, জীবনযাত্রার মাঝখানে যদি এমন আঘাত কখনো পাও দিদি, পরলোকগত দাদার এই কথাটি তখন ভুলো না। কিন্তু, এইবার আমি উঠি। ঘাটে আমার নৌকা বাঁধা আছে, ভাঁটার মুখে অনেকখানি দাঁড় না টানলে আর ভোর রাত্রে জাহাজ ধরতে পারব না।

ভারতী শঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল, কহিল, এই ভয়ঙ্কর নদীতে? এই ভীষণ ঝড়ের রাত্রে?

তাহার ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে সুমিত্রার আত্মসংযমের কঠিন বাঁধ ভাঙিয়া পড়িল। সে পাংশুমুখে প্রশ্ন করিল, সত্যিসত্যিই কি তুমি সিঙ্গাপুরে নামবে নাকি? এ কাজ তুমি কখ্খনো করো না ডাক্তার, সেখানকার পুলিশে তোমাকে ভাল করেই চেনে। এবার তাদের হাত থেকে তুমি কিছুতেই—

কথা তাহার শেষ হইল না, উত্তর আসিল, তারা কি এখানেই আমাকে চেনে না সুমিত্রা?

কিন্তু এই লইয়া তর্ক করিয়া ফল নাই, যুক্তি দেখাইবার অবসর নাই,—হয়ত বা, প্রশ্নটা সুমিত্রা শুনেও নাই; যে কথা বাহিরে আসিবার ব্যাকুলতায় এতদিন মাথা কুটিয়া মরিতেছিল তাহাই অন্ধবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিল,- কেবল একটিবার ডাক্তার, শুধু এইবারটির মত আমার উপরে নির্ভর করে দেখ, তোমাকে আমি সুরাভায়ায় নিয়ে যেতে পারি কিনা! তারপরে টাকায় কি না হয় বল!

ডাক্তার হেঁট হইয়া জুতার ফিতা বাঁধিতেছিল, বাঁধা শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া কহিলেন, টাকায় অনেক কাজ হয় সুমিত্রা, তার অপচয় করতে নেই।

সকলেই বুঝিল, এ আলোচনা বৃথা। উপায়হীন বেদনায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া সুমিত্রা অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। ভারতী কহিল, আমাকে অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে চললে দাদা, অথচ, বারবার বলতে আমাকে,—আর শুধু আমাকে কেন, আমাদের যত বয়সের যেখানে যত মেয়ে আছে তাদের প্রতি তোমার বড় লোভ, সকলকেই তুমি অত্যন্ত ভালোবাসো, সে কি এই?

ডাক্তার সায় দিয়া বলিলেন, সত্যই ভালবাসি ভারতী। মেয়েদের 'পরে যে আমার কত লোভ, কত ভরসা, সে কথা নিজে তোমাদের জানাবার সুযোগ হল না, কিন্তু পারো যদি দাদার হয়ে এই কথাটা তাদের জানিয়ে দিয়ো বোন।

ভারতী সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, জানাবো এই যে, আমাদের শুধু তুমি বলি দিতে চাও।

ডাক্তার মুহূর্ত্তকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, বেশ তাই বোলো। বাঙলাদেশের একটি মেয়েও যদি তার অর্থ বোঝে, আমি তাতেই ধন্য হব। এই বলিয়া তাঁহার সুবৃহৎ বোঁচকাটা কাঁধে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে সকলেই নীচে নামিয়া আসিল। ভারতী শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, দেশের আয়োজন যার নিষ্ফল হয়ে যায়, বিদেশের আয়োজনে তার কি হয় দাদা? যারা অন্তরঙ্গ সুহৃৎ একে একে সবাই ছেড়ে গেল, এখন তুমি একেবারে নিঃসঙ্গ,—একেবারে একা!

ডাক্তার স্বীকার করিয়া কহিলেন, ঠিক তাই। কিন্তু, একাই আরম্ভ করেছিলাম

ভারতী! আর বিদেশ? কিন্তু ভগবান এইটুকু দয়া করেচেন, মানুষের মর্জিমত ছোট বড় প্রাচীরের বেড়া তুলে তাঁর পৃথিবীকে আর সহস্র কারাকক্ষে পৃথক করে রাখবার তিনি জো রাখেননি। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে যতদূর দৃষ্টি যায় বিধাতার রাজপথ একেবারে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। একে রুদ্ধ করে রাখবার চক্রান্ত মানুষের হাতের নাগাল ডিঙিয়ে গেছে। এখন এক প্রান্তের অগ্ন্যুৎপাত অপর প্রান্তে স্ফুলিঙ্গ উড়িয়ে আনবেই আনবে ভারতী, সে তাণ্ডব দেশ-বিদেশের গণ্ডী মানবে না!

কিন্তু, এদিকে যে রুদ্রের সত্যকার তাণ্ডব ঘরের বাহিরে তখন কি উন্মাদ মূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছিল, ভিতর হইতে তাহা কেহই উপলব্ধি করে নাই। বিদ্যুতে, ঝঞ্ঝায়, প্লাবনে ও বজ্রাঘাতে সে যেন একেবারে প্রলয় শুরু হইয়া গিয়াছিল, এবং ডাক্তার অর্গল মুক্ত করিতেই এক ঝলক সুতীক্ষ্ণ বৃষ্টির ছাট ভিতরে ঢুকিয়া সকলকে ভিজাইয়া আলো নিবাইয়া সমস্ত ওলট-পালট করিয়া ঘর ও বাহির চক্ষের পলকে অন্ধকারে একাকার করিয়া দিল।

ডাক্তার ডাকিলেন, সরদারজী!

বাহির হইতে সাড়া আসিল, ইয়েস ডক্টর, রেডি।

সকলে চমকিত হইল। এই দুঃসহ বায়ু ও মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় পাতিয়া কেহ যে এই সূচীভেদ্য আঁধারে দাঁড়াইয়া নিশ্চল নিঃশব্দ প্রহরায় নিযুক্ত থাকিতে পারে এ কথা সহসা যেন কেহ ভাবিতেই পারিল না।

ডাক্তার রহস্যভরে কহিলেন, তাহলে, আসি এখন! এই বলিয়া বাহিরে পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই অপূর্ব্ব ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, একদিন যে আমি প্রাণ পেয়েছিলাম একথা চিরদিন মনে রাখবো ডাক্তার।

অন্ধকার হইতে জবাব আসিল, তুচ্ছ পাওয়ার ব্যাপারটাকেই কেবল বড় করে দেখলে, অপূর্ব্ববাবু, যে দিলে তাকে মনে রাখলে না?

অপূর্ব্ব চীৎকার করিয়া কহিল, মনে? এ-জীবনে ভুলব না। এ ঋণ মরণ পর্য্যন্ত আমি—

দূরে আঁধারের মধ্য হইতে প্রত্যুত্তর আসিল, তাই যেন হয়। প্রার্থনা করি, সত্যকার দাতাকে যেন একদিন তুমি চিনতে পারো অপূর্ব্ববাবু! সেদিন সব্যসাচীর ঋণ—

কথার শেষটা আর শুনা গেল না, অস্ফুটধ্বনি বায়ুবেগে শূন্যে ভাসিয়া গেল। তাহার পরে ক্ষণকালের জন্য যেন কাহারও সংজ্ঞা রহিল না। অচেতন জড়মূর্ত্তির ন্যায় কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল থাকিয়া ভারতী অকস্মাৎ চকিত হইয়া উঠিল এবং দ্রুতবেগে উপরে উঠিয়া আসিতেই সবাই তাহার পিছনে ছুটিয়া আসিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে

জানালা উন্মুক্ত করিয়া দিয়া যতদূর দৃষ্টি যায় নিষ্পলক চক্ষু দুটি অন্ধকারে একাগ্র করিয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল। এমন কতক্ষণ কাটিল। সহসা ভীষণ শব্দে হয়ত কাছে কোথাও বাজ পড়িল এবং তাহারই সুতীব্র বিদ্যুৎ শিখা শুধু পলকের জন্যই আকাশ ও ধরাতল উদ্ভাসিত করিয়া একবার শেষ দেখা দেখাইয়া দিল।

এই ভয়ানক দুর্য্যোগে বাটীর বাহিরে আসিয়া ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার মত উন্মাদ বোধ হয় পুলিশের মধ্যে কেহ ছিল না, তথাপি রাজপথ এড়াইয়া উভয়ে মাঠের দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে। মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড় ও কাঁটা-গাছের বেড়া; এই সূচীভেদ্য আঁধারে পিচ্ছিল পথ-হীন পথে বিপুল বোঝার ভারে একজন আনতদেহে সাবধানে অগ্রসর হইয়াছে এবং অপরের বিরাট পাগড়ির নীচে প্রচণ্ড বারিপাত হইতে যথাসম্ভব নিজের মাথাটা বাঁচাইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে।

নিমিষমাত্র। নিমিষমাত্র পরেই সমস্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া রহিল শুধু নিবিড় অন্ধকার।

হঠাৎ গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিয়া উঠিল, দুর্দ্দিনের বন্ধু! নমস্কার সরদারজি!

সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্বও তাহার দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিঃশব্দে নমস্কার করিল। তাহার মনের মধ্যে হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল।

ভারতী তেমনি পাষাণ মূর্ত্তির মতই অন্ধকারে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শশীর কথাও যেমন তাহার কানে গেল না, তেমনি জানিতেও পারিল না ঠিক তাহারই মত আর একজন নারীর দুই চক্ষু প্লাবিয়া তখন এমনি অশ্রুপ্রবাহই বহিয়া যাইতেছিল।

মহেশ

মহেশ

১

গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট তবু দাপটে তাঁর-প্রজারা টুঁ শব্দটি করিতে পারে না—এমনই প্রতাপ।

ছোট ছেলের জন্মতিথি পূজা। পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহরবেলায় বাটী ফিরিতে-ছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।

সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মত তাহাদের সর্পিল ঊর্দ্ধ গতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে—যেন নেশা লাগে।

ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ি। তাহার প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে; এবং অন্তঃপুরের লজ্জা-সম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

পথের ধারে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ওরে, ও গফরা, বলি, ঘরে আছিস্ ?

তাহার বছর-দশেকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কেন বাবাকে ? বাবার যে জ্বর!

জ্বর! ডেকে দে হারামজাদাকে। পাষণ্ড! ম্লেচ্ছ!

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙা প্রাচীরের গা ঘেঁসিয়া একটা পুরাতন বাবলা গাছ—তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্চে কি শুনি ? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে ? তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁঝে রক্তবর্ণ, সুতরাং সে মুখ দিয়া তপ্ত খরবাক্যই বাহির হইবে, কিন্তু হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া গফুর শুধু চাহিয়া রহিল।

তর্করত্ন বলিলেন, সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফেরবার পথে দেখচি তেমনি ঠায় বাঁধা। গোহত্যা হলে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়!

কি করব বাবাঠাকুর, বড় লাচারে পড়ে গেছি। কদিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি, ধরে যে দুখুঁটো খাইয়ে আনব—তা মাথা ঘুরে পড়ে যাই।

তবে ছেড়ে দে না, আপনি চরাই করে আসুক।

কোথায় ছাড়বো বাবাঠাকুর, লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয়নি—খামারে পড়ে; খড় এখনো গাদি দেওয়া হয় নি, মাঠের আলগুলো সব জ্বলে গেল—কোথাও এক মুঠো ঘাস নেই। কার ধানে মুখ দেবে, গাদা ফেড়ে খাবে—ক্যামনে ছাড়ি বাবাঠাকুর?

তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন, না ছাড়িস্ ত ঠাণ্ডায় কোথাও বেঁধে দিয়ে দু-আঁটি বিচুলি ফেলে দে না ততক্ষণ চিবোক। তোর মেয়ে ভাত রাঁধে নি? ক্যানে-জলে দে না, এক গামলা খাক।

গফুর জবাব দিল না। নিরুপায়ের মত তর্করত্নের মুখের পানে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তর্করত্ন বলিলেন, তাও নেই বুঝি? কি করলি খড়? ভাগে এবার যা পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ? গরুটার জন্যে এক আঁটি ফেলে রাখতে নেই? ব্যাটা কসাই।

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন-খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে কর্তামশায় সব ধরে রাখলেন। কেঁদে কেটে হাতে-পায়ে পড়ে বললাম, বাবু-মশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাবো কোথায়, আমাকে পণ-দশেক বিচুলিও না হয় দাও। চালে খড় নেই—একখানি ঘর, বাপ-বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাতার গোঁজা-গাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেরে আমার মহেশ মরে যাবে।

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, ইস্! সাধ করে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ! হেসে বাঁচি নে!

কিন্তু এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেল না, সে বলিতে লাগিল, কিন্তু হাকিমের দয়া হ'ল না। মাস-দুয়েক খোরাকের মত ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হয়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলে না। বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার অশ্রুভারে ভারী হইয়া উঠিল। কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না; কহিলেন, আচ্ছা মানুষ ত তুই—খেয়ে রেখেছিস, দিবি নে, জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে না কি। তোরা ত রাম রাজত্বে বাস করিস্—ছোটলোক কিনা, তাই তাঁর নিন্দে করে মরিস্।

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, নিন্দে করব কেন বাবাঠাকুর, নিন্দে তার আমরা করি নে। কিন্তু কোথা থেকে দিই বল ত? বিঘে-চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপরি উপরি দু'সন অজন্মা—মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল—বাপ-বেটিতে দুবেলা দুটো পেট ভরে খেতে পর্য্যন্ত পাই নে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ, বিষ্টি-বাদলে মেয়েটিকে নিয়ে কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজরা গোনা যাচ্চে—দাও না ঠাকুরমশাই, কাহন-দুই ধার, গরুটাকে দুদিন পেটপুরে খেতে দিই। বলিতে বলিতেই সে ধপ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন তীরবৎ দু'পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, আঃ মর, ছুঁয়ে ফেলবি না কি?

না বাবাঠাকুর, ছোঁব কেন, ছোঁব না। কিন্তু দাও না এবার আমাকে কাহন-দুই খড়। তোমার চার চারটে গাদা সেদিন দেখে এসেছি—এ কটি দিলে তুমি টেরও পাবে না। আমরা না খেয়ে মরি ক্ষতি নেই, কিন্তু ও আমার অবলা জীব—কথা বলতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

তর্করত্ন কহিল, ধার নিবি, শুধবি কি করে শুনি?

গফুর আশান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, যেমন করে পারি শুধবো বাবাঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।

তর্করত্ন মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া গফুরের ব্যাকুলকণ্ঠের অনুকরণ করিয়া কহিলেন, ফাঁকি দেব না! যেমন করে পারি শুধবো! রসিক নাগর! যা যা সর, পথ ছাড়। ঘরে যাই, বেলা হ'য়ে গেল। এই বলিয়া তিনি একটু মুচকিয়া হাসিয়া পা বাড়াইয়াই সহসা সভয়ে পিছাইয়া গিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, আ মর্, শিঙ নেড়ে আসে যে, গুঁতোবে না কি!

গফুর উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরের হাতে ফল-মূল ও ভিজা চালের পুঁটুলি ছিল, সেইটা দেখাইয়া কহিল, গন্ধ পেয়েচে, এক মুঠো খেতে চায়—

খেতে চায়? তা বটে! যেমন চাষা তার তেমনি বলদ। খড় জোটে না, চাল-কলা খাওয়া চাই! নে নে, পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ। যে শিঙ, কোন্ দিন দেখচি কাকে খুন করবে। এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গফুর সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার গভীর কালো চোখ দুটি বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা, কহিল, তোকে দিলে না এক মুঠো? ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না! না দিক্ গে—তাহার গলা বুজিয়া আসিল, তার পরে চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে

লাগিল। কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলতে লাগিল, মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস্, তোকে আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারি নে—কিন্তু তুই ত জানিস্ তোকে আমি কত ভালবাসি।

মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল। গফুর চোখের জল গরুটার পিঠের উপর রগড়াইয়া মুছিয়া ফেলিয়া তেমনি অস্ফুটে কহিতে লাগিল, জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশান ধারে গাঁয়ের যে গোচর-টুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি করে দিলে, এই দুর্ব্বচ্ছরে তোকে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখি বল? ছেড়ে দিলে তুই পরের গাদা ফেড়ে খাবি, মানুষের কলাগাছে মুখ দিবি—তোকে নিয়ে আমি কি করি! গায়ে আর তোর জোর নেই, দেশের কেউ তোকে চায় না—লোকে বলে তোকে গো-হাটায় বেচে ফেলতে—কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়াই আবার তাহার দুচোখ বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া গফুর একবার এদিক-ওদিকে চাহিল, তার পরে ভাঙা ঘরের পিছন হইতে কতকটা পুরানো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের কাছে রাখিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, নে, শিগ্‌গির করে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরি হ'লে আবার—

বাবা?

কেন মা?

ভাত খাবে এসো, বলিয়া আমিনা ঘর হইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মহেশকে আবার চাল কেড়ে খড় দিয়েচ বাবা?

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল, লজ্জিত হইয়া বলিল, পুরোনো পড়া খড় মা, আপনিই ঝরে যাচ্ছিল—

আমি যে ভেতর থেকে শুনতে পেলাম বাবা তুমি টেনে বার করচ?

না মা, ঠিক টেনে নয় বটে—

কিন্তু দেওয়ালটা যে পড়ে যাবে বাবা—

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটিমাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গিয়াছে এবং এমন করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না এ-কথা তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশি জানে? অথচ এ উপায়েই বা কটা দিন চলে।

মেয়ে কহিল, হাত ধুয়ে, ভাত খাবে এসো বাবা, আমি বেড়ে দিয়েচি।

গফুর কহিল, ফ্যানটুকু দে ত মা, একেবারে খাইয়ে দিয়ে যাই।

ফ্যান যে আজ নেই বাবা, হাঁড়িতেই মরে গেছে।

নেই ? গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখের দিনে এটুকুও যে নষ্ট করা যায় না এই দশ বছরের মেয়েটাও তাহা বুঝিয়াছে। হাত ধুইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া দিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটির সান্‌কিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল, আমিনা, আমার গায়ে যে আবার শীত করে মা—জ্বর গায়ে খাওয়া কি ভাল ?

আমিনা উদ্বিগ্নমুখে কহিল, কিন্তু তখন যে বললে বড় ক্ষিধে পেয়েছে ?

তখন ? তখন হয় ত জ্বর ছিল না মা।

তা হলে তুলে রেখে দি, সাঁঝের-বেলা খেয়ো ?

গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়বে আমিনা।

আমিনা কহিল, তবে ?

গফুর কত কি যেন চিন্তা করিয়া হঠাৎ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল ; কহিল, এক কাজ কর না মা, মহেশকে না হয় ধরে দিয়ে আয়। তখন রাত্তের-বেলা আমাকে এক মুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবি নে আমিনা ? প্রত্যুত্তরে আমিনা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পারব বাবা।

গফুরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।

২

পাঁচ-সাত দিন পরে একদিন পীড়িত গফুর চিন্তিত মুখে দাওয়ায় বসিয়াছিল, তাহার মহেশ কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত ফিরে নাই। নিজে সে শক্তিহীন, তাই আমিনা সকাল হইতে সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্ত-বেলায় সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শুনেচ বাবা, মানিক ঘোষেরা মহেশকে আমাদের থানায় দিয়েছে।

গফুর কহিল, দুর পাগলি!

হাঁ বাবা, সত্যি। তাদের চাকর বললে, তোর বাপকে বল গে যা দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে খুঁজতে।

কি করেছিল সে?

তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করেছে বাবা।

গফুর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মহেশের সম্বন্ধে সে মনে মনে বহুপ্রকারের দুর্ঘটনা কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু ও আশঙ্কা ছিল না। সে যেমন নিরীহ,তেমনি গরীব, সুতরাং প্রতিবেশী কেহ তাহাকে এত বড় শাস্তি দিতে পারে এ ভয় তাহার নাই। বিশেষতঃ মানিক ঘোষ। গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি তাহার এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

মেয়ে কহিল, বেলা যে পড়ে এল বাবা, মহেশকে আনতে যাবে না?

গফুর বলিল, না।

কিন্তু তারা যে বললে তিনদিন হলেই পুলিশের লোক তাকে গো-হাটায় বেচে ফেলবে?

গফুর কহিল, ফেলুক গে।

গো-হাটা বস্তুটা যে ঠিক কি, আমিনা তাহা জানিত না, কিন্তু মহেশের সম্পর্কে ইহার উল্লেখমাত্রেই তাহার পিতা যে কিরূপ বিচলিত হইয়া উঠিত ইহা সে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছে. কিন্তু আজ সে আর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাত্রের অন্ধকারে লুকাইয়া গফুর বংশীর দোকানে আসিয়া কহিল, খুড়ো, একটা টাকা দিতে হবে, এই বলিয়া সে তাহার পিতলের থালাটী বসিবার মাচার নীচে রাখিয়া দিল। এই বস্তুটির ওজন ইত্যাদি বংশীর সুপরিচিত। বছর-দুয়ের মধ্যে সে বার-পাঁচেক ইহাকে বন্ধক রাখিয়া একটি করিয়া টাকা দিয়াছে। অতএব আজও আপত্তি করিল না।

পরদিন যথাস্থানে আবার মহেশকে দেখা গেল। সেই বাবলাতলা, সেই দড়ি,

সেই খুঁটা, সেই তৃণহীন শূন্য আধার, সেই ক্ষুধাতুর কালো চোখের সজল উৎসুক দৃষ্টি। একজন বুড়ো-গোছের মুসলমান তাহাকে অত্যন্ত তীব্র চক্ষু দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। অদূরে একধারে দুই হাঁটু জড় করিয়া গফুর মিঞা চুপ করিয়া বসিয়াছিল, পরীক্ষা শেষ করিয়া বুড়া চাদরের খুঁট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া বার বার মসৃণ করিয়া লইয়া তাহার কাছে গিয়া কহিল, আর ভাঙাব না, এই পুরোপুরিই দিলাম —নাও।

গফুর হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া তেমনি নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। যে দুইজন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা গরুর দড়ি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই কিন্তু সে অকস্মাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দড়িতে হাত দিয়ো না বলচি—খবরদার বলচি, ভাল হবে না।

তাহারা চমকিয়া গেল। বুড়ো আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কেন?

গফুর তেমনি রাগিয়া জবাব দিল, কেন আবার কি! আমার জিনিস আমি বেচব না—আমার খুশি। বলিয়া সে নোটখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তাহারা কহিল, কাল পথে আসতে বায়না নিয়ে এলে যে?

এই নাও না তোমাদের বায়না ফিরিয়ে। বলিয়া সে ট্যাঁক হইতে দুটো টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। একটা কলহ বাধিবার উপক্রম হয় দেখিয়া হাসিয়া ধীরভাবে কহিল, চাপ দিয়ে আর দুটাকা বেশি নেবে, এই ত? দাও হে, পানি খেতে ওর মেয়ের হাতে দুটো টাকা দাও। কেমন, এই না?

না।

কিন্তু এর বেশি কেউ একটা আধলা দেবে না তা জানো?

গফুর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

বুড়ো বিরক্ত হইল, কহিল, না ত কি? চামড়াটাই যা দামে বিকোবে, নইলে মাল আর আছে কি?

তোবা! তোবা! গফুরের মুখ দিয়ে হঠাৎ একটা বিশ্রী কটু কথা বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া শাসাইতে লাগিল যে তাহারা যদি অবিলম্বে গ্রাম ছাড়িয়া না যায় ত জমিদারের লোক ডাকিয়া জুতা-পেটা করিয়া ছাড়িবে।

হাঙ্গামা দেখিয়া লোকগুলা চলিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জমিদারের সদর হইতে তাহার ডাক পড়িল। গফুর বুঝিল, এ কথা কর্ত্তার কানে গিয়াছে।

সদরে ভদ্র অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তি বসিয়াছিল, শিববাবু চোখ রাঙা করিয়া

কহিলেন, গফ্‌রা তোকে যে আমি কি সাজা দেব ভেবে পাই নে। কোথায় বাস করে আছিস্‌, জানিস ?

গফুর হাত জোড় করিয়া কহিল, জানি। আমরা খেতে পাই নে, নইলে আজ আপনি যা জরিমানা করতেন আমি না করতাম না।

সকলেই বিস্মিত হইল। এই লোকটাকে জেদি এবং বদ্‌-মেজাজি বলিয়াই তাহারা জানিত। সে কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল, এমন কাজ আর কখনো করব না কর্ত্তা! বলিয়া সে নিজের দুই হাত দিয়া নিজের দুই কান মলিল, এবং প্রাঙ্গণের একদিক হইতে আর একদিক পর্য্যন্ত নাকখত দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিববাবু সদয়কণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা, যা যা হয়েচে। আর কখনো এ সব মতি-বুদ্ধি করিস নে।

বিবরণ শুনিয়া সকলেই কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন এবং এ মহাপাতক যে শুধু কর্ত্তার পুণ্য প্রভাবে ও শাসন ভয়েই নিবারিত হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সংশয়-মাত্র রহিল না। তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন, তিনি গো-শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিলেন এবং যে জন্য এই ধর্ম্মজ্ঞানহীন ম্লেচ্ছজাতিকে গ্রামের ত্রিসীমানায় বসবাস করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করিয়া দিলেন।

গফুর একটা কথার জবাব দিল না, যথার্থ প্রাপ্য মনে করিয়া অপমান ও সকল তিরস্কার সবিনয়ে মাথা পাতিয়া লইয়া প্রসন্নচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশী-দের গৃহ হইতে ফ্যান চাহিয়া আনিয়া মহেশকে খাওয়াইল এবং তাহার গায়ে মাথায় ও শিঙে বারংবার হাত বুলাইয়া অস্ফুটে কত কথাই বলিতে লাগিল।

৩

জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আসিল। রুদ্রের যে মূর্ত্তি একদিন শেষ বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে যে কত ভীষণ, কত বড় কঠোর হইয়া উঠিতে পারে তাহা আজিকার আকাশের প্রতি না চাহিলে উপলব্ধি করাই যায় না। কোথাও যেন করুণার আভাস পর্য্যন্ত নাই। কখনো এ-রূপের লেশমাত্র পরিবর্ত্তন হইতে পারে, আবার কোন দিন এ আকাশ মেঘভরে স্নিগ্ধ সজল হইয়া দেখা দিতে পারে আজ এ-কথা ভাবিতে যেন ভয় হয়। মনে হয় সমস্ত প্রজ্বলিত নভঃস্থল ব্যাপিয়া যে অগ্নি অহরহঃ ঝরিতেছে ইহার অন্ত নাই, সমাপ্তি নাই—সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া না গেলে এ আর থামিবে না।

এমনি দিনে দ্বিপ্রহর-বেলায় গফুর ফিরিয়া আসিল। পরের দ্বারে জন-মজুর খাটা তাহার অভ্যাস নয় এবং মাত্র দিন চার-পাঁচ তাহার জ্বর থামিয়াছে, কিন্তু দেহ যেমন দুর্ব্বল তেমনি শ্রান্ত, তবুও আজ সে কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রচণ্ড রৌদ্র কেবল তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, আর কোন ফল হয় নাই। ক্ষুধায় পিপাসায় ও ক্লান্তিতে সে প্রায় অন্ধকার দেখিতেছিল, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, আমিনা, ভাত হয়েচে রে?

মেয়ে ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নিরুত্তরে খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল।

জবাব না পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল, হয়েচে ভাত? কি বললি—হয় নি? কেন শুনি?

চাল নেই বাবা!

চাল নেই? সকালে আমাকে বলিস্ নি কেন?

তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম?

গফুর মুখ ভ্যাঙাইয়া কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া কহিল, রাত্তিরে যে বলেছিলুম! রাত্তিরে বললে কারু মনে থাকে? নিজের কর্কশকণ্ঠে ক্রোধ তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। মুখ অধিকতর বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, চাল থাকবে কি করে? রোগা বাপ খাক আর না খাক বুড়ো মেয়ে চারবার পাঁচবার করে ভাত গিলবি! এবার থেকে চাল আমি কুলুপ বন্ধ করে বাইরে যাবো। দে, একঘটি জল দে, তেষ্টায় বুক ফেটে গেল। বল্, তাও নেই।

আমিনা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া গফুর যখন বুঝিল গৃহে তৃষ্ণার জল পর্য্যন্ত নাই, তখন সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। দ্রুতপদে কাছে গিয়া ঠাস করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, মুখপোড়া হারামজাদা মেয়ে, সারাদিন তুই করিস কি? এত লোকে মরে তুই মরিস্ নে!

মেয়ে কথাটি কহিল না, মাটির শূন্য কলসীটি তুলিয়া লইয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিঁধিল। মা-মরা মেয়েটিকে সে যে কি করিয়া মানুষ করিয়াছে সে কেবল সেই জানে। তাহার মনে পড়িল তাহার এই স্নেহশীলা ধর্ম্ম-পরায়ণা শান্ত মেয়েটির কোন দোষ নাই। ক্ষেতের সামান্য ধান কয়টি ফুরানো পর্য্যন্ত তাহাদের পেট ভরিয়া দুবেলা অন্ন জুটে না। কোনদিন একবেলা, কোনদিন বা তাহাও নয়। দিনে পাঁচ-ছয়বার ভাত খাওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি মিথ্যা এবং পিপাসার জল না থাকার হেতুও তাহার অবিদিত নয়। গ্রামে যে দুই-তিনটা পুষ্করিণী

আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণবাবুর খিড়কীর পুকুরে যা একটু জল আছে তা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত খুঁড়িয়া যাহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেমনি ভিড়। বিশেষতঃ মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা ত কাছেই ঘেঁসিতে পারে না। ঘণ্টার পরে ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয় বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে একটু ঢালিয়া দেয় সেইটুকুই সে ঘরে আনে। এসমস্তই সে জানে। হয়ত আজ জল ছিল না, কিংবা কাড়াকাড়ির মাঝখানে কেহ মেয়েকে তাহার কৃপা করিবার অবসর পায় নাই—এমনিই কিছু একটা হইয়া থাকিবে নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার নিজের চোখেও জল ভরিয়া আসিল। এমনি সময়ে জমিদারের পিয়াদা যমদূতের ন্যায় আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল, চিৎকার করিয়া ডাকিল, গফ্‌রা ঘরে আছিস্?

গফুর তিক্তকণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, আছি। কেন?

বাবুমশায় ডাকচেন, আয়।

গফুর কহিল, আমার খাওয়া-দাওয়া হয় নি, পরে যাবো।

এতবড় স্পর্দ্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কুৎসিত একটা সম্বোধন করিয়া কহিল, বাবুর হুকুম জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।

গফুর দ্বিতীয়বার আত্মবিস্মৃত হইল, সেও একটা দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবো না।

কিন্তু সংসারে অত ক্ষুদ্রের অতবড় দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয়, বিপদের কারণ। রক্ষা এই যে অত ক্ষীণকণ্ঠ অতবড় কানে গিয়া পৌঁছায় না—না হইলে তাঁহার মুখের অন্ন ও চোখের নিদ্রা দুই-ই ঘুচিয়া যাইত। তাহার পর কি ঘটিল বিস্তারিত করিয়া বলার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঘণ্টা-খানেক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাঁহার চোখ-মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার এত বড় শাস্তির হেতু প্রধানতঃ মহেশ। গফুর বাটী হইতে বাহির হইবার পরে সেও দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং জমিদারের প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে, পরিশেষে ধরিবার উপক্রম করায় বাবুর ছোটমেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে। এরূপ ঘটনা এই প্রথম নয়—ইতিপূর্ব্বেও ঘটিয়াছে, শুধু গরীব বলিয়াই তাহাকে মাপ করা হইয়াছে। পূর্ব্বের মত এবারও সে আসিয়া হাতে-পায়ে পড়িলে হয় ত ক্ষমা করা হইত, কিন্তু সে যে কর দিয়া বাস করে বলিয়া কাহারও গোলাম নয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে—প্রজার মুখের এতবড় স্পর্দ্ধা

জমিদার হইয়া শিবচরণবাবু কোন মতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেখানে সে প্রহার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ মাত্র করে নাই, সমস্ত মুখ বুঁজিয়া সহিয়াছে, ঘরে আসিয়াও সে তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা তাহার মনে ছিল না, কিন্তু বুকের ভিতরটা যেন বাহিরের মধ্যাহ্ন আকাশের মতই জ্বলিতে লাগিল। এমন কতক্ষণ কাটিল তাহার হুঁশ ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে সহসা তাহার মেয়ের আর্তকণ্ঠ কানে যাইতেই সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছুটিয়া বাহিরে আসিতে দেখিল, আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং বিক্ষিপ্ত ভাঙা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মত যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপর সজোরে আঘাত করিল।

একটিবারমাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরে তাহার অনাহার-ক্লিষ্ট শীর্ণদেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বাহিয়া ফোঁটাকয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার-দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে সম্মুখ ও পশ্চাতের পা দুটা তাহার যতদূর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমিনা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কি করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে মরে গেল!

গফুর নড়িল না, জবাব দিল না, শুধু নির্নিমেষচক্ষে আর এক জোড়া নিমেষহীন গভীর কালোচক্ষের পানে চাহিয়া পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিল।

ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যে সংবাদ পাইয়া গ্রামান্তের মুচির দল আসিয়া জুটিল, তাহারা বাঁশে বাঁধিয়া মহেশকে ভাগাড়ে লইয়া চলিল। তাহাদের হাতে ধারালো চক্‌চকে ছুরি দেখিয়া গফুর শিহরিয়া চক্ষু মুদিল, কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

পাড়ার লোকে কহিল, তর্করত্নের কাছে ব্যবস্থা নিতে জমিদার লোক পাঠিয়েছেন, প্রাচিত্তিরের খরচ যোগাতে এবার তাকে না ভিটে বেচতে হয়।

গফুর এ সকল কথায় উত্তর দিল না, দুই হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া ঠায় বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিয়া কহিল, আমিনা, চল্ আমরা যাই—

সে দাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কোথায় বাবা?

গফুর কহিল, ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।

মেয়ে আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্ব্বে অনেক দুঃখেও পিতা তাহার

কলে কাজ করিতে রাজি হয় নাই—সেখানে ধর্ম্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত আব্রু থাকে না, একথা সে বহুবার শুনিয়াছে।

গফুর কহিল, দেরি করিস্ নে মা চল্, অনেক পথ হাঁটতে হবে।

আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল, গফুর নিষেধ করিল, ওসব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছুই নাই। আঙিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ ক'রো না।

বারোয়ারি

বারোয়ারি

২১

অরুণের মুখে শাশুড়ীর ওই দুর্দ্দান্ত অসুখের কথা শুনে কমলার দু'চক্ষু ছল্ ছল্ করে এল। এবং বিশেষ করে, সে যখন জানালে যে জামাইবাবু নিরুদ্দেশ, হয় ত বা তিনি এখন হিমালয়ের কোন গুহার মধ্যে তপস্যায় নিযুক্ত, এবং তাঁকে একটা সংবাদ দেওয়া পর্য্যন্ত সম্ভবপর নয়, তখন সেই দুটি চোখ দিয়ে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ধারা বেয়ে নেমে এল।

হঠাৎ কি কারণে যে সতীশ সংসার ত্যাগ করে চলে গেল, এ-কথা মনে মনে সবাই বুঝলে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ উচ্চারণ পর্য্যন্ত করতে পারলে না।

অরুণ বললে, শুধু কি এই? ডাক্তারের কাছে শুনে এলুম দুর্নামের ভয়ে পাড়ার কেউ শুশ্রূষা পর্য্যন্ত করতে রাজি নয়। একেই ত ওদের গ্রামে মানুষের চেয়ে জানোয়ারই বেশি. তার ওপর যদি এই উৎপাত হয় ত বুড়ী বে-ঘোরেই মারা যাবে।

কমলা আঁচলে চোখ মুছে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ অরুণ, মা কি তবে একলাই পড়ে আছেন? মুখে একফোঁটা জল দেবারও কি কেউ নেই?

অরুণ বললে—অবস্থা ত তাই বটে,—আমাকে ত একরকম দোর ভেঙেই বাড়ি ঢুকতে হয়েছিল, তবে, আজ রাতটার মত একটা বন্দোবস্ত করে এসেছি, ডাক্তারবাবু তাঁর হিন্দুস্থানী দাসীটাকে পাঠিয়ে দেবেন ভরসা দিয়েছেন।

যাক্, বাঁচা গেল। বলে হরেন একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, রাতটা ত কাটুক; ভোর পাঁচটায় একটা ট্রেন আছে, আমরা তাইতে বেরিয়ে পড়লে সকাল নাগাদ কমলাকে পৌছে দিতে পারবো।

ক্ষিতীশ এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করেই ছিল, মুখ তুলে বললে, কমলাকে নিয়ে যাবে? হঠাৎ ওঁকে নিয়ে গিয়ে কি সুবিধে হবে হরেন?

বাঃ, সুবিধে হবে না? সতীশ যখন নেই, তখন শাশুড়ীর সমস্ত দায়িত্ব ত এখন ওরই। তাছাড়া দেখবে কে? শুনলে ত গ্রামের মেয়েরা দুর্নামের ভয়ে বুড়ীর কাছে ঘেঁসতে পর্য্যন্ত রাজি নয়। কে সেবা করে বল ত?

ক্ষিতীশ লোকটা অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিও নয়, আগাগোড়া ভেবে-চিন্তে হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করাও তার সম্ভব নয়, কিন্তু ভিতরে একটা গোপন বেদনা কিছুদিন থেকে ওই দিকের দৃষ্টিকে তার অত্যন্ত প্রখর কোরে তুলেছিল, সে ক্ষণকাল চুপ

কোরে থেকে বললে, কথাটা ঠিক সত্য নয়, হরেন। আমার মনে হয় তাঁর অসুখের খবর পাড়ার মেয়েরা জানেন না। কারণ আমার নিজের বাড়িও ত পল্লীগ্রামে, সেখানে বাপের বাড়ি থেকে বৌ হারিয়ে গেলে শাশুড়ীর জাত যেতে আমি আজও দেখিনি, এবং এই দোষে পাড়ার মেয়েরা পীড়িতের সেবা করেন না, এত বড় কলঙ্কও তাঁদের দেওয়া চলে না হরেন।

অভিযোগটা হরেনের নিজের গায়েও বিঁধলো। সে লজ্জিতমুখে জবাব দিলে, বেশ ত ক্ষিতীশ, সেবা না হয় তাঁরা করতে পারেন, কিন্তু তাই বলে এত বড় একটা টাইফয়েড রোগের সেবাও তাঁরা নিয়মিত কোরে যাবেন, এত বড় বোঝাও ত তাঁদের চাপানো যায় না, ভাই।

ক্ষিতীশ বললে, ওটা যে টাইফয়েড তাও নিশ্চয় বলা যায় না। অন্ততঃ, একটা দিনের জ্বরকে অত-বড় একটা নামের ঘটা দিয়ে না ডাকাই ভাল হরেন।

হরেন চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলে, তাহলে কি করা যায় বল ?

এতক্ষণ পর্য্যন্ত অরুণ বড়দের কথায় কথা কয়নি, চুপ করেই শুনছিল, এবার বলে উঠলো, দিদির শাশুড়ী সকাল থেকে জ্বরে বেহুঁশ এই আমি শুনে এসেছি, কিন্তু জ্বরটা যে কেবল আজই হয়েছে তাও ত জানিনে। হয় ত বা ক'দিন থেকে -

ক্ষিতীশ কথাটা তার শেষ করতেও দিলে না, কানেও নিলে না, বললে, তাছাড়া একটা বড়া কথা আছে হরেন। তাঁর সামান্য জ্বর—হয়ত দু'চার দিনেই সেরে যাবে, কিন্তু মাঝখানে সহসা কমলাকে নিয়ে গেলে পল্লীগ্রামে কত বড় একটা সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি হতে পারে, ভেবে দেখ দিকি ? সতীশের মা জ্বরের ঘোরে হয়ত বলেছেন যে তিনি কমলার কলঙ্ক বিশ্বাস করেন না। কিন্তু—

কিন্তুটা ওখানেই থেমে গেল। অরুণের মত ক্ষিতীশের নিজের বক্তব্যটাও শেষ হতে পেল না। কমলা এতদূর পর্য্যন্ত নীরবে শুনছিল, হঠাৎ তার কান্না যেন একেবারে সহস্রধারে ফেটে পড়ল। অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠলো,—কিন্তু কি ক্ষিতীশদা ? আমাকে কি তোমরা এইখানেই বেঁধে রাখতে চাও ? আমার শাশুড়ীর ব্যামো তিনি কাছে নেই, আমি না গেলে কে যাবে বল ত ?

ক্ষিতীশ হতবুদ্ধি হয়ে বলতে গেল, তা বটে, কিন্তু ভেবে দেখলে—

কমলা তেমনি কাঁদতে কাঁদতে বললে, ভেবে কি দেখতে চাও শুনি ? কেবল ভেবে ভেবেই ত আজ আমার এই দশা করেছ। হরেনের মুখের দিকে চোখ তুলে বললে, আমি দোষ করিনি,—আমার ভালর জন্যে যদি তোমরা অত ফন্দি-ফিকির না করে সোজা আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে ত আজ হয়ত আমার ভালই হতো,

তোমাদেরও আমার জন্যে এমন ভেবে সারা হতে হ'তো না। আমি আর তোমাদের সাহায্য চাইনে, কেবল অরুণকে সঙ্গে নিয়ে কাল ভোরেই চলে যাবো। আমার ভাগ্যে যা আছে তা হোক, তোমরা আর আমার ভালোর চেষ্টা করো না।

ক্ষিতীশ এবং হরেন দু'জনেই চমকে গেল। কমলাকে এমন করে কথা বলতে কেউ কখনো শোনেনি। ভাল-মন্দ সম্বন্ধে তার নিজের ব্যক্তিগত যে কোন মতামত আছে আপনার দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া, এবং তার সংশোধনের সমস্ত ভার অপরের উপর নির্ভর করা ভিন্ন সেও যে আবার মনে মনে কিছু চিন্তা করে, একথা তারা দু'জনেই একপ্রকার ভুলে গিয়েছিল।

হরেনের মুখে সহসা কোন উত্তর যোগাল না, এবং ক্ষিতীশ বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে চেয়ে রইলো। কিন্তু এ-কথা বুঝতে আর তাদের বাকী রইলো না যে, তাদের উভয়ের সম্মিলিত দুশ্চিন্তাকেও বহু দূরে অতিক্রম করে আর এক-জনের উদ্বেগ কোথায় এগিয়ে গেছে।

কমলা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলে বললে, তোমরা মনে করো না, ক্ষিতীশদা, তোমাদের দয়া আমি কোনদিন ভুলতে পারবো, কিন্তু আজ তোমাদের হাত জোড় কোরে জানাচ্ছি ভাই,—বলতে বলতেই তার দুচোখ বেয়ে ঝর ঝর করে আবার জল গড়িয়ে পড়ল, কিন্তু এবার সে জল মোছবার চেষ্টাও করলে না, হাত-দুটি জোড় করে বলতে লাগল—আমার জন্যে তোমরা যে কত দুঃখ পেলে, সে আমি জানি, আর ভগবানই জানেন, কিন্তু আর একটা দিনও না। আজ থেকে আমার দুর্ভাগ্যের সমস্ত ভারই আমি নিজের মাথায় তুলে নিলুম। ক্ষিতীশদা, এক-দিন যেমন আমাকে তুমি পথ থেকে এনে বাঁচিয়েছিল, আজ তেমনি আমাকে কেবল এই আশীর্ব্বাদ তুমি কর, এর থেকেও একটা যেন কোথাও কূল পাই,—আর না তোমাদের দুঃখ দিতে ফিরে আসি!

ক্ষিতীশ চোখ ফিরিয়ে বোধ হয় তার চোখের জলটাই গোপন করলে, কিন্তু হরেন বললে, আমরা দুজনে সেই আশীর্ব্বাদই তোকে করি কমলা, আমি বলচি এ বিপদ একদিন তোর কেটে যাবেই—কিন্তু কাল সকালে আমিও কেন তোর সঙ্গে যাইনে?

কমলা ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

হরেন উত্তেজনার সঙ্গে বলে উঠলো, না কেন কমলা? আমি যদি তোর সত্যিকারের দাদা হতুম, তা' হলে ত তুই না বলতে পারতিস্ নে!

তার শেষ কথাটায় এত দুঃখেও কমলার মুখখানি লজ্জায় রাঙা হয়ে গেলো, সে আধোমুখে তেমনি নীরবে মাথা নেড়ে বললে, না।

তার এই লজ্জাটা হরেনের অগোচর রইল না। কিন্তু পরস্পরের নাম নিয়ে এই যে একটা লজ্জাকর অপবাদ একে সে যে বিন্দুমাত্র স্বীকার করে না, এই কথাটাই সদর্পে জানাবার জন্যে হরেন তীব্রকণ্ঠে বলে ফেললে, তুই কি ভাবিস্ কমলা, আমি মিথ্যে দুর্নামকে ভয় করি? বাবার অন্যায় শাসন গ্রাহ্য করি? আমি যাবো তোর সঙ্গে, দেখি গ্রামের কে আমার মুখের সামনে তোকে কিছু বলতে পারে। তার জবাব আমি দিতে পারবো, কিন্তু ছেলেমানুষ অরুণ পারবে না।

কমলা সজল চোখ দুটি তার মুখের পানে তুলে বললে, অরুণ পারবে না সত্যি, কিন্তু তোমারও পেরে কাজ নেই হরেনদা। আমার বোঝা আমাকে বইতে দাও, আর আমার সমস্যাকে তোমরা জটিল করে তুলো না।

হরেন বললে, গ্রামের লোকগুলোকে একবার ভেবে দেখ কমলা। সেখানে একাকী তোর অদৃষ্টে কি যে না ঘটতে পারে, সে তো আমি ভেবেও পাইনে!

কমলা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। সে আর কথা কাটাকাটি না করে শুধু উপরের দিকে মুখ তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বললে,—তিনিই জানেন। এই বলে সে হাতদুটি মাথায় ঠেকিয়ে উদ্দেশে কাকে যেন প্রণাম কোরেই, দ্রুত-পদে উঠে অন্য ঘরে চলে গেল।

কয়েক মুহূর্ত্ত কারও মুখ দিয়েই কোন কথা বার হলো না, সবাই যেন নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল। খানিক পরে অরুণ বললে, আমি কিন্তু একটা সুবিধে করে এসেছি হরেনদা। জামাইবাবুর মাকে বলে এসেছি, দিদি হারিয়ে যাবার পরে অসুখ থেকে সেরে উঠে পর্য্যন্ত বরাবর আমার কাছেই আছেন। ঠিক করিনি ক্ষিতীশদা? অবশ্য তোমাদের নামও করেছি বটে।

হরেন বললে, দূর পাগলা! তুই ছেলেমানুষ,—কলকাতায় কমলা তোর কাছে আছে, এ-কথা কি কেউ কখনো বিশ্বাস করে? কি বল হে ক্ষিতীশ?

ক্ষিতীশ হঠাৎ চমকে উঠে বললে, হুঁ। বলেই লজ্জিত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে একটুখানি হেসে বললে, আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে হরেন, আমি চললুম। বলে ঠিক যেন টলতে টলতে তার নিজের ঘরে চলে গেল।

নিজের বাড়িতে তাদের কোন খেয়াল না করে ক্ষিতীশ শুতে গেল, এটা তার স্বভাবের এমনি বিরুদ্ধ যে হরেন ও অরুণের বিস্ময়ের সীমা রইল না; কিন্তু যথার্থই আজ ক্ষিতীশের এদিকে দৃষ্টি দেবার সাধ্যই ছিল না। বহুক্ষণ থেকেই সে অনমনস্ক হয়ে পড়েছিল, এত আলোচনা ও তর্কবিতর্কের অর্দ্ধেক বোধ হয় তার কানেই যায় নি। সেখানে কেবল একটা কথাই বারংবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল—সমস্ত প্রকাশ হয়ে গেছে, সমস্ত প্রকাশ হয়ে গেছে! তার মনের নিভৃত গুহায় যত কিছু পাপ

সঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, কমলার কাছে সমস্ত ধরা পড়ে গেছে,—তার কোথাও কিছু আর লুকানো নেই! তাই সে আজ ব্যাধভয়ে ভীত হরিণীর মত ছুটে পালাতে চায়! আজ তার সকল যত্ন, সকল সেবা, সকল পরিশ্রম একেবারে ব্যর্থ, একেবারে নিরর্থক!

২২

ক্ষিতীশদা!

কে?

আমি কমলা, একবারটি দোর খোল।

ক্ষিতীশ শশব্যস্তে দোর খুলে বাইরে এসে দেখলে সুমুখে দাঁড়িয়ে কমলা। রাত্রির ঘোর তখনো কাটেনি, তখনো কালো আকাশে দু-চারটে বড় বড় তারা জ্বল জ্বল করে জ্বলচে। কেবল পূবের দিকটা একটু স্বচ্ছ হয়েছে মাত্র। বারান্দার এককোণে যে লণ্ঠনটা মিট মিট্ করে জ্বলছিল, তারই অস্পষ্ট আলোতে ক্ষিতীশ চক্ষের নিমিষে সমস্ত ব্যাপারটা দেখে নিলে।

কমলার গায়ে আগাগোড়া একটা হলদে রঙের র‍্যাপার জড়ানো, এবং তারই অদূরে দাঁড়িয়ে অরুণ। তার ডোরাকাটা কোটের ওপর কোমরে বাঁধা একটা আধ-ময়লা চাদর। বাঁ-হাতে তার পৈতের সময়কার লালরঙের ছাতাটি এবং ডান বগলে চাপা একটি ছোট্ট পুঁটুলি।

কেবল এইটুকুই ক্ষিতীশ দেখতে পেলে। কিন্তু কমলা যখন গড় হয়ে প্রণাম করে তার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ক্ষিতীশদা, আমি চল্লুম, তখন আলোর অভাবেই হোক, বা চোখের দোষেই হোক, তার মুখের কিছুই আর ক্ষিতীশের চোখে পড়ল না। তার মনে হল, অকস্মাৎ এক মুহূর্তে যেন সম্মুখে, পাশে, ওপরে, নীচে সমস্তটাই একেবারে মসীকৃষ্ণ হয়ে গেছে।

—আমাদের সময় হয়েছে আমি যাচ্ছি ক্ষিতীশদা।

—যাচ্ছো? আচ্ছা।

—আমি কোথাকার কে, তবু কত কষ্টই না এতদিন ধরে তোমাকে দিলাম— এই বলে কমলা র‍্যাপারের কোণে চোখ মুছলে।

প্রত্যুত্তরে ক্ষিতীশ শুধু কেবল জবাব দিলে, কষ্ট? কই, নাঃ—

—কিন্তু তোমার প্রাণ বাঁচানো যেন নিষ্ফল না হয়, যাবার সময় আমাকে

এইটুকু আশীর্ব্বাদ কেবল তুমি কর ক্ষিতীশদা—এই বলে কমলা ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগল।

ক্ষিতীশ কোন উত্তরই খুঁজে পেলে না। কিন্তু খানিক পরে বলে উঠলো, আশীর্ব্বাদ? নিশ্চয়! নিশ্চয়! তা করচি বই কি। হাঁ অরুণ, মোটরটা বলে দেওয়া হয়েছে?

অরুণ মাথা নেড়ে জবাব দিলে, হাঁ, হরেনদা ত নীচে তাতেই বসে আছেন। তিনি ইস্টিশন পর্য্যন্ত আমাদের পৌছে দিয়ে আসবেন। আপনি যাবেন না?

আমি? না ভাই, আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই।

কমলা দূর থেকে আর একবার নিঃশব্দে নমস্কার করে আস্তে আস্তে নীচে চলে গেল। অরুণ কাছে এসে বললে, আমিও চল্লুম ক্ষিতীশদা—এই বলে সে দিদির মত প্রণাম করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্ষিতীশ সহসা সজোরে তার হাতদুটো ধরে হিড় হিড় করে টেনে তার ঘরের মধ্যে এনে ফেলে বললে, অরুণ, তোমরা সত্যি সত্যিই চললে ভাই?

অরুণ অবাক হয়ে তার পানে চেয়ে রইল, প্রশ্নটা যেন সে বুঝতে পারলে না।

ক্ষিতীশ পুনশ্চ বললে, কে জানে, আর হয়ত আমাদের দেখাই হবে না,—আমিও আজ দুপুরের গাড়িতে পশ্চিমে চল্লুম ভাই।

অরুণ এ-কথারও জবাব দিতে পারলে না, কিন্তু বালক হলেও সে এটুকু বুঝতে পারলে যে ক্ষিতীশদার কণ্ঠস্বর কান্নার জলে যেন একেবারে মাখামাখি হয়ে গেছে।

ক্ষিতীশ প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বললে, তুমি ছেলেমানুষ, তোমার ওপর যে কত বড় ভার পড়ল, এ হয়ত তুমি জানও না, কিন্তু ভগবানের কাছে আমি কায়মনে প্রার্থনা করি, তোমাদের আজকের যাত্রাটা যেন তিনি সকল প্রকারে নির্ব্বিঘ্ন করে দেন।

এই বলে সে তার বালিশের তলা থেকে একখানা খাম বার করে অরুণের হাতে গুঁজে দিতে গেল। অরুণ হাতটা সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এ কি ক্ষিতীশদা?

সামান্য গোটা-কয়েক টাকা আছে অরুণ!

কিন্তু ভাড়ার টাকা ত আমাদের আছে ক্ষিতীশদা।

তা থাক্। তবু ছোট ভাইয়ের যাবার সময় কিছু হাতে দিতে হয়।

এই বলে সে অরুণের কোঁচার খুটটা টেনে নিয়ে তাতে বাঁধতে বাঁধতে বললে, তোমার ত কেউ বড় ভাই নেই অরুণ, তাই জানো না, নইলে তিনিও এমনি করেই বেঁধে দিতেন দাদার স্নেহের উপহার বলে নিতে কিছু লজ্জা করো না

ভাই! তোমার দিদি কখনো যদি জানতে পেরে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁকেও এই কথাটাই বলো। এই বলে সে সেটা যথাস্থানে পুনরায় গুঁজে দিয়ে হাত ধরে তাকে বাইরে এনে বললে, আর সময় নেই অরুণ, তুমি যাও ভাই, সাড়ে চারটে বেজে গেছে। ওঁরা বোধ করি বড্ড ব্যস্ত হচ্ছেন—এই বলে সে একরকম তাকে জোর করে বিদায় করে দিলে।

অরুণ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কতদিন পশ্চিমে থাকবেন ক্ষিতীশদা?

সে কথা আজ কি করে বলব ভাই?

মিনিট-খানেক পরে অরুণ গিয়ে যখন গাড়িতে উঠে বসলো, তখন তাকে একাকী দেখে কমলা কোন প্রশ্নই করলে না, কিন্তু হরেন জিজ্ঞাসা করলে, ক্ষিতীশ এলো না অরুণ!

তার জবাবটা ক্ষিতীশ নিজেই দিলে। সে উপরের বারান্দার রেলিঙয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, বললে, শরীরটা আমার ভাল নেই হরেন, আর ঠাণ্ডা লাগাবো না।

হরেন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, ভাল নেই? তাহলে হিমে আর দাঁড়িয়ো না ক্ষিতীশ, ঘরে যাও, আমি এদের পৌঁছে দিয়ে এসে তোমাকে জানাবো।

মোটর ছেড়ে দিলে। হরেনের উপদেশ তার কানে গেল কি না কে জানে, কিন্তু গাড়ি যখন বহুক্ষণ তার চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখনও সে তেমনি সেই দিকে চেয়ে তেমনি স্তব্ধ হয়েই দাঁড়িয়ে রইল।

স্টেশনে পৌঁছে, টিকিট কিনে দুজনকে গাড়িতে তুলে দিয়ে হরেন কমলার কাছে গিয়ে একটুখানি লজ্জার সঙ্গে বললে, আমার উপস্থিত ঠিকানা যদিচ আমি নিজেই জানিনে, তবুও আমাকে খবর দেবার যদি আবশ্যক হয় ত কেয়ার অফ—

অরুণ পকেট থেকে তাড়াতাড়ি একটুকরো কাগজ আর পেনসিল বার করে বললে, থামো থামো হরেনদা, ঠিকানাটা তোমার লিখে নিই। তাছাড়া শুনলুম ক্ষিতীশদাও আজ দুপুরের ট্রেনে পশ্চিমে চলে যাচ্ছেন, ওটা ছাই মনে হ'লো না যে তাঁর ঠিকানাটা জিজ্ঞেসা করে রাখি।

সংবাদ শুনে কমলা মনে মনে আশ্চর্য্য হলো, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করলে না। কিন্তু হরেন উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠলো, বলিস্ কি অরুণ! তাহলে ত আমাকে এখুনি ফিরে গিয়ে তাকে থামাতে হয়।

কমলা মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে, কেন হরেনদা?

অরুণ বললে, কেন কি, বাঃ—

হরেন বললে, সেখানে কত কি ঘটতে পারে কে বলতে পারে? আবশ্যক হলে

আমি ত যাবই, এমন কি ক্ষিতীশকে পর্য্যন্ত ধরে নিয়ে যেতে ছাড়বো না। তুই আমাকে ভীরু মনে করিস্?

কমলা ঘাড় নেড়ে বললে, না তা করিনে। কিন্তু তোমাদের কারও সেখানে আমার জন্য যাবার দরকার হবে না।

হরেন ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে বললে, হবে না? নাই হোক, কিন্তু আজও কি তুই আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোককে চিনিস্ নি কমলা?

কমলা এ-প্রশ্নের ঠিক জবাব দিলে না, বললে, আমি কিছুতে ভেবে পাইনে হরেনদা, এতদিন কি করে আমার সমস্ত বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, আর কেমন করেই বা এতদিন নিজের কাজের ভার তোমাদের—পরের ওপর নির্ভর করে থাকতে পেরেছিলুম! ভুল যা করেচি তার সীমা নেই, কিন্তু তোমাদের সাক্ষী দিতে ডেকে পাঠাবো এতবড় ভুল বোধ হয় আমিও আর করব না। এই বলে সে ছোট ভাইয়ের হাত থেকে কাগজের টুকরোখানি নিয়ে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলে।

হরেন মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং লজ্জিত হয়ে বললে, কিন্তু কমলা, নির্দ্দোষীকেও কি সাক্ষী দিয়ে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে হয় না?

কমলা একটুখানি ম্লান হেসে বললে, সে আদালতে হয়; কিন্তু আমার বিচারের ভার আমি যার হাতে তুলে দিয়েচি হরেনদা, তাঁকে সাক্ষী যোগাতে হয় না, তিনি আপনিই সব জানেন।

এই বলে সে উদ্গত অশ্রু গোপন করতে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে।

গার্ড-সাহেব সবুজ নিশান নেড়ে দিলেন, ড্রাইভার বাঁশী বাজিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলে, এই সময়টুকুর মধ্যে হরেন যেন একটা ধাক্কা সামলে নিলে। সে সঙ্গে সঙ্গে দু'পা এগিয়ে এসেও কমলার মুখ আর দেখতে পেলে না, কিন্তু তাকেই উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বললে, তাই যেন হয় বোন, আমি কায়মনে প্রার্থনা করি তিনিই যেন আমাদের বিচারের ভার গ্রহণ করেন।

কমলা এ-কথায়ও কোন উত্তর দিলে না, দেবার ছিলই বা কি! কিন্তু গাড়ি কতকটা পথ চলে গেলে সে কেবলমাত্র একটিবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে পেলে হরেন তখনও সোজা তাদের দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পথের মধ্যে অরুণ অনেক কথাই বকে যেতে লাগলো। তার নিজের প্রতি ভারি একটা ভরসা ছিল। সেই যে দুর্গামণি তাকে বলেছিলেন, তিনি গুজবটা বিশ্বাস করেন নি, এবং সেও তাঁকে জানিয়ে এসেছে কলকাতায় দিদি তার কাছেই আছেন, এতেই তার সাহস ছিল দুর্ঘটনাকে সে অনেকখানিই সহজ করে দিয়েচে।

এই ভাবের সাওনাই সে থেকে থেকে দিদিকে দিয়ে যেতে লাগলো, কিন্তু দিদি যেমন নিঃশব্দে ছিল, তেমনি নীরবেই বসে রইল। হরেন্দ্রর সেই কথাটা সে ভোলেনি যে অরুণের এই কথাটা সহজে কেউ বিশ্বাস করবে না! কিন্তু এজন্যে মনের মধ্যে তার বিশেষ কোন চাঞ্চল্যও ছিল না। বস্তুতঃ যা সত্য নয় সে যদি লোক অবিশ্বাস করে ত দোষ দেবার কাকে কি আছে! কিন্তু যথার্থ যে চিন্তা তার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে পাঁতার মত চেপে বসেছিল সে তার শাশুড়ীর কথা। তিনি বলেছিলেন বটে তাঁর বধূর কলঙ্ক তিনি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু এই বিশ্বাস কি তাঁর শেষ পর্য্যন্ত অটুট থাকবে? কোথাও কি কোন বিঘ্ন ঘটবে না? সে জানতো, ঘটবে। পল্লীগ্রামে মানুষ হয়েই সে এতবড় হয়েছে, তাদের সে চেনে—কিন্তু এ সংকল্পও তার মনে মনে একান্ত দৃঢ় ছিল, অনেক ভুল, অনেক ভ্রান্তিই হয়ে গেছে, কিন্তু আর সে তার নিজের এবং স্বামীর মধ্যে তৃতীয় মধ্যস্থ মানবে না। এ সম্বন্ধ যদি ভেঙেও যায় ত যাক, কিন্তু জগদীশ্বর ভিন্ন দুজনের মাঝখানে অন্য বিচারক সে কখনো স্বীকার করবে না।

বেলতলি স্টেশনে যথাসময়েই ট্রেন এসে পৌছল, কিন্তু ঘোড়ার গাড়ি যোগাড় করা সহজ হলো না। অনেক চেষ্টায়, অনেক দুঃখে অরুণ একটা সংগ্রহ করে নিয়ে এলো। অশ্বযান যখন জগদীশপুরের সতীশ রায়ের বাটীর সুমুখে উপস্থিত হল, তখন অনেকটা বেলা হয়েছে।

দুর্গামণি গোটা-তিনেক ময়লা, ওয়াড়হীন তুলো-বার-করা বালিশ জড় করে ঠেস দিয়ে বসে একবাটি গরম দুধ পান করছিলেন, এবং অদূরে মেঝেয় বসে পাড়ার একটি বিধবা মেয়ে কুলোয় খৈয়ের ধান বাচছিল। দুর্গামণির জ্বর তখনও একটু ছিল বটে, কিন্তু টাইফয়েডের কোন লক্ষণই নাই। তিনি অরুণকে দেখে খুশী হয়ে বললেন, কে অরুণ এসেছো, বাবা? এসো, বসো,—দোর গোড়ায় ও কে গো।

দিদি এসেছেন—

দিদি? কে, বৌমা?

পরক্ষণেই কমলা ঘরে ঢুকে গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিতলে গড় হয়ে প্রণাম করতেই দুর্গামণি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দুধের বাটিটা মুখ থেকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, থাক্ থাক্ বউমা, আর পায়ের ধুলো নিতে হবে না। সারাদিন পরে দুধ ফোঁটাটুকু মুখে তুলেছি, এটুকু আর ছুঁয়ে দিয়ো না।

যে মেয়েটি খৈ বাচছিল সে স্পর্শ বাঁচিয়ে কুলোসমেত দুহাত সামনে এগিয়ে গেল। কমলা নির্ব্বাক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু অরুণ যেন একেবারে অগ্নি-

কাণ্ডের ন্যায় জ্বলে উঠে বলে ফেললে, মিথ্যেবাদী! কেন তবে কাল তুমি বললে, ও-সব গুজব তুমি বিশ্বাস করো না! কেন বললে—

শোন কথা! কবে আবার বললুম বিশ্বেস করিনে? আর জ্বরের ধমকে যদি কিছু বলেই থাকি ত সে কি আবার ধর্ত্তব্যি, বাছা!

অরুণ কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, তা হলে ত আমি কখখনো দিদিকে আনতুম না! দুর্গামণি দুধের বাটিটা সরিয়ে একটু নিরাপদ স্থানে রেখে বললেন, তা বেশ ত বাছা, অমন মার-মুখী হোচ্ছো কেন? শাণ্ডেল মশাই আসুন, রায় বটঠাকুরকে খবর দি—ততক্ষণ, ঘরে সবই আছে, পটলের মা বের করে দিক,—দোরের উনুনটায় বোকনোয় করে চাল ডাল দুটো ফুটিয়ে তোমাকেও দুটো দিক, নিজেও দুটো খাক।

অরুণ চতুর্গুণ জ্বলে উঠে বললে, কি, আমরা তোমার বাড়ি ভিক্ষে নিতে এসেচি। এত বড় কথা বল তুমি! আচ্ছা টের পাবে। এই বলে সে কমলার হাতখানা চেপে ধরে বললে, চল দিদি, আমরা যাই,—এখনো আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—আর এক মিনিটও এর মুখ দেখতে চাইনে।

কমলা ধীরে ধীরে নিজের হাতখানি মুক্ত করে নিয়ে বললে, চল, যাচ্চি ভাই। তার পরে মাথার অঞ্চলটা সরিয়ে শাশুড়ির মুখের পানে চেয়ে শান্ত সহজ কণ্ঠে বললে, মা, আমি চললুম, কিন্তু আমিও এ বাড়ির বউ, তোমার মত এও আমার শ্বশুরের ভিটে। কিন্তু এমন অপরাধ আজও করিনি যাতে এ বাড়িতে আমাকে দোরের উনুনে রেঁধে খেতে হয়!

শাশুড়ি বললেন, তা কি জানি বাছা।

কমলার মলিন চোখের দৃষ্টি হঠাৎ শিখার মত দীপ্ত হয়ে উঠল,—বোধহয় কি যেন সে বলতে চাইলে, কিন্তু সে অবসর আর পেল না। অরুণ বজ্র মুষ্টিতে হাত ধরে জোর করে তাকে টেনে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

'ভারতী'তে প্রকাশিত বারোজন সাহিত্যিক মিলিয়া রচিত 'বারোয়ারি' উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। এই উপন্যাসের ২১ ও ২২ পরিচ্ছেদ (পৃঃ ১৪৫-১৬০) শরৎচন্দ্র রচনা করেন।

ভালমন্দ

ভালমন্দ

অবিনাশ ঘোষাল আরও বছর কয়েক চাকরি করতে পারতেন, কিন্তু তা সম্ভব হোলো না। খবর এলো এবারেও তাঁকে ডিঙিয়ে কে একজন জুনিয়ার মুনসেফ সব-জজ হয়ে গেল। অন্যান্য বারের মত এবারেও অবিনাশ নীরব হয়ে রইলেন, শুধু প্রভেদ রইলো এই যে, এবারে তিনি ডাক্তারের সার্টিফিকেট সমেত অবসর গ্রহণের আবেদন যথাস্থানে পৌঁছে দিলেন। আবেদন মঞ্জুর হবেই এ সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল না।

অবিনাশ সুজন, সুবিচারক, কাজের ক্ষিপ্রতায় সকলেই খুশী, ভদ্র আচরণের প্রশংসা সবাই করে, তবু এই দুর্গতি? এর পেছনে যে গোপন ইতিহাসটুকু আছে কম লোকেই তা জানে। সেটা বলি। তাঁর চাকরির গোড়ার দিকে, একবার এক ছোকরা ইংরেজ আই. সি. এস জেলার জজ হয়ে আসেন অফিস ইনস্পেকসনে। সামান্য ব্যাপারে উভয়ের প্রথমে ঘটলো মতভেদ, পরে পরিণত হ'লো সেটা বিষম বিবাদে। ফিরে গিয়ে জজ সাহেব নিরন্তর ব্যাপৃত রইলেন তাঁর কাজের ছিদ্রান্বেষণে, কিন্তু ছিদ্র পাওয়া সহজ ছিল না। জজ সাহেবের মন তাতে কিছুমাত্র প্রসন্ন হ'লো না। রায় কেটেও দেখলেন হাইকোর্টে সেটা টেকে না—নিজেকেই অপ্রতিভ হতে হয় বেশী! বদলীর সময় হয়েছিল, অবিনাশ চলে গেছেন অন্য জেলায়, কিন্তু দেখা করে গেলেন না। শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রচলিত রীতিতে তাঁর দারুণ ত্রুটি ঘটলো। তারপরে কত বছর কেটে গেল, ব্যাপারটা অবিনাশ ভুলেছিলেন, কিন্তু তিনি ভোলেন নি। তারই প্রমাণ এলো কিছুকাল পূর্ব্বে। সেই ছোকরা জজ হয়ে এসেছেন এখন হাইকোর্টে, মুনসেফ প্রভৃতির দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে। অবিনাশ সিনিয়র লোক, কাজে সুনাম যথেষ্ট, উন্নতির পথ সম্পূর্ণ বাধাহীন, হঠাৎ দেখা গেল তাঁকে ডিঙিয়ে নীচের লোক হয়ে গেল সব-জজ। আবার এখানেই শেষ নয়, পরে পরে আরও তিনজন তাকে এমনি অতিক্রম করে উপরে উঠে গেল। যাঁরা জানেন না, তাঁরা বলবেন, এ কি কখনো হয়? এ যে গভর্ণমেণ্টের চাকরি! তায় আবার এত বড় চাকরি! এ কি কাজির আমল! কিন্তু অভিজ্ঞ যাঁরা তাঁরা বলবেন, হয়। এর আরও বেশী কিছু হয়। সুতরাং, অবিনাশ মনে মনে বুঝলেন এর থেকে আর উদ্ধার নেই। আত্মসম্মান ও চাকরি দু-নৌকোয় পা দিয়ে পাড়ি দেওয়া যায় না—যে-কোন একটা বেছে নিতে হয়। সেইটেই এবার তিনি বেছে নিলেন।

বাসায় অবিনাশের ভার্য্যা আলোকলতা, আই. এ ফেল করা পুত্র হিমাংশু এবং কন্যা শাশ্বতী। ঝি-চাকরের সংখ্যা অফুরন্ত বললেও অতিশয়োক্তি হয় না—এত বেশী।

সেদিন অবিনাশ আদালত থেকে ফিরলেন হাসিমুখে। যথারীতি বেশভূষা ছেড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে জলযোগে বসে বললেন, যাক, এতদিনে মুক্তি পাওয়া গেল ছোটবৌ। সরকারি ভাবে খবর না এলেও হাইকোর্টের এক বন্ধুর কাছ থেকে আজ টেলিগ্রাম পেলাম আমার জেলখানার মিয়াদ ফুরালো বলে। অধিক বিলম্ব হবে না। বিলম্ব যে হবে না তা জানতাম।

আলোকলতা অনতিদূরে একটা চেয়ারে বসে সেলাই করছিলেন, এবং কন্যা শাশ্বতী পিতার পাশে বসে তাঁকে বাতাস করছিল, শুনে দুজনেই চমকে উঠলেন।

স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, এ কথার মানেটা কি?

অবিনাশ বললেন, শুনেছ বোধ হয় কে একজন গোবিন্দপদবাবু এবারেও আমাকে ডিঙিয়ে মাস-ছয়েকের জন্যে সব-জজ হয়ে গেলেন। হগ সাহেব হাইকোর্টে আসা পর্য্যন্ত বছর তিনেক ধরে এই ব্যাপারই চলচে—একটা কথাও বলিনি। ভেবেছিলাম ওদের অন্যায়টা একদিন ওরা নিজেরাই বুঝবে, কিন্তু দেখলাম সে হবার নয়। অন্ততঃ ও লোকটি থাকতে নয়। অবিচার এতদিন সয়ে ছিলাম, কিন্তু আর সইলে মনুষ্যত্ব যাবে।

কাল বিকেলেই সদরআলার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে এমনি ধরণের একটা কথা আলোকলতা আভাসে-ইঙ্গিতে শুনে এসেছিলেন, কিন্তু অর্থ তার বুঝতে পারেন নি। এখনো পারলেন না, শুধু বললেন, তদবির-তাগাদা না করলে আজকালকার দিনে কোন্ কাজটা হয়? মনুষ্যত্ব যাতে না যায় তার কি করেছ শুনি?

অবিনাশ বললেন, তদবির-তাগাদা পারিনে, কিন্তু যেটা পারি সেটা করেছি বৈ কি।

আলোকলতা স্বামীর মুখের পানে চেয়ে এখনও তাৎপর্য্য ধরতে পারলেন না, কিন্তু ভয় পেলেন। বললেন, সেটা কি শুনি না? কি করেছ বলো না?

অবিনাশ বললেন, সেটা হচ্ছে কাজে ইস্তফা দেওয়া—তা দিয়েছি।

আলোকের হাত থেকে সেলাইটা মাটীতে পড়ে গেল। বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থেকে বললেন, বলো কি গো? এতগুলো লোককে না খেতে দিয়ে উপোস করিয়ে মারবার সংকল্প করেছ? কাজ ছাড়ো দিকি—আমি তোমার দিব্বি করে বলচি, সেই দিনই গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।

অবিনাশ স্থির হয়ে রইলেন, জবাব দিলেন না।

দরখাস্ত যদি দিয়ে থাকো, কালই উইথড্র করবে বলো?

না।

না কেন? মনের দুঃখে ঝোঁকের মাথায় কত লোকেই ত কত কি করে ফেলে, তার কি প্রতিকার নেই?

অবিনাশ আস্তে আস্তে বললেন, ঝোঁকের মাথায় ত আমি করিনি ছোটবৌ। যা করেছি ভেবে চিন্তেই করেছি।

উইথড্র করবে না?

না।

আমার মরণটাই তাহলে তুমি ইচ্ছে কর?

তুমি ত জানো ছোটবৌ, সে ইচ্ছে করিনে। তবু স্ত্রী হয়ে যদি স্বামীর মর্য্যাদা এমন করে নষ্ট করে দাও যে মানুষের কাছে আর মুখ তুলে দাঁড়াতে না পারি, তাহলে—

কথাটা অবিনাশের মুখে হঠাৎ বেধে গেল—শেষ হ'লো না। আলোকলতা বললেন, কি তাহলে—বলো?

উত্তরে একটা কঠোর কথা তার মুখে এসেছিল, কিন্তু এবারেও বলা হোলো না। বাধা পড়লো কন্যার পক্ষ থেকে। এতক্ষণ সে নিঃশব্দেই সমস্ত শুনছিল, কিন্তু আর থাকতে পারলে না। বললে, না বাবা, এ সময়ে মার ভেবে দেখবার শক্তি নেই, তাঁকে কোন জবাব তুমি দিতে পারবে না।

মা মেয়ের স্পর্দ্ধায় প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, পরক্ষণে প্রচণ্ড ধমক দিলে বলে উঠলেন, শাশ্বতী, যা এখান থেকে, উঠে যা বলচি।

মেয়ে বললে, যদি উঠে যেতে হয়, বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো মা। তোমার কাছে ফেলে রেখে যাবো না।

কি বললি?

বললাম, তোমার কাছে ওঁকে একলা রেখে আমি যাবো না। কিছুতেই যাবো না। চলো বাবা, আমরা নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসিগে। সন্ধ্যের পরে আমি নিজে তোমার খাবার তৈরি করে দেবো—এখন থাকগে খাওয়া। ওঠো বাবা, চলো। এই বলে সে তাঁর হাত ধরে একেবারে দাঁড় করিয়ে দিলে।

ওরা সত্যিই চলে যায় দেখে আলোক নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, একটু দাঁড়াও। সত্যিই কি একবারও ভাবোনি, চাকরি ছেড়ে দিলে তোমার বাড়ির এতগুলি প্রাণী খাবে কি।

অবিনাশ উত্তর দিতে গেলেন, কিন্তু এবারেও বাধা এলো মেয়ের দিক থেকে। সে বললে, খাবার জন্যে কি সত্যই তোমার ভয় হয়েছে মা? কিন্তু হবার তো কথা নয়। চাকরি ছাড়লেও বাবা পেনসন পাবেন—সে তিনশ' টাকার কম হবে না।

পাশের বাড়ির সঞ্জীববাবু ষাট টাকা মাইনে পান, খেতে তাঁরা ন-দশজন। কতদিন দেখে এসেছি, খাওয়া তাঁদের আমাদের চেয়ে মন্দ নয়। তাঁদের চলে যাচ্ছে, আর আমাদের তিন-চারজনের খাওয়া-পরা চলবে না!

মায়ের আর ধৈর্য্য রইলো না, একটা বিশ্রী কটূক্তি করে চেঁচিয়ে উঠলেন—যা দূর হ আমার সুমুখ থেকে। তোর নিজের সংসার হলে গিন্নীপনা করিস, কিন্তু আমার সংসারে কথা কইলে বাড়ি থেকে বার করে দেবো।

মেয়ে একটু হেসে বললে, বেশ তো মা, তাই দাও। বাবার হাত ধরে আমি চলে যাই, তুমি আর দাদা বাবার সমস্ত পেনসন নিয়ে যা ইচ্ছে ক'রো, আমরা কেউ কথা কব না। আমি যে-কোন একটা মেয়ে স্কুলে চাকরি করে আমার বুড়ো বাপকে খাওয়াতে পারবো।

মা আর কথা কইলেন না, দেখতে দেখতে তাঁর দুচোখ উপচে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়লো।

মেয়ে বাপের হাতে একটু চাপ দিয়ে বললো, বাবা, চলো না যাই। সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

অবিনাশ পা বাড়াতেই আলোকলতা আঁচলে চোখ মুছে ধরা-গলায় বললেন, আর একটু দাঁড়াও। তোমার এ কি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা! এর কি নড়-চড় নেই?

অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বললেন, না। সে হবার জো নেই।

দেখো, আমি তোমার স্ত্রী, তোমার সুখ-দুঃখের ভাগী -

অবিনাশ বাধা দিলেন, বললেন, তা যদি সত্যি হয় তো আমার সুখের ভাগ এতদিন পেয়েছো, এবার আমার দুঃখের ভাগ নাও না।

আলোক বললেন, রাজি আছি, কিন্তু সমস্ত মান-ইজ্জৎ বজায় রেখে এতগুলো টাকায় চলে না, এই সামান্য ক'টা পেনসনের টাকায় চালাবো কি করে?

অবিনাশ বললেন, মান-ইজ্জৎ বলতে যদি বড়মানুষি বুঝে থাকো ত চলবে না, আমি স্বীকার করি। নইলে সঞ্জীববাবুরও চলে।

কিন্তু তোমার মেয়ে? উনিশ-কুড়ি বছর হ'লো, তার বিয়ে দেবে কি করে?

মেয়ের সমস্যার সমাধান করতে শাশ্বতী বললে, মা, আমার বিয়ের জন্য তুমি ভেবো না। যদি নিতান্তই ভাবতে চাও তো বরঞ্চ ভেবো সঞ্জীববাবু কি করে তাঁর দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন।

উত্তর শুনে মায়ের আর একবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। সজল চক্ষু দৃপ্ত হ'লো, ধরা-গলা মুহূর্ত্তে তীক্ষ্ণ হয়ে কণ্ঠস্বর গেল উচুপর্দ্দায় চড়ে। বললেন, শাশ্বতী, পোড়ার-মুখি, আমার সুমুখ থেকে এখনো তুই দূর হয়ে গেলিনে কেন? যা, যা বলছি।

যাচ্ছি মা। চলো না বাবা।

পাশের ঘরে হিমাংশু কবিতা রচনায় রত ছিল। আই. এ. পরীক্ষার তৃতীয় উদ্যমের এখনো কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। তার কবিতা 'বাতায়ন' পত্রিকায় ছাপা হয়, আর কোন কাগজওয়ালা নেয় না। 'বাতায়ন' সম্পাদক উৎসাহ দিয়ে চিঠি লেখেন, "হিমাংশুবাবু, আপনার কবিতাটি চমৎকার হয়েছে। আগামী বারে আর একটা পাঠাবেন একটু ছোট করে। এবং ঐ সঙ্গে শাশ্বতী দেবীর একটি রচনা অতি অবশ্য পাঠাবেন।" জানিনে বাতায়ন সম্পাদক সত্যি বলেন, না ঠাট্টা করেন। কিংবা তাঁর আর কোন উদ্দেশ্য আছে। শাশ্বতী দেখে হাসে—বলে, দাদা, এ চিঠি বন্ধু মহলে আর দেখিয়ে বেড়িও না।

কেন বল্ তো?

না, এমনিই বল্‌চি। নিজের প্রশংসা নিজের হাতে প্রচার করে বেড়ানো কি ভালো?

কবিতা পাঠানোর আগে সে বোনকে পড়ানোর ছলে ভুল-চুকগুলো সব শুধরে নেয়। সংশোধনের মাত্রা কিছু বেশি হয়ে পড়লে লজ্জিত হয়ে বলে, তোর মত আমি ত আর বাবার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাহিত্য পড়িনি, আমার দোষ কি? কিন্তু জানিস শাশ্বতী, আসলে এ কিছুই নয়? দশটাকা মাইনে দিয়ে একটা পণ্ডিত রাখলেই কাজ চলে যায়। কিন্তু কবিতার সত্যিকার প্রাণ হ'লো কল্পনায়, আই-ডিয়ায়, তার প্রকাশ-ভঙ্গীতে। সেখানে তোর কলাপ মুগ্ধবোধের বাপের সাধ্যি নেই যে দাঁত ফোটায়।

সে সত্যি দাদা।

হিমাংশুর কলমের ডগায় একটা চমৎকার মিল এসে পড়েছিল, কিন্তু মায়ের তীব্র কণ্ঠ হঠাৎ সমস্ত ছত্রভঙ্গ করে দিল। কলম রেখে পাশের দোর ঠেলে সে এ-ঘরে ঢুকতেই মা চেঁচিয়ে উঠলেন, জানিস হিমাংশু, আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'লো? উনি চাকুরি ছেড়ে দিলেন,—নইলে মনুষ্যত্ব চলে যাচ্ছিল। কেন? কেননা কোথাকার কে-একজন ওঁর বদলে সব-জজ হয়েছে, উনি নিজে হতে পারেন নি। আমি স্পষ্ট বলচি, এ হিংসে ছাড়া আর কিছুই নয়! নিছক হিংসে।

হিমাংশু চোখ কপালে তুলে বললে, তুমি বলো কি মা! চাকরি ছেড়ে দিলেন? হোয়াট্ ননসেন্স!

অবিনাশের মুখ পাংশু হয়ে গেল, তিনি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে স্থির হয়ে রইলেন। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় তাঁর সমস্ত চেহারাটা যেন কি একপ্রকার অদ্ভুত দেখালো।

শাশ্বতী পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলো,—উঃ—জগতে ধূর্ত্ততার কি সীমা নেই বাবা! তুমি চলো এখান থেকে, নইলে, আমি মাথা খুঁড়ে মরবো। বলে, অর্দ্ধ-সচেতন বাপকে সে জোর করে টেনে নিয়ে বাড়ি থেকে বার হয়ে গেল।

১৫ই আশ্বিন, ১৩৪৪ সালের 'বাতায়ন' পত্রিকায় আশ্বিন সংখ্যায় শরৎচন্দ্র ইহার সূচনা করেন। পরে আরও নয়জন সাহিত্যিক মিলিয়া এই উপন্যাসটি রচনা সম্পূর্ণ করেন। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত—বৈশাখ, ১৩৫১।

ছেলেবেলার গল্প

দেওঘরের স্মৃতি

চিকিৎসকের আদেশে দেওঘরে এসেছিলাম বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্যে। আসার সময় রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা বারংবার মনে হয়েছিল—

ওষুধে ডাক্তারে—

ব্যাধির চেয়ে আধি হ'ল বড

—করলে যখন অস্থির জর জর

তখন বললে হাওয়া বদল করো।

বায়ু পরিবর্ত্তনে সাধারণতঃ যা হয় সে-ও লোকে জানে, আবার আসে-ও। আমিও এসেছি। প্রাচীর ঘেরা বাগানের মধ্যে একটা বড় বাড়িতে থাকি। রাত্রি তিনটে থেকে কাছে কোথাও একজন গলাভাঙা একঘেয়ে সুরে ভজন শুরু করে, ঘুম ভেঙে যায়, দোর খুলে বারান্দায় এসে বসি। ধীরে ধীরে রাত্রি শেষ হ'য়ে আসে,—পাখীদের আনাগোনা শুরু হয়। দেখতাম ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভোরে ওঠে দোয়েল। অন্ধকার শেষ না হতেই তাদের গান আরম্ভ হয়, তারপরে একটি দুটি করে আসতে থাকে বুলবুলি, শ্যামা, শালিক, টুনটুনি,—পাশের বাড়ির আমগাছে, এ বাড়ির বকুল-কুঞ্জে, পথের ধারের অশ্বত্থ গাছের মাথায়—সকলকে চোখে দেখতে পেতাম না, কিন্তু প্রতিদিন ডাক শোনার অভ্যাসে মনে হ'তো যেন ওদের প্রত্যেককেই চিনি। হলদে রঙের একজোড়া রঙীন পাখী একটু দেরি করে আসতো। প্রাচীরের ধারে ইউক্যালিপটস্ গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালটায় বসে তারা প্রত্যহ হাজিরা হেঁকে যেতো। হঠাৎ কি জানি কেন দিন দুই এলো না, দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম—কেউ ধরলো না ত? এদেশে ব্যাধের অভাব নেই,—পাখী চালান দেওয়াই তাদের ব্যবসা—কিন্তু তিন দিন পরে আবার দুটিকে ফিরে আসতে দেখে মনে হ'লো যেন সত্যিকার একটা ভাবনা ঘুচে গেল।

এমনি করে সকাল কাটে। বিকালে গেটের বাহিরে পথের ধারে এসে বসি। নিজের সামর্থ্য নেই বেড়াবার, যাদের আছে তাদের প্রতি চেয়ে-চেয়ে দেখি। দেখতাম মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে পীড়িতদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই ঢের বেশী। প্রথমেই

যেত পা ফুলো-ফুলো অল্পবয়সী একদল মেয়ে। বুঝতাম এরা বেরী-বেরীর আসামী। ফোলা পায়ের লজ্জা ঢাকতে বেচারাদের কত না যত্ন। মোজা পরার দিন নয়, গরম পড়েচে, তবু দেখি কারও পায়ে আঁট করে মোজা পরা। কেউ বা দেখতাম মাটি পর্য্যন্ত লুটিয়ে কাপড় পরেছে,—সেটা পথ চলার বিঘ্ন,—তবু, কৌতূহলী লোক-চক্ষু থেকে তারা বিকৃতিটা আড়াল রাখতে চায়। আর সব চেয়ে দুঃখ হ'ত আমার একটি দরিদ্র ঘরের মেয়েকে দেখে। সে একলা যেতো। সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন নেই, শুধু তিনটি ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে। বয়স বোধকরি চব্বিশ-পঁচিশ, কিন্তু দেহ যেমন শীর্ণ মুখ তেমনি পাণ্ডুর—কোথাও যেন এতটুকু রক্ত নেই। শক্তি নেই নিজের দেহটাকে টানবার, তবু সব চেয়ে ছোট ছেলেটি তার কোলে! সে তো আর হাঁটতে পারে না—অথচ, রেখে আসবারও ঠাঁই নেই। কি ক্লান্তই না মেয়েটির চোখের চাহনি। মনে হ'তো আমাকে দেখে যেন সে লজ্জা পায়। কোন মতে এই স্থানটুকু তাড়াতাড়ি পালাতে পারলেই বাঁচে। ছেঁড়াখোঁড়া জামা-কাপড়ে সন্তান তিনটি ঢেকে-ঢুকে প্রত্যহই সে এই পথে চলতো। হয়ত ভেবেচে, আর কিছুতে যা হ'লো না, সাঁওতাল পরগনার স্বাস্থ্যকর জল হাওয়ায় এই অত্যন্ত ক্লেশকর হাঁটার মধ্যে দিয়েই সেটুকু সে পূরণ করে নিতে পারবে। রোগ মুক্ত হয়ে আবার ফিরে পাবে বল, ফিরে পাবে আশা—আবার স্বামীপুত্রের সেবায় সংসারে নারী-জীবনটা সার্থক করে, তুলতে পারবে। নিজের মনে বসে বসে ভাবতাম, এ ছাড়া আর কি-ই বা কামনা আছে তার? বাঙলা দেশের মেয়ে,—এর বেশী চাইতে কে কবে শেখালে তারে? মনে মনে আশীর্ব্বাদ করতাম—মেয়েটি যেন ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারে, যে ছেলে তিনটি তার সমস্ত জীবনীশক্তি শোষণ করে নিয়েচে তাদেরই যেন মানুষ করবার অবকাশ পায়। সে কার মেয়ে, কার বৌ, কোথায় বাড়ি কিছুই জানিনে,—শুধু এই বাঙলা দেশের অসংখ্য মেয়ের প্রতীক হয়ে সে যেন আমার মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে রেখে গেল, যা সহজে মুছবার নয়।

আমার সঙ্গে এসেছিল একটি যুবক বন্ধু। নিঃস্বার্থ সেবার জন্যে। কলকাতায় ভারি অসুখের সময়েও যেমন দেখেছি, এখানে দেখতে পেলাম তেমনি। মাঝে মাঝে সে বলতো—চলুন দাদা, আজ একটু বেড়িয়ে আসবেন! আমি বলতাম, তুমি যাও ভাই, আমি এখানে বসেই ও কাজটা সেরে নিই। সে অসহিষ্ণু হয়ে বলতো—আপনার চেয়েও কত বেশী বয়সের লোক এখানে বেড়িয়ে বেড়ায়। একটু চলাফেরা না করলে ক্ষিদে হবে কেন? বলতাম, ওটা কম হলেও সইবে, কিন্তু পথে পথে মিছিমিছি ঘুরে বেড়ানো যাবে না।

সে রাগ করে একলাই বেড়াতে যেতো। কিন্তু সাবধান করে দিত,—অন্ধকারে

বাড়ি ফিরবেন না যেন। আলো আনতে চাকরদের ডাকবেন। এদিকে 'করেত' সাপটা কিছু বেশি। নিরীহ জীব, কেবল গায়ে পা দেওয়াটা তারা পছন্দ করে না।

সেদিন বন্ধু গেছেন ভ্রমণে। সন্ধ্যার তখনও দেরি আছে; দেখি জন-কয়েক বৃদ্ধ ব্যক্তি ক্ষুধা আহরণের কর্ত্তব্যটা সমাধা করে যথারীতি দ্রুতপদেই ত্রস্ত বাসায় ফিরছেন। সম্ভবতঃ এঁরা বাতব্যাধিগ্রস্ত, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এঁদের ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন। তাঁদের চলন দেখে ভরসা হ'লো, ভাবলাম, যাই, আমিও একটু ঘুরে আসিগে। সেদিন পথে পথে অনেক বেড়ালাম। অন্ধকার হয়ে এলো, ভেবেছিলাম আমি একাকী, হঠাৎ পিছনে চেয়ে দেখি একটি কুকুর আমার পিছনে চলেছে। বললাম, কি রে যাবি আমার সঙ্গে? অন্ধকার পথটায় বাড়ি পর্য্যন্ত পৌছে দিতে পারবি? সে দূরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগলো। বুঝলাম সে রাজি আছে। বললাম, তবে, আয় আমার সঙ্গে। পথের ধারে একটা আলোতে দেখতে পেলাম কুকুরটার বয়স হয়েছে, রোগে পিঠের লোম উঠে গেছে, একটু খুঁড়িয়ে চলে। কিন্তু যৌবনে একদিন শক্তি-সামর্থ্য ছিল তা বুঝা যায়। তাকে অনেক কিছু প্রশ্ন করতে করতে বাড়ির সুমুখে এসে পৌছলাম। গেট খুলে দিয়ে ডাকলাম, ভেতরে আয়। আজ তুই আমার অতিথি। সে বাইরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগলো, কিছুতে ভিতরে ঢোকার ভরসা পেলে না। আলো নিয়ে চাকর এসে উপস্থিত হ'ল, গেট বন্ধ করে দিতে চাইলে, বললাম, না, খোলাই থাক্। যদি আসে, ওকে খেতে দিস্। ঘণ্টাখানেক পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম সে আসেনি—কোথায় চলে গেছে।

পরদিন সকালে বাইরে এসেই দেখি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার সেই কালকের অতিথি। বললাম, কাল তোকে খেতে নেমন্তন্ন করলাম, এলিনে কেন?

জবাবে সে মুখপানে চেয়ে তেমনি ল্যাজ নাড়তে লাগলো। বললাম, আজ তুই খেয়ে যাবি,—না খেয়ে যাস্‌নে। বুঝলি? প্রত্যুত্তরে সে শুধু ঘন ঘন ল্যাজ নাড়লে —অর্থ বোধ হয় এই যে—সত্যি বলচ ত?

রাত্রে চাকর এসে জানালে সেই কুকুরটা এসে আজ বাইরের বারান্দার নীচে উঠনে বসে আছে। বামুন ঠাকুরকে ডেকে বলে দিলাম, ও আমার অতিথি, ওকে পেট ভরে খেতে দিও।

পরের দিন খবর পেলাম অতিথি যাননি। আতিথ্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন ক'রে সে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। বললাম, তা হোক, ওকে তোমরা খেতে দিও।

আমি জানতাম প্রত্যহ খাবার ত অনেক ফেলা যায়, এতে কারও আপত্তি হবে না। কিন্তু আপত্তি ছিল এবং অত্যন্ত গুরুতর আপত্তি। আমাদের বাড়তি খাবারের যে প্রবল অংশীদার ছিল এ বাগানের মালীর মালিনী—এ আমি জানতাম না। তার

বয়স কম, দেখতে ভালো এবং খাওয়া সম্বন্ধে নির্বিকারচিত্ত। চাকরদের দরদ তার 'পরেই বেশী; অতএব আমার অতিথি করে উপবাস। বিকালে পথের ধারে গিয়ে বসি, দেখি অতিথি আগে থেকেই বসে আছে ধূলোয়। বেড়াতে বার হ'লে সে হয় পথের সঙ্গী; জিজ্ঞাসা করি, হাঁ অতিথি, আজ মাংস রান্নাটা কেমন হয়েছিল রে? হাড়গুলো চিবোতে চিবোতে স্থিরচিত্তে সে জবাব দেয় ল্যাজ নেড়ে, মনে করি মাংসটা তা হলে ওর ভালোই লেগেছে। জানিনে যে মালীর বউ তাকে মেরে ধরে বার করে দিয়েছে,—বাগানের মধ্যে ঢুকতে দেয় না, তাই ও সুমুখের পথের ধারে বসে কাটায়। আমার চাকরদের তাতে সায় ছিল।

হঠাৎ শরীর খারাপ হ'লো, দিন-দুই নীচে নামতে পারলাম না। দুপুর বেলা উপরের ঘরে বিছানায় শুয়ে, খবরের কাগজটা সেইমাত্র পড়া হয়ে গেছে, জানালার মধ্যে দিয়ে বাইরের রৌদ্রতপ্ত নীল আকাশের পানে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম, কংগ্রেসের পাণ্ডা যাঁরা—মন্ত্রী হবার তাদের কি উগ্র বাসনা। অথচ নিস্পৃহতার আবরণে সেটা গোপন করার কত না কৌশল। আইন যারা বানিয়ে দিলে একটা কথাও শুনলো না, ব্যাখ্যা নিয়ে তাদের সঙ্গে কি ঝুটোপুটি লড়াই। নিঃসন্দেহে প্রমাণ দিতে চায় ওদের মতলব ভাল নয়। বিড়ম্বনা আর বলে কারে!

সহসা খোলা দোর দিয়ে সিঁড়ির উপর ছায়া পড়ল কুকুরের। মুখ বাড়িয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়চে। দুপুরবেলা চাকরেরা সব ঘুমিয়েছে, ঘর তাদের বন্ধ, এই সুযোগে লুকিয়ে সে একেবারে আমার ঘরের সামনে এসে হাজির। ভাবলাম, দুদিন দেখতে পায়নি, তাই বুঝি আমাকে ও দেখতে এসেছে। ডাকলাম, আয় অতিথি, ঘরে আয়। সে এলো না, সেখানে দাঁড়িয়েই ল্যাজ নাড়তে লাগলো। জিজ্ঞাসা করলাম,—খাওয়া হয়েছে ত রে? কি খেলি আজ?

হঠাৎ মনে হ'লো ওর চোখ দুটো যেন ভিজেভিজে, যেন গোপনে আমার কাছে কি একটা ও নালিশ জানাতে চায়। চাকরদের হাঁক দিলাম, ওদের দোর খোলার শব্দেই অতিথি ছুটে পালালো।

জিজ্ঞাসা করলাম, হাঁ রে, কুকুরটারে আজ খেতে দিয়েছিস্?

আজ্ঞে, না। মালী-বৌ ওরে তাড়িয়ে দিয়েছে যে।

আজ যে অনেক খাবার বেঁচেছে, সে সব হ'ল কি?

মালী-বৌ চেঁচে-পুঁছে নিয়ে গেছে।

হাঙ্গামা শুনে বন্ধু ঘুম ভেঙে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘরে এলেন, মুচকি হেসে বললেন, দাদার এক কাণ্ড। মানুষে খেতে পায় না, পথের কুকুরকে ডেকে খাওয়ানো! বেশ! বন্ধু জানেন এর চেয়ে অকাট্য যুক্তি আর নেই। মানুষকে

না দিয়ে কুকুরকে দেওয়া! শুনে চুপ করে রইলাম। সংসারে কার দাবী যে কার কাছে কোথায় গিয়ে পৌঁছায়, সে ওদের আমি বোঝাবো কি দিয়ে?

সে যাই হোক, আমার অতিথিকে ডেকে আনা হ'লো, আবার সে বারান্দার নীচে উঠনের ধূলোয় পরম নিশ্চিন্তে স্থান করে নিলে। মালী-বৌয়ের ভয়টা তার গেছে। বেলা যায়, বিকেল হলে উপরের বারান্দা থেকে দেখি অতিথি এই দিকে চেয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। বেড়াতে যাবার সময় হ'ল যে।

আমার শরীর সারলো না, দেওঘর থেকে বিদায় নেবার দিন এসে পড়লো। তবু দিন-কয়েক দেরি করলাম নানা ছলে। আজ সকাল থেকে জিনিস বাঁধাবাঁধি শুরু হ'লো,—দুপুরে ট্রেনে। গেটের বাইরে সার সার গাড়ি এসে দাঁড়ালো, মাল-পত্র বোঝাই দেওয়া চললো। অতিথি মহা ব্যস্ত, কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটো-ছুটি কোরে খবরদারি করতে লাগলো, কোথাও যেন কিছু খোয়া না যায়। তার উৎসাহই সব চেয়ে বেশি।

একে একে গাড়িগুলো ছেড়ে দিলে, আমার গাড়িটাও চলতে শুরু করলে। এখানেও এসেছিস্? সে ল্যাজ নেড়ে তার জবাব দিলে,—কি জানি মানে তার কি!

টিকিট কেনা হলো, মাল-পত্র তোলা হ'লো, বন্ধু এসে খবর দিলেন—ট্রেন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরি। সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল তারা বকসিস্ পেলে সবাই, পেল না কেবল অতিথি। গরম বাতাসে ধূলো উড়িয়ে সামনেটা আচ্ছন্ন করেছে; যাবার আগে তারই মধ্যে দিয়ে ঝাপসা দেখতে পেলাম—স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথি। ট্রেন ছেড়ে দিলে, বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল অতিথি আজ ফিরে গিয়ে দেখবে বাড়ির লোহার গেট বন্ধ,—ঢোকবার জো নেই! পথে দাঁড়িয়ে দিন-দুই তার কাটবে, হয়ত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা,—তার পরে পথের কুকুর পথেই আশ্রয় নেবে।

হয়ত, ওর চেয়ে তুচ্ছ জীব সহরে আর নেই, তবু, দেওঘরে বাসের ক'টা দিনের স্মৃতি ওকে মনে করেই লিখে রেখে গেলাম।

তরুণের বিদ্রোহ

তরুণের বিদ্রোহ

নিজের জীবন এলো যখন সমাপ্তির দিকে, তখন ডাক পড়লো আমার দেশের এই যৌবন-শক্তিকে সম্বোধন করে তাদের যাত্রাপথের সন্ধান দিতে। নিজের মধ্যে কর্ম্মশক্তি যখন নিঃশেষিতপ্রায়, উদ্যম ক্লান্ত, প্রেরণা ক্ষীণ, তখন তরুণের অপরিমেয় প্রাণধারার দিগনির্ণয়ের ভার পড়লো এক বৃদ্ধের উপর। এ আহ্বানে সাড়া দিবার শক্তি-সামর্থ্য নেই—সময় গেছে। এ আহ্বানে বুকের মধ্যে শুধু বেদনার সঞ্চার করে। মনে হয়, একদিন আমার সবই ছিল—যৌবন, শক্তি, স্বাস্থ্য, সকলের কাজে আপনাকে মিশিয়ে দেবার আনন্দবোধ—এই যুব-সংঘের প্রত্যেকটি ছেলের মতই,—কিন্তু সে বহুদিন পূর্ব্বেকার কথা। সে দিন জীবন-গ্রন্থের যে সকল অধ্যায় ঔদাস্য ও অবহেলায় পড়িনি, এই প্রত্যাসন্ন পরীক্ষার কালে তার নিষ্ফলতার সান্ত্বনা আজ কোন দিকেই চেয়ে আমার চোখে পড়ে না। আমি জানি, এই তরুণ-সংঘকে জোর ক'রে বলবার কোন সঙ্কল্পই আমার নেই। তাদের পথ-নির্দ্দেশের গুরুতর দায়িত্ব আমার সাজে না; সে কল্পনাও আমি করিনে। আমি কেবল গুটি-কয়েক বহু পরিচিত পুরাতন কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে এখানে উপস্থিত হয়েছি।

পেশা আমার সাহিত্য; রাজনীতি চর্চ্চা হয়ত আমার অনধিকার-চর্চ্চা, এ-কথার এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আরও একটা কথা প্রথমেই বলা দরকার, সে আমার নিজের লেখার সম্বন্ধে। আমার বইগুলির সঙ্গে যারা পরিচিত, তারাই জানে আমি কোন দিন কোন ছলেই নিজের ব্যক্তিগত অভিমত জোর ক'রে কোথাও গুঁজে দেবার চেষ্টা করিনি। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তি বিশেষের জীবন-সমস্যার আমি শুধু বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী, অবিচারের মর্ম্মান্তিক জ্বালার ইতিহাস, অভিজ্ঞতার পাতার উপরে পাতা কল্পনার কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছি—এইখানেই আমার সাহিত্য-রচনার সীমারেখা। জ্ঞানতঃ কোথাও একে লঙ্ঘন করতে আমি নিজেকে দিইনি। সেই জন্যেই লেখার মধ্যে আমার সমস্যা আছে, সমাধান নেই; প্রশ্ন আছে, আর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এ আমার চিরদিনের বিশ্বাস যে সমাধানের দায়িত্ব কর্ম্মীর, সাহিত্যিকের নয়। কোথায় কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ; বর্ত্তমান কালে কোন্ পরিবর্ত্তন উপযোগী, এবং কোন্‌টার সময় আজও আসেনি, সে বিবেচনার ভার আমি সংস্কারকের উপরে

রেখেই নিশ্চিন্ত মনে বিদায় নিয়েছি; আজকে এই কয়ছত্র লেখার মধ্যেও তার অন্যথা করিনি। এখানেও সেই সমস্যা আছে, তার জবাব নেই। কারণ জবাব দেবার ভার বাঙলার তরুণ-সংঘের—এ বৃদ্ধের নয়। সেইটাই এই অভিভাষণের বড় কথা।

প্রথমেই একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া চাই। তরুণ-সংঘ যে রাষ্ট্রীক সংস্রবে অংশতঃ বিজড়িত, এ সত্য গোপন ক'রে লাভ নেই। এ তার কর্ত্তব্য। অথচ এই সহরে দিন-দুই পরে বাঙলাদেশের রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের কাজ আরম্ভ হবে। সুতরাং উভয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য যখন বহুলাংশে এক, তখন আলাদা ক'রে তরুণ-সংঘ সম্মিলনের কি আবশ্যকতা ছিল? কেউ কেউ বলেন, আবশ্যকতা এইজন্যে যে তরুণ-সংঘের মধ্যে অনেক ছাত্র আছেন এবং ছাত্র না হয়েও এমন অনেক আছেন, যাঁরা খোলাখুলি ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন না। বাধা ও নিষেধ বহুপ্রকার আছে, তাদের জন্য একটা আবরণ দরকার। কিন্তু আবরণ দিয়ে—কৌশলে ও ছলনার আশ্রয়ে, কোন দিন সত্যকার সিদ্ধিলাভ হয় না। কাজ করতেও চাই, উপর-ওয়ালার চোখেও ধূলো দিতে চাই—এ দুটো চাওয়া একসঙ্গে পাওয়া যায় না, অতএব যুব-সংঘকে স্পষ্ট ক'রে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য দেশের কাছে ব্যক্ত করতে হবে। ভয় করলে চলবে না! কিন্তু তা যারা পারে না, তাদের দিয়ে এটাও হবে না,—এটাও নিষ্ফল হবে। কিন্তু আসলে তা নয়। এ দুটো প্রতিষ্ঠানের বাইরের চেহারায় হয়ত অনেক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ভেতরের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে প্রভেদও অপরিসীম। কংগ্রেস অনেক দিনের—আমারই মত সে বৃদ্ধ; কিন্তু যুব-সংঘ সেদিনের —তার শিরায় রক্ত এখনও উষ্ণ, এখনও নির্ম্মল। কংগ্রেস দেশের মাথাওয়ালা আইনজ্ঞ রাজনীতি-বিশারদগণের আশ্রয়কেন্দ্র, কিন্তু যুব-সংঘ কেবল মাত্র প্রাণের ঐকান্তিক আবেগ ও আগ্রহ দিয়ে তৈরী। একটাকে চালনা করে কূট বিষয়বুদ্ধি, কিন্তু অন্যটাকে নিয়োজিত করে জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম;—তাই নানা প্ররোচনা ও উত্তেজনার পর মাদ্রাজ-সংগ্রেস যখন পাশ করেছিল দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা, তখন সে বস্তু টেঁকলো না—একটা বৎসর গত না হতেই কলিকাতার কংগ্রেসে সে মত নাকচ হয়ে গেল। স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে তাঁরা ফিরে চাইলেন Dominion Status; কিন্তু দেশের তরুণদল সে নির্দ্ধারণে কান দিল না। উভয় প্রতিষ্ঠানের এইখানেই পার্থক্য। পুরাতনের বিধি-নিষেধের বেড়াজালে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে, যুব-সমিতির জন্ম-ইতিহাসের সেই হেতু। শুধুই কি কেবল ভারতবর্ষে? পৃথিবীর যে-কোন দিকে চেয়ে দেখি, সেই দিকেই যেন এর নব অভ্যুদয়ের রক্তরাগ রেখা চোখে পড়ে। দেখা যায়, কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয় সমাজনীতি, অর্থনীতি

প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নীতির সম্পর্কেই তরুণ-শক্তি যেন নব চেতনা লাভ করেছে। তাঁরা ছাড়া জগতের বর্ত্তমান দুর্ভেদ্য সমস্যা যে কোন মতেই মীমাংসিত হবে না, এ সত্য তারা নিঃসংশয়ে অনুভব করেছে। এটা মস্ত বড় আশার কথা। পুরাতন পন্থীরা তাদের মাঝে মাঝে তিরস্কার ক'রে বলেন, তোমরা সে দিনের—তোমাদের কতটুকু অভিজ্ঞতা? যুব-সমিতি এ অভিযোগের উত্তর দিতে ছাড়ে না। কিন্তু আমি ভাবি, নানা বাগ্‌বিতণ্ডার মাঝে এ কথা কেন না তারা স্পষ্ট ক'রে জানায় যে পুরাতনের অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধেই তাদের সব চেয়ে বড় লড়াই? তাদের এই বহুযত্ন-অর্জ্জিত ঘনবিন্যস্ত অভিজ্ঞতার জ্ঞানটাকেই নিঃশেষে দগ্ধ ক'রে দিয়ে তারা জগতকে মুক্তি দিতে চায়। কিন্তু একটা বিষয়ে তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান, বস্তুতঃ এই-ই দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান—যা বিদেশীর রাজ-শাসনের অবিচার ও অনাচার মুখ বুজে মেনে নেয়নি। তার দীর্ঘকালব্যাপী বাদ-প্রতিবাদ অনুযোগ-অভিযোগের সম্মিলিত কোলাহল বধির রাজকর্ণে প্রবেশ করেনি সত্য, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় ছিল কি? এমন ভাবে দিন চলে যাচ্ছিল, সহসা একদিন এলো মহাত্মার অদ্রোহ অসহযোগ এবং তার টিকি বাঁধা রইলো তার খাদি চরকার দড়িতে। স্বরাজের তারিখ ধার্য্য হ'লো ৩১শে ডিসেম্বর। এলো জেলে যাবার দিন, এলো আত্মত্যাগের বন্যা। মন্ত্র এলো বাঙলার বাইরে থেকে; অথচ যত চরকা ও যত খাদি সে দিন বাঙলায় তৈরী হ'লো, যত লোক গেল বাঙলার কারাগারে, যত ছেলে দিলে জীবনের সর্ব্বস্ব বলিদান, সমগ্র ভারতবর্ষে তার জোড়া রইল না; কেন জান? কারণ এই বাঙলার ছেলে যতখানি তার দেশকে ভালবাসে হয়ত পাঞ্জাব ছাড়া তার একাংশও ভারতের কোথাও খুঁজে মিলবে না। তাই 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র সৃষ্টি এই বাঙলায়। এই বাঙলাতে জন্ম নিয়েছিলেন পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় দেশবন্ধু। এ দিকে ৩১শে ডিসেম্বর পার হয়ে গেল—স্বরাজ এলো না। কোথায় কোন এক অজানা পল্লী চৌরীচৌরায় হ'লো রক্তপাত, মহাত্মা ভয় পেয়ে দিলেন সমস্ত বন্ধ ক'রে। দেশের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা আকাশ-কুসুমের মত এক মুহূর্ত্তে শূন্যে মিলিয়ে গেল। কিন্তু সে দিন একজন জীবিত ছিলেন, তাঁর ভয়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল না—তিনি দেশবন্ধু। তিনি তখন জেলের মধ্যে, বাঙলার বাহিরে-ভিতরের সকলে মিলে তাঁর সমস্ত চেষ্টা-আয়োজন নিষ্ফল ক'রে। কে জানে, ভারতে ভাগ্য হয়ত এতদিনে আর এক পথে প্রবাহিত হ'তে পারতো, কিন্তু যাক সে কথা।

আবার কিছুদিন নিঃশব্দে থাকার পরে, সাড়া পড়ে গেছে। সেবার ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ, এবার হয়েছে সাইমন কমিশন। আবার সেই চরকা, সেই

খাদি, সেই বয়কটের অহেতুক গর্জ্জন, সেই তাড়ির দোকানে ধন্না দেওয়ার প্রস্তাব, সেই ৩১শে ডিসেম্বর, এবং সর্ব্বোপরি বাঙলার বাইরের নেতার দল আবারও বাঙলার ঘাড়ে চেপে বসেছে। আমি জানি এবারও সেই ৩১শে ডিসেম্বর ঠিক তেমনি ক'রে পার হয়ে যাবে। কেবল একটুখানি ক্ষীণ আশার আলো বাঙলার এই যৌবনশক্তির জাগরণ। বঙ্গভঙ্গ সেটেল্‌ড্‌ ফ্যাক্ট (settled fact) একদিন আন-সেটেলড্‌ (unsettled) হয়েছিল - সে এই বাঙলা দেশে। সেদিন বাইরে থেকে কেউ ভার বইতে আসেনি, আন্দোলন পরিচালনার পরামর্শ দিতে বাইরে থেকে কর্ত্তা আমদানি করতে হয়নি; বাঙলার সমস্ত দায়িত্ব সে দিন বাঙলার নেতাদের হাতে ন্যস্ত ছিল।

প্রত্যেক দেশেরই স্বভাব-প্রবৃত্তি, রীতি-নীতি, চাল-চলন বিভিন্ন। এ বিভেদ শুধু তার দেশের লোকেই জানে। এই জানার উপর যে কতবড় সাফল্য নির্ভর করে, বহু লোকেই তা ভেবে দেখে না। অবশেষে এই অজ্ঞতাই একদিন যখন বিফলতার গর্ত্তে টেনে ফেলে তখন দেশের লোকের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে বাইরের মানুষে সান্ত্বনা লাভ করে। ভাবে সমস্ত দেশের কার্য্য-তালিকা সর্ব্বাংশে এক হওয়ার নামই বুঝি একতা। ভিন্ন কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যেও যে সত্যকার ঐক্য নিহিত থাকতে পারে, এই সত্য স্বীকৃত হয় না বলেই গণ্ডগোল বাঁধে। তাই ত দেশের লোকের হাতেই তার আপনার দেশের কাজের ধারা নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন। সাইমন সাহেবের দলেরও ঠিক এই ভুলই হয়েছিল, যখন এক দেশ থেকে এসে তাঁরা আর দেশের constitution তৈরীর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেছিলেন-- এই কথাটা, বাঙলার যুব-সমিতিকে ভেবে দেখতে আজ আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি!

আমার বক্তব্য নীরস, অনেকের কানে হয়ত কটু শোনাবে, শব্দাড়ম্বরের ঘটায়, বচন-বিন্যাসের কৌশলে উত্তেজনার সৃষ্টি করতে আমি অক্ষম। কিন্তু তোমরা ত জান, সোজা কথা সোজা ভাবে বলাই আমার স্বভাব। কারও বিরুদ্ধে কতকগুলো কঠোর অভিযোগ করতেও আমি নারাজ, তাই আমার কথার মধ্যে তেমন স্বাদ নেই—এ আমি নিজেই অনুভব করি। কিন্তু ভরসা এই যে, রাষ্ট্রীয় সম্মিলন আসন্ন-প্রায়। নেতারা অনেকে এসে পৌঁছেছেন; বাকী যাঁরা, তাঁরাও এলেন বলে। বক্তৃতা শুনে তোমাদের ক্ষুধা মিটবে। ইংরাজ রাজত্বের দেড়শো বছরের ইতিহাস তাঁদের কণ্ঠস্থ। ইংরাজ, তুমি এই করেছ—এই করেছ—এই করেছ, এই করনি—এই করনি- এই করনি, অমুককে লাঠি মেরে খুন করেছ—অমুককে বিনাবিচারে আটক করেছ,—চা বাগানের অমুক সাহেবকে ছেড়ে দিয়েছ, অতএব তোমার রাজ্য শয়তানের। এমনি অত্যাচারের ধারাবাহিক ফর্দ্দ দিয়ে জগতের কাছে তাঁদের নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করতে হয় যে, ইংরেজ-শাসন-প্রণালী অতিশয় মন্দ এবং তার

চাপে আমরা আর বাঁচিনে। সুতরাং হয় আইন-কানুন বদলাক, নয় এর সঙ্গে আমরা আর কোন সংশ্রব রাখব না। এ সকলের যে প্রয়োজন নেই তা আমি বলিনে, বরঞ্চ বোধ করি, বেশী প্রয়োজনই আছে। কিন্তু প্রয়োজন যতই থাক, এখানেই উভয় প্রতিষ্ঠানের মনস্তত্ত্বের গভীর ব্যবধান। কারণ শয়তানের রাজ্য কি না—এ সপ্রমাণ করার দায়িত্ব যুব-সমিতির নেই। তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা এই উত্তরই দেবে যে, বিদেশীর শাসন-প্রণালী যা হয় তাই। কংগ্রেসের সম্মিলিত ধিক্কারে লজ্জিত হয়ে তারা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করবে কিনা, সে তারাই জানে, কিন্তু আমরা জানি তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নেই। স্বাধীনতার বিনিময়ে পরাধীন স্বর্গরাজ্যও দেশের যৌবনশক্তি কোন দিন প্রার্থনা করবে না।

কিন্তু স্বাধীনতা শুধু কেবল একটা নাম মাত্রই ত নয়। দাতার দক্ষিণ হস্তের দানেই ত একে ভিক্ষার মত পাওয়া যায় না—এর মূল্য দিতে হয়। কিন্তু কোথায় মূল্য? কার কাছে আছে? আছে শুধু যৌবনের রক্তের মধ্যেই সঞ্চিত। সে অর্গল যতদিন না মুক্ত হবে, কোথাও এর সন্ধান মিলবে না। সেই অর্গল মুক্ত করার দিন এসেছে। কোন ক্রমেই আর বিলম্ব করা চলে না। কিন্তু মানুষের জীবনে, কি দেশের জীবনে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ যখন শূন্য দিগন্ত থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকে, তখন কিছু না জেনেও যেন জানা যায়, সর্ব্বনাশ অত্যন্ত নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুদ্র পল্লীর অতি ক্ষুদ্র নর-নারীর মুখের 'পরেও আমি তার আভাস দেখতে পাই। চারিদিকে দুর্ব্বিসহ অভাবের মধ্যে কেমন করে যেন তারা নিঃসংশয়ে বুঝে নিয়েছে—এদেশে এ থেকে আর নিষ্কৃতি নেই, দুর্নিবার মরণ তাদের গ্রাস করলে বলে।

এদের বাঁচাবার ভার তোমাদের। এ ভার কি তোমরা নেবে না? জগতের দিকে দিকে চেয়ে দেখ—এ বোঝা কে বয়েছে। তোমরাই ত! শুধু এদেশেই কি তার ব্যতিক্রম হবে? শান্তি-স্বস্তিহীন সম্মানবর্জ্জিত প্রাণ কি একা ভারতের তরুণের পক্ষেই এতবড় লোভের বস্তু? দেশকে কি বাঁচায় বুড়োরা? ইতিহাস পড়ে দেখ। তরুণ-শক্তি নিজের মৃত্যু দিয়ে দেশে দেশে কালে কালে জন্মভূমিকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে গেছে। এ সত্ত্বেও যদি তোমরা ভোলো, তবে এ সমিতি গঠনের তোমাদের লেশমাত্র প্রয়োজন ছিল না।

ভারতের আকাশে আজকাল একটা বাক্য ভেসে বেড়ায়—বিপ্লব। বৈদেশিক রাজশক্তি তাই তোমাদের ভয় করতে শুরু করেছে। কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলো না যে, কখনও কোন দেশেই শুধু শুধু বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব আনা যায় না। অর্থহীন অকারণ বিপ্লবের চেষ্টায় কেবল রক্তপাতই ঘটে, আর কোন ফল লাভ হয়

না। বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য্য ধ'রে তার প্রতীক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা, এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব-পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে। নইলে অসহিষ্ণু অভিলাষ ও কল্পনার আতিশয্যে তোমাদের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই দেবে না। স্বাধীনতার সংগ্রামে বিপ্লবই অপরিহার্য্য পন্থা নয়। যারা মনে করে, জগতে আর সব কিছুরই আয়োজনের প্রয়োজন, শুধু বিপ্লবেরই কিছু চাই না—ওটা শুরু করে দিলেই চলে যায়, তারা আর যত কিছুই জানুক, বিপ্লব-তত্ত্বের কোন সংবাদই জানে না। মনে মনে যাঁরা বিপ্লবপন্থী, আমার কথায় হয়ত তাঁরা খুশী হবেন না। কিন্তু আমি গোড়ায় ব'লে রেখেছি, খুশী করবার জন্য এখানে আসি নাই। এসেছি সত্য কথা সোজা করে বলবার জন্যে।

আমরা কতদিকেই না নিরুপায়। অনেকে বলেন, বিদেশী রাজশক্তি আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নিয়ে একেবারে অমানুষ করে রেখেছে। অভিযোগ যে অসত্য তা আমি বলিনে, কিন্তু এই কি সমস্ত সত্য? অস্ত্র-শস্ত্র আজই না হয় নেই, কিন্তু হাজার বছর ধ'রে করেছিলাম কি? তখন তো Arms Act জারি হয়নি! সবচেয়ে বেশী নিরুপায় করেছে—আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আত্মকলহ। তাই বার বার মোগল-পাঠান-ইংরাজের পায়ে আমাদের মাথা মুড়ানো গেছে। পৃথিবীর সমস্ত শক্তিমান জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায়, আত্মকলহ তাদের মধ্যে থাকে না যে তা নয়, কিন্তু বহিঃশত্রুর সম্মুখে সে কলহ তারা স্থগিত রাখতে জানে। শত্রুকে সম্পূর্ণ পরাভূত না করা পর্য্যন্ত তারা কিছুতেই ঘরোয়া বিবাদে লিপ্ত হয় না। এই তাদের সবচেয়ে বড় জোর। কিন্তু আমাদের? জয়চাঁদ, পৃথ্বীরাজ থেকে সিরাজদ্দৌলা ও মীরজাফরের এই মজ্জাগত অভিশাপ আর ঘুচল না। বাঙলাদেশে মুসলমানেরা জয় করতে এলো। এদেশে ব্রাত্য-বৌদ্ধেরা খুশী হয়ে তাদের ধর্ম্ম-দেবতার যশোগান করে 'ধর্ম্ম মঙ্গলে' লিখলেন—

> "ধর্ম্ম হইলা যবনরূপী
> মাথায় দিলা কালোটুপী
> ধর্ম্মের শত্রু করিতে বিনাশ।"

অর্থাৎ বিদেশী মুসলমানরা যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী প্রতিবেশী বাঙালী ভায়াদের দুঃখ দিতে লাগল, এতেই তাঁরা পরমানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন। এই ত সেইদিনের কথা—নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে অত বড় বিরাট পুরুষ চিত্তরঞ্জনের সমস্ত আয়ু নিঃশেষ হয়ে গেল। আজও কি তার বিরাম আছে? এই যে যুব-সঙ্ঘ; খোঁজ

করলেই দেখা যাবে, এর মধ্যেও তেরটি দল। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই—এর কত রকমের মতভেদ, কত রকমের মান-অভিমানের অ-বনিবানাও—পদ্মপাত্রে জল-বিন্দুর মত অস্থির, কখন গড়িয়ে আলাদা হয়ে গেল বলে বাইরে থেকে জড়ো করে ভিড় করার নাম কি organisation? Organic দেহবস্তুর মত এর পায়ের নখে ঘা দিলে কি মাথার চুল শিউরে ওঠে? কিন্তু যেদিন উঠবে, সেদিন উপায়হীনতার নালিশও অন্ততঃ বাঙ্গালাদেশে উঠবে না।

ভাবি, সেই ত সনাতন সংস্কার! শত্রু এসে সদর দরজায় ঘা দিচ্ছে, তবু দলাদলি আর মিটল না! অথচ এদের 'পরেই দেশের আজ সমস্ত আশা ভরসা! কবে যে এর মীমাংসা হবে, তা-জগদীশ্বরই জানেন।

আগেকার দিনে দিগ্বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করার জন্যে প্রধানতঃ রাজারা রাজ্য জয়ে বার হতেন, কিন্তু এখন দিনকাল বদলে গেছে। এখন রাজা নেই, আছে রাজশক্তি। এবং সেই শক্তি আছে জনকয়েক বড় ব্যবসাদারের হাতে। হয় স্বহস্তে করেন, না হয় লোক দিয়ে করান। বণিক-বৃত্তিই এখন মুখ্যতঃ রাজনীতি। শোষণের জন্যই শাসন। নইলে তার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। দশ-পনের বছর পূর্ব্বে যে জগৎব্যাপী সংগ্রাম হয়ে গেল, তার গোড়াতেও ছিল ঐ কথা—ঐ বাজার ও খদ্দের নিয়ে দোকানদারের কাড়াকাড়ি। বস্তুতঃ এইখানে আঘাত দেওয়ার মত বড় আঘাত বর্ত্তমান কালে আর নেই। নানা অসম্মানে ক্ষিপ্ত হয়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ-পণ্য বর্জ্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে; সঙ্কল্প তাদের সিদ্ধ হোক। বাঙলার তরুণের দল, এই সংঘর্ষে তোমরা তাদের সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করো। কিন্তু অন্ধের মত নয়; মহাত্মাজী হুকুম করলেও নয়; কংগ্রেস সমস্বরে তার প্রতিধ্বনি করে বেড়ালেও নয়। ভারতের বিশ লাখ টাকার খাদি দিয়ে আশী ক্রোর টাকার অভাব পূর্ণ করা যায় না। কাঠের চরকা দিয়ে লোহার যন্ত্রকেও হারানো যায় না, গেলেও তাতে মানুষের কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হয় না। বিশেষতঃ সম্প্রতি এটা অর্থনৈতিক বিবাদ নয়, রাজনৈতিক বিবাদ। একথা কোন মতেই ভোলা উচিত নয়। সুতরাং জাপানী সুতায় দেশের তাঁতের কাপড় দিয়ে হোক, দেশের কল-কব্জার তৈরী কাপড় দিয়ে অথবা খেয়ালী লোকের খদ্দর দিয়েই হোক, এ ব্রত উদযাপন করাই চাই। বাঙলা দেশে এই ব্রত অজানা নয়। সেদিন যে-পথ বাঙলার মনীষীরা স্থির করে দিয়েছিলেন, আজও সেই পথেই এই সঙ্কল্প সার্থক হবে। British cloth-এর স্থানে foreign cloth জুড়ে দিয়ে অহিংসা-নীতির পরাকাষ্ঠা দেখানো যেতে পারে, কিন্তু অসম্ভবের মোহে, আত্ম-বঞ্চনায় শুধু বঞ্চনায় জঞ্জালই স্তূপাকার হবে আর কিছুই হবে না। আগামী

৩১শে ডিসেম্বর ভোজবাজি সেবারের মতনই চোখে ধূলো দিয়ে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।

বাঙলার পল্লীতে আমার গৃহ; বাঙলাকে আমি চিনিনে এ অপবাদ বোধ করি আমার অতি বড় শত্রুও আমাকে দেবে না। ঘরে ঘরে গিয়ে দেখেছি, এ জিনিস চলে না। স্বদেশ-বৎসল দু-চারজন পুরুষের যদি বা চলে, মেয়েদের চলে না। অন্যান্য প্রদেশের কথা জানিনে, কিন্তু এদেশের তাদের দিনান্তে অনেকগুলি বস্ত্রের প্রয়োজন। এই দেশের সামাজিক রীতি এবং এই এ-দেশের মজ্জাগত সংস্কার। সভায় দাঁড়িয়ে খদ্দরের মহিমায় গলা ফাটালেও সে চীৎকার গিয়ে কোনমতেই পল্লীর নিভৃত অন্তঃপুরে পৌঁছাবে না। স্বচ্ছল গৃহস্থের কথাই শুধু বলিনে, গরীব চাষা-ভুষোর ঘরের কথাও আমি বলছি—এই সত্য, এবং এঁকে স্বীকার করাই ভাল। বাঙলার কোনো একটা বিশেষ সবডিভিসনে মণ-দুই চরকায়-কাটা সূতো তৈরী হওয়ার নজীর দাখিল করে এর জবাব দেওয়া যাবে না। এই ত গেল খদ্দরের বিবরণ; চরকারও ঐ অবস্থা। আমাদের ওদিকে চাষা-ভূষো দরিদ্র ঘরে মেয়েদের উদয়াস্ত খাটুনি। তারই ফাঁকে এক-আধ ঘণ্টা যদি সময় পায়, মহাত্মার আদেশ জানিয়ে চরকার হাতল হাতে তার গুঁজে দিলেও ঘুমিয়ে পড়ে। দোষ দিতে পারিনে। বোধ হয় সত্যিকার প্রয়োজন নেই বলেই এমনি ঘটে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। এদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মত—মানুষের জীবন-যাত্রার প্রয়োজন নিত্যই কমিয়ে আনা দরকার। অভাববোধই দুঃখ। অতএব দশ হাতের বদলে পাঁচ হাত কাপড় এবং পাঁচ হাতের বদলে কৌপীন পরিধান—এবং যে হেতু বিলাসিতা পাপ, সেই হেতু সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্র-সাধনই মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্ব্বোত্তম উপায়। এই পুণ্যভূমি ত্যাগ মাহাত্মেই-ভরপুর। উচ্চাঙ্গের দর্শনশাস্ত্রে কি আছে জানিনে, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, এই ত্যাগের মন্ত্র দিনের পর দিন সর্ব্বসাধারণকে মানুষের ধাপ থেকে নামিয়ে পশুর কোঠায় টেনে এনেছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা করবে কি, অভাব বোধটাই তাদের শুকিয়ে গেছে। ছোট জাত অস্পৃশ্য—তাতে কি? ভগবান করেছেন! একবেলার বেশি অন্ন জোটে না,—কপালের লেখা! এতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যারা আর একটু বেশী জানে, তারা উদাস চক্ষে চেয়ে বলে, সংসার ত মায়া,—দুদিনের খেলা; এজন্মে সন্তুষ্টচিত্তে দুঃখ সয়ে গেলে ভগবান আর-জন্মে মুখ তুলে চাবেন। এক অদৃষ্ট ছাড়া আর কারও বিরুদ্ধে তাদের নালিশ নেই। চাইতে তারা জানে না, চাইতে তারা ভয় পায়। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শক্তি নেই, স্বাস্থ্য নেই, অভাবের পর অভাব নিরন্তর যতই চেপে বসে, ততই তারা সহ্ করার বর প্রার্থনা

করে। তাতেও যখন কুলোয় না, তখন আকাশের পানে চেয়ে নিঃশব্দে চোখ বোজে।

একটা কথা পুরানো-পন্থীদের মুখে দুঃখ করে প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে, সেকালে এমনটি ছিল না। এখন চাষারা পর্য্যন্ত জামা পরে, পায়ে জুতো দিতে চায়, মাথায় ছাতা ধরে, তাদের মেয়েরা গায়ে সাবান মাখে, বাবুয়ানিতে দেশটা উচ্ছন্নে গেল। প্রত্যুত্তরে তাদের এই কথাই তোমাদের বলা চাই যে, এই যদি সত্য হয় ত আনন্দের কথা। দেশ উচ্ছন্ন না গিয়ে উন্নতির দিকে মুখ ফিরিয়েছে, তারই আভাস দেখা দিয়েছে। মানুষ যত চায়, ততই তার পাবার শক্তি বাড়ে। অভাব জয় করাই জীবনের সফলতা—তাকে স্বীকার করে তার গোলামী করাটাই কাপুরুষতা। একদিন যা ছিল না, তাকে অহেতুক বাবুয়ানি বলে ধিক্কার দিয়ে বেড়ানোই দেশের কল্যাণ কামনা নয়।

বিগত ডিসেম্বরে কলকাতায় আহূত All India Youth League-সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত নরিম্যান সাহেবের বক্তৃতার একটা স্থান আমি উল্লেখ করতে চাই। তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগে বার বার এই কথাটা বলেছিলেন যে, বারদোলীতে ইংরেজ শাসন-দণ্ডকে আমরা ভূমিসাৎ করে দিয়েছি। বৃটিশ-সিংহ লজ্জায় আর মাথা তুলতে পারছে না। অতএব Bardolise the whole country. বারদোলীর গৌরব-হানি করবার সংকল্প আমার নেই, এবং ওরা যে সাহসী এবং দৃঢ়চিত্ত এবং বড় কাজই করেছে তা সম্পূর্ণ স্বীকার করি। কিন্তু ঠিক এমনি কাজ যদি কখনও তোমাদের বাঙলায় করতে হয় ত কোরো, কিন্তু পশ্চিম ভারতের কংগ্রেস নেতাদের মত পৃথিবীময় অমন তাল ঠুকে ঠুকে বেড়িয়ো না। একটুখানি বিনয় ভালো। ব্যাপারটা কি হয়েছিল সংক্ষেপে বলি। প্রজারা বললে, "হুজুর, এক টাকার খাজনা দু-টাকা হয়ে গেছে, আমরা আর দিতে পারব না—মারা যাব। সত্য কি না খোঁজ করুন।" অবিবেচক রাজকর্ম্মচারী বলেন, "না, সে হবে না। আগে খাজনা দাও তারপরে অনুসন্ধান করব।" প্রজারা বললে, "না"। নেতারা জমা হয়ে সরকারকে জানালেন, এটা নিছক অর্থনৈতিক বিবাদ—একেবারে রাজনৈতিক নয়। গভর্ণমেণ্ট কান দিলে না, অল্প-সল্প অত্যাচারেই উৎপীড়ন শুরু হল—কতকটা যেমন ইউনিয়ন বোর্ড উপলক্ষে মেদিনীপুরে সেবার হয়েছিল। ছোট বড় যেখানে যত নেতা ছিলেন, রৈ-রৈ শব্দ করতে লাগলেন, খবরের কাগজগুলোর একটা যোজ্ঞোপ লেগে গেল। লাখে লাখে টাকা গিয়ে পড়ল বারদোলীতে,—যুদ্ধ চলতে লাগল। যুদ্ধ ততদিন থামল না, যতদিন না সরকারের সন্দেহ দূর হল যে, প্রজারা সত্যই ব্রিটিশ রাজত্ব উল্টে দিতে চায় না,—তারা শুধু একটু Enquiry এবং সম্ভবপর হয়ত কিছু খাজনার

মাপ, শুধু একটা ন্যায়বিচার। মোটামুটি এই এর ইতিহাস। বাঙ্গলাদেশে একে কখনও ব্রিটিশের হার বলে ভেবো না, কিংবা political সংঘর্ষকে economical ঝগড়া বলেও কখনো ভুল করো না,—সে repression-এর চেহারাই আলাদা। কাজে যদি কখনো নামো, যেমন নেমেছিলে বিগত কংগ্রেস volunteer organisationএ—যার সমতুল্য ভারতের কোথাও আজও হয়নি,—তখন আত্ম-বঞ্চনায় নিজেকে এবং দেশকে ঠকিয়ো না। তবে, ভরসা এই যে, এখানে উপস্থিত সভ্যদের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ অনেক আছেন যাঁরা ইংরেজের সে মূর্ত্তিকে ভালো ক'রেই চেনেন। যার যা যথার্থ মূল্য তা জানাবার জন্যই আমার এত কথা বলা। অসম্মানের লেশমাত্রও উদ্দেশ্য নেই।

অনেক সময় নিলাম ; অভিভাষণটা হয়ত দীর্ঘ হয়ে গেল। পরিশেষে একটা কথা বলে শেষ করব—সে, দেশে শিক্ষা-বিস্তারের কথা। যে শিক্ষা সভ্যজগতের প্রজারা দাবী করে, সে শিক্ষা-বিস্তার গভর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতিরেকে ব্যক্তি-বিশেষের চেষ্টায় হয় না। করতে মানা আমি করিনে, কিন্তু এখানে একটা night school, আর ওখানে একটা আশ্রম, বিদ্যাপীঠ খুলে যা হয়, তা ছেলেখেলার নামান্তর, তা সে যাই হোক, লেখাপড়া ছাড়া তার অন্য প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু একথা যাঁরা বলেন যে, দেশের সবাই লেখাপড়া না শেখা পর্য্যন্ত আর গতি নেই, মুক্তির দ্বার আমাদের একান্ত অবরুদ্ধ এবং এই জন্যে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে লেখাপড়া শেখান নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তাঁরা ভাল লোক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের 'পরে আমার ভরসা কম। এইবার শেষ করি। মুসলমান ভাইদের সম্বন্ধে আলাদা করে কিছুই বলার আবশ্যক মনে করিনে—কেন না, তাঁরাও দেশের এই তরুণ-সংঘের অন্তর্গত। তরুণেরা তরুণ-জাতি—তাদের আর কোন নাম নেই।

তোমরা ভালবেসে এতদূর আমাকে টেনে এনেছ, তার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ দিই।

সত্য মনে করে অনেক অপ্রিয় কথা বলেছি। পুরস্কার তার তোলা রইল। এই কংগ্রেস-মণ্ডপেই দু-দিন পরে তিরস্কারের বান ডেকে যাবে। কিন্তু তখন আমি হাওড়ার নিভৃত পল্লী মাজুতে গিয়ে সাহিত্যের দরবারে ভিড়ে যাব, এখানকার তর্জ্জন-গর্জ্জন কানে পৌছবে না—এইটুকু ভরসা।*

---

* ১৩২৯ সালের ইস্টারের ছুটিতে রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অব্যবহিতপূর্ব্বে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে প্রদত্ত বক্তৃতা।

অপ্রকাশিত রচনাবলী

বেতার-সঙ্গীত

শহর হইতে দূর গ্রামের মধ্যে আমার বাস। অতীতের নানাপ্রকার আমোদ ও আনন্দের প্রাত্যহিক আয়োজন গ্রামে আর নাই, পল্লী এখন নির্জীব, নিরানন্দ। কর্মক্লান্ত দিনের কত সন্ধ্যায় এই নিঃসঙ্গ পল্লীভবনে বেতারের জন্য উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করিয়াছি। শ্রাবণের ঘন মেঘে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আসে, কর্দমাক্ত জনহীন গ্রাম্যপথ নিতান্ত দুর্গম, নিবিড় অন্ধকার ভারের মত বুকের 'পরে চাপিয়া বসে, তখন বেতার-বাহিত গানের পালায় মনে হয় যেন দূরে থাকিয়াও আসরের ভাগ পাইতেছি।

আবার কোন দিন ক্ষান্তবর্ষণ আকাশে লঘু মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো দেখা দেয়, বর্ষার সুবিস্তীর্ণ নদী-জলে মলিন জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়ে, আমি তখন প্রাঙ্গণের একান্তে নদী-তটে আরাম-কেদারায় চোখ বুজিয়া বসি, তামাকের ধুঁয়ার সঙ্গে মিশিয়া বেতার বাঁশীর সুর যেন মায়াজাল রচনা করে। দু-একজন করিয়া প্রতিবেশী জুটিতে থাকে, ঘাটে বাঁধা নৌকায় দূরের যাত্রী, কৌতূহলী দাঁড়ি-মাঝির দল নিঃশব্দে আসিয়া ঘিরিয়া বসে, আবার শেষ হইলে পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া যে যাহার আলয়ে চলিয়া যায়। এই আনন্দের অংশ আমি পাই। (শ্রীনরেন্দ্র দেব রচিত 'শরৎচন্দ্র' নামক জীবনী-গ্রন্থ ; ২য় সংস্করণ)

শরৎচন্দ্রের উভয় সংকট

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একষষ্টিতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করিতে ৩রা আশ্বিন, ১৩৪৩, হাওড়া টাউন-হলে এক সভার অধিবেশন হয়।

সংবর্দ্ধনার উত্তরে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, তিনি যখন বাহির হইতে প্রথমে বাঙলা দেশে আসেন, তখন হাওড়াতেই অবস্থান করেন। তার পর বহু গ্রন্থও হাওড়ায় আসিয়া তিনি রচনা করিয়াছেন। হাওড়া তাঁহার অতি প্রিয় স্থান ; হাওড়াবাসীর নিকট হইতে তিনি বহুবার সংবর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন, সুতরাং প্রিয়জনের পুনর্ব্বার সংবর্দ্ধনার কোন প্রয়োজন ছিল না।

জীবনের অবশিষ্টাংশ মুসলমান-সমাজের চরিত্র অঙ্কনে ব্রতী থাকিবেন বলিয়া ঢাকায় তিনি যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখপূর্ব্বক ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, তাঁহার এই কথা বলিবার "একটা বড় কারণ রহিয়াছে।" তিনি বলেন যে, আমরা যতই মুসলমান সম্প্রদায়কে বিরুদ্ধবাদী বলিয়া মনে করি না কেন, মুসলমানগণ আমাদেরই প্রতিবেশী, বাঙলা ভাষাই তাহাদের মাতৃভাষা। "সত্যিকারের সহানুভূতি দিয়া যদি তাহাদের সহিত কথা বলি, তবে তারা শুনতে বাধ্য, কারণ, তারাও মানুষ।"

ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, অল্প দিনের মধ্যে বহু শিক্ষিত মুসলমানের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছে। তাহারা তাঁহার নিকট এই অভিযোগ করিয়াছে যে, বাঙলা-সাহিত্য অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক, কারণ উহাতে না-কি শুধু হিন্দুর সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্য 'সাম্প্রদায়িক' হইতে পারে না; "সাহিত্য সার্ব্বজনীন ব্যাপার।" হিন্দু ও মুসলমানের আর্থিক স্বার্থ এক—এই আর্থিক ভিত্তিতে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়া কত দিনে হইবে তাহা তিনি বলিতে পারেন না। যাঁহারা অর্থনৈতিক প্রশ্ন লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাহাদের এই বিষয়ে যাহা করিবার আছে তাহারা তাহা করুন, তবে তিনি "নিশ্চিত বুঝিয়াছেন যে, অন্ততঃ দশ বৎসরের মধ্যে সাহিত্যের ভিতর দিয়া (দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে) একটা বোঝাপড়া করা যাইতে পারে।" বহু হিন্দু ডাঃ চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, তিনি যেন তাঁহার সাহিত্যে মুসলমান সমাজ-চরিত্র অঙ্কন না করেন, কারণ ইহাতে তাঁহার "একটা বিপদ" ঘটিতে পারে। আবার বহু মুসলমানও তাঁহাকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তিনি মুসলমান-সমাজের "অনেক কিছুই" জানেন না, কাজেই তাঁহার পক্ষে এই কাজে হাত দেওয়া বিপজ্জনক। কিন্তু ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, সুতরাং দুইদিন পূর্ব্বে বা পরে মরিলে তাঁহার আক্ষেপের কিছু নাই।

উপসংহারে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, হিন্দুদের অনেক কিছু সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহাদের মনে যে গভীর ক্ষত হইয়াছে "সেই ক্ষতকে উস্কে তুলে" দিলে সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। তিনি মনে করেন যে সাহিত্যের ভিতর দিয়া দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বোঝাপড়ার চেষ্টা তিনি করিবেন, তাহা যদি তিনি "সমস্ত মন দিয়া" করিতে পারেন, তাহা হইলে সমস্যার আশু সমাধান হইবে। ('বাতায়ন', ৭ই আশ্বিন, ১৩৪৩)

অপ্রকাশিত খণ্ডরচনা

এক

১। বিদ্যা বা লেখাপড়া শেখার ফলে Standard of living এর standard বাড়বেই এবং economic condition ভালো না হলে পারিবারিক অসন্তোষ বাড়বেই।

২। Economic অবস্থা বাড়াবার উপায় একমাত্র শিক্ষিত পুরুষদের industry গড়ে তোলা, ছোট দোকান করবার শিক্ষা ছেলেবেলা থেকে শিখতে হয়। B. A. পাস করার পরে ও-জিনিস চলে না, ওখানে অশিক্ষাই বরং কাজের।

৩। জাতের ছোট-বড় ভাঙ্গার চেষ্টা করতে হবে।

৪। মুষ্টিমেয় সমাজের মধ্যে থেকে মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী ভদ্র সন্তানের অপরিসীম sacrifice কাজে লাগে না। এই মুষ্টিমেয় লোকগুলি যদি সমাজের সর্ব্বস্তরের মধ্যে থেকে আসতো, সমস্ত সমাজের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ থাকতো।

৫। Permanent Settlementএর জন্যেই জমিদার, তালুকদার ও অসংখ্য মধ্যবিত্ত middlemen সমস্ত সমাজেরeconomic অবস্থাকে বাড়তে দেয়নি—কেবল মাত্র জমি আঁকড়ে থেকে শুধু কৃষকরাই যা কিছু দেশের wealth সৃষ্টি করছে। বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে Permanent Settlement না থাকার জন্যই ওদেশে industryর উন্নতি হচ্ছে। জমি কেনা ও বেশী সুদে লগ্নি কারবার করা এই হচ্ছে বাঙলার ধনী হবার একমাত্র পন্থা।

৬। কলেজের-মেয়ে,—বই মুখস্থ করে, আর পরীক্ষা পাস করার চেষ্টায় ক্রমাগত রাত্রি জাগরণে শরীর-স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে যায়—আর সব লোকসানই পূরণ হতে পারে, কিন্তু যে সন্তান এদের জন্মাবে সে চিররুগ্ন হয়েই থাকবে? ('বাতায়ন', ১৬ই বৈশাখ, ১৩৪৫)

দুই

১। সহজ বুদ্ধিই দুনিয়ায় সবচেয়ে অ-সহজ।

২। বিশেষ কাজের বিশেষ ধারা পৌনঃপুনিক ব্যবহারে দাঁড়ায় মানুষের অভ্যাসে। সেই ব্যষ্টির অভ্যস্ত কাজ ব্যাপ্ত হয়ে যখন সমষ্টিতে ছড়িয়ে পড়ে তখনই সে হয় আচার।

৩। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরও পূর্ব্বে যাঁরা চিন্তা এবং বুদ্ধি দিয়ে দেখিয়েছিলেন বহু ক্লেশসাধ্য কাজের পরিণাম মঙ্গলময়।

৪। আচার-বিচার কথাটা এক নিশ্বাসেই বলি বটে, কিন্তু আচার জিনিসটা বুদ্ধি দিয়ে প্রবর্ত্তিত হয়নি, তাই যুক্তি দিয়েও এর পরিবর্ত্তন হয় না।

৫। অদৃষ্ট জিনিসটাই চিরদিন জীবন-সংগ্রাম ও ধর্ম্মের মাঝে অচ্ছেদ্য ও অফুরন্ত সেতুর শিকলের মতো জুড়ে আছে।

৬। দৃশ্যমান সকল বস্তুরই আরম্ভটা অজ্ঞেয়তত্ত্বে অদৃশ্য হয়েছে।

৭। ধর্ম্মনিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে ধর্ম্মের বই কত পড়তে হয়। সমাজের উন্নতি করতে হলে সমাজ সম্বন্ধে কত অভিজ্ঞতা দরকার। তার সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করতে নেই। ('বাতায়ন', ৬ই আশ্বিন, ১৩৪৫)

শুভেচ্ছা

শারদীয় পূজা বাঙালীর সবচেয়ে বড় উৎসব। এর প্রতি বাঙালীর নর-নারীর ঔৎসুক্যেরও অবধি নাই, স্নেহেরও অন্ত নাই। তাই এ প্রকাশ পায় তাদের আনন্দের নানা পথে, নানা বিচিত্র গতিতে। কোথাও বা অন্তর্ম্মুখী—মানুষের আপন গৃহে ফিরে আসার তাড়া, আত্মীয়-স্বজনগণের সামীপ্য কামনা। আর কোথাও বা বহির্ম্মুখী—ঘর ছেড়ে বাহিরে যাবার তাগিদ। যে অপরিচিত আজও অজানা, তাঁদের আপন করে জানার ব্যাকুলতা। সুতরাং, সেদিন যখন শিলং পাহাড়ের হেমচন্দ্র এসে বললেন, এবার পূজায় তাঁরা একখানি কাগজ বার করবেন, আমি বিস্মিত হইনি, এ ভালোই হ'ল যে, এঁদের আনন্দোৎসবের ধারা এবার সাহিত্যসেবার খাতে প্রবাহিত হবে। এ আয়োজন সম্পূর্ণ ও সুন্দর করবার শ্রম আছে, ব্যয় আছে,—সে থাক—

তবু, সমস্তকে অতিক্রম করেও একাগ্র সাধনার যে সফলতা বাণীর প্রসাদস্বরূপ এঁরা পাবেন, তাতে অকলঙ্ক আনন্দরস মধুরতর হয়ে উঠবে।

কিন্তু একটা কথা বলারও আছে। আমি জানি, আমার এই কয় ছত্র মাত্র লেখার মূল্য কিছু নেই, থাকা সম্ভবও নয়। কারণ, শক্তি যাদের নিঃশেষিতপ্রায়, আয়ুঃ অস্তোন্মুখ, তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করা আর চলে না। তবু এই আগন্তুক পত্রিকাখানির ক্ষতি হবে না। সাহিত্যব্রতে যাঁরা নবীন পথিক, যাঁরা উদীয়মান, বেগ যাঁদের চঞ্চল গতিশীল, এই বাণীপূজার মহৎ অর্ঘ্য তাঁদের কাছ থেকেই সম্পূর্ণ সমাহৃত হবে, এই আমার আশা। শিলংএর বাঙালী অধিবাসীগণের পক্ষে হেম চেয়েছিলেন শুধু আমার কাছে আশীর্বাদ, তাঁদের শারদবার্ষিকীর জন্য শুভ কামনা। একান্ত মনে প্রার্থনা করি, তাঁদের যত্ন, তাঁদের সাধনা সার্থক হোক, এই বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকাখানির আয়ু যেন সুদীর্ঘ হয়। এ যেন এমনি করেই বর্ষে বর্ষে ফিরে আসে। ইতি—১৪ই ভাদ্র, ১৩৪১। (১৩৪১ সালের 'শিলং বার্ষিক' পত্রিকা)

জীবন দর্শনে শরৎচন্দ্র

'প্রথমেই তাহার স্বাস্থ্যের কথা তুলিলাম। সে কথায় অতিশয় ক্লান্ত এবং মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "মোহিত, আমি মৃত্যু কামনা করি, আমার আর এতটুকু বাঁচিতে ইচ্ছা নাই।" কথাটা যেন কেমন বোধ হইল, আমি প্রতিবাদ করিলাম—বলিলাম, নিজের মৃত্যু কামনা করা ও আত্মহত্যা করা একই কাজ—তাঁহার মত লোকের মুখে এমন কথা বাহির হওয়া উচিত নয়। শুনিয়া তিনি হাসিলেন, বলিলেন, "না, তোমার বয়সে তুমি ইহা বুঝিবে না; মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন সুখ-দুঃখ সকল চেতনাই মন হইতে খসিয়া যায় এবং জীবনকে আর তিলার্দ্ধ সহ্য করিতে পারে না। আমার তাহাই হইয়াছে। আমি দুঃখ বা সুখের কথা ভাবিতেছি না—আমি জীবন হইতে অব্যাহতি চাই মাত্র। তুমি বিশ্বাস করিতেছ না? আমি অন্যেরও এমন অবস্থা হইতে দেখিয়াছি। ছোটবেলায় আমি আমার এক দিদির কাছে থাকিতাম। তাঁহার বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ী তখন বাঁচিয়া ছিলেন; তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; শেষে কিছুকাল রোগভোগ করিতে ছিলেন। এরূপ অবস্থায় রোগমুক্তি অথবা শীঘ্র মৃত্যুর আশায় হিন্দু যাহা করে, গ্রামের সকলে তাহাই করিতে পরামর্শ দিল, বলিল, "প্রাচিত্তিরটা করিয়ে দাও, এমন-

ভাবে রাখা ঠিক নয়।" প্রায়শ্চিত্ত করিতে বৃদ্ধার কি আনন্দ! যেন কত আশা! প্রায়শ্চিত্তের পরে কবিরাজ একদিন তাঁহার নাড়ী দেখিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তাঁহার আর জ্বর নাই, তিনি এ-যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। শুনিয়া বৃদ্ধার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল, একটি কথা কহিলেন না। সেদিন রাত্রে এক শব্দে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল—আমি বাহিরের ঘরে শুইতাম, ভিতরে উঠানের দিকে বার বার একটা কিসের শব্দ হইতেছে। দরজা খুলিয়া উঠানে নামিয়া শব্দের নিকটে আসিয়া দেখি—উঠানের মাঝখানে যে ঠাকুর-ঘর আছে, তাহারই দুয়ারের পৈঠায় সেই বৃদ্ধা পাগলের মত আপনার মাথা ঠুকিতেছে, আর বলিতেছে, "তুমি আমাকে নেবে না—এত করে ডাকছি, তবু তোমার দয়া নাই!" স্থানটা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে। বুঝিলাম, রাত্রে সকলে ঘুমাইলে পর সেই চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধা আপনার দেহটাকে এত-দূর টানিয়া আনিয়াছে—বড় আশায় হতাশ হইয়া তাঁহার দেহের শেষ শক্তিটুকু দিয়া তিনি এই কাজ করিয়াছেন। সকলকে ডাকিয়া তাঁহাকে ধুইয়া মুছিয়া ধরাধরি করিয়া ঘরের ভিতরে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। ইহার পর তিনি আর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। সেদিন যা বুঝি নাই, আজ তাহা বুঝি। আমারও সেই অবস্থা হইয়াছে।"—"দেখ লোকে বলে আমি বঙ্কিমের অনুরাগী নই—আমার যেন বঙ্কিমের প্রতি একটা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ আছে—দেখ, জীবনের সত্যকে, যত বড় কবিই হউক, লঙ্ঘন করিতে পারেন না; নারীর সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের সমাজে সংস্কারের মত বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা যে কত মিথ্যা, তাহা আমি জানি বলিয়াই কোন কবি, বিশেষ করিয়া যিনি খুব বড় কবি বলিয়াই সম্মান পাইয়া থাকেন, তাঁহার লেখার দায়িত্বহীন কল্পনার অবিচার আমি সহ্য করিতে পারি না। ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের অনুরোধে মানুষের প্রাণকে ছোট করিয়া দেখিতে হইবে,—নারীর জীবনের যেটা সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি, তাহাকেই একটা কুৎসিত কলঙ্করূপে প্রকাশ করিতে হইবে—ইহাতে কবিপ্রাণের মহত্ত্ব বা কবি কল্পনার গৌরব কোথায়? আমাদের সমাজে যে নিদারুণ অবিচার প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, সাহিত্যে যদি তাহারই পুনরা-বৃত্তি দেখি, তবে মানুষ হিসাবে মানুষের মূল্য স্বীকার করা সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে রোহিণীর দুর্গতির কথা যখন ভাবি, তখন আমার নিরুদিদির কথা মনে হয়! সে গল্প তোমাকে বলি। নিরুদিদি ছিলেন ব্রাহ্মণের-মেয়ে, বালবিধবা! বত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। গ্রামে এমন সুশীলা, ধর্ম্মমতি, পরোপকারী, শ্রমশীলা ও কর্ম্মিষ্ঠা আর কেহ ছিল না; রোগে সেবা, দুঃখে সান্ত্বনা, অভাবে সাহায্য, এমন কি অসময়ে দাসীর-ন্যায় পরিচর্য্যা, তাঁহার নিকটে পায় নাই এমন পরিবার বোধ হয় সে গ্রামে একটিও ছিল না। আমার বয়স

তখন অল্প, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া আমার একটা বড় উপকার হইয়াছিল—আমি একটা বড় হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম। এতকাল পরে, সেই বত্রিশ বৎসর বয়সে নিরুদিদির পদস্খলন হইল। গ্রামের স্টেশনের এক বিদেশী রেল-বাবু সেই আজন্ম ব্রহ্মচারিণীর কুমারী হৃদয় যে কি মন্ত্রে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহা সেই পাষণ্ডই জানে—যে শেষে তাঁহাকে কলঙ্কের প্রকাশ্য অবস্থায় ফেলিয়া পলায়ন করিল। সে অবস্থায় সচরাচর যে একমাত্র উপায়, নিরুদিদিকে তাহাই করিতে হইল। ইহার পরে, এমন যে স্বাস্থ্য তাহা একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। অবশেষে তিনি মরণাপন্ন হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। মুখে একটু জল দেওয়া পরের কথা, কেহ তাঁহার দুয়ার মাড়াইত না। যে সকলের সেবা করিয়াছে, যাহার যত্নে শুশ্রূষায় কত লোক মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচিয়াছে, সে আজ একটা গৃহপালিত পশুর অধিকারেও বঞ্চিত হইল। আমাদের বাড়িতেও কড়া হুকুম ছিল, তাঁহার কাছে কাহারও যাইবার জো ছিল না। আমি লুকাইয়া যাইতাম—মাথায় পায়ে একটু হাত বুলাইয়া দেওয়া, দুই-একটা ফল সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া আসা,—আমার নিজের অসুখ হইলে, রোগীর পথ্যরূপে যাহা পাইতাম, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ তাঁহার জন্য লইয়া যাওয়া—ইহাই ছিল আমার যথাসাধ্য সেবা। কিন্তু সেই অবস্থাতেও, মানুষের হাতে এই পৈশাচিক শাস্তি পাইয়াও তাঁহার মুখে কোনও অভিযোগ অনুযোগ শুনি নাই, তাঁহার নিজেরই লজ্জা ও সঙ্কোচের অবধি ছিল না,—যেন তিনি যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহার কোন শাস্তিই অতিরিক্ত হইতে পারে না। সেদিন তাহাই দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম, পরে বুঝিয়াছি, আপনার অপরাধের শাস্তি তিনি আপনাকেই আপনি দিয়াছেন—পর যেন উপলক্ষ মাত্র; মানুষকে তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন, আপনাকে ক্ষমা করেন নাই। ইহাতেও তাঁহার শাস্তির শেষ হয় নাই—তিনি যখন মরিয়া গেলেন, তখন তাঁহার শবদেহ কেহ স্পর্শ করিল না, ডোমের সাহায্যে তাহা নদীতীরের এক জঙ্গলে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল, শিয়াল-কুকুরে তাহা ছিঁড়িয়া খাইল।”...পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, “মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছে, আমরা এমন করিয়াই তাহার অপমান করি। রোহিণীর কলঙ্ক ও তাহার শাস্তিও এই পর্য্যায়ের, এমন একটা নারীচরিত্রের কি দুর্গতিই বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন!”*

---

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. উপাধিদান উপলক্ষে ঢাকায় অবস্থানকালে শরৎচন্দ্র আলাপ-আলোচনায় কবি ও সমালোচক শ্রীমোহিতলাল মজুমদারকে উপরি-উক্ত বিষয় বিবৃত করেন। (‘শনিবারের চিঠি’—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)

সাহিত্য-সভার অধিবেশনে অভিভাষণ

আমাকে আপনারা আজ এখানে আহ্বান করে পরম গৌরব দান করেছেন। কিন্তু পাঁচ বৎসর আগে রবিবাবু এখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—সে জন্য সঙ্কোচ বোধ করছি। আমি লিখে থাকি, কিন্তু বলতে আমি পারি না—সকলে সব কাজ পারে না। আমি কতকগুলি বই লিখেছি; কিন্তু বক্তৃতা আমার কাছে বেশী প্রত্যাশা করবেন না।

আমি সাহিত্যিক—কাজে কাজেই সাহিত্যের বিষয় বলাই আমার স্বাভাবিক। রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে 'হুতুম পেঁচার নক্সা' প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে বাঙলা সাহিত্য কেমন করে বড় হয়ে উঠল, সে ইতিহাস আমি ঠিক জানি না; দীনেশবাবু সে বিষয়ে ঠিক বলতে পারবেন।

আমি দশবৎসর পূর্ব্বে প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে দাঁড়াই। 'যমুনা' বলে একটা কাগজ ছিল, তাঁর গ্রাহক সংখ্যা মোটে বত্রিশ—কেউ তাতে লেখে না। আমি তখন বর্ম্মা থেকে এখানে এসেছিলাম। সম্পাদক বললেন—কেউ লেখা দিতে চায় না, তোমাকে লিখতে হবে। (কেউ লেখা দিতে চায় না বলে আমায় লিখতে হবে, সেটা আমার পক্ষে খুব গৌরবের কথা নয়।) বললুম—ছেলেবেলায় লিখিছি বটে, কিন্তু তার পরে তো লিখিনি। সম্পাদক বললেন—তাতেই হবে। তারপর বর্ম্মা ফিরে গেলুম। ক্রমাগত টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পেয়ে লিখতে হ'লো। সেই থেকে এই দশবছরে এই বইগুলো লিখেছি। কিন্তু আগেই বলেছি—সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষ জানি না। কিন্তু আধুনিক সাহিত্য যাকে বলা হয়, তা যখন রচনা করেছি; তখন জানি না বললে সেটা বোধ হয় অতিরিক্ত বিনয় হয়ে পড়বে। যদি কিছু অপ্রিয় সত্য বলে ফেলি তা হলে ক্ষমা করবেন।

আমি প্রথমেই দেখলুম—ছোট ছোট গল্প বড় দরকার। রবিবাবু আগে লিখে গেছেন তারপর আর তেমন কেউ লেখেননি। আমি লিখতে লাগলুম। সম্পাদক বললেন—দেখ, প্রেম-ট্রেম না। ও একবারে পুরানো হয়ে গেছে। দুর্নীতি না থাকে এমন সব ভাল গল্প লেখ। লিখলেম। তাঁরা বললেন—ভাল হয়েছে। ক্রমশঃ সাহিত্যের মধ্যে যখন আসতে লাগলুম, দেখলুম—দুর্নীতি প্রচার ক'রো না; প্রেমের গল্প লিখ না; এ ক'রো না; ও ক'রো না—এসব বললে তো চলবে না। তখন 'চরিত্রহীন' শুরু করি। সে বইটা বেশ প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। যখন লিখি

তখন—মেসের ছাত্রদের চরিত্র থাকল না, দেশ দুর্নীতিতে ডুবে গেল, সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা হ'ল না—প্রভৃতি অনেক গালাগালিই শুনতে হয়েছে। কিন্তু বর্মা চলে গেলুম—গালি ততদূর পৌঁছল না।

ভাবলুম—ভয়ে লিখব না, সে ত ঠিক না। কেননা সব জিনিসই বদলায়। আজ যা সত্য দশ বৎসর পরে তা আর সত্য থাকবে না। আজ যা অসত্য, আজ যা অন্যায়, হয়তো একশো বছর পরে তার স্বরূপ বদলাবে। যারা লেখক তারা যদি পঞ্চাশ বছর, একশো বছরের কথা এগিয়ে কল্পনা করতে না পারে তবে চলে না। যাঁদের মনে হচ্ছে—লোক বিগড়ে যাবে; তখন তাঁদেরই আর সে কথা মনে হবে না। মানুষের idea ক্রমেই বদলে যাচ্ছে।

সাহিত্য স্বষ্টির কাজে দুই রকম লোক আছে। অনেকে লিখছেন না, কাজ করে যাচ্ছেন—জানছেন না—তাঁদের আমার মত সাহিত্য ব্যবসায়ীকে আঁকবার চরিত্র যোগাচ্ছে, আমরা আর একদল লিখি—এই সব চরিত্র স্বষ্টি করি। এ ছাড়াও আর একদল আছেন, যাঁরা শুধু যাচাই করেন। আমরা সমাজের বাইরে যাচ্ছি কিনা, দুর্নীতি প্রচার করছি কিনা—এই সব দেখেন। রবিবাবু সেদিন বললেন—ও ইস্কুল মাস্টারের দল আমরা মানব না। ওদের বিধিনিষেধকে ঠেলে যা খুশি করবো। আমার কিন্তু মনে হয়—একথা বলা যায় না। তাঁদেরও চাই। তাঁদেরও বলবার right আছে। আমরা সকলে মিলে ভাষাকে পর পর গঠিত করে যাচ্ছি।

আমি সেদিনও বলেছি যে, আজকাল একটা রব উঠেছে—বঙ্কিমবাবুকে কেউ মানে না, তাঁর ভাষা লেখে না। আমার মতে বঙ্কিমবাবুর কাজ হয়ে গেছে, তাঁর ভাষাকে ডিঙিয়ে যেতে হবে; তাঁর ideaকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। আমার বোধ হয়, —"তাঁর অনেক চরিত্রেই খুঁত আছে। অনেক চরিত্রে সামঞ্জস্য নাই। এইটা করা দরকার, এইটা মন্দ—এই ভাবেই তিনি লিখে গেছেন। যাকে ভাল করেছেন—তাকে ভালই করেছেন, আর যাকে মন্দ করেছেন—তাকে মন্দই করেছেন। তার বেশী তিনি এগুতে পারেননি; হয়তো দরকার হয়নি, কিম্বা সমাজের মান রেখে বলতে পারেননি; কিংবা ফলাফল ভেবে বলেননি—বলতে পারি না। তাঁর সঙ্গে তো আমার আলাপ ছিল না। কিন্তু, এখন মনে হয়—চরিত্রের দিক দিয়ে তাঁর অনেক ভুল আছে। আজ-কালকার দিক দিয়ে দেখলে—এখানে থেমে থাকা চলে না। সত্য কথা বলতে হবে।"

সম্পাদক মহাশয় বললেন—"আমি সত্য কথা সোজা করে বলবার চেষ্টা করেছি। বাস্তবিকই আমি দেখেছি—ঐ জিনিসটা দরকার। তাই এতে আমি কুণ্ঠা করি না। সাহিত্য গড়বার শক্তি হয়তো আমার নেই। কিন্তু গোটা-কয়েক সত্য কথা

বলবার চেষ্টা করেছি, অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশে যা দেখেছি শুনেছি—তাই লিখে যাচ্ছি, আমি তা বলতে ভয় করি না। কারণ আগেই বলেছি—একশো বছর পরে হয়তো মনে হবে এই সত্য এ সব বোধ হয় কারো বলবার দরকার ছিল।"

নিজের সম্বন্ধে অনেক বলে ফেলেছি। সেটা দেখতে তেমন ভাল দেখায় না। আমি যা বলছিলাম, তাই বলব। আজ কাল একটা তর্ক উঠেছে—আমরা দুর্নীতি প্রচার করছি, যা খারাপ, মন্দ তাই সব লিখছি। রবিবাবুও অনেক গাল-মন্দ খেয়েছেন। আমি তাঁর শিষ্য, আমিও বড় কম খাইনি। কেবল যুবক সম্প্রদায়ই বোধহয় আমার পৃষ্ঠপোষক। যাঁরা আমার বয়সী, কিংবা আমার চেয়ে প্রবীণ, তাঁরা রব তুলেছেন আমি ক্ষতি করছি। আমি এমন জিনিস এনেছি, যা আগে ছিল না, যা নাকি অত্যন্ত নোংরা। অবশ্য আমি মনে করি না যে সব সত্যই সাহিত্যে স্থান পেতে পারে; অনেক কুৎসিত ব্যাপার আছে, যাতে সাহিত্য হয় না। (এ আমি বললুম কারণ এ নইলে অনেকে আমাকে ঠিক বুঝবেন না।) কিন্তু আমি যে জিনিসটা দেবার চেষ্টা করেছি সেটা ক্রমাগত সমাজের মধ্যে এসে পড়েছে, আমাদের চোখের উপর চলেছে—সে সমাজের অঙ্গ, তাকে কুৎসিত বলে অস্বীকার করলে চলবে না। তাকে সাহিত্যে স্থান দিতে হবে। আমি পাপীর চিত্র এঁকেছি। হয়তো পাপ তাঁরা করেছেন, তাই বলে খুনী আসামীর মত তাঁদের ফাঁসি দিতে হবে নাকি? মানুষের আত্মার আমি অপমান করতে কখনও পারি না। কোন মানুষকেই নিছক কালো মনে করতে আমার ব্যথা লাগে। আমি ভাবতে পারিনে যে একটা মানুষ একেবারে মন্দ, তার কোন redeeming feature নেই। ভাল-মন্দ দুই-ই সবার মধ্যে আছে, তবে হয়তো মন্দটা কারো মধ্যে বেশী পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু তাই বলে ঘৃণা তাকে কেন করবো? অবিশ্যি আমি কখনও বলি না যে, পাপ ভালো। পাপের প্রতি মানুষকে প্রলুব্ধ করতে আমি চাই না। আমি বলি তাঁদের মধ্যেও তো ভগবানের দেওয়া মানুষের আত্মা রয়েছে। তাকে অপমান করবার আমাদেরও কোন অধিকার নাই।

আমি এমন জিনিস অনেক সময় তাদের মধ্যে দেখেছি, যা বড় সমাজের মধ্যে নেই। মহত্ত্ব জিনিসটা কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে না। তাকে সন্ধান করে খুঁজে নিতে হয়। মানুষ যখন মহত্ত্বের সন্ধান করতে ভুলে যাবে তখন সে নিজেকে ছোট করে আনবে। আমি অনেক সময় তাদের মধ্যে যা ভালো, দেখাতে চেয়েছি; কারণ তাকে discard করবার আমাদের right নেই। যেখানে বড় জিনিস আছে তাকে সম্মান করতে হবে। জ্ঞান যদি প্রয়োজনীয় হয়, খারাপ জিনিসের

মধ্যেও তাকে খুঁজতে হবে—ক্ষতির ভয় থাকলেও খুঁজতে হবে। তা ছাড়া জানতে গেলেই যে আকৃষ্ট হতে হবে তার মানে আছে?

আমি মনে করি মানুষকে একথা বোঝানো দরকার যে খারাপের মধ্যেও মহত্বকে মনে মনে recognise করতে হবে। পাপীর প্রতি ঘৃণা—এই যে একটা convention আছে; তা হয়তো আমি জানি না। এইজন্য লোকে ভাবে, আমি এমন করলাম যাতে তারা তরুণ, তাদের মন এমন খারাপ হয়ে যাবে যে সমাজ ভেঙে পড়বে। কিন্তু আমি কেবল দেখাতে চেয়েছি যে পাপীর প্রতি ঘৃণা মেনে নিলেও, তাদের মধ্যে যেটুকু ভালো সেটুকুর প্রতি যেন অন্ধ না করে। তা ছাড়া যে কথাটি বার বার বলেছি, আজ যেটা নীতি, ভাল-মন্দের যে মাপকাঠি দিয়ে তাকে বিচার করা হচ্ছে, কাল যে সে বদলে যাবে না তাই বা কে জানে? লেখাই যাদের পেশা, তাঁরাও যদি—কেবল সমাজে যা দেখছি, যা হচ্ছে, কেবল তাই নিয়ে নাড়া-চাড়া করেন, তবে সেটা ভাল মনে হয় না।

দেখুন, এক সময়ে বিধবা-বিবাহের কথা তুললে বড় খারাপ জিনিস মনে হ'ত। যাঁরা বলতেন বা সাহিত্যে লিখতেন সমাজ তাঁদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠতো। আমার 'পল্লী সমাজ' বলে একটা বই আছে। সে বিষয়ে অনেকেই জিজ্ঞাসা করে থাকেন, "ওর নায়ক-নায়িকার তো কিছুই করলেন না, ও কি রকম হল?" আবার কেউ বলেন, "আমার এই বইয়ের জন্য গ্রামে গ্রামে খারাপ ভাব বেড়ে যাবে ও সমস্তের মন্দ ফল হবে।" আমি তার মধ্যে এই বলতে চেয়েছিলাম—"এই পাড়া-গাঁয়ের সমাজ। যাকে শহর থেকে মনে করছি—সেখানে পদ্ম ফুটছে; মানুষ ভাইয়ে ভাইয়ে প্রেমে গলাগলি করছে, জ্যোৎস্না ছড়িয়ে যাচ্ছে এই সব, সেখানেও পুকুরে শালুক ফুটছে, বিলাতী কচুরীতে সব ছেয়ে গেছে, দলাদলির তো অন্তই নাই।"

পল্লী-সমাজের বিধবা নায়িকা—রমা। তার বিবাহের ছমাস পরে তার স্বামী মারা যায়। সে তার বাল্যবন্ধুকে আগে থাকতেই ভালবাসত। শেষে নায়ক জেল থেকে ফিরে এলো। নায়িকা জর হয়ে কাশীটাশী চলে গেল। সমস্ত গল্পটাই ছন্নছাড়া হয়ে গেল। তাই অনেকে বলেন—কিছু constructive করলেন না, কোনো সমস্যার পূরণ করলেন না, সব শেষে কিম্ভূত-কিমাকার হয়ে গেল। আমি বলি ও আমার কাজ নয়। আমি দেখালুম—গ্রামে নায়কের মত একটা মহৎ প্রাণ এলো, নায়িকার মত মহৎ নারী এলেন। সমাজ তাঁদের উৎপীড়ন করলে। সমাজের কি gain হ'লো? এই দুটি জীবনের যদি মিলন হ'তে পারতো, এ জিনিসটা যদি সমাজ নিতে পারতো; তবে তারা দশখানা গ্রামের আদর্শ হ'তো। আমরা তাদের

repress করলাম, ছটো জীবন ব্যর্থ করে দিলাম, সেই জন্য conclusionও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

Social reform বা Construction আমার কাজ নয়। আমার ব্যবসা লেখা। এই যে আগ বাড়িয়ে এরা ছজন দেখছে সেটা সত্য হলে সমাজ লাভবান হ'তো এই দেখাতে গিয়েছিলাম। যাঁরা একে অন্যায় ভাবেন, তাঁরা এর জন্য আমায় গালাগালি দিচ্ছেন; তা ছাড়া আমার যাঁরা আত্মীয় তাঁরাও আমাকে বলেন—এ বিষয়ে অন্যায় করেছো। যে বিধবা হ'লো, সে নিজের স্বামীকে ধ্যান করবে, তা না সে আর একজনকে ভালবাসছে; এ তার উচিত হয়নি। এর উত্তরে আমি আর কি বলবো? সেই এক কথা বলবার আছে, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিতের standard যুগে যুগে বদলে যায়। আর একটা জিনিস দেখতে হবে। দুর্নীতি প্রচার করছে বলে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছি, দেখতে হবে সে কোনও নূতন idea দিচ্ছে, না সত্যের অজুহাতে কতকগুলো নোংরা জিনিস চালাচ্ছে। মিছামিছি কুৎসিত কথা টিকবে না। আমিও যদি সেরকম দিয়ে থাকি আমার সে সব লেখাও ঝরে পড়ে যাবে। মোট কথা, সমসাময়িক ভাবের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না বলেই দুর্নীতিমূলক—একথা মনে করা ঠিক হবে না। যদি লোকে দেখে লেখকের কথাটা ভাবা দরকার তা হলেই তার কাজ হ'ল।

আজ যে এত কথা বলছি, কারণ, কেন জানি না, এ জিনিসটা আজকাল বড় ঘুলিয়ে উঠেছে। সেদিন Oriental Seminaryতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কয়েকজন এ-বিষয়ে আমাকে খুব মন্দ বললেন। (এ রকম ডেকে নিয়ে গালাগালি দেওয়া—ব্যাপারটা মন্দ নয়) তাঁরা এক Library প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানে নাকি কেবল দুর্নীতিমূলক নভেলের ছড়াছড়ি হচ্ছে, তাতে ছেলেদের চরিত্র নষ্ট হচ্ছে। আর তার জন্য আমিই নাকি দায়ী। আমি বললাম, তা জিনিসটা বাস্তবিকই খারাপ হয়েছে। তা এক কাজ করুন—Library তুলে দিয়ে একটা সংকীর্তনের দল খুলে দিন। বেশ নীতি প্রচার হবে।

এ প্রসঙ্গে আর দরকার নেই। এই জিনিসটাই আমার বলবার ছিল যে, আপনারা আজ আমার বিষয় বলতে গিয়ে, অনেক অত্যুক্তি করেছেন, কিন্তু যদি মনে করেন সাহিত্যকে সাহিত্যিকের দিক দিয়ে সাহিত্যিকের প্রাণ নিয়ে—যে জিনিস কল্পনা দিয়ে সাহিত্যিক দেখতে পাচ্ছেন—সে রকম আমি দেখবার চেষ্টা করেছি, তবে তার চেয়ে আনন্দের বিষয় আমার আর নেই। আপনারাই দেশের

আশাস্থল। সমাজে আপনারা অনেকেই ভবিষ্যতে গণ্যমান্য হবেন। আপনাদের প্রশংসাই আমার গৌরবের বিষয়।

আমি আজ ঠিক সুস্থ নই—তবে এইখানেই আলোচনাটা শেষ করি।*

ছাত্র-সভায় ভাষণ

তোমাদের এই বিদ্যামন্দিরে এসে আমার নিজের অধ্যয়ন-জীবনের কথাই আজ বারবার করে মনে পড়ছে। আমারও একদিন তোমাদের মতই উচ্চশিক্ষার আশা নিয়ে এমনি করে ছাত্রজীবন শুরু হয়েছিল, সেদিন মনে মনে ভাবীকালকে স্মরণ করে কত আশার মুকুলই না রচনা করেছিলাম। কিন্তু স্বপ্ন যত বড় ছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য থেকেও ঠিক ততখানিই বঞ্চিত হলাম। বিধাতা যে এমন বঞ্চনা আমার জন্য রেখেছিলেন, ভাবতে পারিনি। বিদ্যামন্দিরের উদ্দেশে দূর থেকে নমস্কার জানিয়েই একদিন ভবঘুরে হলাম। এমনি করেই আজ জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় এসে পৌঁছেচি। এ জীবনে একটা সত্য উপলব্ধি করেছি, সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ফাঁকি দিয়ে মানুষের চোখ ঝলসাতে গেলে সে-ফাঁকি এক সময় নিজেকে এসেই বেঁধে। তোমাদের তাই বলবো—অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমাদের সামনে, তোমাদের দিয়ে দেশ একদিন বড় হবে। তোমরা তাই খাঁটি হও। চোখে দেখে যা পরখ করবে না, জীবনে তাকে কখনও সত্য বলে প্রচার করবে না, তাতে ঠকতে হয়। তোমরা আমার ভালবাসা নাও।†

---

* Presidency College Magazine এর Vol. X No 1. September 1923তে মুদ্রিত হয়। ইহার Editorial Notes এ প্রকাশ—On August 30, (1923) last we had the Anniversary of the Bengali Literary Society···the Society···This year invited the renowned novelist Srijut Sarat Chandra Chatterji, to deliver an address,

† রাজেন্দ্র কলেজে প্রদত্ত ভাষণ। 'বঙ্গশ্রী', মাঘ, ১৩৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত।

জলধর-সম্বর্দ্ধনা

পরম শ্রদ্ধাস্পদ—

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের

করকমলে-

বরেণ্য বন্ধু,

তোমার দীর্ঘজীবনের একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনায় আমাদের মানস লোকে তুমি পরমাত্মীয়ের আসন লাভ করিয়াছ।

তোমার অকলঙ্ক চরিত্র, নিষ্কলুষ অন্তর, শুভ্র সদাচার আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তোমার স্নেহে তোমার সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ, আমাদের অকপট মনের ভক্তি-অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ কর।

বাণীর মন্দির-দ্বারে তুমি সকলকে দিয়াছ অবারিত পথ, কনিষ্ঠগণকে দিয়াছ আশা, দুর্ব্বলকে দিয়াছ শক্তি, অখ্যাতকে দিয়াছ খ্যাতি, আত্মপ্রত্যয়হীন শঙ্কাকুল কত আগন্তুক-জনই না সাহিত্য পূজার বেদীমূলে তোমার ভরসা ও বিশ্বাসের মন্ত্রে স্বকীয় স্বার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছে।

সাহিত্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে তুমি আনন্দ বিতরণ করিতে। সে ব্রত তোমার সফল হইয়াছে। তোমার সৃষ্টি কাহাকেও আহত করে না, তোমার অন্তঃপ্রকৃতির মতোই সে সৃষ্টি স্বচ্ছন্দ সুন্দর ও অনাড়ম্বর। তোমার দুঃখ-বেদনাভরা হৃদয় একান্ত সহজেই জগতের সকল দুঃখকে আপন করিয়াছে, তাই ব্যথিত যে-জন সে তোমারই সৃষ্টির মাঝে আপনার শান্তি ও সান্ত্বনার পথের সন্ধান পাইয়াছে।

হে নিরহঙ্কার বাণীর পূজারী, তুমি আজ বঙ্গের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর। ইতি —তোমার স্বদেশবাসীর পক্ষ হইতে—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।*

* ২রা ভাদ্র, ১৩৪১ বঙ্গাব্দে নিখিল বঙ্গ জলধর-সম্বর্দ্ধনায় প্রদত্ত মানপত্র।

পত্র সঙ্কলন

পত্র সঙ্কলন

[শ্রী প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লেখা]

14 Lower pozoungdoung Street
Rangoon.

প্রমথনাথ—ভাই অনেক দিন যাবৎ তোমার চিঠির জবাব দেওয়া হয় নাই। এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আশা করি তুমি ভাল আছ, বাড়ির সকলেও ভাল আছেন। পরশু V. P. ডাকে তোমার 'ভারতবর্ষের' এক খণ্ড sample copy দশ আনা পয়সা দিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ দাম ৷৷৹ মাসুল খরচা ৵৹ একুনে ৷৷৵৹। সেখানি ক্লাবে দিয়াছি—ফিরিয়া পাইলে পড়িব। যেদিন আসে, সেই দিন ঘণ্টাখানেক কতক কতক দেখিয়াছি মাত্র। আমার একটা ভুল ধারণা ছিল, যে, তোমাদের লেখার অভাব, কিন্তু ছাপাইয়াছ যে, এত ভাল জিনিস রহিয়া গিয়াছে যে স্থান সঙ্কুলান করিতে পার নাই। বাস্তবিক এটা বড় আশার কথা। কেন না আমিই এত বেশী telegraph, registered letter, শুধু পত্র, এবং উপহার মাসিক পত্র পাইতেছি, যে মনে হইয়াছিল, মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা লেখার জন্য বড়ই অসুবিধা এবং অভাব বোধ করেন, তাই আমার মত নগণ্য লোককেও এত বিব্রত করেন। যাদের কখনও নামও জানি না, তাঁরাও লম্বা চওড়া চিঠি দেন, শুধু যে বিপদে পড়িয়াই, এই বিশ্বাস আমার মনে ছিল। এখন দেখিতেছি বাস্তবিক তাহা নয়, কেন না, তোমাদের মত এই মর্ম্মে 'প্রবাসী'ও ছাপাইয়াছেন, যে তাহারা শীঘ্র আর কাহারও কোন লেখা পাইতে ইচ্ছা করেন না—কারণ ভাঁড়ারে তাহাদের অত্যন্ত বেশী জমিয়া গিয়াছে। আমি নিজেও অনেক দিন আর কিছু লিখি নাই মুখ্যতঃ অসুস্থ বলিয়াই। তবে 'যমুনা'র জন্য না কি না-লিখিলেই নয়, তাই আষাঢ়ে গোটা-দুই প্রবন্ধ (একটা প্রতিবাদ) লিখিয়াছিলাম মাত্র। গল্প লিখি নাই—লিখিতে ভালও লাগে না। তবে তোমার কথামত আমার একটা মতলব হইয়াছে। "রামের সুমতি"র মত প্রেম-বর্জ্জিত আমাদের বাঙালীর ঘরের কথা—(যাহাতে মানুষের শিক্ষাও হয়) series of stories লিখিব মনে করিয়াছি। বাঙালীর ideal অন্তঃপুর যে কি, ইহাই প্রতি-

পাত্ত বিষয়। 'বিন্দুর ছেলে' বলিয়া আর একটা লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছি— একবার মনে করিয়াছিলাম তোমাকে দেখাইব, কিন্তু সময় হইল না। অবশ্য তোমাদের 'ভারতবর্ষ" কাগজের যোগ্য সেটা মোটেই হয় নাই, তার উপর আবার একটু বড় আয়তনের হইয়া পড়িয়াছে। 'ভারতবর্ষের মত কাগজের অন্ততঃ ২৬।২৭ পাতা—তাই, ও কাগজে ছাপান অসম্ভব বুঝিয়াই 'যমুনা'য় পাঠাইয়া দিয়াছি।

কই প্রভাতবাবুর (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়) লেখা দেখলাম না ত? ও ভদ্রলোক প্রায় শতাবধি গল্প লিখিয়াছেন। আর যে কি চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিবেন আমি ত ভাবিয়াই পাই না, অথচ অগ্রিম টাকাও লইয়াছেন। এ দিকে 'সাহিত্য' সম্পাদকও 'বঙ্গবাসী' কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে প্রভাতবাবুর লেখা তাঁর কাগজ ছাড়া আর কোথাও বাহির হইবে না। ব্যাপার কি।

তোমাদের কাগজ বাহির করিবার জন্য তোমাকে বোধ হয় খুব পরিশ্রম করিতে হয়; এটা ভাল। এই সময়ে হয়ত তোমারও কাজ হইয়া যাইতে পারে। যদি সত্যিই তোমার ভিতরে পদার্থ থাকে নাড়াচাড়া করিয়া এই সময়ে বাহিরে আসিতে পারে। এ সাহিত্যচর্চ্চার সংস্রবই আলাদা। তোমার মত এক হিসাবে নিষ্কর্ম্মা লোকের এই সময় যদি কিছু দায়ে পড়িয়া পরিশ্রম করিবার সময় নিজের বস্তু উজ্জ্বল হইয়া উঠিবার অবকাশ এবং সুযোগ পায় সেইটাই লাভের কথা তোমার।

গত বারে তুমি আমাকে লিখিয়াছিলে "এ বিষয়ে এত সাধাসাধি" অনুনয় প্রভৃতি আরও কত কি হইয়া গিয়াছে যে আর বলা শোভা পায় না। আমি এইটাই ভয় করিয়াছিলাম যে পরের ভালো করিতে গিয়া নিজেদের মন্দ না হইয়া যায় অর্থাৎ আত্ম-মনোমালিন্যে না দাঁড়ায়।—শরৎ।

প্রমথনাথ—ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় আমার অসম্পূর্ণ চিঠিটা পেয়েছ। যে দিন চিঠি লিখেছিলাম, হঠাৎ দেখি ডাক নিয়ে পিয়াদা যাচ্ছে, আর সময় নাই, কাজেই যেটুকু লিখেছিলাম, বন্ধ করে পাঠালাম। আজ তোমার আর একটা পত্র পেলাম। প্রথমে কাজের কথা বলি। 'দেবদাস' নিয়ো না, নেবার চেষ্টাও করো না।...ওটার জন্তে আমি নিজেও লজ্জিত। ওটা immoral, বেশ্যা চরিত্র ত আছেই, তাছাড়া আরও কি কি আছে বলে মনে হয় যেন। আর আগেকার লেখাও প্রকাশ করা সম্বন্ধে

আমার বিশেষ আপত্তি তা তোমাদের কাগজেই হোক আর কারীর কাগজেই হোক। আষাঢ়ের 'যমুনা'র 'আলো ও ছায়া' বলে একটা অর্দ্ধসমাপ্ত গল্প বেরিয়েছে দেখলাম। আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়ত বা আমারই লেখা। কিন্তু এই একটা কথা যে আমার এত আপত্তি সত্বেও তারা প্রকাশ করতে নিশ্চই ভরসা করবে না, সেই কারণেই ভাবছি—হয়ত আমার ছেলেবেলার লেখার অনুকরণে আর কেউ লিখেছে। যা হোক জিজ্ঞাসা করে দেখবো। সুরেনের সঙ্গে দেখা হয়ে আমার কথা হয়েছে শুনে সুখী হলাম। তুমি যে বার বার বলছ আমি চাকরি ছেড়ে দিলেও ভয় নেই, এ কথাটা বিশ্বাস করতে পারলা না। মিত্তির মশাই জবাব দিয়েছেন যে তিনি ছ' মাসের ছুটিতে আছেন, এবং এ অবস্থায় কি করতে পারেন? কথা ঠিক। আরও ভাবছি যদি চাকরি করতেই হয়, তবে সেখানেই বা কি, আর এখানেই বা কি; মৃত্যু একদিন হবেই এবং তাহা সত্যই আসন্ন সে চিহ্নও চারিদিকে ফুটে উঠেছে। তবে নিরর্থক ছুটাছুটি করে লাভ কি! তবে এই পূজার সময় একবার কলকাতায়। যাব। ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে অধিক কিছু চিন্তা করে নিজেকে এবং পরকে পীড়িত করা যুক্তিসঙ্গত নয় ভেবে চুপ করে আছি। 'ভারতবর্ষ' মোটের উপরে কি; হয়েছে, তা কি তুমি নিজে জান না। আমাদের আষাঢ়ের 'যমুনা'র এবার কিছু নেই, তবু বল দেখি ঐটুকু কাগজে যথার্থ readable matter যতটা আছে, তার চেয়ে বেশী 'ভারতবর্ষে' আছে কি না! তোমাদের গল্পের ছবিগুলি আরও চমৎকার! পাঁজিতে জমাইষষ্ঠীর পুরাণো ব্লকে তোলা ছবির মত। রাগ ক'রো না ভাই, সত্যি কথা একা বন্ধুর কাছেই বলা যায় বলেই বললুম। দ্বিজুবাবু থাকতে লোকে কত আশা করেছিল, তার চার ভাগের এক ভাগও যদি প্রথম সংখ্যাটায় বার হ'ত সেও ভাল হ'ত, কিন্তু তাও হয়নি। ওর মধ্যে যেটুকু দ্বিজুবাবুর লেখা, সাহিত্য হিসাবে সেইটুকুই ভাল। তার পরে তাম্রলিপ্তি আর বেদের তর্জ্জমা! কি করব আমরা নিরক্ষর লোক বেদের তর্জ্জমা করে? আর অত বড় কাগজ এতে কি চলে? অন্ততঃ এমন একটা জিনিস contineously থাকা চাই যার জন্য গ্রাহকের মনে আশা জেগে থাকবে—সে কোথায়? একটা bold review থাকা প্রয়োজন—কই তা? শুধু তাম্রলিপ্তিতে সুবিধা হবে না দাদা, তা বলে দিলাম। গল্প অতি বদ। এই কি তোমাদের Selection?

'ছিন্নহস্ত'টা বোধ করি হবে ভাল। তোমার লেখাও পড়েছি—কিন্তু একে সাহিত্য বলা চলে না। তবে প্রথম বারের কাগজ দেখে কিছুই বলা যায় না—খুব চেষ্টা কর যাতে 100 times ভাল হয়। এবারের 'প্রবাসী'ও দেখলাম। তারা তোমাদের কাগজের চেয়ে ভালই করেছে। এই সমস্ত আমার স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ

মতামত—এর কতটুকু দাম, সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যদি কিছু থাকে, সেটা তুমি নিজের কাছেই গোপনে রেখো। তবে, 'প্রবাসী' লোকের কাছে অশ্রদ্ধাভাজন হয়ে পড়েছে, এই সময় ঠিক প্রতিযোগিতায় তাকে টলান যায়, অন্যথা যায় না। কারণ সে established! যাক এ সব কথা। কেন না, আমি দূরে থেকে যা বলব, হয়ত ঠিক না হতেও পারে। তোমরা সরজমিনে—man on the spot! প্রভাতবাবুকে দাদন দিয়ে রেখেছ, গল্প কই হে? তার পরে তোমরা টাকা দেবার অধিকারে গল্পের জন্যে যখন তাগাদা সুরু করবে, তখন তেমনি গল্পই বোধ করি তিনি দেবেন।

যা হোক, এ সব বাজে কথা। আসল কথা এই যে, এই সব বাহিরের হাঙ্গামা নিয়ে যেন আপোষে বিবাদ না হয়। তুমি গত বারে যে রকম খাপ্পা হয়ে উঠেছিল, ভয় হয়েছিল, এইবারে বুঝি ভীষণ একটা কিছু হয়। তোমার সুবুদ্ধি ফিরে এসেছে দেখে নিশ্চন্ত হলাম। আজ কাল আছি ভাল। গত মাস-দুই যাবৎ ঘাড় নীচু করলেই মাথা ধরে উঠত, তা লিখবই বা কি, আর পড়াশুনা করবই বা কি! গত চিঠিতে তোমাকে জানিয়েছি যে, একটা গল্প লিখে 'যমুনা'য় পাঠিয়েছি—বস্তুটা ভালও হয়নি, অথচ দীর্ঘকায় হয়েছে—তোমাদের কাগজে সেটা কিছুতেই চলত না। চলবার মত নয় বুঝেই আর পাঠালাম না। ও কি প্রমথ, আমাকে 'ভারতবর্ষ' পাঠিয়ে দাম আদায় করছ কেন? আমি গরীব মানুষ, তোমাদের অত দামী কাগজ কিনে পড়বার যোগ্য লোক নই ভাই—আমি কোথাও থেকে চেয়ে-টেয়ে পড়বার চেষ্টা করব,—আমাকে আর পাঠিয়ো না। আমি দরিদ্র বলেই এ কথা অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জানালাম—কিছু মনে করো না। বাড়ির খবর ভাল ত? তোমার নাটক প্লে হবে না কি? খুব ভাল, খুব ভাল—বড় আনন্দের কথা!—শরৎ

২৫এ জুলাই, ১৯১৩

প্রমথ—তোমাদের প্রেরিত 'ভারতবর্ষ' ও তোমার পত্র উভয়ই পাইয়াছি। কাগজখানির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এবারকার কাগজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য। "বিন্দুর ছেলে" তোমার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া খুব খুশী হইলাম। বোধ হয় ওটি মন্দ হয় নি, কেন না, অনেকেই ভাল বলিতেছেন। অনেকে "রামের সুমতি"র চেয়েও ভাল বলেন শুনিতেছি। প্রায় "পথনির্দ্দেশে"র কাছাকাছি। পূজার সংখ্যার জন্য আমার সাধ্যমত একটি গল্প লিখিয়া পাঠাইব—কিন্তু, প্রকাশ করিবার

জন্য কাহাকেও অর্থাৎ সম্পাদক-যুগলকে খোশামোদ করিও না। আমার শপথ রইল। কেন না, তোমার ভাল লাগিলেই তাহা যে তাঁহাদের ভাল লাগিবেই অথবা প্রকাশের যোগ্য হইবে—সে কথা কোন মতেই জোর করিয়া বলা চলে না। কেন তাহা পরে বলিব। তোমাদের এবারের কাগজ পড়িয়া গোটা দুই প্রশ্ন মনে হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি। ১ম স্বরজ কওর সম্বন্ধে। স্বরজ বেশ্যা এবং খুনে। হরি সিংকে এক স্থানে বলিতেছে—"এই ত দরশ পরশ হইল। আমি যে কাজ বলিয়াছি করিয়া আইস, তখন আমার অদেয় আর কিছুই থাকিবে না।" অর্থাৎ সোজা বাঙলায়, "কাজ করে এলেই তোমার কাছে শোব।" ঠিক কি না? কেন না ইতি পূর্ব্বে, নির্জ্জন ঘরে বেশ্যা স্বরজ "হাসিয়া মুখে কাপড় দিয়াছে" এবং "চোখে প্রেমের আহ্বান করিয়াছে" এবং "হরি সিং আঁচল ধরিয়া ওড়না টানাটানি করিয়াছে।" কি প্রমথ, অস্বীকার করিবে সমস্ত গল্পের drift টা কি? অনাবৃত রূপ যে শুধু জানিয়া শুনিয়া মঙ্গলসিংকেই দেখায় নাই—পাঠককেও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে! তাহাতে ছবি দিয়া জিনিসটি বেশ ফুটিয়াছে। সাবাস! সাবাস!! "তবে দেখ! রূপ দেখ!" অনেকেই তাহা দেখিতে পাইয়াছে!

২। ১৭৩ পাতা—"অন্ধকার বৃন্দাবন"। চতুর্থ stanza : "করে না দধি মন্থ গোপী নাচায়ে কটি চন্দ্রহার"। কটির চন্দ্রহার নাচিয়ে নাচিয়ে দধি মন্থ করলে, দেখতে পুরুষ মানুষের বোধ করি বেশ ভালই লাগে। চোখ বুঁজিয়া একবার উচ্চাঙ্গের ভাবটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করিও, সুখ পাবে। তাছাড়া গোপীর মধ্যে যশোদাও আছেন। উপানন্দের স্ত্রীটিও 'দধি-মন্থ' করতেন, চন্দ্রহারও পরতেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে কটি নাচিয়ে দেখাতে পাচ্ছেন না বলে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন দেখছি! ভট্টিকাব্যে না কোথায় এই কথাটা আছে না? কিন্তু এ ভট্টির দিন নয়—ইংরাজের রাজত্ব। আমি সমগ্রভাবে সব কাগজটা পড়িনি—পড়ে বলব। এই কবিতাটির তৃতীয় stanza— "যমুনা জল শিহরে, শুনি বাঁশীটি শ্যাম চন্দ্রমার"। শ্যাম চাঁদটি তখন কোথায় শুনি? বোধ করি মথুরা থেকে Bagpipe বাজাচ্ছিলেন, না হলে অত দূরে বৃন্দাবনের যমুনা জল শিহরে কি করে? অতদূরে আর একটা জেলা থেকে বাঁশী বাজালে? তবে, দেবতার কথা বলা যায় না, ওঁরা জাহাজের বাঁশীর মত ইচ্ছা করলে বাজাতে পারেন। সম্ভব বটে! ৪র্থ stanza—"যায় না চুরি নবনী ক্ষীর, বলিয়া ফেলে অশ্রুনীর"—ক্রিয়া আছে ছত্রের কর্ত্তাটি কি? আর একটা কথা ভাই। ছেলে-ছোকরার গল্প লিখলে ধরি নে। কোকিলেশ্বরের 'ভারতবর্ষের অদ্বৈতবাদ' বাপ্ রে! যা হোক, ১৭ এবং ১৮ লাইনে লিখেছেন, 'দেবতাবর্গ' দেবত্ব শব্দের ষষ্ঠী কি হয় পণ্ডিতমশাইকে জেনে বলে দেবে ভাই? যদি দেবতাবর্গই হয়, 'দেবত্ববর্গ'

না হয় (বাঙলা বলে) তবে এবার থেকে যেন 'পিতাকুল' 'মাতাকুল' লেখেন। পিতৃকুল ইত্যাদি লেখেন না। কই বার কর দেখি এমনি লেখা, অক্ষয় মৈত্রের কিংবা বিজয়বাবুর (বিজয়চন্দ্র মজুমদার) প্রবন্ধে? তোমাদের কুটস্থ চৈতন্যস্বরূপ সম্পাদকের কি এটাও নজরে পড়ে না? যদি নাই পড়ে, ত অত বেদান্ত নিয়ে নাড়াচাড়া ঠিক নয়। দুটো-একটা ভুলও আছে। যথা "মাসিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ—বৈশাখ" ২৭৪ পাতা। গল্প ও উপন্যাস—"রামের সুমতি" —কিন্তু "রামের সুমতি" ফাল্গুন ও চৈত্রে বার হয়েছিল। অর্থাৎ গত বৎসরে। বৈশাখের 'যমুনা'র উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না—তাতে "পথনির্দেশ" আর "নারীর মূল্য" ছিল। নিশ্চয়ই কোনটা উল্লেখযোগ্য হতে পারে না, অবশ্য সে জন্য আমি দুঃখ করছি নে, কেন না তার কথার মূল্য আমার কাছে অতি অল্পই। কিন্তু ভাবছি 'অজ্ঞাতবাস' ফকিরবাবুর বইয়ের মত আমার কোন একটা বই যদি থাকত আর বিদ্যাভূষণ তার হতেন প্রকাশক—তা হলে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য হ'ত। 'রত্নদীপ' নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। কেন না, নায়ক রাখাল পরস্ত্রীর সতীত্ব হরণ করবার মানসে যাত্রা করেছেন এবং 'মানসী'তে বার হচ্ছে। হায় রে দ্বিজুদার প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ'! 'সাহিত্য সমালোচনা'র মধ্যে পাঁচকড়ির 'নববর্ষ'ও উল্লেখযোগ্য। যার দুটো ছত্র consistent নয়। "তারে জোর করে শ্যামের বাঁশী" আর "আমার মরণ হল না" আছে কি না! 'নববর্ষ' পড়ে দেখো—এমন এলো-মেলো গাঁজাখুরি jargon আর সম্প্রতি দেখেছি কি না মনে হয় না। আরো একটু মন দিয়ে 'ভারতবর্ষ' পড়ি, তার পরে 'আশ্বিন' সংখ্যার 'সাহিত্যে' একটি বিরাট সমালোচনা লিখব। সমাজপতিও কিছু লিখে দেবার জন্য ঘন ঘন registered letter এবং telegram পাঠাচ্ছেন, তাঁর কথাটাও রাখা হবে। প্রমথ ভাই, দোকানদারি দেখতে দেখতে আর অসহ্য খোশামোদ ভণ্ডামি শুনতে শুনতে হাড় কালি হয়ে গেল। সব কাগজই কি এক সুরে বাঁধা? যদি তাই হয়, প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজুদার নামটা 'ভারতবর্ষ' থেকে তুলে দাও—তাঁর পরে এই রকম অবিচার এবং মানুষকে mislead ক'রো। নারীর মূল্য তাঁরও ভাল লেগেছিল—দুঃখ হয় শেষটা তিনি পড়লেন না। এতে অনেক সত্য কথা আছে, তাইতেই এটা প্রবন্ধের যোগ্য নয়। যাক্। যথার্থ সুখও পেয়েছি। 'প্রাক্তন' গল্পটি যথার্থই উঁচু লেখা! আর জলধরবাবুর 'দিনাজপুর'টি মন্দ নয়। 'ঘাটে' ছবিটি বেশ। নোলকটা না থাকলে আরো ভাল হ'ত। 'কানাকড়ি' এখনও পড়ি নি। এই অবনীন্দ্র ঠাকুরের ওপর আমার ভয়ানক রাগ আছে—অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা হয় একচোট ঝাল ঝাড়ি—কিন্তু কোনদিন করি নি। "Art Painting' আমিও

নিজে করি। Oil-painting আমি বুঝি—ও সম্বন্ধে নিতান্ত কম বইও পড়ি নি—কিন্তু 'যমুনা' ছোটো কাগজ, ওতে সুবিধে হবে না। তা ছাড়া 'অনিলা দেবী' নাম নিয়ে সমালোচনা করতে আর ইচ্ছে করে না। আমাদের ফণীন্দ্রভায়ার proof দেখার চোটে, আমার লেখার ত ছত্রে ছত্রে ভুল বিরাজ কচ্ছেন—বিপক্ষ সেইগুলো তুলে ধরলেই ত গেছি! দেখা যাক কি হয়। যাই হোক তোমাকে না দেখিয়ে বা তোমার মত না নিয়ে কিছুতেই প্রকাশ করব না। তবে, আর একটা কথা বলে রাখি ভাই। তুমি মনে করো না আমি সেই পুরাতন কথার শোধ তুলছি। 'চরিত্রহীনে'র এখন বাজারে অত্যন্ত দুর্নাম, তা সত্বেও আমি সে জন্য আজকের এই কথাগুলো লিখি নি। কথাগুলি যদি সত্য না হয়, ভালই, যদি সত্য হয়, ভবিষ্যতে সাবধান হলেই হবে। এই সূরজ কওরটা আমাদের club-এর সকলেই একবাক্যে নিন্দা করেছে। অনেকে এমনও বলেছে ওটা প্রকাশ্য অনাবৃত immorality. সত্যিই ওর ছত্রে ছত্রে এই exciting ভাব ছাড়া আর কিছুমাত্র দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই। যা হোক আমারও একটা নজির হয়ে রইল 'চরিত্রহীন' প্রকাশ করার সময় লোকের মুখ সহজেই বন্ধ করবার উপায়ও আমাকে ইতিমধ্যে খুঁজে রাখতে হবে। আমি বিদ্রূপ করলে কিরূপ করি তা জানই—এমনি করে প্রতি ছত্রে প্রতি পাতা তুলে ধরে expose করব। আমি অনেক নজির এর মধ্যেই জোগাড় করেছি রবিবাবু প্রভৃতি সর্ব্বত্র হতেই।

হ্যাঁ, আর একটা কথা। সেই সাবিত্রীকে আর নিতান্ত মেসের ঝি রাখি নি। প্রথম থেকেই মানুষ তাকে যেন অশ্রদ্ধার চোখে না দেখে সে উপায় করেছি। বড় মন্দ হয়নি প্রমথ! আর ক্রমশঃ প্রকাশ্য নভেল ও-রকম না হলে গ্রাহক জোটে না। লোকে নিন্দে হয়ত করবে—কিন্তু পড়বার জন্যও উৎসুক হয়ে থাকবে। আমরা এক রকম আশা করে আছি, ওতে 'যমুনা'র পশার বাড়বে। নইলে দেখছি ত ভাই, এই সব খবরের কাগজে ফেকাসে, রক্তহীন উপন্যাস বেরিয়েই যাচ্ছে—কেউ পড়ে না। ঐ 'ভারতী'র বাগদত্তা, পোষ্যপুত্র, দিদি—অরণ্যবাস - বারো আনা লোকেই পড়ে না, যদিও পড়ে নেহাৎ ব্যাগার খাটা গোছ। অথচ রত্নদীপ এর মধ্যেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—অথচ সেটা বটতলার যোগ্য বই। এই ধর তোমাদের 'মন্ত্রশক্তি'! ঐ পুরুত, আর মন্দির আর ঐ সব ঘ্যানোর ঘ্যানোর কেউ পড়ে না অপরের কথা কি বলব ভাই আমি এখনো পড়িনি। অথচ আমার এই ব্যবসা।

দেখ না লেখবার কায়দা, বঙ্কিমবাবুর রবিবাবু। প্রথমেই একটা something! যাই হোক দেখাই যাবে। আমার ছেলেবেলার 'চন্দ্রনাথ'টা কি জানি কেউ পড়েছে

কি না! ওটা আমার দেবার ইচ্ছেই ছিল না। ঐ ঘ্যানোর ঘ্যানোর ক্রমশঃ হলে লোকের patience থাকে না। তা যতই শেষে ভাল হোক। যেমন আছে, বাড়ির খবর লেখ না কেন? –শরৎ

মনে হয় প্রমথ, নিজের একটা কাগজ থাকত ত, বাক্য বাণে এই তথাকথিত পণ্ডিতগুলির চৈতন্য করিয়ে দিতাম। কতক বলে সমাজপতি, কিন্তু তার বলায় কোন ফল হয় না। কেন না, তার অনেকটাই শুধু গ্লানি আর গালিগালাজ—প্রায় ফাঁকা আওয়াজ। তাতে আওয়াজ থাকে কামানের মত, কিন্তু ভেতরে একটা ছররাও থাকে না। তাই লোকে বড় গ্রাহ্য করে না। কিন্তু আমি Jack of all trade কি না, সঙ্গীত, চিত্র, দর্শন, কাব্য, নাটক, নভেল, সব বিষয়েই এক ফোঁটা এক ফোঁটা জানি, তার উপর নির্ভর ক'রে মনের সাধে 'যুদ্ধং দেহি' করে দিতাম। হাঁ হাঁ—আমি উদাসীনও বটে, গৃহীও বটে। চোখ বেশ করে খুলে রাখলেই দেখা যায়। দেখতে তুমিও পার, আমিও পারি, কিন্তু মনে রাখা চাই। আমি মনে করে রাখি, তোমরা ভুলে মেরে দাও -এই প্রভেদ, আর কিছু নয়।

Rangoon

9. 8. 13

প্রমথ—তোমার চিঠি যেদিন পাইলাম তার পরদিন manuscript পাইলাম। দেখিয়া শুনিয়া দিয়া পাঠাইতে গেলে আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম ২৩।২৪ শ্রাবণের আগে পৌঁছিবে না, সেই জন্য ভাদ্রে কিছুতেই ছাপা হইবে না বুঝিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া পাঠাইলাম না। এমন কোন অর্থ নাই যে পরের মাসে না বাহির হইলে আর উত্তর দেওয়া চলে না। ওটা আশ্বিনে ছাপিলেই হইবে। এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। প্রবন্ধ কিছু দীর্ঘ হইয়াছে এবং এমন সব কথা আছে যাহা 'ঝগড়া', ওটা উচিত কিনা সন্দেহ। আমি ঐ কথাগুলাই আর একটা কাগজে লিখিয়া আশ্বিনের জন্য পাঠাইব মনে করিয়াছি। তবে, আক্রমণ করিতেই হইবে এবং তাহা একটু polite ধরণে অনেকটা কানকাটার মত করিয়া। আশা করি ইহাতে তুমি মনে কিছু করিবে না। যাহা ভাল হইবে, নিশ্চয় তোমার জন্য তাহাই করিব। তা ছাড়া দেখ গৃহস্থ কি বলে? দুঃখ এই যে, আমি উঁর original painting দেখি নি, তাহা হইলে এমন বলা বলিতাম যে, তিনি বুঝিতেন এ কোন চিত্র-

ব্যবসায়ীর লেখা—যার তার নয়। আমি তোমার জন্য গল্প লিখিতেছি অর্থাৎ দু-দিন লিখিয়াছি আর দু-দিন লিখিব। ছবি দেবে কি হে? দোহাই প্রমথ, আমার গল্পের ভেতরে ছবি দিও না—ওরে বাপ্‌রে। সেই 'ফুলগাছ' আর সেই ব্যথিতের মৃত্যু-শয্যা। আমি তাহলে লজ্জায় বাঁচব না। তাছাড়া আশা করি, ছবি আমার গল্পে না দিলেও লোকে পড়বে। এক হপ্তা করে পাঠাব। তুমি সমাজপতির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, ফণি তার চেয়েও বেশী করিয়া লিখিতেছে—অথচ সমাজপতি মহাশয়ের কালকের রেজেস্ট্রী পত্র এই সঙ্গে পাঠালাম পড়িলেই বুঝিবে, কি বুঝিলে পড়িয়াছি। কি যে করি ঠিক করিতে পারি না, অথচ, আমার হাতেও গল্প লেখা নাই, মগজেও আসিতেছে না। তার ওপর আফিসের কাজ এত বেশী এই মাসটায় পড়িয়াছে যে রাত্রি সাতটার পূর্ব্বে বাড়ি ফিরিতে পারি না। তার পরে লেখাপড়া, বিশেষ, মাথার ভেতর থেকে কিছু বার করা প্রায় অসাধ্য! তবে আমার নাকি বড় শক্ত মাথা, তাই এত ঘা খেয়েও কিছু কিছু ঠুকলে ঠাকলে বার হয়। সকালে আজকাল আবার আরো বিপদ—লোকের অসুখ, আমাকে নিজেই বাজারে যেতে হয়। না গেলে যিনি আছেন তিনি বলেন, "খেতে পাবে না"। ইনি ত দিনরাত জপতপ পুজো-আচ্চা নিয়েই থাকেন, একটু-আধটু লেখাপড়া জানেন বটে, কিন্তু কাজে আসে না। এক দিন বলেছিলাম, আমি শুয়ে শুয়ে বলে যাই, তুমি লিখে যাও—স্বীকারও করেছিলেন, কিন্তু সুবিধা হল না। 'বরং' লিখতে জিজ্ঞেস করেন অনুস্বরের ঐ টানটা ফোঁটার ভেতর দিয়ে দেব, না বাহিরে দিয়ে দেব? অর্থাৎ 'ং' হবে না 'ং' হবে? কাজেই আমাকে সমস্ত নিজেই লিখতে হয়। রাত্রে একটু আফিমের ঘোরও ধরে উঠে, বসে লিখতে পারি নে। এ সব কারণেই লেখা এত কম হয়। তাই আর এক কাজ করেছি প্রমথ, আমি নিজে ত 'যমুনা' চালাতে পারি নে, তাই আমার সমস্ত শিষ্যগুলিকে লাগিয়ে দিয়েছি। নিরুপমা, বিভূতি, সুরেন, গিরীন এবং ভাগলপুরের আরো-দুই একজন সাহিত্যিক লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। দেখা যাক 'যমুনা'র অদৃষ্টে কি সঞ্চয় হয়। তারা ত বলেছে তুমি গুরুদেব তোমার কথার আমরা অবাধ্য হব না। এই যা আশা। আর একটা কথা, সেদিন একটা চিঠি পেলাম (ভাবী সম্পাদক হইতে) 'অর্চন' বলে একটা কাগজ ও 'কর্ম্মক্ষেত্র' বলে আর একটা কাগজের জন্য তাঁরা বিশেষ লোভ দেখিয়ে পত্র দিয়েছেন—কিন্তু লোভ দেখালে কি হয়? আমার পুঁজি কই, আমি ত আর সত্যেন দত্ত নই যে বললেই কবিতা লিখে ফেলব! শুনছি 'অর্চন' পত্রিকা আমার 'কোরেল' গল্পটা সুরেনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে—তবে বেনামি ছাপাবে এ সর্ত্ত বুঝি তার সঙ্গে হয়েছে। সেটা না কি ভাল গল্প। কি জানি, আমার ভাল মনেও নেই। আচ্ছা, আজকাল হুহু শব্দে এত মাসিক

পত্রের আয়োজন হচ্ছে কেন? এটা কি খুব লাভের ব্যবসা? একে ত খোশামোদ করে করে প্রাণ অস্থির, তারপরে ঐ যে লিখেছ, এতটুকু স্বাধীনতা নেই। আমার গল্পগুলো বই করে ছাপিয়ে কি হবে? কে কিনবে? কত গল্পের বই রয়েছে, আমার বই কি কেউ পড়বে? আমার নষ্ট করার মতো টাকা নেই। তাছাড়া হাঙ্গামা কত, advertise কর, ক্যানভাস্ কর, লোকের opinion সংগ্রহ কর—ও সব আমি চাইও না, পারবও না। আমি একটু চুপচাপ থাকতে পেলে বাঁচি। অত হৈ চৈ কে করবে? আমার ত সাধ্য নয়। প্রমথ, একটা কথা তোমাকে গোপনে বলি। এত দিন এ কথাটা আমার মনে ওঠে নি। এত বড় বড় কাগজ বার হচ্ছে, আমাকে কেউ Sub-Editor কি কিছু একটা করে না? অনেক কাজ তাদের করে দিতে পারব। একটা বড় গল্প, একটা ধারাবাহিক ভাল উপন্যাস, একটা প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা এও আমিই দিতে পারব। তাছাড়া, ছবি judge করা, গানের স্বরলিপির দোষগুণ ধরা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা, সাহিত্যিক আলোচনা এও, (আর কিছু ভাল না জুটলে) আমি করে দেব। ১০টা থেকে ৪।৫টা পর্য্যন্ত খাটলে আমি খুব পারি। অবশ্য তাম্রলিপ্তি টিপ্তি পারব না। তার পরে এখন যেমন সকালে ও রাত্রে নিজের কাজ করি তখনও করব। দেখো ত যদি কেউ আমাকে নিতে স্বীকার করে। একজন ভাল Editor থাকলেই আমি কাজ চালিয়ে দেব। অন্ততঃ ছি ছি কাগজ কোন মাসেই হতে দেব না, এ assurance তুমি আমার হয়ে দিতে পার। এ চাকরি আমার খুব ভাল লাগবে, তবে যদি টিকসই হয়। এমন না হয় দু-দিন পরেই বলে তোমাকে চাই নে, যাও। এর মধ্যে যদি কোন কাগজ বার হবার কথাবার্ত্তা হয়, আর তোমার চেনা-শোনা থাকে তাহলে চেষ্টা দেখো—আমার বর্ম্মা আর পোষাচ্ছে না। দেশ দেশ মন কচ্ছে। সমাজপতির সম্বন্ধে কি পরামর্শ দাও? তোমার মত ছাড়া আমি কিছুই করব না। কিন্তু বিপদেও বড় পড়েছি তা বোধ করি বুঝতে পাচ্ছ। সমাজপতি সম্বন্ধে কি করা উচিত অতি সত্বর জবাব দিয়ো। আর চিঠিটা হারিয়ো না, আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো, কেন না, এক সময়ে যখন আমার নিন্দে শুরু করবে, তখন কাজে আসতে পারে। Documentary evidence! আজ রাত্রে কিছুই হল না, কেবল চিঠিই লিখছি।—শরৎ

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা]

10. 1. 13.
D. A. G's Office, Rd,

প্রিয় উপীন—তোমার পত্র পেয়ে দুর্ভাবনা গেল। দু'দিন পূর্ব্বে ফণীন্দ্রের পত্র ও 'চরিত্রহীন' পেয়েছি। তোমাদের ওপরে বেশি দিন রাগ করে থাকা সম্ভব নয়, তাই এখন আর রাগ নেই, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে সত্যই অনেকটা রাগ ও দুঃখ হয়েছিল। আমি কেবলি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতাম এরা করে কি? একখানা চিঠিও যখন দেয় না, তখন নিশ্চয়ই এদের মতিগতি বদলে গেছে। তোমাকে একটা কথা বলে রাখি উপীন, আমার এই একটা ভারী বদ্ স্বভাব আছে যে একটুতেই মনে করি লোকে যা করে তা ইচ্ছে করেই করে। ইচ্ছা না করেও যে কেউ কেউ অভ্যাসের দোষে আর এক রকম করে, আমার নিজের সম্বন্ধে সে কথা মনে থাকে না। Sensitive বলে একটা কথা যে আছে আমার সেটা অপর্য্যাপ্ত রকম বেশি। সুরেন[১]কে আজ হপ্তা দুই একখানা চিঠি দিয়েছিলাম আজ পর্য্যন্ত তার জবাব পেলাম না। এরা কেনই বা লেখে, কেনই বা বন্ধ করে। তুমি 'কাশীনাথ' সমাজ-পতিকে দিয়ে ভাল কর নি। ওটা 'বোঝা'র[২] জুড়ি, ছেলেবেলায় হাত-পাকানোর গল্প। ছাপানো ত দূরের কথা, লোককে দেখানও উচিত নয়। আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা, যেন না ছাপা হয়। আর আমার নামটা মাটি কোরো না, একা 'বোঝা'ই যথেষ্ট হয়েছে।

আমি 'যমুনা'র প্রতি স্নেহহীন নই। সাধ্যমত সাহায্য করব, তবে ছোট গল্প লিখিতে আর ইচ্ছে হয় না—ওটা তোমরা পাঁচ জনেই কর। প্রবন্ধ লিখব—এবং পাঠাবও। 'চরিত্রহীন' কবে সম্পূর্ণ হবে বলতে পারি না। প্রায় অর্দ্ধেকটা হয়েছে মাত্র। হলেও যে সমাজপতির কাছেই পাঠিয়ে দেব তাও বলা ঠিক হয় না। এক তুমি যদি কলকাতায় থাকতে তোমার কাছে পাঠাতাম। ইতিমধ্যে তুমি সমাজ-পতিকে লিখে দিয়ো 'কাশীনাথ' যেন প্রকাশ না করে। যদি করে ত আমি লজ্জায় বাঁচব না। তুমি দু-একটা গল্প লিখতে বলেচ এবং পাঠাতেও লিখেচ, যদি লিখিই কাকে পাঠাব? তোমাকে না ফণিকে?...গিরীন[৩] তখন ছোটো ছিল, যখন আমি

১। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

২। 'যমুনা'র ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক-পৌষ সংখ্যায় 'বোঝা' প্রকাশিত হয়েছিল।

৩। ইনি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

সংসারের বাইরে চলে আসি। এত বৎসরে পরে আমাকে বোধ করি তার মনেও নেই। উপীন, আর একটা কথা বলি তোমাকে—একদিন তার একখানা বই কিনতে চাই—তুমি নিষেধ করে বলো যে শুনলে সে দুঃখ করবে। আজ পর্য্যন্ত আমি সেই কথা মনে করেই কিনি নি। একখানা স্পষ্ট করে চেয়েও ছিলাম—অথচ. সে পাঠালে না। ছেলেবেলায় তার অনেক চেষ্টা সংশোধন করে দিয়েচি—আমি লিখতাম বলেই তারাও লিখতে শুরু করে। ও বাড়ির মধ্যে আমিই বোধ করি প্রথমে ওদিকে নজর দিই। তার পরে ওরা চাঁচল (মালদহ জেলার অন্তর্গত) থেকে হাতে লিখে মাসিক পত্র বার করত। আজ সে আমাকে একখানা পড়তেও দিলে না! সে হয়ত মনে করে, আমার মত নির্ব্বোধ মূর্খ লোকে তার লেখা বুঝতেও পারে না। যাক্, এজন্য দুঃখ করা নিষ্ফল। সংসারের গতিই বোধকরি এই। আমার শরীর আজকাল ভাল। আমাশা সেরেচে। আজকাল পড়াটা প্রায় বন্ধ করেচি। আমার অসমাপ্ত মহাশ্বেতা (oil painting) আবার সমাপ্ত হবার দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্চে। তোমার সেই বড় উপন্যাস লেখার মতলব এখনো আছে ত? যদি না থাকে ত ভারী খারাপ। ওকালতিও করা চাই এটাকেও ছাড়া চাই না।

আমার কলিকাতা যাওয়া—(এদের ছেড়ে) বোধ করি হয়ে উঠবে না। শরীরও টিকবে না বুঝচি কিন্তু না টিকাও বরং ভাল, কিন্তু ওখানে যাওয়া ঠিক নয় এইরকমই মনে হচ্চে। আমার ফাউনটেন পেন তোমার হাতে অক্ষয় হোক্—ও কলমটা অনেক জিনিসই লিখেচে—খাটিয়ে নিলে আরও লিখবে।

আজ এই পর্য্যন্ত। যদি 'চন্দ্রনাথ' পাঠান সম্ভব হয় এবং সুরেনের যদি অমত না থাকে, তা হলে যা সাধ্য সংশোধন করে ফণিকে পাঠাব; চিঠির জবাব দিয়ো।

—শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon, 26. 4. 13

শ্রীচরণেষু—তোমার চিঠি পাইয়া যতটা আশ্চর্য্য হইয়াছি তাহার শতগুণ ব্যথিত হইয়াছি। তুমি আমাকে দ্বেষ করিবে, এই কথাটা যদি আমি নিজেও বলি, তাহা হইলেও কি তুমি বিশ্বাস করিবে? আমার কলকাতার স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে জাজ্বল্যমান আছে—আমি অনেক কথাই ভুলি বটে, কিন্তু এসব কথা এত শীঘ্র ত নয়ই,

বোধ করি কোন দিনই ভুলি না। যাই হোক, এ লইয়া আমি জবাবদিহি করিব না। আমি বেশ জানি একবার যদি তুমি নিভৃতে আমার মুখ এবং আমার কথা মনে করিয়া দেখ, তখনই বুঝিতে পারিবে—আমাকে তুমি বিদ্বেষ করিবে এ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে না। এ-কথা আমি ত উপীন কল্পনা করিতে পারি না। তবে বলি, তোমার যা ইচ্ছা আমার সম্বন্ধ মনে করিতে পার, আমি তোমাকে আমার তেমনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ আত্মীয় এবং সম্পর্কে মান্য ব্যক্তি বলিয়া মনে করিব এবং ইহা চিরদিনই করিয়াছি। তোমাদের আপোষের মধ্যে কলহ বিবাদ হইতে পারে, তাই বলিয়া আমি কি তার মধ্যে যাইব? তুমি বিশ্বাস করিয়াছ আমি বলিয়াছি তুমি আমাকে দ্বেষ কর। কি করিয়া আমার সম্বন্ধে তুমি ইহা বিশ্বাস করিলে? আমার অনেক রকম দোষ আছে। তাই বলিয়াই আজ তুমি এই কথা বিশ্বাস করিলে এবং আমাকে তাহা লিখিতে সাহস করিলে। আমি মন্দ বলিয়া কি এত অধম? আমি মনে জ্ঞানে এমন কথা কল্পনা করিতে পারি এই আজ নূতন শুনিলাম। আমাকে তুমি গভীর আঘাত করিয়াছ। যদি বেশী দিন আর না বাঁচি, এটা তোমার মনেও একটা দুঃখের কারণ হইয়া থাকিবে যে আমাকে তুমি নিরর্থক দুঃখ দিয়াছ। তোমার চিঠি পাইয়া অবধি কেবলি ভাবিয়াছি তুমি আমাকে না জানি কত নীচই না মনে কর। আমি বোধ করি মূর্খ এবং নীচ বলিয়াই তুমি আমার সম্বন্ধে (সম্প্রতি কলিকাতায় এত ঘনিষ্ঠতা এত কথাবার্তা হইয়া যাইবার পরেও) এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছ। না হইলে মনে করিতে না এমন হইতেই পারে না। আমার শপথ রহিল উপীন, আমাকে পত্র পাইবামাত্রই লিখিবে তুমি আর এ কথা বিশ্বাস কর না। আমি সুরেনকে কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, আমার মনে হয়, আমাকে বিদ্বেষ করিয়াই যেন এসব ছাপা হইতেছে। তার কারণ আমিও সমাজপতিকে লিখি ওগুলো আর ছাপাইবেন না —তথাপি আমাকে কোন উত্তর না দিয়াই ছাপা হইতে লাগিল। যাই হোক এখন ভিতরকার কথাটাও জানিতে পারিলাম। তুমি যে ওই কথা সমাজপতিকে বলিয়াছিলে তাহা এখন আরো জানিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলাম। তুমি যে আমার কত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাও যদি না বুঝিতাম উপীন, এমন করিয়া আজ পত্র লিখিতেও পারিতাম না। আমি মানুষের হৃদয় বুঝি। তুমি যেমন তোমার অন্তর্য্যামীর কাছে নির্ভয়ে অসঙ্কোচে বলিতে পার "আমি শরতকে সত্যই ভালবাসি"। আমিও ঠিক তেমনি জানি এবং তেমনি বিশ্বাস করি।

থাক এ কথা। শুধু একটা 'চন্দ্রনাথ' লইয়াই এত হাঙ্গামা। অথচ, সেটা যে কি-রকম ভাবে কণী পালের কাগজে বার হবে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

তোমরা সব দিকে না বুঝিয়া, সব দিকে না সামলাইয়া হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপন দিয়া অনেকটা নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছ। এবং তাহারি ফল ভুগিতেছ। দোষ তোমাদেরি—আর বড় কারু নয়। কণী পালের জন্য তুমি কতকটা যে false positionএ পড়িয়াছ তাহা প্রতি পদে দেখিতে পাইতেছি।

আমি আরো বিপদে পড়িয়াছি। একে আমার একেবারে ইচ্ছা নয় 'চন্দ্রনাথ' যেমন আছে তেমনি ভাবে ছাপা হয়, অথচ, সেটা খানিকটা ছাপা হয়েও গেছে, আবার বাকীটাও হাতে পাই নাই। সুরেনের বড় ভয়, পাছে ও জিনিসটা হারিয়ে যায়। ওরা আমার লেখাকে হৃদয় দিয়া ভালবাসে—বোধ করি তাই তাদের এত সতর্কতা।

আর একটা কথা উপীন: 'ভারতবর্ষ' কাগজের জন্য প্রমথ 'চরিত্রহীন' বরাবরই চাহিতেছিল। শেষে এমনি পীড়াপীড়ি করিতেছে যে কি আর বলিব। যে আমার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু এবং বন্ধু বলিলে সত্য যাহা বুঝায়, তাহাই। সে জাঁক করিয়া সকলের কাছে বলিয়াছে 'চরিত্রহীন' দিবই এবং এই আশায় জ—প্রভৃতির লেখা চার-পাঁচটা উপন্যাস অহঙ্কার করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। সে-ই হইতেছে 'ভারতবর্ষ'র মোড়ল। এখন, বিন্দুবাবু প্রভৃতি (হরিদাস, গুরুদাসের পুত্র) তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। এদিক 'যমুনা'তেও বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে ঐ কাগজে 'চরিত্রহীন' ছাপা হবে। সমাজপতি registry চিঠি ক্রমাগত লিখচেন, কোন্ দিকে কি করি একেবারে ভেবে পাইতেছি না। এইমাত্র আবার প্রমথনাথের দীর্ঘ কান্নাকাটি চিঠি পাইলাম—সে বলে, এটা সে না পেলে আর তাহার মুখে দেখাইবার জো থাকিবে না। এমন কি পুরাতন বন্ধু-বান্ধব, club প্রভৃতি ছাড়িতে হইবে। কি করি? একটু ভাবিয়া জবাব দিবে। তোমার জবাব চাই, কেন না, একা তুমিই এর গুরু থেকে history জান।

বড় ভাল নই, ৭।৮ দিন প্রায় জ্বর জ্বর কচ্চে—অথচ স্পষ্ট জ্বরও হচ্চে না। যদি আবশ্যক বিবেচনা কর এই পত্র সুরেনকে দেখাইয়ো। তোমরা আপোষে যত পার ঝগড়া করিয়া মর, কিন্তু আমি যে তোমাদের এক সময়ে শিক্ষক ছিলাম—বয়সের সম্মানটাও অন্তত দিয়ো।

সেবক শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street,

Rangoon, 10, 5, 13,

প্রিয় উপেন - আজ তোমারও চিঠি পাইলাম, প্রমথরও চিঠি পাইলাম। তুমি যে আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, ইহাতে যে কত তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে যাওয়া পাগলামি। তুমি যে আর মনে ক্লেশ পাইতেছ না কিংবা দুঃখ করিতেছ না, ইহা হইতেই বুঝিলাম যে অতি সহজভাবে আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছি। আমি নিজেকে মূর্খ বলিয়াছিলাম—সেটা কি মিছে কথা? তোমাদের কাছে আমি কি পণ্ডিত বলিয়া নিজেকে মনে করিব, আমি কি এত বড় আহম্মক? না হয়, বানাইয়া গল্প লিখিতে পারি—এতে পাণ্ডিত্য কোথায়? যাক। B. A. M. A. B. L. এ টাইটেলগুলোকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি তাহাই জানাইলাম। প্রমথ লিখিতেছে, গল্পগুলো তাদের Evening Club এ অত্যন্ত সম্মান পাইয়াছে। D, L. Roy এত প্রশংসা করিয়াছেন যে, তাহা বিশ্বাস হইতে চায় না। দিদির 'নারীর মূল্য' নাকি অমূল্য হইয়াছে। বিজুবাবু বলেন, এ রকম গল্প রবি-বাবুরও বোধ করি নাই। (এমন) প্রবন্ধ বাঙলা ভাষায় আর কখন পড়েন নাই। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। ফণীর কাগজখানা ছোট বটে, কিন্তু তার মত ভাল কাগজ বোধ করি আজকাল আর একটাও বাহির হয় না। ঈশ্বর করুন, ফণী এই ভাবে পরিশ্রম করিয়া তাহার কাগজ সম্পাদন করুক—দুদিন পরে হোক দশদিন পরে হোক শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য্য। তবে চেষ্টা করা চাই—পরিশ্রম করা চাই। আর আমার কথা! আমি তাকে ছোট ভায়ের মতই দেখি। তার কাগজ থেকে যদি কিছু বাঁচে, তবে অন্য কাগজে। তবে, আজকাল এত বেশী অনুরোধ হইতেছে যে, আমার দশটা হাত থাকিলেও ত পারিয়া উঠিতাম বলিয়া মনে হয় না। 'চরিত্রহীন' তার কাগজে বার হবে না এ কথা কে বলিয়াছে? আমি প্রমথকে পড়িতে দিয়াছি। তবে, সে যদি ধরিয়া বসিত যে সে-ই প্রকাশ করিবে তাহা হইলে আমাকে হয়ত মত দিতে হইত, কিন্তু, তাহারা সে দাবী করে না। বোধ করি manuscript পড়িয়া কিছু ভয় পাইয়াছে। তাহারা সাবিত্রীকে "মেসের ঝি" বলিয়াই দেখিয়াছে। যদি চোখ থাকিত, এবং কি গল্প কি চরিত্র কোথায় কি ভাবে শেষ হয়, কোন্ কয়লার খনি থেকে কি অমূল্য হীরা-মানিক ওঠে তা যদি বুঝিত, তাহা হইলে অত সহজে ওখানা ছাড়িতে চাহিত না। শেষে হয়ত এক দিন আপশোষ করিবে—কি রত্নই হাতে পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে! আমার কাছে সে উপসংহার কি হইবে

জানিতে চাহিয়াছে। আমার উপরে যাহার ভরসা নাই—অবশ্য সে ও-রকম প্রথম নভেল প্রথম কাগজে বাহির করিতে দ্বিধা করিবে আশ্চর্য্যের কথা নয়, কিন্তু, নিজেই তাহারা বলিতেছে 'চরিত্রহীনে'র শেষ দিকটা (অর্থাৎ তোমরা যত দূর পড়িয়াছ তার পরে আর ততটা) রবিবাবুর চেয়েও ভাল হইয়াছে (style এবং চরিত্র-বিশ্লেষণে) তবুও তাদের ভয় পাছে শেষটা বিগড়াইয়া ফেলি। তারা এটা ভাবে নাই যে-লোক ইচ্ছা করিয়া একটা "মেসের ঝি"কে আরম্ভেই টানিয়া আনিয়া লোকের সুমুখে হাজির করিতে সাহস করে, সে তার ক্ষমতা জানিয়াই করে। তাও যদি না জানিব তবে মিথ্যাই এতটা বয়স তোমাদের গুরুগিরি করিলাম। আর এক কথা—প্রমথ বলিতেছে, 'ভারতবর্ষ'কে আমি যেন নিজের কাগজ বলিয়া মনে করি। আমি প্রমথকে কথা দিয়াছি আমার সাধ্যমত করিব, কিন্তু সাধ্য কতটুকু তাহা বলি নাই। আরো এক কথা—তাহারা দাম দিয়া লেখা ক্রয় করিবে—তখন তাহাদের অভাব হইবে না, কিন্তু দাম দিলেই যে সকলের লেখাই পাওয়া যায় না, এইটা তাহারা আমার সম্বন্ধে এইবার বোধ করি বুঝিয়াছে। যাই হোক — চরিত্রহীন' আমার হাতে আসিয়া পড়িলেই ফণীকে পাঠাইয়া দিব। আমার হাতে আর রাখিব না। তবে প্রমথ ফণীর হাতে সেটা দিবে না, কেন না ফণীর উপর তাহারা কিছু রাগিয়া গিয়াছে। তা হয়। কারণ, মাসিক পত্রের পরিচালকেরা পরস্পরকে দেখিতে পারে না। আর কিছু নয়। তবে, প্রমথ লোকটি শুধু যে আমার বাল্যবন্ধু তা নয়, আমার পরম বন্ধু এবং অতি সৎ লোক। সত্যই ভদ্রলোক। তাকে আমি ভালবাসি। সেই জন্যই ভয় করিয়াছিলাম তাহার জোর-জবরদস্তিতে আমি পারিয়া উঠিব না। এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ পরে দিব।

তুমি লিখিতেছ আমরা 'যমুনা'কে বড় করিব। আমরাটা কে? তুমি যে 'যমুনা'র পরম বন্ধু, এবং নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব করিতে গিয়াই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছ, তাহা আমি বিশেষ জানি বলিয়াই তোমার সম্বন্ধে যত কিছু শুনিয়াছি একটাতেও বিন্দুমাত্র কান দিই নাই। হইতে পারে কিছু deplomatic চাল চালিয়াছ—তা বেশ করিয়াছ। যাকে ভালবাসিবে, তাকে অমনি করিয়াই সাহায্য করিবে। ফণীকে তুমিই ভালবাস, কিন্তু তা ছাড়া 'আমরা' কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিলাম না। এবারে বুঝাইয়া বলিবে। 'পথ নির্দ্দেশ' এবং 'রামের সুমতি' সম্বন্ধে আমার অভিমত 'পথ নির্দ্দেশ'টাই ভাল। তবে এ গল্পটা একটু শক্ত। সবাই ভাল বুঝিবে না। আমিও অনেকের অনেক রকম মত শুনিয়াছি। যাহারা নিজে গল্প লেখে তাহারা ঠিক জানে, 'রামের সুমতি' যদিও বা লেখা যায় 'পথ নির্দ্দেশ' লিখিতে কিছু বেশী বেগ পাইতে হইবে। হয়ত সবাই পারিবে না। ও-রকম গোলযোগ circumstance এর ভেতর

খেই হারাইয়া একটা হ-য-ব-র-ল করিয়া তুলিবে। হয়ত ধৈর্য্যের অভাবে শেষ হবার পূর্ব্বেই শেষ করিয়া ফেলিবে। আর নিজের সমালোচনা নিজে কি করিয়াই বা করিব? তবে কলিকাতা এবং এদেশের লোকের মত ছুটো গল্পই superlative degreeতে excellent! বিভূবাবু বলেন গল্পের আদর্শ! ফণীর কাগজে প্রতি মাসেই যাতে এই রকম একটা কিছুই বার হয়, তার চেষ্টা সবিশেষ করা উচিত। তবে, আমি আর বড় ছোট গল্প লিখিতে ইচ্ছা করি না। একটু বড় হয়েই যায়। তোমাদের মত বেশ ছোট করে যেন লিখতেই পারি না। তা ছাড়া আর একটা কথা এইখানে আমার বলবার আছে। আমি ত 'চন্দ্রনাথ'কে একেবারে নূতন ছাঁচে ঢালবার চেষ্টায় আছি, অবশ্য গল্প (Plot) ঠিক তাই থাকবে। তারপরে হয় 'চরিত্রহীন', না হয় ওর চেয়েও একটা ভাল কিছু 'যমুনা'য় বার করা চাই। আর প্রবন্ধ। এটাও খুব প্রয়োজন। ভাল প্রবন্ধের বিশেষ দরকার, তা না হলে শুধু গল্পতেই কাগজ যথার্থ 'বড়' বলে লোকে স্বীকার করে না। আমাকে যদি তোমরা ছোট গল্প লিখবার পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি দিতে পার ত আমি প্রবন্ধও লিখতে পারি। বোধ করি গল্পের মত সরল এবং সুপাঠ্য করেই। এ বিষয়ে তোমার অভিমত জানাবে। যদি গল্প লেখার কাজটা তোমরা চালিয়ে নিতে পার, আমি শুধু novel ও প্রবন্ধ নিয়েই থাকি। তা না হইলে দেখচি রাত্রেও খাটিতে হয়। আমার শরীর ভাল নয়, রাত্রে লিখিতে পারি না এবং পড়াশুনার ক্ষতি হয়। সমালোচনা, প্রবন্ধ, নভেল, গল্প, সব মিলিয়ে আবার লোকে হয়ত সব্যসাচী বলে ঠাট্টা করবে। আবার অন্যকাগজেও কিছু কিছু দিতে হবে।

'দেবদাস' ও 'পাষাণ' পাঠিয়ে দিয়ো আমি re-write করবার চেষ্টা দেখব। আচ্ছা, ফণী ৩০০০ কপি ছাপিয়ে নষ্ট করচে কেন? তার গ্রাহক কি কিছু বেড়েচে? আমার বোধ হয় না। তবে খুব ভরসা আছে আসচে বছরে ওর কাগজ একটি শ্রেষ্ঠ কাগজের মধ্যেই দাঁড়াবে।

ফণীর ক্রমাগত আশঙ্কা হয় আমি বুঝি তাকে ছেড়ে আর কোথাও লিখতে শুরু করব। কিন্তু এ আশঙ্কার হেতু কি? সে আমার ছোট ভায়ের মত—এ কথাটা কেন যে সে বিশ্বাস করতে পারে না তা সেই জানে। আমি জানি না।

তোমার 'ক্রয়-বিক্রয়' গল্পটা সত্যই ভাল। কিন্তু, আরো একটু বড় করা উচিত ছিল। এবং শেষটা সত্য সত্যই শেষ করা উচিত ছিল। অমন গল্পটি কেন যে তুমি অত তাড়াতাড়ি শেষ করলে জানি না। একটা কথা মনে রেখো, গল্প অন্তত ১২।১৪ পাতা হওয়া চাই এবং conclusionটা বেশ স্পষ্ট করা চাই।

সুরেন আমাকে চিঠির জবাব দিলে না কেন? তাকে আমার হাতের কলম

দিয়েছি, কেন না, এর চেয়ে ভাল জিনিস আর আমার দিবার নাই। সে তার কি সদ্ব্যবহার কচ্চে জিজ্ঞাসা করে লিখো। আমার কলমের যেন অসম্মান না হয়। আর চারটে কলম দেওয়ার বাকী আছে। যোগেশ মজুমদার কোথায়? পুঁটু, বুড়ী এবং সৌরীন[১] এদের জন্যও আমার কলম ঠিক করে রেখেছি—একদিন পাঠিয়ে দেব।

গিরীন কি বাঁকিপুরে ফিরেচে? তাকে জবাব দিতে পারি নি, সে কোথায় আছে জানতে পারিনি বলিয়া। কটো ত আমার নাই—কোন দিন ও-কথা মনেও হয় নি। আচ্ছা।

আজ এই পর্য্যন্ত।

হাঁ, আর এক কথা। সুধাকৃষ্ণ বাগচি একটা written statement পাঠিয়েছে। সে বলে সমস্ত কথা মিথ্যা। ভালই। আমি জানি কোন্‌টা মিথ্যা। যাই হোক লোকটা যখন deny কচ্চে তখন ঐখানেই শেষ করা উচিত। তা ছাড়া বুড়ো মানুষ!

* * * *

14, Lower Pozoungdoung Street'
Rangoon, ২২শে আগস্ট, '১৩।

প্রিয় উপীন—অনেক দিন পরে তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। তুমিও অনেকদিন আমাকে কোন সংবাদই তোমার দাও নাই। নাই দাও, সেজন্য দুঃখ করিতেছি না বা অনুযোগ করিতেছি না। ২।৩ মাস পরে সম্ভবত আবার আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হইবে, তখন সে সব কথা হইতে পারিবে।

এ মাসের 'যমুনা' পাইয়া তোমার 'লক্ষ্মীলাভ' পড়িলাম। এ সম্বন্ধে আমার মত তুমি বিশ্বাস করিবে কি না, তোমার কথাতেই প্রকাশ করিতেছি "বাপের মুখে ছেলের সুখ্যাতি শুনে কাজ নাই—(লক্ষ্মীলাভ গল্পটির একটি ছত্র)।" আমার যথার্থ মত, এমন মধুর গল্প অনেকদিন পড়ি নাই। হয়ত তোমার best এটি। অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই, লোকের দোষ দেখানো সংসারের দুঃখের দিকটা তুলিয়া ধরা ইত্যাদি কিছু নেই—শুধু একটি সুন্দর ফুলের মত নির্ম্মল এবং পবিত্র। মধুর, অতি মধুর!

১। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু।

এই আমি চাই। পড়িয়া যদি না আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল আসে তবে আর সে গল্প কি? বড় ভাল হয়েচে উপীন, আমি আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি, যেন মাঝে মাঝে এমনি গল্প পড়তে পাই। অবশ্য আমাকে খুশী করা শক্ত, কিন্তু এমন পেলে আমি আর কিছু চাই না। আমার এত বড় সুখ্যাতিতে হয়ত তুমি একটু সঙ্কুচিত হবে এবং সবাই হয়ত আমার সঙ্গে একমতও হবে না, কিন্তু আমার চেয়ে ভাল সমঝদার এখনকার কালে এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ নেই। মনে কোরো না গর্ব্ব করচি—কিন্তু, আমার আত্মনির্ভরতাই বল, আর prideই বল, এই আমার নিজের ধারণা। এমন গল্প অনেকদিন পড়িনি। শুনেচি, তোমার আর একটি বড় এবং ভালো গল্প 'ভারতবর্ষে' বেরিয়েচে। 'ভারতবর্ষ' এখনো এসে পৌঁছে নি, বলিতে পারি না সেটি কেমন, কিন্তু যদি ভাবে মাধুর্য্যে এমনটি হয়ে থাকে তা হলে সেও নিশ্চয় খুব ভাল গল্পই হয়েচে।

তা ছাড়া তোমাদের লেখার styleটি বড় সুন্দর। আমি যদি এমনি সুন্দর ভাষা পেতাম, ভাষার ওপর এমনি অধিকার থাকত তা হলে বোধ করি আমার গল্প আরো ভাল হত। অবশ্য আমি নিজের সহিত তোমার তুলনা করচি না, তাতে তুমিও লজ্জা বোধ করবে, কিন্তু খুশী হলে আমি আর রেখে চেপে বলতে পারি নে।

কেমন আছ আজকাল? আমি বড় ভাল নই—এই বর্ষাকালটা আমার বড় দুঃসময়। ১০।১২ দিন জ্বর হয়েছিল, দুদিন ভাল আছি। আমার ভালবাসা জেনো।

ইতি—শরৎ

['যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ পালকে লেখা]

রেঙ্গুন, মাঘ, ১৩১৩।

প্রিয় ফণীন্দ্রবাবু—'রামের সুমতি' গল্পটার শেষ পাঠালাম, এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। গল্পটা কিছু বড় হয়ে পড়েছে, বোধ করি একবারে প্রকাশ হতে পারবে না, কিন্তু হলে ভাল হয়। একটু ছোট টাইপে ছাপালে এবং দুই একখানা পাতা বেশী দিলে হতে পারে। ছোট গল্প খণ্ডশঃ প্রকাশ করায় তেমন সুবিধা হয় না, বিশেষ আপনার কাগজের এখন একটু পসার হওয়া উচিত। যদিও আমার ছোট গল্প লেখার অভ্যাস আজকাল কিছু কমেছে, তবে আশা করি দু-এক মাসের মধ্যেই অভ্যাস ঠিক হয়ে যাবে। আমি প্রতি মাসেই গল্প ছোট করে

(১০।১২ পাতার মধ্যে) এবং প্রবন্ধ পাঠাব। গল্প নিশ্চয়ই, কেন না আজকাল ঐটার আদর কিছু অধিক।...

আগামী বারে গল্প যাতে ছোট হয় সেদিকে চোখ রাখব। আর এক কথা, আপনি সমাজপতির সহিত সদ্ভাব রাখবেন। তাঁর কাগজে যদি আপনার কাগজের একটু-আধটু আলোচনা থাকতে পায়· সুবিধা হয়। এবারের 'সাহিত্যে' আমার নাম দিয়ে কি একটা ছাইপাঁশ ছাপিয়েছে। ও কি আমার লেখা? আমার ত একটুও মনে পড়ে না। তা ছাড়া যদি তাই হয়, তা হ'লেই বা ছাপান কেন? মানুষ ছেলেবেলা অনেক লেখে, সেগুলো কি প্রকাশ করতে আছে? আপনি 'বোঝা' ছাপিয়ে আমাকে যেমন লজ্জিত করেছেন, সমাজপতিও তেমনি ঐটে ছাপিয়ে আমাকে লজ্জা দিয়েচেন। যদি উপীনকে চিঠি লেখেন এই অনুরোধটা জানাবেন যেন আমার অমতে আর কিছুই না প্রকাশ হয়। আবশ্যক হ'লে গল্প আমি ঢের লিখতে পারি—আপনার কাগজ ত এক ফোঁটা, ও-রকম ৩।৪ গুণ কাগজও একলা ভ'রে দিতে পারি। তা ছাড়া আমার আর একটা সুবিধে আছে। গল্প ছাড়া সমস্ত রকম snbject নিয়েই প্রবন্ধ লিখতে পারি, তা যদি আপনার আবশ্যক থাকে লিখবেন। যে কোন subject—তাতেই আমি স্বীকার আছি। 'রামের সুমতি' ক'বারে ছাপাবেন, কিংবা একেবারে ছাপাবেন, আমাকে লিখে জানাবেন। তা হ'লে চৈত্রের জন্য আর লিখবার আবশ্যক হবে না।

'চরিত্রহীন' প্রায় সমাধার দিকে পৌঁছেচে। তবে সকালবেলা ছাড়া রাত্রে আমি লিখতে পারি নে। রাত্রে আমি শুয়ে পড়ি?...

আর একটা কথা—আপনি 'যমুনা' ছাপাতে দেবার আগে গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি আমাকে একবার যদি দেখাতে পারেন, বড় ভাল হয়। এই ধরুন চৈত্রের জন্য যে-সব ঠিক করেছেন সেইগুলো এখন অর্থাৎ মাসখানেক আগে আমাকে পাঠালে—একটু নির্ব্বাচন ক'রে দিতেও পারি। পৌষের 'যমুনা' বড় ভাল হয় নি। শেষের গল্পটা সুবিধে নয়। অবশ্য এতে খরচ আপনার পড়বে (ডাক-টিকিট) কিন্তু কাগজ ভাল হয়ে দাঁড়াবে। আমার এদিক থেকে ফেরত পাঠাবার খরচ আমি দেব, কিন্তু প্রবন্ধগুলি ডাকে পাঠালে আমি একটু দেখে দিই এমনি ইচ্ছে করে। আগেই বলেছি আমি শুধু গল্পই লিখি নে। সব রকমই পারি, শুধু পদ্য পারি নে। আচ্ছা আপনি সৌরীনবাবুকে দিয়ে, কিংবা, উপীন, সুরেন, গিরীনকে দিয়ে 'নিরুপমা দেবী'র রচনা—কবিতা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন না কেন? তাঁর বড় ভাই বিভূতিকে বোধ করি আপনিও চেনেন। তাঁকে লিখলে নিরুপমার রচনা (রচনা না হয় কবিতা) বোধ করি পেতেও পারেন। অনেকের চেয়ে তাঁর কবিতা এবং রচনা ভাল।

আমাকে দিয়ে যতটুকু উপকার হ'তে পারে আমি তা নিশ্চয় করব। কথা দিয়েছি, সেই মত কাজও করব। সাহিত্যের মধ্যে যতটা নীচতাই প্রবেশ করুক না, এদিকে এখনও এসে পৌঁছায় নি। তা ছাড়া এ আমার পেশা নয়; আমি পেশাদার লিখিয়ে নই এবং কোন দিন হ'তেও চাই না।

আমি একটু কাছে থাকিতে পারিলে আপনার সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু এদেশ আমি বোধ করি কোন মতেই ছাড়তে পারব না। আমি বেশ আছি, অনর্থক মুস্কিলের মধ্যে যেতে চাই না এবং যাবও না। আমার এই পর্য্যন্ত—

আগামী বৎসর থেকে আপনি কাগজখানা যদি একটু বড় করতে পারেন, কিছু মূল্য বৃদ্ধি করে, সে চেষ্টা করবেন। প্রতি সংখ্যায় পড়বার উপযুক্ত জিনিস থাকবে; এ-কথা প্রকাশ করে জানাবেন। সেই জন্যেই বলি গল্পগুলো এক সংখ্যাতেই প্রকাশ করা ভাল—একটু ক্ষতি স্বীকার করেও, তাতে অনেকটা Advertisement-এর মত হবে।

উপেন আমাকে অনেকবার লিখলে সে 'চন্দ্রনাথ' পাঠাচ্চে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পেলাম না। বোধ করি সে হাতে পাচ্চে না তাই। তবে আপনি যদি 'চন্দ্রনাথ'টা ক্রমশঃ প্রকাশ করতে চান, আমি নূতন করে লিখে দেব। ভবানীপুরে সৌরীনের মুখে জিনিসটা যে কি শুনে নিয়েছি। আমার কতক মনে পড়েছে—সুতরাং নূতন করে লিখে দেওয়া বোধ করি শক্ত হবে না। আপনি যদি এই রকম নূতন লেখা চান আমাকে জানাবেন।...আঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রেঙ্গুন, ১২।২।১৩

প্রিয় ফণীবাবু—এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। ১ম কথা 'বঙ্গবাসী'র ক্রোড়পত্র প্রভৃতি করে অর্থশূন্য বাজে খরচ ভাল হয় নাই। আপনি একেবারে ব্যস্ত হবেন না। আপনার কাগজের মধ্যে যদি ভাল জিনিস থাকে দু-দিনে হোক দশদিনে হোক সে-কথা আপনি প্রচার হয়ে যাবে, কেউ আটকে রাখতে পারবে না। আপনার কোন ভয় নেই। ক্যানভাস করে গ্রাহক যোগাড় করা ক্রোড়পত্র দিয়ে টাকা নষ্ট করার চেয়ে ঢের ভাল।

২য় কথা—'রামের সুমতি' ছোট টাইপে ছাপিয়ে একেবারে বার করতে পারলেই বড় ভাল হত—কেন না, এ রকম ছোট ধরণের গল্প 'ক্রমশঃ' বড় সুবিধে হয় না। যা হোক যখন হয় নি, তার জন্যে আলোচনা বৃথা। আমি দু-এক দিনের

মধ্যে আর একটি গল্প পাঠাব (আপনার জবাব পেলে পাঠাব), এ গল্পটা আমার বিবেচনায় 'রামের সুমতি'র চেয়ে ভাল, তবে দুঃখের বিষয় এই যে প্রায় ঐ রকম বড় হয়ে পড়েচে। এত চেষ্টা করেও ছোট করা গেল না। ভবিষ্যতে চেষ্টা করে দেখি কি হয়।

৩য় কথা—'চন্দ্রনাথ' নিয়ে কি একটা বোধ করি হাঙ্গামা আছে। তাই বলি ওতে আর কাজ নেই। 'চরিত্রহীন' বার করা যাবে। অবশ্য সেজন্য কাগজ কিছু বড় করা চাই কিন্তু মূল্য কত এবং কবে থেকে বাড়াবেন এটা লিখবেন। দাম না বাড়ালে কিছুতেই কাগজ বড় করে গচ্ছা দেওয়া উচিত নয়।

৪র্থ কথা—সমাজপতির সঙ্গে অসদ্ভাব করবেন না এইটাই বলেচি, তাঁকে খোসামোদ করতে বলি নি। ফণীবাবু, আপনার দোকানের মাল যদি খাঁটি হয়, এক দিন পরে হোক, পাঁচ দিন পরে হোক খদ্দের জুটবে। মাল ভাল না হলে হাজার চেষ্টাতে দোকান চলবে না—দু-চার দিনে হোক, মাসে হোক ফেল হতে হবে।

আমার ছেলেবেলার ছাইপাঁশ ছাপিয়ে আমাকে যে কত লজ্জা দেওয়া হচ্চে এবং আমার প্রতি কত অন্যায় করা হচ্চে তা আমি লিখে জানাতে পারিনে। সমাজপতি সমঝদার লোক হয়ে কেমন করে যে ঐ ছাই ছাপালেন আশ্চর্য্য!

৫ম কথা—সৌরীনবাবুর সঙ্গে আপনার আজকাল মিল কেমন? তিনি আমার দিদির লেখা সমালোচনাটা দেখেছেন কি? বোধ হয় খুব রাগ করেচেন, না? কিন্তু আমার দোষ কি? যিনি লিখেছেন তিনিই দায়ী। তা ছাড়া এ-সব লেখা ছোট টাইপে ছেপেছেন ত?

৬ষ্ঠ কথা - আমার নূতন গল্পটা (যেটা দু-এক দিনের মধ্যেই পাঠাব) কোন মাসে ছাপাবেন? চৈত্রে 'রামের সুমতি' শেষ হবে, সুতরাং সে মাসে আর কাজ নেই, বৈশাখে দেবেন। কিন্তু যাতেই দিন, ছোট টাইপে ছাপালে কম জায়গা লাগবে, অথচ গ্রাহক অনেকটা জিনিস পড়তে পারে।

৭ম কথা—বৈশাখ থেকে কাগজখানি যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। ছবির পেছনে মেলাই কতগুলো টাকা নষ্ট না ক'রে ঐ টাকা যাতে অন্য কোন রকমে কাগজের পিছনে লাগান যায় তাই ভাল। অবশ্য আমি জানি না গ্রাহক ছবি চায় কি না, যদি ঐ ফ্যাশান হয় তা হ'লে নিশ্চয় দিতে হবে। আপনি আমাকে প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি selection-এর মধ্যে একটু স্থান দিলে এই ভাল হয় যে, আমিও দেখে শুনে দিতে পারি। খাতিরে প'ড়ে ছাইমাটি দেওয়া কিংবা 'নাম' দেখে ছাইমাটি দেওয়া দু-ই মন্দ।

৮ম কথা—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী যদি তাঁর লেখা দয়া ক'রে আপনাকে দেন

সে ত নিশ্চয়ই ভাল, তাঁর কবিতা লেখবার ক্ষমতাও খুব বেশী। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর লেখা বোধ করি পাওয়া দুঃসাধ্য। তিনি 'ভারতী'তে লেখেন, আপনার এতে লিখবেন কি না বলা যায় না। লিখলেও হয়ত অশ্রদ্ধা ক'রে যা-তা লিখবেন। এঁরা সব বড় লেখিকা, এঁদের হয়ত 'যমুনার' মত ছোট কাগজে লিখতে প্রবৃত্তি হবে না। তবে একটু চেষ্টা ক'রে দেখবেন। পাওয়া যায় ভালই, না যায় সেও ভাল।

আমার তিনটে নাম।

সমালোচনা প্রবন্ধ প্রভৃতি—অনিলা দেবী।

ছোট গল্প—শরৎচন্দ্র চট্টো।

বড় গল্প—অনুপমা।

সমস্তই এক নামে হ'লে লোকে মনে করবে, এই লোকটি ছাড়া আর বুঝি এদের কেউ নেই।

আমার এখানে একজন বন্ধু আছেন, তাঁর নাম প্রফুল্ল লাহিড়ী, B, A, তিনি অতি সুন্দর দার্শনিক। প্রবন্ধ লেখেন খুব ভাল, অবশ্য নাম নাই, কেন না কোন মাসিকপত্রের লেখক নন। আমি এঁকে অনুরোধ করেছি—আমাদের 'যমুনা'র জন্য লিখতে। লেখা পেলে আমি পাঠিয়ে দেব।

অসুবিধা এই, 'যমুনা' আকারে ছোট। বেশী প্রয়াস এতে চলে না। দামও কম। হঠাৎ দাম বাড়াবার চেষ্টা কি রকম সফল হবে বলা যায় না। যদি একান্তই সম্ভব না হয়, কিছু দিন পরে, অর্থাৎ আশ্বিন মাস থেকে (গ্রাহকের মত নিয়ে, এবং প্রমাণ ক'রে যে তাঁহারা বেশী দাম দিলেও ঠকবেন না) মূল্য এবং আকারে আরও বড় করলে কি হয় না? আপনি নিজে একটু ঢিলা লোক, কিন্তু সে রকম হ'লে চলবে না। রীতিমত কাজ করা চাই। আপনি যখন আর অন্য কিছু করবেন না মতলব করেচেন, তখন এই জিনিসটাকেই একটু বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখবার চেষ্টা করবেন। এবং যাকে 'বিষয়বুদ্ধি' বলে তাও অবহেলা করবেন না। 'প্রবাসী' প্রভৃতি এক সময়ে কত ছোট কাগজ এখন কত বড় হয়ে গেছে। আপনি আমাকে পুরুষ লেখকদের সমালোচনা লিখতে বলেছেন, কিন্তু আমার বাঙ্গলা বই নাই। মাসিকপত্রও একটাও লই না—আমি কোথায় কি পাব যে সমালোচনা লিখব। লিখলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিশ্চয় এবং একটা বাদানুবাদ হবার উপক্রম হয়। আমি এটা জানি যদি তাই হয়, তা হলে'ও চিন্তার কথা কিছু নাই—আমার সমালোচনায় ভুল থাকে আর তা যদি প্রমাণ করতে পারেন (পারা শক্ত যদিও) সেও ভাল কথা।

এইখানে আমার আর একটা বলবার জিনিস আছে। আমার পড়াশুনার কিছু ক্ষতি হচ্চে। সমস্ত সকালটা কোন দিন বা আপনার জন্যে, কোন দিন বা 'চরিত্র-হীনের' জন্য নষ্ট হচ্ছে। রাত্রিটা অবশ্য পড়তে পাই, কিন্তু নোট করা প্রভৃতি হয়ে উঠছে না। আর একটা কথা আমি কয়েক দিন ধ'রে ভাবছি—এক একবার ইচ্ছে করে, H. Spencerএর সমস্ত Synthetic Philo : একটা বাঙ্গলা সমালোচনা—সমালোচনা ঠিক নয়, আলোচনা—এবং ইউরোপের অন্যান্য Philosopher যাঁরা Spencerএর শত্রু মিত্র তাঁহাদের লেখার উপর একটা বড় রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি। আমাদের দেশের পত্রিকায় কেবল নিজেদের সাংখ্য আর বেদান্ত ছাড়া, দ্বৈত আর অদ্বৈত ছাড়া আর কোন রকমের আলোচনাই থাকে না। তাই মাঝে মাঝে এই ইচ্ছাটা হয়—কি করি বলুন ত? যদি আপনার কাগজে স্থান না হয় (হওয়া সম্ভব নয়) কোন পত্রিকায় প্রকাশ করে এ-রকম জোগাড় ক'রে দিতে পারেন কি?

আপনি আমাকে সর্ব্বদা চিঠি লিখবেন। না লিখলে আমারও যেন আর তেমন চাড় থাকে না। এটাও একটা কাজ ব'লে মনে করবেন। লেখা Registry ক'রেই পাঠাব। খরচ আপনি দেবেন কেন? আমার অত দৈন্যদশা নয় যে এর জন্য খরচ নিতে হবে। এ সব কথা আর লিখবেন না।

আশীর্ব্বাদ করি আপনার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক—সেই আমার পারিতোষিক হবে।

'চন্দ্রনাথ' আর চাইবেন না। যদি দরকার হয় আমি আবার লিখে দেব। সে লেখা ভাল বই মন্দ হবে না।

আমার তিন রকমের নাম গ্রহণ করা সম্বন্ধে আপনার মত কি? বোধ করি এতে সুবিধে হবে। এক নামে বেশী লেখা ভাল নয়, না?

উপেন কি বলে? সে ত চিঠিপত্র লেখবার লোক নয়। সে থাকলে ঢের সুবিধে ছিল—না থাকায় বোধ করি বেশ অসুবিধে হচ্চে। সে লোকটার আপনার প্রতি ভারী স্নেহ ছিল—যদি তার নিকট থেকে কাজ আদায় করতে পারেন সে চেষ্টা ছাড়বেন না।

যাই হোক আর যেমনই হোক ব্যস্তও হবেন না, চিন্তিতও হবেন না। আমি আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও যে যাব কিংবা কোন লোভে যাবার চেষ্টা করব, এমন কথা কোন দিন মনেও করবেন না। আমার সমস্তটাই দোষে ভরা নয়।

আপনি পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করবার জন্যে চিঠিতে লিখতেন—অন্য

কাগজওয়ালারা আমাকে অনুরোধ করবে। করলেই বা, charity begins at home, সত্যি না? একটু শীঘ্র জবাব দেবেন। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। ইতি

শরৎচন্দ্র

প্রিয় ফণীবাবু—আপনার প্রবন্ধ ফেরত পাঠাইয়াছি। প্রবন্ধ দুটি মন্দ নয়, দেওয়া চলে, 'চক্ষু' সম্বন্ধে প্রবন্ধটা বেশ।

'চন্দ্রনাথ' লইয়া ভারী গোলমাল হইতেছে। না জানিয়া হাতে না পাইয়া এই সব বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দেওয়া ছেলেমানুষির এক শেষ। তাহারা সমস্ত বই 'চন্দ্রনাথ' দিবে না, এজন্য মিথ্যা চেষ্টা করিবেন না। তবে, নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবে। আমার একেবারে ইচ্ছা নয় আমার পুরান লেখা যেমন আছে তেমনই প্রকাশ হয়। অনেক ভুলভ্রান্তি আছে, সেগুলি সংশোধন করিতে যদি পাই ত ছাপা হইতে পারে, অন্যথা নিশ্চয় নয়। এক 'কাশীনাথ' লইয়া আমি যথেষ্ট লজ্জিত হইয়াছি—আর যে বন্ধুবান্ধবদের নিকটে এই লইয়া লজ্জা পাই আমার ইচ্ছা নয়। তাঁহারা নিশ্চয় আমার মঙ্গলেচ্ছাই করিয়াছেন, কিন্তু আমার মত সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। 'চন্দ্রনাথ' বন্ধ থাক। 'চরিত্রহীন' জ্যৈষ্ঠ থেকে শুরু করুন। আর যদি 'চন্দ্রনাথ' বৈশাখে শুরু হইয়াই গিয়া থাকে (অবশ্য সে অবস্থায় আর উপায় নাই) তাহা হইলেও আমাকে বাকীটা পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন ইত্যাদি করিতেই হইবে। বৈশাখে কতটুকু বাহির হইয়াছে দেখিতে পাইলে আমি বাকীটা হাতে না পাইলেও খানিকটা খানিকটা করিয়া লিখিয়া দিব। যদি বৈশাখে ছাপা না হইয়া থাকে তাহা হইলে 'চরিত্রহীন' ছাপা হইবে।

আমি 'চরিত্রহীনের'র জন্য অনেক চিঠিপত্র পাইতেছি। কেহ টাকার লোভ, কেহ সম্মানের লোভ, কেহ-বা দুইই, কেহ-বা বন্ধুত্বের অনুরোধও করিতেছেন। আমি কিছুই চাহি না—আপনাকে বলিয়াছি আপনার মঙ্গল যাতে হয় করিব—তাহা করিবই। আমি কথা বদলাই না।

আপনি দয়া করিয়া এই ঠিকানায় ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ 'যমুনা' পাঠান—B. Promathanath Bhattacharji, 19, Jugal Kisore Das Lane, Calcutta.

এঁরা অর্থাৎ গুরুদাসবাবুর পুত্র তাঁহার নূতন কাগজের জন্য আমার লেখার জন্য

বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, অবশ্য আমার প্রিয়তম বন্ধু প্রমথর খাতিরে, কিন্তু ঐ কথা আমার। যা হোক ফাল্গুন চৈত্র 'যমুনা' তাঁকে দিন—তিনি তাঁর দল আমার 'কাশীনাথ' সম্বন্ধে কিছু গোপন সমালোচনা করিয়াছেন। আরও এই একটা কথা যে আমি নিয়মিত 'যমুনা' ছাড়া আর কোথাও লিখিব না তাহাতেও একটা কাজ হইবে। আমার লেখা তুচ্ছ করিতে তাঁহারাও সাহস করিবেন না। আমি গণ্ডমূর্খ নই, সে-কথা প্রমথ জানে।

নিরুপমাকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিবেন তিনি সত্যই লেখেন ভাল। এবং বাজারে নাম আছে। অনেক সময়ে এবং বেশীর ভাগ সময়েই আমার চেয়েও তাঁর লেখা ভাল বলেই আমার মনে হয়। 'মানসী'র শ্রীযুক্ত ফকিরবাবুর সহিত যদি দেখা হয় বলিবেন তাঁর পত্র পাইয়াছি এবং শীঘ্র উত্তর দিব। আমারও জ্বর, এই জন্য পত্র দিতে পারিতেছি না—শীঘ্র দিব।

আপনি একটা কথা বলিতে পারেন কি? আমার আরও কত দিন শ্রাদ্ধ 'সাহিত্য' কাগজে হইবে? লোকে হয়ত মনে করিবে আমার লেখার ক্ষমতা 'কাশীনাথে'র অধিক নয়। এটাতে যে নাম খারাপ হয়, উপীন বেচারার বোধহয় সে কথা মনেও ছিল না। তথাপি সে যে আমার আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছাতেই এরূপ করিয়াছে, এই জন্যই কোন মতেই সহ্য করিয়া আছি। আর উপায়ও নাই। তবে জিজ্ঞাসা করি, আরও ঐ রকমের গল্প তাঁদের হাতে আছে নাকি? যদি থাকে তা হলেই সারা হব দেখচি। আরও একটা আপনাকে বলি। সেদিন গিরীনের পত্র পাই—তাঁহাদের সহিত উপীনের 'চন্দ্রনাথ' লইয়া কিছু বকাবকির মত হইয়া গিয়াছে। তাঁরা যদিও আপনার প্রতি বিরূপ নন, তত্রাচ এই ঘটনাতে এবং 'কাশীনাথে'র 'সাহিত্যে' প্রকাশ হওয়া ব্যাপারে তাঁরা 'চন্দ্রনাথ' দিতে সম্মত নন। তাঁরা আমার লেখাকে বড় ভালবাসেন। পাছে হারিয়ে যায় এই ভয় তাঁদের। এবং পাছে আর কোন কাগজওয়ালারা ওটা হাতে পায় এই জন্য সুরেন নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবার মতলব করিয়াছে। 'চন্দ্রনাথ' যদি বৈশাখে ছাপা হইয়া গিয়া থাকে আমাকে লিখিয়া কিংবা তার দিয়া জানান 'yes' or 'no' আমি তারপরে সুরেনকে আর একবার অনুরোধ করিয়া দেখিব! এই বলিয়া অনুরোধ করিব যে আর উপায় নাই দিতেই হইবে। যদি ছাপা না হইয়া থাকে তাহা হইলেই ভাল, কেন না 'চরিত্রহীন' ছাপা হইতে পারিবে।

আমাকে গল্প ও প্রবন্ধ পাঠাবেন। অন্যান্য আপনিই দেখিয়া দিবেন। যা-তা গল্প ছাপা নয়, অন্ততঃ হাত থাকিতে ছাপা না হয় এই আমার অভিপ্রায়।

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিতেছি (কাজের মধ্যেই) সেই জন্য সব

কথা ভলাইয়া ভাবিতে পারিতেছি না, কিন্তু যাহা লিখিয়াছি তাহা ঠিকই জানিবেন।

দ্বিজবাবুকে সম্পাদক করিয়া grand ভাবে হরিদাসবাবু কাগজ বাহির করিতেছেন। ভালই। তাঁরা টাকা দিবেন কাজেই ভাল লেখাও পাইবেন। তা ছাড়া তেলা মাথায় তেল দিতে সকলেই উদ্যত, এটা সংসারের ধর্ম্ম! এর জন্য চিন্তার প্রয়োজন দেখি না।

জ্যৈষ্ঠের জন্য যাহা পাঠাইব তাহা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই পাঠাইব। শুধু 'চন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলাম। ওটা কেমন গল্প কি রকম লেখার প্রণালী না জেনে প্রকাশ করা উচিত নয় বলে ভয় হচ্চে। যা হোক অতি শীঘ্র এ-বিষয়ে সংবাদ পাবার আশায় রইলাম।

ভাল নই—জ্বরোভাব কাল রাত্র থেকেই হয়ে আছে। না বাড়লেই ভাল। আপনার দেহ কেমন? জ্বর সারল? ইতি—আপনাদের স্নেহের 'শরৎ'

রেঙ্গুন, ২৮শে মার্চ, ১৯১৩

প্রিয় ফণীবাবু—এইমাত্র আপনার রেজেস্ট্রী প্যাকেট পাইলাম। যদি Registry করেন, তবে বাড়িতে পাঠান কেন? অফিসের ঠিকানাই ভাল—কেন না বাড়িতে যখন পিয়ন যায়, তখন আমি অফিসে থাকি। যদি Unregistered পাঠান তবে বাড়ির ঠিকানায় দেবেন। প্রবন্ধ দুটি দেখিয়া শুনিয়া শীঘ্রই পাঠাব। বৈশাখের জন্য দেখি বড়ই গোলযোগ। যা হোক এ মাসটা এই রকমে চালান—১) পথ নির্দ্দেশ, ২) নারীর মূল্য এবং অন্যান্য প্রবন্ধ প্রভৃতি। 'চন্দ্রনাথ' ছাপাবেন না, কারণ যদি ছাপানই মত হয় ত একটু নতুন করে দিতে হবে। জ্যৈষ্ঠ থেকে হয় 'চরিত্রহীন' না হয় 'চন্দ্রনাথ' আরও বড় এবং ভাল করে ক্রমশঃ। দেখি সুরেন গিরীন কি জবাব দেয়। বৈশাখে আর বিশেষ কোন উপায় হয় না দেখিতেছি। অবশ্য আপনার claim যে আমার উপর First তাহাতে আর সন্দেহ কি! আমি যে-কটা দিন বাঁচিয়া আছি—আপনাকে বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। তবে ভাই, আমার শরীর ত ভাল নয়—তা ছাড়া গল্পটল্প বড় লিখিতেও প্রবৃত্তি হয় না। এ যেন আমার অনেকটা দায়ে পড়ে গল্প লেখা! যা হোক লিখব- অন্ততঃ আপনার জন্যেও। সত্যই এর মধ্যে গল্প লিখে পাঠাবার অনেকগুলি নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছে, কিন্তু আমি বোধ করি প্রায় নিরুপায়। অত গল্প লিখতে গেলে আমার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে

যাবে। আমি প্রতি দিন ২ ঘণ্টার বেশি কিছুতে লিখি না—১০। ১২ ঘণ্টা পড়ি—এ ক্ষতি আমার নিজের আমি কিছুতে করিব না। যা হোক আপনার বৈশাখটা গোলমালে এক রকম বার হয়ে যাক্, তার পরের মাস থেকে দেখা যাবে। দেখুন প্রথমে আপনার গ্রাহকেরা কি বলে। তার পরে বুঝে কাজ করা। আমার পরম ভাগ্য যে আপনার মাতৃদেবীও আমার খোঁজ নেন। তাঁকে বলবেন আমি ভাল আছি। আশা করি অপরাপর মঙ্গল। বৈশাখেরটা তত ভাল যদি না হয়, একটু না হয় কাগজে সে বিষয়ে উল্লেখ করে দেবেন—যে আমার একটা গল্প প্রায় মাসেই থাকবে।

(আমার ঠিকানাটা আপনি যাকে তাকে দেন কেন?) আমাকে অনেকেই বলেন, বড় কাগজে লিখতে। কেন না, তাতে বেশি নাম হবে। আপনার ছোট কাগজ—ক'টা লোকে বা পড়ে। অবশ্য এ কথা আমিও স্বীকার করি। লাভ লোকসানের বিচার করতে গেলে তাদের কথাই সত্য এবং সচরাচর সকলে সেইরূপ করে! কিন্তু আমার একটু আত্মসম্ভ্রমও আছে এবং একটু আত্মনির্ভরও আছে। তাই সকলে যে পথটাকে সুবিধা মনে করেন, আমি সেটাকে সুবিধা মনে করিলেও আমার সমস্ত আশ্রয়ই তা নয়। আমি ছোট কাগজকে যদি চেষ্টা করিয়া বড় করিতে পারি—সেইটাকেই বেশি লাভ মনে করি। তা ছাড়া আপনাকে অনেকটা ভরসা দিয়েচি। এখন ইতরের মত অন্য রকম করিব না। আমার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু, সমস্তটাই দোষে ভরা নয়। আমি অনেক সময়েই নিজের কথা বজায় রাখবার চেষ্টা করি। আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার এই চিঠিটা কাহাকেও পড়িতে দিবেন না। যদি বৈশাখে বোঝা যায় গ্রাহক কমিতেছে না, বরং বাড়িতেছে, তাহা হইলে আশা হইবে যে পরে আরও বাড়িবে। 'পথ নির্দ্দেশটা' সমস্তটা একেবারেই ছাপিবেন। ক্রমশঃ ছাপিবেন না। আর এক কথা 'নারীর' লেখায়' বিস্তর ছাপার ভুল হইয়াছে, এক জায়গায় 'অনুরূপা'র বদলে 'আমোদিনী'র নাম হইয়া গিয়াছে। "ভূমার সঙ্গে ভূমির" ইত্যাদি এটা অনুরূপার—আমোদিনীর নয়। নিরুপমাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া যদি তাহার লেখা বেশি পাইতে পারেন চেষ্টা করিবেন। সে বাস্তবিকই ভাল লেখে। সে আমার ছোট বোনও বটে, ছাত্রীও বটে।—শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street,

Rangoon, 3-5-13.

প্রিয় ফণীবাবু—আপনার পত্র পাইয়াছি এবং প্রেরিত কাগজগুলো অর্থাৎ প্রবাসী, মানসী, ভারতী, সাহিত্য ইত্যাদি সবগুলাই পাইয়াছি। 'চন্দ্রনাথে'র যাহা পরিবর্ত্তন উচিত মনে করিয়াছি, তাহাই করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে এইরূপ করিয়াই দিব। 'চন্দ্রনাথ' গল্প হিসাবে অতি সুমিষ্ট গল্প, কিন্তু আতিশয্যে পূর্ণ হইয়া আছে। ছেলেবেলা অন্ততঃ যৌবনে ঐরূপ লেখাই স্বাভাবিক বলিয়াই সম্ভব হইয়াছে। যাহা হউক, এখন যখন হাতে পাইয়াছি তখন এটাকে ভাল উপন্যাসেই দাঁড় করান উচিত। অন্ততঃ দ্বিগুণ বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। প্রতি মাসে ২০ পাতা করিয়া দিলেও আশ্বিনের পূর্ব্বে শেষ হইবে কি না সন্দেহ। এই গল্পটির বিশেষত্ব এই যে কোনরূপ immoralityর সংস্রব নাই। সকলেই পড়িতে পারিবে। 'চরিত্রহীন' artএর হিসাবে এবং চরিত্র গঠনের হিসাবে নিশ্চয়ই ভাল, কিন্তু এরকম ধরনের নয়। 'চরিত্রহীনে'র জন্য প্রমথ ক্রমাগত তাগিদ দিতেছিল, কিন্তু শেষের তাগিদ এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়াছিল যে বুঝি বা আজন্মের বন্ধুত্ব যায়। সেই ভয়ে তাকে আমি 'চরিত্রহীন' পড়িতে পাঠাইয়াছি। অবশ্য কি তাহার মনের ভাব ঠিক বুঝি না, কিন্তু আমার মনের ভাব তাহাতে বেশ সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছি। এখন তাহার নিকট হইতে জবাব পাই নাই। পাইলে লিখিব। আমার এবং আপনার মধ্যে একটা স্নেহের সম্বন্ধ অতি প্রগাঢ়। আমার বয়স হইয়াছে—এই বয়সে যাহা হয় তাহাকে ইচ্ছামত নষ্ট করি না। কেন আপনি আমার সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্বিগ্ন হন। 'যমুনা'র উন্নতি আমার সকলের চেয়ে বেশি লক্ষ্য, তার পরে আর কিছু। 'চরিত্রহীন' সেই অর্দ্ধেক লেখা হইয়াই আছে—কি হবে তাও জানি না, কবে শেষ হবে তাও বলতে পারি না। 'চন্দ্রনাথ'টা যাতে এ বৎসরে ভাল হয়ে বার হয় তার চেষ্টা করতেই হবে—কারণ সেটা already প্রকাশ করা হইয়াছে। এ বৎসর যাতে 'যমুনা' অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে, তার চেষ্টা সবচেয়ে দরকার। তার পরে অর্থাৎ পর-বৎসর আকারটা আরও বৃদ্ধি ক'রে দেওয়া। এ বৎসর গ্রাহক কত? গত বৎসরের চেয়ে কম না বেশি? এটা লিখবেন। আমি যদি অন্য কাগজে লিখে নামটা আরো প্রচার করতে পারতাম তা হলে 'যমুনা'র সম্বন্ধে উপকার ছাড়া অপকার হ'ত না, কিন্তু অসুখের জন্য লিখতেই পারি না এবং তাহা হবেও না। তাড়াতাড়ি করলে হবে না ফণীবাবু, স্থির হয়ে বিশ্বাস রেখে অগ্রসর

হ'তে হবে। আমি বরাবরই আপনার কাজে লেগে থাকব—কিন্তু, আমার ক্ষমতা বড়ই কমে গেছে। খাটতে পারিনে। আর একটা সমালোচনা লিখচি—দু-তিন দিনেই শেষ হবে। ঋতেন্দ্র ঠাকুরের বিরুদ্ধে। (বোধ করি একটু অতিরিক্ত তীব্র হয়ে গেছে) ফাল্গুনের 'সাহিত্যে' তিনি উড়িয়ার খোন্দ জাতি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন, সেটা আগাগোড়াই ভুল। প্রত্নতত্ত্ব যা-তা লেখা না হয় (নাম বাজাবার জন্য), এইটাই আমার সমালোচনার উদ্দেশ্য, ঠিক জানি না ঋতেন্দ্র ঠাকুরের সহিত 'যমুনা'র কিরূপ সম্বন্ধ—যদি বিবেচনা করেন, ছাপাবেন, না হয় 'সাহিত্যে' দেবেন[১]। না, সে গল্প আজিও পাই নি। নিরুপমা দেবীর কোনো লেখা পেলেন কি? তাঁকে একটা কিছু ভার দিতে যদি পারেন তা হলে তো খুব ভাল হয়। অবশ্য সৌরীনবাবু যদি আমার অবর্ত্তমানে আমার ভার নেন তা হ'লে ভালই হয়, কিন্তু আমার বোধ হয় নিরুপমাও অনেকটা ভার নিতে পারে। সুরেন, গিরীন, উপীনও। তবে প্রবন্ধ লিখতে এরা পারবে কিনা জানি না। প্রবন্ধ লিখতে একটু পড়াশুনা থাকলে ভাল হয়—কেন না তাতে মনে জোর থাকে। গল্পটল্প এঁরা যদি লেখেন আমি তা'হলে শুধু প্রবন্ধ নিয়েই থাকতে পারি। গল্প লেখা তেমন আসেও না, বড় ভালও লাগে না। বয়স হয়েচে, এখন একটু চিন্তাপূর্ণ কিছু লিখতে সাধ হয়। আমার গল্প লেখা অনেকটা জোর ক'রে লেখা। জোর-জবরদস্তির কাজ তেমন মোলায়েম হয় না। প্রমথর শেষ চিঠিটা এই সঙ্গে পাঠালাম। আমার নাম যে 'অনিলা দেবী' কেউ যেন না জানে। প্রমথ নাকি 'আমি' আন্দাজ ক'রে D. L. Royকে বলেচে। তাকে কড়া চিঠি লিখব।

আপনার কাগজ আমি নিজের কাগজ মনে করি। এর ক্ষতি ক'রে কোন কাজ করব না। শুধু প্রমথকে নিয়েই একটু গোলে পড়েচি—সেও acquaintance নয়, পরম বন্ধু। চিরদিনের অতি স্নেহের পাত্র। তাহাতেই একটু ভাবিত হই, না হ'লে আর কি। প্রমথর চিঠি থেকে অনেক কথাই টের পাবেন। এখন জ্বর ১০২·৫। জ্বর রেঙ্গুনে হয় না—কিন্তু আমার জ্বর হয় অন্য কারণে। বোধ করি হার্ট সংক্রান্ত, general health এ-দেশের ভালই, তবে আমার সহ্য হচ্চে না।

ইতি—আঃ শরৎ

১। সমালোচনাটি 'কানকাটা' নামে শ্রীমতী অনিলা দেবীর ছদ্মনামে ১৩২০ সালের আষাঢ় সংখ্যা যমুনাতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

14, Lower Pozoungdoung Street,
Rangoon, 10. 5. 1913.

ফণীবাবু—আপনার তার পাইয়া জবাব দিই নাই। কারণ জবাব দিবার ঠিক জিনিসটা আমার হাতছাড়া। তবে আশা করি শীঘ্র হাতে আসিবে।

আগামী মেলে সমালোচনা, 'নারীর মূল্য' পাঠাইব। পরের মেলে 'চন্দ্রনাথ' ও একটা যা হয় কিছু। 'চরিত্রহীন' যাতে যমুনায় বার হয় তাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাই হবে। নিশ্চিন্ত হোন। তবে শুনিতেছি, ওটাতে 'মেসের ঝি' থাকাতে রুচি নিয়ে হয়ত একটু খিটিমিটি বাধিবে। তা বাধুক। লোকে যতই কেন নিন্দা করুক না, যারা যত নিন্দা করিবে তারা তত বেশী পড়িবে। ওটা ভাল হোক মন্দ হোক একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়িতেই হইবে। যারা বোঝে না, যারা artএর ধার ধারে না তারা হয়ত নিন্দা করিবে। কিন্তু নিন্দা করলেও কাজ হবে। তবে ওটা Psychology এবং analysis সম্বন্ধে যে খুব ভাল তাতে সন্দেহই নেই। এবং একটা সম্পূর্ণ Scientific Ethical Novel! এখন টের পাওয়া যাচ্ছে না। আঃ শরৎ—

রেঙ্গুন, ১৪-৬-১৩

প্রিয়বরেষু—আমার সংবাদ যে আপনার মাতৃদেবী গ্রহণ করেন, আমার এ বহু সৌভাগ্যের কথা, আমি বেশ সুস্থ হইয়াছি তাঁহাকে জানাইবেন। আমার সংবাদ লইবার লোক সংসারে প্রায় নাই, সেই জন্য কেহ আমার ভাল-মন্দ জানিতে চাহেন শুনিলে কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠি। আমার মত হতভাগ্য সংসারে খুবই কম।...উপকার করিতেছি, যশ মান স্বার্থ ত্যাগ করিতেছি ইত্যাদি বড় বড় ভাব আমার কোনও দিনই নাই। কোনো দিন ছিল না আজও নাই, এটা আর বেশি কথা কি? যশের কাঙাল হইলে সেই রকম হয়ত ইতিপূর্ব্বেই চেষ্টা করিতাম, এতদিন এমত চুপ করিয়া থাকিতাম না।...আরো একটা কথা এই যে, শতধারী চণ্ডীপাঠক হইতে আমার লজ্জাও করে। একটা কাগজে নিয়মিত লিখি এই যথেষ্ট। যে আমার লেখা পড়িতে ভালবাসে সে এই কাগজই পড়িবে এই আমার ধারণা। তা ছাড়া হোমিওপ্যাথী ডোজে এতে একটু ওতে একটু, অশ্রদ্ধা ক'রে, যা তা ক'রে, তর্জ্জমা ক'রে, পরের ভাব চুরি ক'রে—এ সব ক্ষুদ্রতা আমার ছেলেবেলা থেকেই

নেই। আর এত লিখিতে গেলে পড়াশুনা বন্ধ করিতে হয়, সেটা আমার মৃত্যু না হইলে আর পারিব না।...আমার ছোট গল্পগুলা কেমন যেন বড় হইয়া পড়ে এটা ভারী অসুবিধার কথা। আরো এই যে আমি একটা উদ্দেশ্য লইয়াই গল্প লিখি, সেটা পরিস্ফুট না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িতে পারি না। "বিন্দুর ছেলে" আমি ভাবিয়াছিলাম আপনার পছন্দ হইবে না, হয়ত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন। তাই পাছে আমার খাতিরে, অর্থাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রকাশ করেন, এই আশঙ্কায় আপনাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দিতেছিলাম। অর্থাৎ sincere হওয়া চাই—যদি সত্যিই আপনার ভাল লাগিয়া থাকে, ছাপাইয়া ভালই করিয়াছেন—তাতে পাঠক যাই বলুক। "নারীর মূল্য" আগামীবারে শেষ করিয়া আর একটা শুরু করিব। "নারীর মূল্যের বহু সুখ্যাতি হইয়াছে। আমি মনে করিয়াছি ১০টা মূল্য ঐ রকমের লিখিব। এবারে হয় প্রেমের মূল্য, না হয় ভগবানের মূল্য লিখিব। তার পরে ক্রমশঃ ধর্ম্মের মূল্য, সমাজের মূল্য, আত্মার মূল্য, সত্যের মূল্য, মিথ্যার মূল্য, নেশার মূল্য, সাংখ্যের মূল্য, ও বেদান্তের মূল্য লিখিব।... 'চরিত্রহীন' মাত্র ১৪।১৫ চ্যাপ্‌টার লেখা আছে, বাকীটা অন্যান্য খাতায় বা ছেঁড়া কাগজে লেখা আছে, কপি করিতে হইবে। ইহার শেষ কয়েক চ্যাপটার যথার্থই grand করিব। লোকে প্রথমটা যা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু তাহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইবেই। আমি মিথ্যা বড়াই করা ভালবাসি না এবং নিজের ঠিক ওজন না বুঝিয়াও কথা বলি না, তাই বলিতেছি, শেষটা সত্যই ভালো হইবে বলিয়াই মনে করি। আর moral হোক immoral হোক, লোকে যেন বলে, "হ্যাঁ একটা লেখা বটে।" আর এতে আপনার বদনামের ভয় কি? বদনাম হয় ত আমার। তা ছাড়া কে বলিতেছে আমি গীতার টীকা করিতেছি? 'চরিত্রহীন' এর নাম!—তখন পাঠককে ত পূর্ব্বাহ্নেই আভাস দিয়াছি—এটা সুনীতিসঞ্চারিণী সভার জন্যও নয়, স্কুলপাঠ্যও নয়! টলস্টয়ের 'রিসরেক্‌শন্‌' তাহারা একবার যদি পড়ে তাহা হইলে 'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না। তা ছাড়া ভাল বই, যাহা art হিসাবে—Psychology হিসাবে বড় বই, তাহাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকিবেই থাকিবে। কৃষ্ণকান্তের উইলে নাই?...টাকাই সব নয়, দেশের কাজ করা দরকার; পাঁচ-জনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায়, গোঁড়ামির অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়, তার চেয়ে আনন্দের বস্তু আর কি আছে? আজ লোকে আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের কথা না শুনিতে পারে, কিন্তু একদিন শুনিবেই।...একদিন এই সঙ্কল্প করিয়াই আমি সাহিত্যসভা গড়িয়াছিলাম, আজ আমার সে সভাও নাই, সে জোরও নাই!

[শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা]

54, 36th Street, Rangoon, 15-11-15

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র যথা সময়ে পাইয়াছিলাম। জ্বর হইয়াছিল বলিয়া জবাব দিই নাই। এখন ভাল হইয়াছি। আমার বিজয়ার আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষা জানিবেন।

"শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী" যে সত্যই ভারতবর্ষে ছাপিবার যোগ্য আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না। তবে যদি কোথাও কেহ ছাপে এই মনে করিয়াছিলাম। বিশেষ তাহাতে গোড়াতেই যে সকল শ্লেষ ছিল সে সকল যে কোন মতেই আপনার কাগজে স্থান পাইতে পারে না সে ত জানা কথা। তবে, অপর কোন কাগজের হয়ত সে আপত্তি না থাকিতে পারে, এই ভরসা করিয়াছিলাম। সেইজন্যই আপনার মারফতে পাঠানো।

যদি বলেন ত আরও লিখি—আরও অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে। তবে ব্যক্তিগত শ্লেষ বিদ্রূপ ঐ পর্য্যন্তই! তবে শেষ পর্য্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে।

আমার নামটা যেন কোন মতে প্রকাশ না পায়।[১] এমন কি আপনি ছাড়া, উপেনবাবু ছাড়া (তাঁর ত মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না—তা ভালই হোক মন্দই হোক) আর কেহ না জানে ত বেশ হয়। ওটা কি? অবশ্য শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই, তাছাড়া ওটা ভ্রমণই বটে। তবে 'আমি' 'আমি' নেই। অমুকের সঙ্গে শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়াছি, অমুকের গা ঘেঁসিয়া বসিয়াছি—এসব নেই। বাস্তবিক 'তিনমাস' যে ত্রিশ বছরের ধাক্কা লইবার উপক্রম করিল।[২] অথচ কি নীরস! কি কটু! আপনি দুঃখিত হবেন না—এইটা শুধু আমার নয় অনেকেরই মত। মহারাজের[৩] ওটায় ত এর শতভাগের একভাগও আত্মম্ভরিতা নেই। তাতে 'আমি'ও যেমন আছে, 'তুমি'ও তেমনি আছে—'ওরা' 'তারা'ও বাদ যায় নাই। রবিবাবু নিজের আত্মকাহিনী লিখিয়াছেন, কিন্তু নিজেকে কেমন করিয়াই না সকলের পিছনে ফেলিবার সফল চেষ্টা করিয়াছেন। যাহারা লিখিতে জানে না,

---

১। 'ভারতবর্ষে' "শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী" প্রথমে শরৎচন্দ্রের ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

২। শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী লিখিত "য়ুরোপে তিনমাস"। তিনমাসের কাহিনী বহুমাস ধরে প্রকাশিত হচ্ছিল বলে শরৎচন্দ্র এই উক্তি করেছিলেন।

৩। বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চন্দ্ মহাতাবও এই সময় ভারতবর্ষে "আমার য়ুরোপ ভ্রমণ" লিখছিলেন।

অর্থাৎ যাহাদের লেখার পরখ হয় নাই, তা তাহারা যত বড় লোকই হোক, না জানিয়া তাহাদের দীর্ঘ লেখা ছাপিবার অনেক দুঃখ। ইহারা মনে করে সব কথাই বুঝি বলা চাই-ই। যা দেখে, যা শোনে, যা হয়, মনে করে সমস্তই লোককে দেখানো শোনানো দরকার। যারা ছবি আঁকতে জানে না, তারা যেমন তুলি হাতে করিয়া মনে করে যা চোখের সামনে দেখি সবই আঁকিয়া ফেলি। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে-ই শেষে টের পায়, না তা নয়। অনেক বড় জিনিস বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না বলা, না আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।

বাঃ এ যে আপনাকেই লেক্‌চার দিচ্ছি! মাপ করবেন—এ সব আমার চেয়ে আপনি নিজেই ঢের বেশি জানেন—সে আমি খুব জানি। যাই হোক 'শ্রীকান্ত' পড়ে লোকে কি রকম ছি ছি করে দয়া করে আমাকে জানাবেন। ততদিন 'শ্রীকান্ত' একটি ছত্রও আর লিখব না।

আমি আবার একটা গল্প লিখেচি। অর্থাৎ শেষ করব বলে লিখচি। ভালই হবে। Comedy হবে Tragedy নয়। যত শীঘ্র শেষ হয়।

এ গল্পটা 'গোরার' পরেশবাবুর ভাব নেওয়া। অর্থাৎ নিজেদের কাছে বলতে অনুকরণ। তবে ধরবার জো নেই। সামাজিক পারিবারিক গল্প। আমার ত মনে মনে বড় উৎসাহ হয়েচে যে চমৎকার হবে। তবে কি থেকে যে কি হয়ে যাবে বলবার জো নেই।

প্রমথ চলে গেছে কি? আমি অনেক দিন তার চিঠি পাইনি। সে যে ভাল হচ্চে, এই আমাদের ভাগ্য। বাস্তবিক, সত্য কথা বলতে অমন বন্ধু আর হয় না। বন্ধু বলতে ত এই! ও যদি না বাঁচে আমার ত মনে হয় আমার 'বন্ধু'র দিকটা যথার্থই খালি পড়ে যাবে।

আপনার পিতাঠাকুরের খবর কি? কেমন আছেন আজকাল? আচ্ছা 'যমুনা' আজকাল কি চলে? ফণী নাকি বই ছাপিয়েচে? সে বলত আপনার এক একটা গল্প আমি ৩০।৪০ বার পড়ে মুখস্থ করে ফেলি। আপনার লেখাই আপনার আদর্শ। অথচ এমনি গুরুভক্তি যে একখানা বইও পাঠালে না। আমি তার সব লেখাই পড়েচি এবং সে সব লেখা যে কি সে ত আমার চেয়ে আর কেউ বেশি জানে না। অবশ্য নানা কারণে আমিও তার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখি নাই। যাক পর-চর্চ্চায় কাজ নেই।

গতমাসের 'ভারতবর্ষ' তেমন ভাল হয় নাই। সমস্তই মেয়েদের লেখা—নতুন

কাণ্ড বটে কিন্তু worth হিসাবে অন্যান্য বারের চেয়ে নীচে। সে ত হবারই কথা। কিন্তু একটা কাজ হয়েচে—file অনেকটা clear হয়েচে, না?

আপনি আমাকে 'চৈতন্য চরিতামৃত' পড়িতে দিয়াছিলেন—সেগুলি আমি ফিরাইয়া দিই নাই—আসিবার সময় মনেই হয় নাই—তারপরে সেগুলি এখানে চলিয়া আসিয়াছে। পুলিশে ঘাঁটাঘাটি করিয়া তাহাদের (আমার সব বইগুলিরই) এমন অবস্থা করিয়া দিয়াছে যে বিক্রী হওয়া শক্ত। মলাটে কিসের দাগ লাগিয়াছে—এগুলির অনেক দাম এবং পরের বই—আমি অতিশয় লজ্জিত হইয়া আছি, কিন্তু কোন রকম উপায় দেখি না। এ ছাড়া আরও অনেকগুলি বৈষ্ণবগ্রন্থ পড়িতে দিয়াছিলেন। সমস্ত বইগুলি যে কতবার পড়িয়াছি (এমনকি রোজই প্রায় পড়ি) তা বলতে পারি না। এগুলিও ফিরাইয়া দিবার কথা ছিল। আপনাকে অনেক রকমেই ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছি, তাই হঠাৎ এগুলির দাম বলিয়া দিতেও ইচ্ছা হয় না। বইগুলি বরং আমাকে দান করুন। আমি অনেক আশীর্ব্বাদ করিব। এবং ভবিষ্যতেও প্রত্যহ এই কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া লজ্জা পাইব না।

উপেনবাবু, জলধরদাকে আমার কথাটা স্মরণ করাইয়া দিবেন। বহুকাল পূর্ব্বে জলধরদার (শ্রীজলধর সেন) একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহার জবাব দিয়াছিলাম কিনা মনে হয় না। যাই'হোক সেজন্য তিনি পথ চাহিয়াও নাই তাও জানি।

আপনাদেরই

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

54, 36th Street, Rangoon

22-2-16

করকমলেষু,

অনেক দিন আপনার পত্র পাই নাই। আশা করি সমস্ত ভাল। ভায়া আমি এবার বড়ই বিপদেপড়িয়াছি। সুদূর হইতে প্রমথ ভায়ার বাতাস লাগিল[১] না কি হইল বুঝিতে পারিতেছি না। এ আবার আরও খারাপ। এ শুনি বর্ম্মা দেশের ব্যায়রাম—দেশ না ছাড়িলে কোন দিন এও ছাড়ে না। তাই দুয়ের এক বোধ করি অনিবার্য্য

১। প্রমথবাবু স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কিছুদিন ছত্রপুরে গিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ায় তিনি ছত্রপুর ছেড়ে উত্তর প্রদেশের ভাওয়ালী সেনিটোরিয়ামে যান। পরে ঐখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হইয়া উঠিতেছে। কি জানি, ভগবানই জানেন। ভয় হয়, হয়ত বা চিরজীবন পঙ্গু হইয়াই বা যাইব। এই সম্ভবনা মনে করিতেও যেন পারি না। যাহাকে যথার্থই বলে ভয়ে 'পেটের ভাত চাল' হইয়া যাওয়া, আমার তাই হইয়াছে। সুতরাং Dispepsiaও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। হইবার কথাও বটে। কারণ, খাও দাও, স্নান কর, লেখাপড়া কর কিন্তু চলিয়া বেড়াইবার বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলে হজম হওয়াও বন্ধ হইয়া আসে। ডান পায়ের হাঁটুর নীচে হইতে পায়ের আঙুল পর্য্যন্ত সে এক প্রকাণ্ড কাণ্ড। অথচ গোদ নয়—কি যে ডাক্তারেরা তাহাও বলিতে পারে না—কতদিনে সারিবে কিংবা কোন দিন সারিবে কিনা এখবরও তারা দিতে পারেন না। দুদিন বা কিছু কমে দুদিন বা ঠিক তেমনি হইয়া দাঁড়ায়। গতবারে যখন লিখি, তখন এইরূপ কমিবার মুখে আসিতেছিল বলিয়া খুব একটা আশা হইয়াছিল, কিন্তু তার পরেই আবার যখন ধীরে ধীরে তেমনি হইয়া উঠিতে লাগিল তখন আশা ভরসা সব গেল। এই মানসিক চঞ্চলতা বশতঃ কিছুই কাজ করিতে ইচ্ছা হয় নাই। এই কথাটি জলধর দাদাকে (জলধর সেন) জানাইয়া এই "সমাজ ধর্ম্মের মূল্য" পড়িতে দিবেন। ইহার fair copy করা এইটুকু মাত্র পারিয়াছিলাম —বাকী লেখাটা fair করিয়া পরে পাঠাইতেছি। তারপর যাহা লিখিব মনে করিয়াছি তাহা শুদ্ধ মাত্র অপরাপর দেশের সামাজিক নিয়ম কানুনের সহিত আমাদের দেশের সমাজের একটা তুলনামূলক সমালোচনা ছাড়া আর কিছু না, সুতরাং সেদিকে কোনরূপ ব্যক্তিগত সমালোচনার ভয় নাই। জানি না এ প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' ছাপাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কি না, কিন্তু যদি না হয়, এটা আপনি ফেরৎ পাঠাইবেন, আমি ধীরে ধীরে সমস্তটা লিখিয়া একটা পুস্তকের মত করিয়া রাখিব। এবং ভবিষ্যতে ইহার ব্যক্তিগত অংশগুলি বাদ দিয়া ছাপাইবার চেষ্টা করিব। বাস্তবিক ভায়া এই Sociology লইয়া বহুদিন কাটাইয়াছি—অনেক কথা বলিবার জন্য প্রাণটা যেন আন্‌চান্‌ করে। অথচ, কি করিয়া যে এ সকল বেশ ভদ্র লোকের মত বলা যায় তাও ঠিক করিতে পারি না!

আপনি যদি এইটুকুর শেষ দিকটা একবার পড়িয়া দেখিতে পারেন আর Suggest করিয়া দিতে পারেন যে কি করিয়া কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিলে কাহারও গায়ে লাগিবে না, অথচ, সব কথাগুলি বলাও যাইতে পারিবে, আমি সেইরূপ করিবার একটা চেষ্টা করিব। তবে আরও যেটুকু লেখা আছে, সেটুকু পাঠাইবার পরেই মতামত দিবেন। জলধরকে অনেক আশা দিয়েছিলাম, কিন্তু গল্প লেখা মানসিক সুস্থিরতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি অদৃষ্ট আমার চিরকালের মত ভাঙিয়াও থাকে তাহাও যদি ঠিক জানিতে পারি তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই

মহা দুঃখ বোধ করি সহিয়া যাইবে। হয়ত বা তখন এই পত্র হওয়াটাকেই ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনেও করিব এবং স্থিরচিত্তে গ্রহণ করিতেও পারিব। আমার এই কাঠির মত শরীরে এইরূপ একটা ব্যামো যে কখনও সম্ভব হইতে পারিবে তাহাও মনে করি নাই। আর তাই যদি হয়—হয়ত বা শেষে ইহারই আমার আবশ্যকতা ছিল! ছেলেবেলায় ভগবানকে বড় ভালবাসিতাম মাঝে বোধ করি সম্পূর্ণ হারাইয়াছিলাম, আবার শেষ বয়সে যদি তিনিই দেখা দিতে আসেন—তাই ভাল।

মনের অস্থিরতায় অনেক বাজে কথা লিখিয়া ফেলিলাম। মাপ করিয়া চিঠিখানি পড়িবেন এই ভরসা।

আর একবার প্রমথ ভায়ার খবরটা মনে করিয়া আমাকে জানাইবেন।

আপনাকে আন্তরিক শত সহস্র আশীর্ব্বাদ করিলাম।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জলধরদাকে বলিবেন—যাহা আরম্ভ করিয়াছি অর্থাৎ 'শ্রীকান্ত' শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হঠাৎ বন্ধ কিছুতেই হইবে না।

['ভারতী' পত্রিকার লেখক শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা]

14, Lower Pozoungdoung Street,
Rangoon. 7. 1. 14,

প্রিয় মণিবাবু—অনেক দিন হইয়া গেল আপনার চিঠির জবাব দিই নাই। এই ত্রুটির জন্য নিজেই লজ্জিত হইয়া আছি, ইহার উপর আপনি আর যেন কিছু মনে করিবেন না।

আপনার লেখার সমালোচনা শুনিয়া আপনি যে দুঃখিত হন নাই, একথা আপনার নিজের মুখে শুনিয়া বড় স্বস্তি পাইলাম। মাঝে মাঝে ভাবিতাম, আমার নিজের ত এই বিদ্যা, অপরের দোষ দেখাই, হয়তো বা তিনি কি ভাবিয়াছেন। যাক্—বড় সুখী হইয়াছি।

আমি তার পরেও আপনার বইটা আর একবার আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম, সত্যই খুব ভাল লাগিয়াছে—এবার আরও যেন একটু বেশি করিয়া বুঝিয়াছি, কেন, এ লেখা সকলের আমার মত ভাল লাগে না। যথার্থই আপনার লেখার tone-টা কবির মত। Abstract ভাবের কবিতা যে-সব লোকের ভাল লাগে না, তাদেরই আপনার লেখা ভাল লাগে না একথা নিশ্চয় বলিতে পারি।

যে-সব কবিতায় বা ছোট গল্পে অনেক fact আছে, ঘটনা আছে, ভাবটা নিতান্ত সাদাসিদা সাংসারিক, আমি দেখিয়াছি বেশি লোকেরই তা ভাল লাগে, তারা সেটা বোঝে ভাল, কেন না বোঝা সহজ। এইখানে আরো একটা কথা বলি। অনেকদিন পূর্ব্বে 'বসুমতী' কাগজে আপনার 'বিন্দুর' সমালোচনা (?) করিয়া বলে, "হিন্দুর বিধবার রাত্রে আর এক বাড়িতে যাওয়া, কি রুচি, ইত্যাদি ইত্যাদি।" (আমার এক বন্ধু এই সমালোচনার কথাটা আমাকে জানান—আমি নিজে ঠিক কথাগুলা দেখি নাই।) সেইটা শুনিয়া একবার আমার মনে হয় এই লোকটার স্পর্দ্ধার মত আমিও একটা কঠিন প্রতিবাদ করিয়া কোন কাগজে ছাপাইয়া দিই—আমার মনে হইয়াছিল বলিব এবং খুব কড়া করিয়াই বলিব, "লেখকের রুচি খুব ভাল, শুধু তুমি গোঁড়া এবং নির্ব্বোধ তাই ইহাতে দোষ দেখিয়াছ"। বিন্দুর অপরাধটা যে কি আমি তাহা ত কোন মতেই ভাবিয়া পাইলাম না। সে বেচারা আর একটা নিতান্ত নিরুপায় হতভাগা সঙ্গীকে রাত্রিতে লুকাইয়া দেখিতে গিয়াছিল, যদি আবশ্যক হয়, এক ফোঁটা মুখে জল দিবে কিংবা এমনি একটা কিছু করিবে এই ত। এতেই মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গেল। হয়ত বা মনে মনে একটু স্নেহও করিত—খেলার সঙ্গী—ইহা কি দোষের না রুচিবিগর্হিত? কারণ, সে বিধবা—অর্থাৎ, হিন্দুর বিধবার সুমুখে কেউ যদি মরে আর সে যদি একটা আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিলেও সে বাঁচে, হিন্দু বিধবা তাও যেন না করে—যেহেতু সে বিধবা এবং যে লোকটা মরিতেছে সে পরপুরুষ! এই ইহাদের হিন্দু বিধবার আদর্শ!

মনে হয়, লোকগুলা এতটাই সঙ্কীর্ণ মন লইয়া পরের দোষ দেখাইবার স্পর্দ্ধা করে এবং দেখায়, এবং লোকে সেই সমালোচনা পড়িয়া বলে, "ঠিক ত! ঠিক কথাই বলিয়াছে।"

আমি ঠিক বলিতে পারি না সমালোচনা কিরূপ ছিল, যেমন আমার বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি সেইমত বলিলাম। আপনি নিজে হয়ত এই সমালোচনা দেখিয়াছেন।

আবার কতকগুলো পাঠকে মনে করে, যেখানে সেখানে জপতপ আর সন্ন্যাসী আর হিন্দু ধর্ম্মের বড় বড় কথা না থাকিলে সে গল্প বা উপন্যাস কোন মতেই ভাল হইতে পারে না।

আপনি লিখুন দেখি কোন বিধবার বিবাহ হইয়াছে—আপনার আর রক্ষা থাকিবে না—মার্ মার্ শব্দ করিয়া সব ছুটিয়া আসিবে। আর এই লোকগুলা নিতান্ত বেহায়া গালিগালাজ করিতে বিশেষ পটু, সেইটাই ইহাদের জোর—অর্থাৎ এরা চীৎকার করিয়া এবং গায়ের জোরে জিতিবার চেষ্টা করে এবং জিতিয়াও যায়।

দিন দিন আমাদের সাহিত্য যেন একেবারে একছাঁচে ঢালা গোছ হইয়া উঠিতেছে—প্রতি দিন সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া উঠিতেছে। (তাই এক এক-বার আমার মনে হয়, উচ্ছৃঙ্খল লেখা লিখিতে শুরু করিয়া দিব—কেবল রাগের উপরেই যা-তা লিখিয়া ফেলিব!) আমি কিছুদিন পূর্ব্বে আমার দিদির নামে "নারীর মূল্য" বলিয়া একটা প্রবন্ধ লিখি। আমার দিদি ব্যাপারটা আমাকে চিঠিতে লিখিয়া পাঠান আমি সেইটাকে বড় করিয়া লিখি। এজন্য আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবেরা কত যে আমাকে চোখ রাঙাইয়াছেন। তাহা লিখিয়া জানান যায় না। কেহ কেহ এমনও বলিয়াছেন, আমি ম্লেচ্ছভাবাপন্ন—ঠিক হিন্দু নই। অথচ হিন্দু ধর্ম্মকে একতিলও কটাক্ষ করি নাই, ইহার গোঁড়ামিকে আক্রমণ করিয়াছিলাম মাত্র। কত লোকে কত সমালোচনা (ভয়ানক প্রতিবাদ) করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন, অথচ আজ পর্য্যন্ত কেহই কিছু করিলেন না। সেই সময়ে আমার এক মামা চিঠি লিখিলেন আমি মনে মনে ব্রাহ্ম বাহিরে হিন্দু। অথচ, আমার গলায় তুলসীর মালা আছে, সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করি না, যার তার হাতে জল পর্য্যন্ত খাই না। (কিছু মনে করিবেন না মণিবাবু, আপনার কাছে এ-সব বলা অন্যায়।) আমি যা তাই শুধু আপনাকে বলিলাম। এ-সব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আমাকে কত যে গালিগালাজ করিলেন এবং আমি ভড়ং করি বলিয়া শাসাইয়া ছিলেন তাহা আর কত লিখিব। তার পরেই পীড়িত হইয়া পড়িলাম, না হইলে ইচ্ছা ছিল, ঐ রকম করিয়া "ঠাকুর দেবতার মূল্য" এবং "হিন্দু শাস্ত্রের মূল্য" বলিয়া প্রবন্ধ শুরু করিব। যাক্ নিজের কথাতেই চিঠি পূর্ণ করিয়া দিলাম—কেমন আছেন? শরীর সারিল কি? নূতন কিছু লিখিলেন? হাঁ ভাল কথা, যা লিখিবেন শেষটায় অস্থির (impatient) হইয়া শেষ করিবেন না—এইখানে বোধ করি আপনার দোষ হয়। —আপনার শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

একটা অনুরোধ, যাহাই এই চিঠিতে লিখিয়া থাকি না কেন দোষ লইবেন না—যদি বা কিছু অন্যায় বলিয়াও থাকি তাহা হইলেও।

পুঃ—আপনার ভাষায় দু-একটা তুচ্ছ খুঁত লইয়া প্রায়ই লোকজনকে হৈ চৈ করিতে দেখি। অবশ্য আমি নিজে আপনার (ওই খুঁতগুলার) মত লিখি না, কিন্তু দোষও দেখি না। আপনি জানিয়া শুনিয়াই ঐ ভাষা এবং বানান লিখিতেছেন—বেশ করিতেছেন। যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছেন—শুধু পরের কথায় ছাড়িবেন না। আর যদি নিজে দেখেন ওগুলা বদলানো আবশ্যক, তখন বদলাইবেন।

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়কে লেখা]

14, Lower Pozoundoung Street,

Rangoon, 20-3-14,

প্রিয় হেমেন্দ্রবাবু—মাঝে অনেকদিন রেঙ্গুনে ছিলাম না, দিন কয়েক পূর্ব্বে ফিরে এসে আপনার চিঠি পাই। গত মেলেই সে চিঠির জবাব দেওয়া আমার উচিত ছিল, কিন্তু দেহটা সে সময় এতই মন্দ ছিল যে, পাছে অসঙ্গত কিছু লিখে বসি, এই আশঙ্কায় জবাব দিই নাই। কিছু মনে করিবেন না। শরীরের জন্য আমার সব সময়ে সহজ ভদ্রতাটুকু পর্য্যন্ত রেখে চলা শক্ত হয়ে পড়ে। তবে, ভরসা এই যে আমি বুড়ো মানুষ,[১] আপনার কাছে সব সময়েই ক্ষমার্হ।

'চরিত্রহীন' বোধ করি আগামী বর্ষের মাঝামাঝি নাগাদ শেষ হবে। সে ঠিক কথা,—শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণ পাঠক কিভাবে ও-বস্তুটাকে গ্রহণ করবেন আন্দাজ করা যায় না। আমার লেখার ওপর আপনার অনুগ্রহ দেখে সত্যই বড় সুখী হয়েছি। অনেকেই অনুগ্রহ করেন বটে, কিন্তু, লেখা আমার নিতান্তই মামুলি ধরণের। বিশেষতঃ, আর কি আছে? তবে, এটা ঠিক করে রাখি যেন মনের সঙ্গে লেখার সঙ্গে ঐক্য থাকে। যা ভাবি, তাই যেন লিখি। এ কি মনে করবে, ও কি বলবে, সেদিকে প্রায়ই তাকাইনে। বোধ করি এই জন্যেই লোকের মাঝে মাঝে ভাল লাগে—কখন বা লাগেও না, তবুও বড় একটা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে লেখককে অপমান করতে চায় না। আপনার লেখার বিশেষত্ব আছে। আমার খুব ভাল লাগে। অনেকদিন পূর্ব্বে ফণীকে বলে পাঠাই যেন সে আপনার অনুগ্রহটা বেশী করে আদায় করবার বিশেষ চেষ্টা করে। আমার বাঙলা ভাষার ওপর মোটেই দখল নেই বললে চলে—শব্দ সঞ্চয় খুব কম। কাজেই আমার লেখা সরল হয়—আমার পক্ষে শক্ত করে লেখাই অসম্ভব। আমার মূর্খতাই আমার কাজে লেগেছে। আচ্ছা, ভারতবর্ষে 'হরিদ্বার' প্রভৃতি ভ্রমণবৃত্তান্তে 'হেমেন্দ্রনাথ রায়' স্বাক্ষর করা ছিল, সেকি আপনিই? এ কথাটার জবাব দেবেন।

১। এই সময় শরৎচন্দ্রের বয়স মাত্র ৩৮ বছর।

মাঝে মাঝে সময় পেলে সংবাদ দেবেন। আপনার চিঠিটা যে কোথায় রেখেছি, খুঁজে পেলাম না, তাই ফণীর ঠিকানায় পাঠালাম। হয়ত সব কথা জবাব দেওয়া হল না। শরীরটাও বড় দুর্ব্বল ঠেকচে। আজ এই পর্য্যন্ত—পর-পত্রে অপরাপর কথা জানাব। আমার অনেক কথাই বলবার আছে।

ফণীকে এবং 'যমুনা'কে একটু দেখবেন। আপনি যদি সত্যিই দেখেন, আমার তাহলে অর্দ্ধেক ভাবনা কমে যায়। এটা আমার আন্তরিক কথা—মন-যোগানো নয়। মন-যোগানো কথা বড় একটা বলিওনে।—আপনাদের অনুগ্রহকাঙ্ক্ষী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[চুঁচুড়ানিবাসী সাহিত্যিক শ্রীসুবোধ রায়কে লেখা]

54, 36th Street, Rangoon
10-3-16

পরম কল্যাণবরেষু,

আমি বৃদ্ধ বলিয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আমার সহিত পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, ইহাকে পরম সৌভাগ্য জ্ঞান না করিয়া ধৃষ্টতা মনে করিব, এত বড় উঁচু মন আমার নেই।

তবে, আপনার চিঠির জবাব দিতে বিলম্ব হইয়াছে। তাহার প্রথম কারণ, আজকাল ১২।১২ দিনের মধ্যে মেল থাকে না। দ্বিতীয় কারণ, আমি বড় পীড়িত।

অবশ্য আমার এ বয়সে আর অসুখ-বিসুখের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা শোভা পায় না, তবু প্রাণের মায়াটা ত কাটিতে চায় না—তাই মাঝে মাঝে মনে হয় আর কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া চল্লিশের ওপারে গিয়া এ-সব ঘটিলেই সব দিকেই দেখিতে ভাল হইত। নিজের মনটাও আর খুঁত খুঁত করিতে পারিত না। কিন্তু সে কথা থাক্।

'পল্লীসমাজ' আপনার মন্দ লাগে নাই, বরং ভালই লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাল্য এবং যৌবন কালটার অনেকখানি পাড়াগাঁয়েই আমার কাটিয়াছে। গ্রামকেই বড় ভালবাসি। তাই দূরে বসিয়াও যে দুই চারিটা কথা মনে পড়িয়াছে তাহা লিখিয়াছি, স্মরণশক্তিও আর বুড়া বয়সে নাই—তবুও যে কতক কতক মিলিয়াছে, এ আমার বাহাদুরী বই কি। তবে কিনা পাড়াগাঁয়ের লোকে যদি নিজের মনের সহিত মিলাইয়া লইয়া সত্য কথাগুলাই বলিবার চেষ্টা করে, তাহা

হইলে কথাগুলা চলনসই প্রায়ই হয়। অন্ততঃ ভুলচুক তত হয় না, যত কলিকাতা বাঁ সহরের বড়লোকে কল্পনা করিয়া বলিতে গেলে হয়।

তার পরে প্রতিকারের উপায়। উপায় কি, সে পরামর্শ দিবার সাধ্য কি তোমার আছে? সে অনেক শক্তি, অনেক অভিজ্ঞতার কাজ। আমার মুখ দিয়া সে-কথা বাহির করা কতকটা ধৃষ্টতা নয় কি? তবুও মনের ঝোঁকে মাঝে মাঝে বলিয়াও ফেলিয়াছি ত! যেমন, প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞান বিস্তারে। আর যারা প্রতিকার করিতে চায়, তাহাদের মানুষ হইতে হইবে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে গিয়া, বিদেশে বাহির হইয়া। কিন্তু কাজ করিতে হইবে গ্রামে বসিয়া এবং গ্রামের ভাল-মন্দ সকল প্রকার লোকের সহিত ভাল করিয়া মিল করিয়া লইয়া—তবে। এইটা বড় দরকারী জিনিস। এই ধরণের দুটা চারটা কথা।

বিশ্বেশ্বরীর কথাগুলা হয়ত আপনার তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। —যদি আপনার ধৈর্য্য রাখা সম্ভবপর হয়, আর একবার তাঁর কথাগুলায় চোখ বুলাইয়া লইলে যেগুলা প্রথমে নজর পড়িতে পারে নাই, দ্বিতীয় বারে হয়ত চোখে লাগিতেও পারে। তবে এ কথাও সত্য যে, চোখ পড়িলেও সে-সব কথার এমন কিছু সত্যকার মূল্য নাই, যার জন্য আর একবার পড়িয়া সময় নষ্ট করা যাইতে পারে। সেটা আপনার ইচ্ছা।

একে একে মোটের উপর প্রায় সব কথাই হইল। বাকী রহিল শুধু ঐ শিষ্যত্বের কথাটা।

গুরু হইবার ভারি শক্তি ছিল আমার বয়স যখন ১৮ পার হয় নাই। তখন যাঁদের গুরুগিরি করিয়াছিলাম, এখন তাঁরা আমাকে ডিঙাইয়া এত উঁচুতে গিয়াছেন যে, তাঁদের নাম যদি করি, আপনার বিস্ময় রাখিবার স্থান থাকিবে না যে, আমি তাঁদেরও এক সময় লেখা পড়িয়া কাটিয়া কুটিয়া দিয়াছি, ভালমন্দ মতামত প্রকাশ করিয়াছি এবং দেখাইয়া দিয়াছি!

তারপর যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, ঐ ক্ষমতাটা ততই হারাইয়াছি। এখন আজকাল একেবারেই আর নাই। আমি শিখাইব আপনাদের এ-কথা আর ত মনে আনিতেই পারি না।

এ পত্র যতদিনে আপনার হাতে পড়িবে, সেই সময় আমিও সম্ভবতঃ তোড়জোড় বাঁধিয়া রেঙ্গুন ছাড়িয়া জাহাজে চড়িব। দেহটা যদি দেশ বদলাইলে একটু সারে এই আশা।

আর একবার বুড়ো মানুষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন। ইতি—

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীপ্রমথ চৌধুরীকে লেখা]

6, Nilkamal Kundu's Lane,
Baje-Shibpur. ১১।২।১৬

সবিনয় নিবেদন,—কোন কারণেই যে হঠাৎ আপনার চিঠি পেতে পারি এ আশা আমি কখনো করিনি। আজ শ্রীমান মণ্টুরও (দিলীপকুমার রায়) একখানা চিঠি পেলুম।

প্রায় মাস-পাঁচেক হ'তে চল্ল আমি এদেশে এসেচি। আসা পর্য্যন্তই আপনার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেচি। কিন্তু ঘটে ওঠেনি। একে ত কোথা দিয়ে গেলে আপনার বাড়িতে পৌছান যায় তা জানি নে, তার ওপর এও একটা সঙ্কোচ ছিল, পাছে অসময়ে গিয়ে আপনার সময় নষ্ট করি। এখন আপনি নিজেই যখন ডেকেচেন তখন ত নিশ্চয়ই যাবো। দেখি, কাল বুধবারে যদি আপনার অফিসে গিয়ে হাজির হ'তে পারি। না পারি শনিবারে আপনার বালিগঞ্জের বাড়িতে যাবই।

আমার দেখা করবার একটা বিশেষ হেতু আছে। আপনার লেখার আমিও একজন ভক্ত। অন্ততঃ একটু বেশি রকম পক্ষপাতী। তাই, বাইরের লোকেরা আপনাকে যখন গালি-গালাজ করে তখন আমারও লাগে। দুই পক্ষের লেখাই আমি মন দিয়ে পড়ি। কিন্তু আমার মুস্কিল হয়েচে এই যে, না পারি ঠাওরাতে তাদের ক্রোধের কারণ, না পারি বুঝতে আপনি বা কি বুঝিয়ে বলেন। এ সব তর্কাতর্কি নিশ্চয়ই খুব উচ্চ অঙ্গের হয় তাতে আমার সংশয় নেই। কিন্তু, ছাপার অক্ষরে একটা অক্ষরও আমার মাথায় ঢোকে না। আমার বুদ্ধিটা মোটা; কোন জিনিস সেই জন্যে বেশ একটু মোটা করে বুঝতে না পারলে আমার বোঝাই হয় না। দেখা করবার হেতু এই। ভেবেচি মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করে জেনে নেব ব্যাপারটা বাস্তবিক কি। শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর পণ্ডিতমশাইকে একদিন এই প্রশ্নই করেছিলুম। তিনি বুঝিয়েও দিয়েছিলেন। আমাদের মণিলালকেও জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তিনিও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এইবার আপনার পালা।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবাবু (নাট্যকার) একদিন আমাকে বলেছিলেন, আমি বাঙলা সাহিত্যের একটি রত্ন। তার কারণ আমি যে ভাষায় লিখি তাই ঠিক। কিন্তু 'সবুজপত্রে'র ওঁরা ভাষাটাকে একেবারে মাটি ক'রে দিচ্চেন। ওঁদের ওটা ভাষাই নয়।

আমি নিজে কিন্তু কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারলুম না, আমার ভাষার সঙ্গে 'সবুজপত্রে'র ভাষার পার্থক্যটা কি। এই কথাটাই আপনার কাছে গিয়ে বেশ ভাল ক'রে বুঝে আসব।

আমার কোন লেখা আপনি পড়েছেন কি না জানি নে, যদি প'ড়ে থাকেন তাহ'লে কোন অসুবিধেই হবে না।

পণ্ডিত মশাই সেদিন বলেছিলেন বাঙলা ভাষাটা সংস্কৃত ঘেঁষা হওয়া চাই এবং তাই নিয়েই বিবাদ। কিন্তু ঘেঁষাটা যে কতখানি চাই তা তিনি জানেন না, আপনারাও না। দেখি এই মীমাংসাটা যদি আপনার কাছে গেলে হয়।—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

6, Nilkamal Kundu's Lane,
Baje-Shibpur. 21. 9. 16.

সবিনয় নিবেদন,—কাল আপনি আমাকে একখানি বই দিয়েছিলেন। এই বই পাওয়াটা আমার এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে তা থেকে একটা বিশ্রী বদ্ অভ্যাস দাঁড়িয়েচে। সে বই পড়ি আর না পড়ি পাওয়াটা স্বীকার করা যে অন্ততঃ একটা ভদ্রতা এও আর যেন মনে পড়ে না। কথাটা দম্ভের মত শোনালেও জিনিসটা সত্য। তাই আপনারা বইখানা অনেক দিনের পর এই ত্রুটিটা আজ যখন প্রথম দেখিয়ে দিলে তখন আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে ত পারি নে। এক দফা ধন্যবাদ এ জন্য আর এক দফা ধন্যবাদ এই চিঠির শেষে পাবেন।

কাল রাত্রেই বইখানি শেষ করি। গল্প প'ড়ে এত আনন্দ বহুকাল পাইনি। এর বিশেষ সুখ্যাতি করতে যাওয়ার নাম এর সমালোচনা করা। এ কাজ অনেকেই করবেন বলে আপনাকে যে দিনরাত শাসাচ্ছেন সে ইঙ্গিতও কাল আপনার ঘরে ব'সেই শুনে এলুম। সুতরাং এ কাজ আমি করব না। কিন্তু তাঁরাও যে কি করবেন, শিব গড়বেন কি বাঁদর গড়বেন সে তাঁরাই জানেন। তাঁদের ভাল লেগেছে—এ এক কথা, কিন্তু এ লেখার মধ্যে যে কত জোর, কত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য আছে, এর নিজস্ব সৌন্দর্য্য কোনখানে, কোথায় এর মধুর কাব্যরস—সবচেয়ে এ লেখা লিখিতে পারা যে কত শক্ত, এ কথা বুঝবে বোধ করি শুধু তারাই যাদের নিজেদের হাতে-কলমে লেখার বাতিক আছে। আর সে লেখা পড়বার বাতিকও দেশের পাঁচ জনের আছে। কিন্তু সে যাক। আমার আসল কথাটা এই যে, এক রবিবাবুর লেখা প'ড়ে মনে হয়েছে চেষ্টা করলেও আমি এমন পারি নে, আর কাল আপনার এই গল্পের বইটা পড়ে মনে হ'ল চেষ্টা করলে আমি এমন করে কিছুতেই লিখতে পারি নে। এই কথাটা জানাবার জন্যই এই পত্র।

কাল সন্ধ্যার সময় অর্থাৎ আপনার ওখান থেকে বেরিয়ে 'ভারতবর্ষ' আফিসে আসি এবং সেইখানেই "সোমনাথের গল্পটা" শেষ ক'রে জলধরবাবু প্রভৃতি কয়েক

জনের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা উঠে। আমি আমার মত এই ব'লে দিই যে, এই বই পড়া উচিত তাদেরই বেশি করে যারা নিজেরা বই লেখে। এর নির্মল লিখনভঙ্গী, সোজা সরল কথোপকথন অথচ এমনিই রসে ভরা, মনের ভাবটা বলবার এই অনাবিল মুক্ত পথ তাঁরা যত শিখতে পারবেন, যারা বই লেখে না তারা তেমন করে শিখতে পারবে না। তাদের শুধু ভালই লাগবে, কিন্তু গ্রন্থকারদের ভালও যেমন লাগবে শিক্ষাও তেমনি হবে। এই আমার মোটের ওপর বক্তব্য। এখানে একটা অনুরোধ আপনাকে করব। আপনি দয়া করে এইটে মনে করবেন না যে আমার এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ভেতর এতটুকু অত্যুক্তি—ইতর লোকে যাকে বলে 'খোসামোদ' তাই আছে। কারণ আমি জানি ইতিমধ্যে যত লোকের যত প্রশংসা আপনি এই 'চারইয়ারি' উপলক্ষ্যে পেয়েছেন তার মধ্যে উপরোক্ত ওই ইতর কথাটা যে আছে তা নিজেই হয়ত অনুভব করেছেন। অন্ততঃ আমি হলে ত তাই করতুম। কারণ, এটা আমি নিশ্চয় বুঝতুম এ বই সাধারণ পাঠকের জন্য নয়। তারা বুঝবেই না।* ইংরিজিতে একটা কথা আছে 'art to hide art' সেটা তারা না ধরতে পেরে মনে করবে এর চাঁচা-ছোলা সৌন্দর্য্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যই নেই। এই ধরুন না যেমন মাড়ওয়ারীরা বাড়ি তৈরি করায় এবং তাতে পয়সা খরচ করে কারুকার্য্য করিয়ে নেয়।

পাঠকের Intelligence এবং Culture একটা বিশেষ সীমায় না পৌঁছন পর্য্যন্ত তারা এ বইয়ের সমঝদার হতেই পারে না। কথাটা আমি বানিয়ে বলচি নে। সেদিন যে আলোচনা হয় তা থেকেই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলুম। যাক্। আবার যদি কখনো দেখা হয় এ-কথা হবে। আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়ে আজ বিদায় নিলুম। এমনও হতে পারে আমার ভাল লাগার দাম হয়ত আপনার কাছে খুবই সামান্য।—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* সেদিন এই বইয়ের প্রসঙ্গে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, আপনি রবিবাবুর সব কবিতার মানে বুঝিয়ে দিতে পারেন?

আমি বলি, না, পারি না। তার কারণ, আপনি বেদান্তে বড় পণ্ডিত হ'লেও কাব্য বোঝবার মত পণ্ডিত নন। তাছাড়া সব কবিতার মানে সবাইকে যে বুঝতেই হবে এমন কিছু মাথার দিব্যি দেওয়াও নাই। রবিবাবুর 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' প'ড়ে গুরুদাস-বাবু বলেছিলেন এমন অশ্লীল বস্তু ইতিপূর্ব্বে তিনি দেখেন নাই। সুতরাং কথাটা স্যার গুরুদাসের মুখ থেকে বার হয়েছে বলেই মেনে নিতে হবে এবং না নিলে মারাত্মক অপরাধ হবে তাও ত নয়।—শঃ 2. 10. 16

6, Nilkamal Kundu Lane
Baje-Shibpore, Howrah, 11-10-16.

সবিনয় নিবেদন,—কয়েক দিন হল আপনার চিঠি পেয়ে জবাব দিতে বিলম্ব হওয়ায় লজ্জিত হয়ে আছি। যাওয়াও ঘটে উঠল না বলে নিজের মনেই এক প্রকার ক্লেশ বোধ করচি। পরশু অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে যদি বাড়ি থাকেন, বিকেলবেলায় একবার আপনার ওখানে যাবো। কিন্তু কি একটা আমার স্বভাব, বড়লোকের বাড়ি যাবো মনে হলেই কেমন সমস্ত মনটা দ্বিধায় সঙ্কোচে অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তাই যাই-যাই করেও যাওয়া হয় না।

এই সঙ্কোচটা যদি কাটাতে পারি পরশু নিশ্চয় গিয়ে হাজির হব, আর যদি না যাই তার কারণ আপনাকে কিছু বোঝাতে হবে না। সে কথা কিন্তু যাক্।

আপনার এই বইখানার সমালোচনা যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা অতি উচ্ছ্বাসের দোষেই যে কাগজওয়ালাদের মনোরঞ্জন করতে পারেন নি তা বোধ হয় নয়। আপনি ত জানেন আমাদের কাগজে 'নামের ভার' না থাকলে ধারটা কেউ অর্থাৎ কোন সম্পাদক যাচাই করে দেখতে চান না। আমার সমালোচনা নিশ্চয়ই ভালো হবে না, কারণ, এ-বিষয়ে শক্তি আমার বড় কম, কিন্তু নামটা নীচে লিখে দিলেই যে-কোন কাগজেই তা স্থান পাবে; সুতরাং তাই আমি আগামী মাসে করব কিনা ভাবচি। হয় 'ভারতবর্ষে' না হয় 'প্রবাসীতে'। তবে কিনা অক্ষমের তুলির আঁচড়ে জিনিসটার চেহারা পাছে আজ-কালকার Indian আর্টের উৎকৃষ্ট নমুনার মত দেখায় সেই আমার ভয়। আর আপনার নিজের ত তাহলে কথাই নেই—আহ্লাদ রাখবার আর জায়গাই থাকবে না। তবে যদি অভয় দেন ত করি।

আপনার 'বড়বাবুর বড়দিন'—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িবাবু[১]রা যাকে বলেন 'মুন্সিয়ানা' তার যদিচ কোনো অভাব নেই (না থাকবারই কথা!) আমার কিন্তু ভাল লাগল না। আমি জানি এ সম্বন্ধে আপনার অন্যান্য সমঝদারদের সঙ্গে আমার মতভেদ আপনি স্পষ্টই টের পাচ্ছেন। তাঁরা হয়ত আপনাকে বলেচেন, একটা চরিত্রকে 'বাঁদর' বানিয়ে তোলবার ক্ষমতা আপনার অসাধারণ। আমিও যে তা বলি নে তা নয়। বিদ্রূপ ব্যাঙ্গের খোঁচায় মানুষের বিশেষ কোন একটা বাঁদরামি প্রবৃত্তিকে পাঠকের কাছে রিডিক্লাস করে তুলতে আপনি ভারি পারেন, কিন্তু আমি দেখি মানুষকে মানুষ করে দেখবার ক্ষমতা এর চেয়েও আপনার ঢের বেশি। এক একটা অত্যন্ত চাপা লোক যেমন তার বড় দুঃখটাকেও বলবার সময় এমন একটা তাচ্ছিল্যের সুর দেয় যে হঠাৎ মনে হয় যেন সে আর কারো দুঃখটা গল্প করে যাচ্ছে।

১। 'নায়ক' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

এর সঙ্গে তার নিজের যেন কোন সম্পর্ক নেই। আপনিও বলেন ঠিক তেমনি করে। ইনিয়ে বিনিয়ে কাতরোক্তি কোথাও নেই—অথচ, কত বড় না একটা জীবনের ট্র্যাজিডি পাঠকের বুকে গিয়ে বাজে। আপনার লেখায় এই সহজ শান্ত রিফাইণ্ড বলার ভঙ্গীটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে। তাহাতেই সেদিন লিখেছিলুমও 'চারইয়ারী'র কথাগুলো ঠিকমত বোঝবার জন্যে পাঠকের Education এবং Culture বিশেষ একটা পর্য্যায়ে পৌছান দরকার। তা না হলে এর সমস্ত সৌন্দর্য্যই তার কাছে ঝুটো হয়ে যাবে।

কিন্তু 'বাঁদর' বানাবার সময় ওই চাপা তাচ্ছিল্যের সুরটা লেখায় কোনমতেই থাকা সম্ভবপর নয়, থাকেও না। বোধ করি এই জন্যেই 'বড়দিন' আমার ভাল লাগে নি। ওর মর‍্যালের তামাসাটা ধরতে পারলুম না।

আবার এমনও হ'তে পারে আমি মোটেই বুঝতে পারিনি। হয়ত তাই। সুতরাং আমার ভাল-না-লাগার দাম একেবারে নাও থাকতে পারে। হয়ত বা আগা-গোড়াই অনধিকার-চর্চ্চা করে যাচ্ছি। তা যদি হয় আমাকে মাপ করবেন! অনধিকার-চর্চ্চার কথাটা আমি অতি-বিনয় করে বলচি নে। কারণ, আমি লেখা-পড়া শিখিনি, ইংরিজি ভাল করে না পড়াশুনা থাকলে লেখার ভাল-মন্দ বিচার করবার ক্ষমতা হয় না। এ ক্ষমতাটাও শিক্ষাসাপেক্ষ। বড় বড় লোকের বড় বড় সমালোচনা যারা পড়ে নি, তারা স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা থেকে অমনি এক রকম করে বুঝতে যে পারে না তা নয় বটে, কিন্তু যে-সব জিনিস তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে তাদের ভেতর তারা এক পাও ঢুকতে পারে না। কপাট যে বন্ধ, সে যে বাইরে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু বন্ধ কপাটের পানে চেয়ে আছে এও ঠাওর পায় না। এই জন্যেই ত সব জিনিসেরই সবাই সমালোচক। মনে করে কথার মানেগুলো যখন বুঝতে পারচি তখন সমস্তই বুঝচি। ইংরিজির কথা এই জন্য তুললুম যে বাংলা ভাষায় সমালোচনার বইও নেই সে শেখবার বালাইও নেই। এও যে রীতিমত সাক্‌রেদি করে শিখতে হয় এ ধারণাও নেই। আমার ধারণা আছে বলেই এত কথা বললাম। এ-সব কথা আমি বিদ্বান লোকদের মুখে শুনেচি। অতএব, আমার ভাল-না-লাগার মূল্য আপনি এই আন্দাজে দেবেন। আমি জানি আমি যা-তা একটা সমালোচনা লিখে ছাপতে দিলেই তা ছাপা হয়ে যাবে এবং সেজন্য আপনার অনুমতি চাওয়াটাও বাহুল্য, কিন্তু আপনার লেখার উপর আমার একটু বেশি শ্রদ্ধা আছে ব'লেই আমার অক্ষমতা জানিয়ে আপনার মত জানতে চাচ্চি। যদি আপত্তি না থাকে ত ছুটো একটা কথা বলবার সাধটা মিটিয়ে নিই। আমার বিজয়ার শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদকে]

বাজে শিবপুর।
২০. ৩. ১৮

সবিনয় নিবেদন,—দিন দুই হইল আপনার পত্র এবং 'মীর পরিবার' পাইয়াছি। শেষ গল্পটা (হামিদ) ছাড়া আর তিনটি গল্পই পড়িয়াছি। আজকালকার দিনে গল্প পড়িয়া আনন্দ পাওয়া এবং সুখ্যাতি করিতে পারা দুইই যেন কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বই উপহার পাইয়া গ্রন্থকারকে দুটা ভাল কথা বলিতে, সর্ব্বান্তকরণে উৎসাহ দিতে পারি না বলিয়া আমি অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া থাকি। আপনি সেই সুযোগ আমাকে দিয়াছেন বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।···

আপনার রচনার মধ্যে যে উর্দ্দু কথা ব্যবহার করিয়াছেন সে ভালই হইয়াছে। তা না হইলে মুসলমান পাঠক-পাঠিকা কখনই ইহাকে নিজেদের মাতৃভাষা বলিয়া অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিত না। তাহাদের কেবল মনে হইত ইহা হিন্দুদের ভাষা, আমাদের নয়। এই পাশাপাশি দুইজাতির মধ্যে সাহিত্যের সংযোগ সাধনের বোধ করি ইহাই সবচেয়ে ভাল উপায়। অবশ্য সকল সাহিত্যিকই এই মতের সপক্ষে নয়, কিন্তু আমি নিজে এইরূপ রচনারই পক্ষপাতি।

তবে, একটি কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মান করি। আমি অনেক দিন এই ব্যবসা করিতেছি, হয়ত যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করিয়াছি, আশা করি, অযাচিত উপদেশ দিতেছি মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন না। কথাটা এই যে, সকল জাতির মধ্যে ভাল-মন্দ লোক আছে। হিন্দুর মধ্যেও আছে, মুসলমানের মধ্যেও আছে। এই সত্যটি বিস্মৃত হইবেন না। আর একটি কথা মনে রাখবেন যে, গ্রন্থকার কোন বিশেষ জাতি, সম্প্রদায় বা ধর্ম্মের লোক নয়? সে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদি সমস্তই। ভবদীয় শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[কানপুর প্রবাসী মহিলা সাহিত্যিক শ্রীমতী লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা]

বাজে শিবপুর (হাওড়া)
২৪।৭।১৯

পরম কল্যাণীয়াসু,—আপনার পত্র এবং 'মিলন' আদ্যোপান্ত পড়িলাম। আমার বই যে আপনার ভাল লাগে ইহার চেয়ে গ্রন্থকারের বড় পুরস্কার আর কি আছে। আপনি ভক্তির দাবী জানাইছেন। ভক্তি যেখানে শুধু বিনয় নয়, সত্যকার বস্তু,

সেখানে এ দাবী আছে বৈ কি। তবে, ভক্তি কাহাকে করি সেটাও একটু বিচার করা আবশ্যক।

আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই, সেই জন্য বেশি কিছু প্রশ্ন করা শোভা পায় না, তবুও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, আপনি যখন ব্রাহ্মসমাজের নয়, তখন বিধবা-বিবাহ দিতে চান কেন?

এটা কি শুধু একটা ক্ষণিকের খেয়াল 'হেম ও গুণীর' অবস্থা দেখিয়া করুণায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে? এতে কি আপনার সত্যকার আপত্তি নাই? যদি তা থাকে, অথচ একটা 'মিলন' হইয়া গেলেও মনটা খুশী হয়—এই যদি হয় ত এ 'মিলনের' বিশেষ কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে করিতে পারি না।

তবে, লেখা হিসাবে অর্থাৎ রচনার ভাল-মন্দ বিচারে এ লেখার দাম ধার্য্য করিতে যাওয়া এটুকু চিঠির কর্ম্ম নয়।

আমার সকল বই আপনি পড়িয়াছেন কি না জানি না। পড়িয়া থাকিলে নিশ্চয়ই অন্ততঃ এই ব্যাপারটা চোখে পড়িয়াছে যে অনেকগুলি বড় এবং সুন্দর জীবন শুধু বিধবা-বিবাহ সমাজে না থাকার জন্যই চিরদিনের জন্য ব্যর্থ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ইহার অধিক নিজের সম্বন্ধে বলিবার আমার নাই।—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাজে শিবপুর, হাওড়া
২৯।৭।১৯

পরম কল্যাণীয়াসু,—আপনার পত্র পাইলাম। আমাকে চিঠি লিখিয়া প্রত্যুত্তরের আশা করাটা যে অত্যন্ত দুরাশা, আমার এই চমৎকার অভ্যাসটির খবর যে আপনি কি করিয়া সংগ্রহ করিলেন তাহাই ভাবিতেছি। কারণ, কথাটা এতবড় সত্য যে তাহার প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। যথার্থই লোকে আমার কাছে জবাব পায় না—আমি এমনি অগাধ কুড়ে।

তবুও আপনাকে দু'খানা চিঠি লিখিয়া ফেলিলাম যে কি করিয়া, ভাবিতে গিয়া দেখি ঐ যে আপনি ভক্তির দাবী করিয়াছেন, উহাই এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। বস্তুতঃ, এই বস্তুটা মানুষকে দিয়া কত অদ্ভুত কার্য্যই না করাইয়া লয়। আমাকে যে বড় ভাইয়ের মত ভক্তি করে, তাহাকেই চিঠি লিখিতেছি, তাহার কথার উত্তর দিতেছি,—ইহার অন্তরে কি বিপুল অহঙ্কারই না প্রচ্ছন্ন থাকে!

আপনাকে আমি কিছুই শিখাই নাই, কখনো চোখেও দেখি নাই, কাহার কন্যা,

কাহার বধূ, কি পরিচয় কিছুই জানি না, অথচ, নিজেকে যখন আপনি আমার ছোট বোন বলিয়া অভিহিত করিতেছেন—এ সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে,—তখন, এ ভাগ্য যাহার ঘটে তাহাকে একপ্রকার নেশার মত পাইয়া বসে।

আমাকে না জানিয়া এবং হিন্দু ঘরের বধূ হইয়াও আমাকে অসংকোচে পত্র লিখিয়াছেন। ইহা সকলে পারে না সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমি যে আপনাকে অসংকোচে পত্র লিখিতে পারি, প্রশ্ন করিতে পারি, এ আশঙ্কা আপনার মনের মধ্যে ছিল না বলিয়াই লিখিতে পারিয়াছিলেন, থাকিলে পারিতেন না। এতটুকু বিশ্বাস আমার প্রতি আপনার ছিলই। না হইলে এতগুলা বই লেখা আমার বৃথাই হইয়াছে।

বেশ, ছোট বোনের মত তুমি যখন খুশি আমাকে চিঠি লিখো। আমার সত্যকার শিষ্যা এবং সহোদরার অধিক একজন আছে, তাহার নাম নিরুপমা। আজ সাহিত্যের সংসারে সে আপনার বোধ করি অপরিচিত নয়, 'দিদি', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'বিধিলিপি' ইত্যাদি তাহারই লেখা। অথচ, এই মেয়েটিই এক দিন যখন তাহার ষোল বৎসর বয়সে অকস্মাৎ বিধবা হইয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল, তখন আমি তাহাকে বার বার করিয়া এই কথাটাই বুঝাইয়াছিলাম, "বুড়ী, বিধবা হওয়াটাই যে নারীজন্মের চরম দুর্গতি এবং সধবা থাকাটাই সর্ব্বোত্তম সার্থকতা ইহার কোনটাই সত্য নয়।" তখন হইতে সমস্ত চিত্ত তাহার সাহিত্যে নিযুক্ত করিয়া দিই, তাহার সমস্ত রচনা সংশোধন করি এবং হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাই—তাই আজ সে মানুষ হইয়াছে, শুধু মেয়ে-মানুষ হইয়াই নাই।

এইটি আমার বড় গর্ব্বের জিনিস।

তুমি লিখিয়াছ, যে স্বামীকে জানিল না চিনিল না তেমন বালবিধবার আবার বিবাহ দিতে দোষ কি? তোমার মুখে এই কথাটার অনেক দাম। এবং আমার লেখা যদি একটিও বালবিধবার প্রতি তোমার এই করুণা জাগাইতে পারিয়া থাকে ত আমারও বড় পুরস্কার পাওয়া হইয়াছে।

এইবার তোমার লেখার সম্বন্ধে কিছু বলব। আজকাল রাশি রাশি বাঙলা উপন্যাস বাহির হইতেছে। ইহাতে দুটা জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথম, পুরুষদের লেখা বইগুলা প্রায়ই যে অন্তঃসারহীন অপাঠ্য বই হইতেছে,—শুধু এই নয়, ইহাদের পোনর আনাই অন্য লোকের চুরি। এবং ইহাতে তাহারা লজ্জা পর্য্যন্ত অনুভব করে না। বই বিক্রি হইলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে।

দ্বিতীয় এই দেখিয়াছি মেয়েদের লেখা বইগুলা আর যাহাই হোক, সেগুলা অন্ততঃ কাহারো চুরি নয়। তাহারা যাহা কিছু ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে দেখিয়াছে,

নিজের জীবনে যথার্থ অনুভব করিয়াছে তাহাই কল্পনা দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং তাহাতে কৃত্রিমতাও বেশি থাকে না।

তোমার লেখায় যে সৎসাহস ও সরলতা আছে, তাহা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। রচনা হিসাবে খুব ভাল না হইলেও ইহার অকৃত্রিমতাই ইহাকে সুন্দর করিয়াছে। আমার পরিশিষ্ট লিখিতে গিয়া আর সময় নষ্ট করিয়ো না,—স্বাধীনভাবে বই লিখিয়ো, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি কাহারও চেয়ে হীন হইবে না।

এইখানে তোমাকে আর একটা উপদেশ দিয়া রাখি। নারীর স্বামী পরম পূজনীয় ব্যক্তি, সকলের বড় গুরুজন। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীও দাসী নয়। এই সংস্কার নারীকে যত ছোট. যত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ করে এমন আর কিছু নয়।

যখনই বই লিখিবে এই কথাটাই সকলের বেশি মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে।

স্বামীর বিরুদ্ধে কদাচ বিদ্রোহের সুর মনে আনিতে নাই, কিন্তু স্বামীও মানুষ, মানুষকে ভগবান বলিয়া পূজা করিতে যাওয়া নিষ্ফল নয়, ইহাতে নিজেকে এবং স্বামীকে উভয়কেই ছোট করিয়া তোলা হয়।

তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করিব। "যে বিধবা স্বামীকে জানে নাই, চিনে নাই…"

কিন্তু যে একবার জানিয়াছে চিনিয়াছে—অর্থাৎ যে ষোল-সতের বছর বয়সে বিধবা হইয়াছে, তাহার সুদীর্ঘ জীবনে আর কাহাকেও ভালবাসিবার বা বিবাহ করিবার অধিকার নাই? নাই কিসের জন্য? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে, ইহার মধ্যে শুধু এই সংস্কারটাই গোপন আছে যে স্ত্রী স্বামীর জিনিস। স্ত্রীর নারী বলিয়া আর কোন স্বাধীন সত্তা নাই।

"হেম সংশয়ের মধ্যেই দিন কাটাইতেছিল। যাহার দৃঢ়তা নাই, তাহার কি বন্ধনই ভাল নয়?"

বন্ধন কেবল তখনই ভাল যখন এই প্রশ্নটার শেষ মীমাংসা হইয়া যাইবে যে বিবাহই নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ।

অথচ, আমি কোথাও বিধবার বিবাহ দিই নাই। এইটি তোমার কাছে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতে পারে।

তার উত্তর এই যে সংসারে অনেক আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে, এবং চেষ্টা করিয়াও তাহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো।—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাজে শিবপুর, হাওড়া

১৪।৮।১৯

পরম কল্যাণীয়াসু,—কাল এবং আজ তোমার বড় এবং ছোট্ট দুখানি চিঠিই পেলাম। নিজের খবরটা দিই। আমি চিরকালই সমস্ত দোর-জানালা খুলে শুই। সে দিন রাত্রি চারটের সময় ঘুম ভেঙে দেখি বিছানা বালিশ গায়ের জামা-কাপড় সমস্ত বৃষ্টির ছাটে এমনি ভিজেছে যে শীত করচে। দুর্ভাগ্য আবার এমন যে সেদিন বিকেল বেলাতেও বার হয়ে পথে কম ভিজিনি,—দুটোতে জড়িয়ে একটু জ্বর মত হ'ল, কিন্তু এক দিনেই সারলে না,—বাড়তেই লাগল। এখন ওটা সেরেছে। দ্বিতীয় দফায় আরও চমৎকার। ক'দিন থেকে ডান পায়ের হাঁটুর খানিকটা নীচের এত জ্বালা আর চুলকোতে লাগলো যে অস্থির হয়ে উঠলাম। দিন-চারেক পূর্ব্বে একদিন সকালে উঠে দেখি খানিকটা জায়গা লাল হয়ে ঠিক যেন একজিমার ভাব হয়েচে। একটু একটু ফুলেও আছে। কিছুদিন থেকে শুনছিলাম এদিকে খুব বেরি-বেরি হচ্চে। ওটা যে কি পদার্থ তা আজও দেখবার সুযোগ পাইনি, ভাবলাম, বুঝি, আমাকে ধরেচে। ভয়ে যাই আর কি। কসে টিন্‌চার আইডিন লাগাতে শুরু করে দিলাম,—কিন্তু বার-কয়েক ঘন-ঘন লাগাবার পরে সে এমন মূর্ত্তি ধারণ করলে যে, তার চেয়ে বুঝি সত্যিকারের বেরি-বেরি হওয়াই ছিল ভাল। ডাক্তার এসে ভয়ানক বকতে লাগলেন,—আপনার কি এতটুকু কোন বিষয়ে সবুর নেই? এবার না হয় কষ্টিক কিংবা এ্যাসিড-ট্যাসিড লাগিয়ে যা পারেন করুন আমি চললাম। যাই হোক পরে ঠাণ্ডা হয়ে ওষুধ আর মালিসের ব্যবস্থা করে গেলেন, পা দুটো একটা তাকিয়ায় তুলে যেন চুপ করে শুয়ে থাকি। কি করি দিদি, তাই আছি। তৃতীয় দফায়,—কোন কালে আমি অম্বলের রুগী নই। এত কম খাই যে অম্বল পর্য্যন্ত আমার কাছে ঘেঁসে না, পাছে তাকেও বা অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়। কি যে সে দিন জোর করে ছাই-পাঁশ কতকগুলো ঘরের তৈরী করা সন্দেশ খাইয়ে দিলে যে আজও যেন তার ঢেঁকুর উঠচে। আমি এ-দেশের একটি বিখ্যাত কুঁড়ে। চিবোবার ভয়ে কোন জিনিস সহজে মুখে দিতে চাইনে,—আমার ধাতে ও-অত্যাচার সইবে কেন? কি বল দিদি, ঠিক না? কিন্তু বাড়ির লোকে বোঝে না, তারা ভাবে আমি কেবল না খেয়েই রোগা। সুতরাং খেলেই বেশ ওদের মত হাতী হয়ে উঠব। স্বর্গীয় গিরিশবাবু তাঁর আবুহোসেনে লাখ কথার একটা কথা বলে গিয়েছেন যে "অবলার বড় নোলা, তারা মলেও খায়।" মেয়ে-মানুষ জাতটাকে তিনি চিনেছিলেন! আজ বিশ বছর আমরা কেবল খাওয়া নিয়েই লাঠালাঠি করে আসচি। ঐ খেলে না, খেলে না—রোগা হয়ে গেল—ঘর-

সংসার রান্না-বান্না কিসের জন্যে—যেখানে দু-চোখ যায় বিবাগী হয়ে যাবে;—ইত্যাদি কত কি। আমি বলি, ওরে বাপু, বিবাগী হবে ত শিগগীর হও,—এ যে শুধু আমাকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়েই কাঁটা করে তুললে! বাস্তবিক, আমার দুঃখটা আর কেউ দেখলে না দিদি! আমি প্রায়ই ভাবি, সত্যিকার স্বর্গ যদি কোথাও থাকে ত সেখানে বোধ হয় এমন করে একজন আর একজনকে খাবার জন্যে জবরদস্তি করে না! আর তা যদি হয় ত আমি যেন বরঞ্চ নরকেই যাই।

হ্যাঁ, আরও একটা আছে। দিন-কুড়ি আগে কুকুরের ঝগড়া থামাতে গিয়ে কোথাকার একটা ঘেয়ো কুকুর আমার হাতের তেলোতেই আচ্ছা করে দাঁত ফুটিয়ে দিয়ে পালাল। হতভাগা কুকুরটা কি অকৃতজ্ঞ! তাকেই আমি আমার 'ভেলু'র কবল থেকে বাঁচতে গিয়েছিলাম! ভয়ে কাউকে এ কথা বলিনি, শুকিয়েও গিয়েছিল, কিন্তু কাল থেকে অবার যেন মনে হচ্চে ব্যথা হচ্চে।

কিন্তু আর নয়, আপাততঃ এখানেই আমার শারীরিক কুশলের তালিকাটা মোটামুটি সম্পূর্ণ করলাম। তবে একটা সুখ এই যে বুড়ো হয়েচি। এখন থেকে এমনি একটা-না-একটা উপলক্ষ্য ক'রে ত চলতে হবে। কত রকম-বেরকমের দুঃখ-দৈন্য আপদ-বিপদের মাঝখান দিয়ে ত আজ চল্লিশের কোটা পার হোলাম। শুনি আমাদের বংশে আজও কেউ চল্লিশে পৌছোন নি। সে হিসাবে ত অন্ততঃ পিতৃপিতামহদের হারিয়েছি! আর কি চাই!

যাক্ গে! বুড়ো মানুষের বাঁচা-মরা নিয়ে আর তোমাদের উদ্বিগ্ন করতে চাই নে, কিন্তু তুমি ত দিদি তেমন ভাল নেই? শরীরের যত্ন কোরো—এমন পরিশ্রম করার দরকার নেই, ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে এসো তার পরে সব হবে। তোমার খাতার লেখাগুলো ত মন দিয়েই পড়লাম,—সমস্তই আছে তাতে, নেই শুধু একটু শিক্ষা। সাহিত্য রচনা করবার কৌশলটাও ত আয়ত্ত করা চাই, ভাই, নইলে শুধু শুধু ত নিজের অনুভূতি মাত্র সম্বল করেই কাজ হবে না। কিন্তু আমি এই ব্যবসাই ত করি, ঠিক জানি এটুকু শিখিয়ে নিতে আমার বেশি দেরি লাগবে না। কতটুকু লিখতে হয়, কোনটা বাদ দিতে হয়, কোনটা চেপে যেতে হয়—

"ঘটে যা তা সব সত্য নয়,
কবি তব মনভূমি, রামের জন্মস্থান
অযোধ্যার চেয়ে ঢের সত্য জেনো।"

এতবড় সত্য কথা আর নেই! দিদি, যত ঘটনা ঘটে তার সবটুকু ত লিখতে নেই—কতক পরিস্ফুট করে বলা, কতক ইঙ্গিতে সারা, কতক পাঠকের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া। অবশ্য, যতটুকু তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম, কেবল চিঠি লিখে

কেটেকুটে দিয়ে দূর থেকে বসে ততটুকু হবে না, তবুও চেষ্টা করতে হবে বৈকি। আর যদি এবারেও শীতের পূর্ব্বে বেরিয়ে পড়তে পারি ত, তোমাদের ঐ খোট্টার দেশেও না হয় ১০।১৫ দিনের জন্যে কাছাকাছি কোথাও একটা বাড়ি নিয়ে একটু সাহায্য করবার চেষ্টা করব। আর আমার সনাতন কুঁড়েমিই যদি সে সময়ে পেয়ে বসে ত ব্যস এই পর্যন্ত্যই।

....মহিলারা? তাঁরা নিরাপদে থাকুন, তাঁদের অনেকের কাছেই তোমাকে বার করতে বোধ করি আমার প্রবৃত্তি হয় না। একটা কথা খুলে বলি। ঐ দূর থেকে শুনতেই....মহিলারা! উচ্চ শিক্ষিতা! দু'-চার জন ছাড়া আমাকে তাঁরা মনে মনে ভারি ভয় করেন; তাঁদের কেবলই মনে হয় আমি তাঁদের ভিতরটা বুঝি খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছি—তাই তাঁরা আমার সামনে কিছুতে স্বস্তি পান না,—অন্তরটা তাঁদের এমনি কৃত্রিম, এমনি সঙ্কীর্ণতায় ভরা! বস্তুতঃ এদের মত সঙ্কীর্ণ চিত্তের স্ত্রীলোক বাংলা দেশে আর নাই! দিদি, আমি কোন কালে খাওয়া-ছোঁয়ার বাচ-বিচার করিনে, কিন্তু...মেয়েদের হাতে আমি কোন দিন কিছু খাইনে। শুধু খাই তাঁদের হাতে যাঁদের বাপ-মা দু'জনেই ব্রাহ্মণ এবং বিয়েও হয়েচে ব্রহ্মণের সঙ্গে।...সমাজ-ভুক্ত হোন তাতে আসে যায় না, কিন্তু ঐ রকম মেশানো-জাত হলে আমি তাঁদের ছোঁয়া খাইনে। তারা বলে শরৎবাবু শুধু লেখেন বড় বড় কথা, কিন্তু বাস্তবিক তিনি ভারি গোঁড়া। আমি গোঁড়া নয় লীলা, কিন্তু শুধু রাগ করেই এদের হাতে খাইনে। আর এটাও দেখেছ বোধ হয়...মেয়েদের মধ্যে সাড়ে পোনর-আনাই কুরূপা। কেবল সাবান পাউডার আর জামা-কাপড়ের দ্বারা, আর নাকি খোনা গলায় কথা কয়ে যত দূর চলে! কেবল ৪।৫টি মেয়েকে দেখেচি তাঁরা সত্যিই শ্রদ্ধার পাত্রী। তাঁদের বি. এ. পাশ করা সত্ত্বেও আমাদের বোনেদের সঙ্গে প্রভেদ করা যায় না। এতই ভাল, মনে হয় যেন তাঁরা হিন্দুর মেয়ে হয়ে আজও আছেন।

এই মেয়েদের নিন্দে করচি বলে হয়ত তোমার খুব রাগ হচ্চে, কিন্তু জানই ত দিদি, ভেতরে ভেতরে তোমাদের প্রতি আমার কত শ্রদ্ধা কত স্নেহ। শুধ তাদের ন্যাকামি, বিদ্যের জাঁক আর কুসংস্কার-বর্জ্জিত আলোর দম্ভ,—এবং যা সত্য নয়, তার ভান—এই দেখেই আমার এত অরুচি।

তাদের কাছে তুমি হাসির পাত্রী হবে? কি বলব, এদের ডজনখানেক গাড়ি বোঝাই করে যদি তোমাদের কানপুরে একবার চালান দিতে পারতাম! আর কিছু না হোক ভায়ার কাজে লাগতে পারত।

"দাদার মর্য্যাদা?" কি করে জানবে তোমার ত দাদা নেই!

তোমার স্বামীর উদার মতের কথা শুনে ভারি খুশী হলাম। আমি তাঁকে

সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করচি। কিন্তু দিদি, একটা কথা তাঁকে বলতে ইচ্ছে করে-। আমি নিজে একবার ছেলেবেলায় ৬।৭ শত বাঙালী কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলাম। অনেক দিন, অনেক মেহন্নত, অনেক টাকা তাতে নষ্ট হয়, কিন্তু একটা আশ্চর্য্য শিক্ষাও আমার হয়েছিল। দুর্নামে দেশ ভরে গেল সত্যি, কিন্তু এই কথাটা নিঃসংশয়ে জানতে পারলাম, যারা কুলত্যাগ করে আসে তাদের শতকরা প্রায় আশিজন সধবা! বিধবা খুব কম! স্বামী বেঁচে থাকলেই বা কি, আর কড়া পাহারা দিয়ে রাখলেই বা কি! আর বিধবা হলেই বা কি! দিদি, অনেক দুঃখেই মেয়েমানুষে নিজের ধর্ম্ম নষ্ট করতে রাজি হয়, আর যে-জন্যে হয় সেটা পরপুরুষের রূপও নয়, একটা বীভৎস প্রবৃত্তির লোভও নয়। তারা এতবড় জিনিসটা যখন নিজের নষ্ট করে তখন বাইরে গিয়ে কিছু একটা আশ্চর্য্য বস্তু পাবার লোভে নয়, কেবল কিছু একটা থেকে আপনাকে রেহাই দেবার জন্যেই এ-দুঃখ মাথায় তুলে নেয়। এ সকল কথা হয়ত তুমি সব বুঝবে না, আমার বলাও হয়ত সাজে না, কিন্তু—সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তুমি ত শুধু মেয়েমানুষই নও,—আমার ছোট বোন কি না! আর এ জিনিসটা সংসারে নিতান্ত তুচ্ছ জিনিসও নয়।

'কাহিনী'র ভেতরে কতটা সত্যি আর কতটা কল্পনা আছে জানি নে, কিন্তু কল্পনা যদি হয় ত বাহাদুরী আছে বটে! সাহসের ত অন্ত নেই দেখি! কে উনি? এখন পবিত্রর কথা একটু বলা চাই। তাকে আমি বেশি দিন জানি নে বটে, কিন্তু এটা জানি সে নির্ম্মল চরিত্র এবং সত্যিই খুব সৎ ছেলে! তোমাকে দিদি হয়ত বলতেও পারে। কারণ বয়সে হয়ত তোমার চেয়ে ২।৪ মাসের ছোটই হবে। তার কাছে কখনো কোন নারীর অমর্য্যাদা হবে না এই আমার বিশ্বাস। তাকে তুমি চিঠি লিখতে পারো কোন ক্ষতি নেই। আর তা ছাড়া তুমি নিজেও খাঁটি সোনা। কার কেমন সম্মান কেমন মর্য্যাদা সমস্ত তোমার কাছে বজায় থাকবে এই আমার দৃঢ় ধারণা। শুনতে পাই সে নাকি এরি মধ্যে চারিদিকে রাষ্ট্র করে বেড়াচ্ছে যে অল্পদিনের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যে আর একজন লেখিকার লেখা দেখতে পাওয়া যাবে যে কারও চেয়ে ছোট যায়গায় দাঁড়াবে না। কাল একটা লোক ওই 'মিলন'টা ছাপাবার জন্যে আমায় খোসামোদ করতে এসেছিল। আমি দিই নি। বলি, কাগজের উপযুক্ত নয়। তাড়াতাড়ি দরকার ত নেই। অনেকে খুব ভাল বলবে জানি, কিন্তু নিন্দে করবারও লোকের অভাব হবে না তাও জানি। আমি ধৈর্য্য ধরে এক বৎসর অপেক্ষা করে যখন মাসিক পত্রে ছাপতে দেব, তখন এই সন্দেহটা থাকবে না।

আমি ত তোমাকে শিষ্য করতে সম্মত হয়েছি, কিন্তু দেখো বোন, শেষকালে

বুড়ীর মত যেন গুরু-মায়া বিস্তে পেয়ে বোসো না। সে তো আমার চেয়ে বড় হয়ে গেছেই, হয়ত বা শেষকালে তুমিও তাই হবে। সংসারে বিচিত্র কিছুই নয়,—কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু এ তো স্বীকার করব যখন তুমিও লিখে জানাবে যে তুমি ভাল হয়ে গেছ, আর কোন অসুখ নেই। নইলে হার্ট ডিজিজের লোককে আমি সাকরেদ করব না। আগে তাকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট পেশ করতে হবে, তা কিন্তু জানিয়ে রাখচি। আমি কষ্ট করে শেখাবো আর তুমি হঠাৎ সরে পড়ে আমাকে পণ্ডশ্রম করাবে সে হবে না।

তুমি একবার লিখেছিলে "আপনার জানিত শ্রীরামপুর!" আর জয়রামপুরটা বুঝি অজানিত? তার ম্যালেরিয়া আর বোলতার মত মশার ঝাঁক সহজে ভুলতে পারে এমন মানুষ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। গত বোশেখ মাসে এর ভয়েই বৌভাতের নিমন্ত্রণ নিতে পারি নি। জয়রামপুরের আর একটি মেয়ে আমাকে বলে দাদা, আর আমি বলি 'ছোড়দি'।

ডিহরীতে যাচ্ছো? যখন তোমাদের জন্মও হয় নি তখন আমি ওই ডিহরীর ক্যানালের পাড়ে পাড়ে পাকা খিরনী কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়াতাম আর ফাঁস করে গিরগিটি ধরতাম। উঃ, সে কত কালের কথা! তখন রেল হয় নি, ছোট স্টিমারে চড়ে আরা থেকে যেতে হতো। তোমাদের বাঙলোটাও আমি যেন চোখে দেখতে পাচ্চি। আচ্ছা, তোমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে ডানহাতি সূর্য্য ওঠে না? তখনকার কালে ওদেশে একটা ঘাট ছিল সতীচওড়া না এমনি একটা কি নাম। বোধ করি তোমাদের ওখান থেকে মাইল-দুই হবে। কিছুকাল ঐখানে বসেচি, কি জানি সে ঘাটের অস্তিত্ব আজও আছে কি না!

'ভবঘুরে'র ত কোথাও যেতে আসতে বাধে না কি না! আচ্ছা, বর্ম্মার অত কথা জানলে কি করে? ম্যাজিস্ট্রেট (ডেপুটি) যে ওখানে 'মিউক' এ খবর কে দিলে? ম্যাগুলে থেকে যে লঞ্চে যাতায়াতের পথ আছে সেই বা কে বললে? যদি যথার্থই বর্ম্মায় থেকে থাকো সে কোন জায়গায়? ও দেশটার হেন স্থান তো নেই যেখানে এ দুটি পা একদিন না একদিন ঘুরে বেড়িয়েচে! অথচ আমার মত বাদশা-কুড়েও দুনিয়ায় কমই আছে।

'রাজলক্ষ্মী'কে কোথায় পাবে? ও-সব বানানো মিছে গল্প। 'শ্রীকান্ত' একটা উপন্যাস বইত নয়; ও-সব মিছে জনরবে কান দিতে নেই। 'কাহিনী'টি কি সত্য? কার কাহিনী? তুমি বেঁচে থাকো দীর্ঘজীবী হও, মানুষ হও বার বার এই আশীর্ব্বাদ করি। আমার আদেশেও কখনো ভুলেও শরীরের অযত্ন কোরো না।

তোমাকে দেখিনি তবুও কেন জানি নে তোমার উপর আমার বড় স্নেহ জন্মেচে। ঐটে বোধ হয় তোমার কপালের লেখা। আমার এমন মনে হচ্চে যদি না এত কুঁড়ে হতুম ত হয়ত শীতকালে শুধু তোমাকেই দেখবার জন্তে কানপুরে যেতাম; কিন্তু সে যে কখনো হবে না তাও বুঝি।

তোমার ছেলে দুটিকে অনেক আশীর্ব্বাদ করচি। তারা মা-বাপের গুণ যদি পায় ত সংসারে সার্থক হবে। কিন্তু তোমার নিজের বেঁচে থেকে মানুষ করা চাই। মরে গেলে কিছুতে চলবে না! তা হলে আমারও বোধ হয় সত্যিই ভারি কষ্ট হবে।

—দাদা

বাজে শিবপুর, হাওড়া
২৭শে জুন, '২১

পরম কল্যাণীয়াসু,—লীলা আজ তোমার চিঠি পেলাম। তোমাকে যে-জবাব দিইনি তা নিতান্তই সময়ের অভাবে। যথার্থ ই দিদি এখানে আমার এক মুহূর্ত্তের সময় নেই। কংগ্রেসের কাজটা যদি সার্থক হয় ত আবার হয়ত সময় পাওয়া যাবে। আজকাল আমার সেই দু'বছর আগে মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দিনের কথাগুলো নিরন্তর মনে পড়ে। আমি ছিলাম একজন ভলান্টিয়ার—আমার পাশের লোক এবং সুমুখের ৬।৭ জন যখন 'যান গিয়া' বলে গুলি খেয়ে মরে পড়ে গেল—তখন আমি পালাই নি, কিন্তু আমার লাগে নি। আজ মনে হয় তারও প্রয়োজন ছিল।
—দাদা

বাজে শিবপুর, হাওড়া
১৭ই মে, ১৯২৩

পরম কল্যাণীয়াসু,—কিছু কাল এখানে ছিলাম না। ঘণ্টা-তিনেক হইল বরিশাল হইতে বাটী আসিয়া পৌছিয়া তোমার পোষ্টকার্ড পাইলাম। এই জন্যই যথাসময়ে চিঠির জবাব দেওয়া হয় নাই।···

হুগলী জেলে আমাদের কবি কাজী নজরুল উপোস করিয়া মর-মর হইয়াছে। বেলা ১টার গাড়িতে যাইতেছি, দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে যদি সে আবার খাইতে রাজি হয়। না হইলে তার কোন আশা দেখি না। একজন সত্যকার কবি! রবিবাবু ছাড়া বোধ হয় এখন কেহ আর এত বড় কবি নাই।····
দাদা—

৭ই ভাদ্র, ১৩২৬
(২৬ আগস্ট ১৯১৯)

....আমার একটু পরিচয় চাই না কি? কিন্তু রাজলক্ষ্মী আবার কে? কেউ নেই!....'শ্রীকান্ত'টা আর একবার পড়ে দেখো। হয়ত তার উপর ঘৃণাই হবে। কিন্তু সব কল্পনা, সব কল্পনা, বেবাক্ মিথ্যে। তারপরে আমার বিয়েসিয়ে কিছু নেই। বড় দরিদ্র ছিলাম—২০টি টাকার জন্য একজামিন দিতে পাইনি। এমন দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান, আমার কিছুদিনের জন্যে জ্বর করে দাও তা'হলে দু-বেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, উপবাস ক'রেই দিন কাটবে। অবশ্য বেশি দিনের জন্যে এ অবস্থা ছিল না। মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা প্রায় পাগলের মতো হয়ে যা কিছুঁ ছিল সমস্ত বিলিয়ে নষ্ট করে দিয়ে স্বর্গগত হন। তারপরে পড়তে শুরু করি। ১৪ বছর ১৪ ঘণ্টা ধরে পড়ি। সেই যে একজামিন দিতে পারি নি। কেবল সেই রাগে। বর্ম্মার রেঙ্গুনে ছিলাম কেরাণী—হঠাৎ বড় সাহেবের সঙ্গে মারামারি করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই ব্যবসা আরম্ভ করেছি। কিন্তু অকস্মাৎ এমনি কপাল ফিরে গেল যে রাতারাতিই একটা বিখ্যাত লোক হয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসীর চেলা হয়েও দিন কাটাতে ছাড়িনি। আমার এই জীবনটা আগাগোড়াই যেন একটা মস্ত উপন্যাস। এবং এই উপন্যাসে সব কাজই করেছি, কেবল ছোট কাজ কখনো করিনি। যখন মরব—ফর্সা খাতা রেখে যাবো—যার মধ্যে কালির আঁচড় এক জায়গাও থাকবে না।

বাজে শিবপুর, হাওড়া
৯ই আগস্ট, '২০

পরম কল্যাণীয়াসু—আমার মানসিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন তুমি বহুদিন হইতে করিয়া আসিতেছ, এবং বহুদিন হইতেই আমি নীরবে আছি। কিন্তু আমার মত যখন তোমার বয়স হইবে, তখন হয়ত ইহা বুঝিতে পারিবে যে জগতে মানুষের এমন কথাও থাকিতে পারে যাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করা যায় না। গেলেও তাহাতে কল্যাণের চেয়েও অকল্যাণের মাত্রাই বাড়ে। অথচ, এই নীরবতার শাস্তি অতিশয় কঠিন।

ভীষ্ম যে একদিন স্তব্ধ হইয়া শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন সে কথাটা চিরদিনের জন্য মহাভারতে লেখা হইয়া গেল, কিন্তু কত অলিখিত মহাভারতে যে এমন কত শরশয্যা নিত্যকাল ধরিয়া নিঃশব্দে রচিত হইয়া আসিতেছে তাহার একটা ছত্রও কোথাও বিদ্যমান নাই। এমনি করিয়াই সংসার চলিতেছে।....

তোমার এই দাদাটির অনেক বয়স হইয়াছে, অনেকের অনেক প্রকারের ঋণ এ নাগাদ শোধ করিতে হইয়াছে, তাহার এই উপদেশটা কখনো বিস্মৃত হইয়ো না যে, পৃথিবীতে কৌতূহল বস্তুটার মূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়া যত বড়ই হোক, তাকে দমন করার পুণ্যও সংসারে অল্প নয়।

যে বেদনার প্রতিকার নাই, নালিশ করিতে গেলে যাহার নীচেকার পঙ্ক জেরায় জেরায় একেবারে উপর পর্য্যন্ত ঘুলাইয়া উঠিতে পারে, সে যদি থিতাইয়া থাকে ত থাক্ না। কি সেখানে আছে নাই-বা জানা গেল। কি এমন ক্ষতি?....

দুঃখের ব্যাপারে আমিই সকলকে ছাড়াইয়া চলিয়াছি, আর সবাই আমার পিছনে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া আসিতেছে—এ ধারণা সত্যও নয়, সাধুও নয়। সৌভাগ্যের দম্ভে রাবণকে পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু দৈন্য ও দুর্ভাগ্যের অহঙ্কারে গৌতমীকে যখন সমস্ত অর্জ্জিত পুণ্যের জরিমানা দিতে হইয়াছিল, তখন সে বিচার ইংরেজ হাকিমের আদালতেও হয় নাই, কালা-গোরার মকদ্দমার পিনাল কোডের ধারাতেও নিষ্পত্তি হয় নাই।...বই আমি যাই লিখি না কেন, এলোমেলো চিঠি লেখায় আমার সমকক্ষ হইতে পারে এরূপ ব্যক্তি যথেষ্ট নাই।

[শ্রীঅমল হোমকে লেখা]

বাজে শিবপুর, হাওড়া

১৬-৮-১৯

পরম কল্যাণীয়েষু,—

অমল, 'ভারতী'র আড্ডায় সেদিন শুনলাম তোমারও নাকি খুব ফাঁড়া গিয়াছে[১]। ইংরেজের মারমূর্ত্তি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভাল করে। এ একটা কম লাভ নয়। আমাদের মোহ কাটাবার কাজে এরও প্রয়োজন ছিল। দরকার মনে করলেই ওরা যে কত নিষ্ঠুর কতটা পশু হ'তে পারে, তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিল এতদিন—এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'ল।

আর এক লাভ—দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবি-বাবুকে[২]। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।

'নারায়ণের' সময় সি. আর. দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবুর যখন

১। এই চিঠিখানি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময় অমলবাবুকে লেখা। এই সময় তিনি লাহোরের দৈনিক 'ট্রিবিউন' পত্রের সহিত যুক্ত ছিলেন।

২। ১৯১৫ সালে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট রবীন্দ্রনাথকে যে 'নাইট' উপাধি দিয়েছিল, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তা ত্যাগ করেন।

নাইটহুড নেন, তখন নাকি দাশ সাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কিনা বলুন।

তোমার কাগজের নামই শুনেছি—কখনো চোখে দেখিনি। পাঠিও না দু-একখানা। তোমার এডিটর ত এখন জেলে। চালাও জোরসে! তোমার নাম-ডাক এখান থেকে শুনেই আমরা খুশী হই। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো!

ইতি—আশীর্ব্বাদক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা]

বাজে শিবপুর, হাওড়া

১২-১০-২০

শ্রদ্ধাস্পদেষু—কেদারবাবু, আপনার অবস্থা শুনিলাম, এবার এ অধীনের অবস্থাটা শুনুন।

কিছুদিন হইতে পিঠের উপরটায় শির-দাঁড়া ধরিয়া একটা অল্প-স্বল্প ব্যথা উপভোগ করিতেছিলাম, বিশেষ কাহারো তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। না আমার না গৃহিণীর। অকস্মাৎ একরাত্রে ব্যথায় ঘুম ভাঙিয়া গেল, দেখি নিশ্বাস ফেলে কাহার সাধ্য! অনেক তাপ-সেক মালিশাদি করিয়া সকালে একটু ভাল লক্ষণ যদিবা দেখা দিল, সন্ধ্যা হইতে এমন হইল যে ডাক্তার ডাকা অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। সেই অবধি ভুগিতেছি। তাহার উপরে আবার একদিন মোটর স্লিপ করায় কোমরেও দারুণ হ্যাঁচকা লাগিয়া আছে। তবে আফিস ভরসা। ইহাতে যদি অচলা ভক্তি রাখিতে পারি, তবে দুর্দ্দিন কাটিবেই কাটিবে। ভগবান শ্রীদেবাদিদেব আমাদের প্রতি বর দিয়াছিলেন যে রক্তবাহ্ না করিয়া আর আমরা কৈলাস গমন করিব না। সেটার সূচনা না হওয়া পর্য্যন্ত আমিই বা কি আর আপনিই বা কি—নির্ভয়ে থাকিতে পারেন—কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

এইজন্য সুরেশকেও[১] জবাব দিতে পারি নাই। গতবারের আপনার—নিজেও ছুটান টানে! বড় চমৎকার বড় উপভোগ্য হয়েছে। 'কালী ঘরামী'ও[২] অনিন্দনীয়। প্রায় সবগুলিই ভাল হইয়াছে। সুরেশের incomplete গল্প সম্বন্ধে এখনও বলিবার

১। বারাণসীর 'উত্তরা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর গৃহে শরৎচন্দ্রের সহিত রস-সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় ঘটে।

২। 'কালী ঘরামী' কেদারবাবুর লেখা একটি গল্প।

সময় আসে নাই। আর দু'চারটে লেখা দেখি। একথা শুনিয়া সে যেন বলার চেয়ে বেশী কিছু না ভাবিয়া লয়। কাগজ ছবি ইত্যাদিকে অবশ্য ভাল কিছুতেই বলা যায় না, তবে ভবিষ্যতে ভাল হইবে আশা করা সাজে।

আমি আছি বৈকি। লিখিতে বসিতেছি। শীঘ্রই পাঠাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িব—যেখানে দু-চক্ষু যায়। অসুখের জন্য ভারতবর্ষের 'দেনা-পাওনাটা'ও লেখা হয় নাই—আপনার শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আপনার পাকা-হাতের হাল-ধরা বজায় থাকিলে 'প্রবাস জ্যোতিঃ'র (কাশী থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা) আর যাই হোক, ডুবিবার সম্ভাবনা নাই। আমার মনে হয় এ-দুঃসময়ে আপনার আফিমের মাত্রাটা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং কর্ত্তব্য পালনের ন্যায় বড় জিনিস সংসারে আর নাই।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, জেলা হাওড়া

৫ই আষাঢ়, '৩৮

সুহৃদ্বরেষু,—কেদারবাবু, যথাসময়েই আপনার স্নেহশীতল চিঠিখানি পেয়েছিলাম, কিন্তু এ ক'দিন এমনি ব্যস্ত ছিলাম যে উত্তর দিতে পারিনি। কাল আমাদের হাবড়ার জেলা Congress election হয়ে গেলো। এবার বিরুদ্ধ দলের সোরগোল, গালি-গালাজ ও লাঠি ঠক্‌ঠকি দেখে ভেবেছিলাম হয়ত বিনা রক্তপাতে শেষ হবে না। আমি President, সুতরাং আমাদের যথারীতি প্রস্তুত হতে হয়েছিল। সভায় দাঙ্গা হয় এ আমার ভারী ভয়, তাই কাঁটা তারের বেড়া, মায় electrification সবই তৈরী রাখতে হয়েছিল। আর তৈরী ছিল বলেই দাঙ্গা হয়নি, নির্ব্বিঘ্নে দখল কায়েম রাখা গেল। বছর দশেক President আছি, vested interest জন্মে গেছে—সহজে ছাড়া চলে না। চলে কি? আমাদের পক্ষের যুক্তিটা এই যে গলদ যতই থাক্, তোমরা বলবার কে? এবং দেশের মুক্তি যদি আসে তো আমাদের দ্বারাই আসুক। তোমরা পারবে না। তোমরা হাত দিতে যেয়ো না। কিন্তু ওরা সম্মত হয় না বলেই তো আমরা রেগে যাই। নইলে আমাদের, অর্থাৎ স্বভাবী দলের মেজাজ খুবই ঠাণ্ডা। অনেকটা আপনার মতো। যাক্, এখন একটু সময় পাওয়া গেল। দু-একমাস বই লিখতে শুরু করি। কি বলেন?

যখন কলিকাতায় এসেছিলেন আমাকে একটু খবর দেননি কেন? রাস্তা-ঘাট যত খারাপই হোক, কিছু একটা উপায় করতামই। কাশী যাবেন কবে? একবার দেখা হলে বড় ভাল হয়। খবর দেবেন। —আপনার শরৎ

বাজে শিবপুর, হাওড়া

১৪-১০-২৪

প্রিয়বরেষু,—আজ সকালে আপনার চিঠি পেলাম। নানা কাজে ভুলে থাকি, প্রতিদিন অনেক চিঠিই ত পাই, কিন্তু কালে-ভদ্রে লেখা আপনার কয়েক ছত্র আমাকে যে আনন্দ দেয় তা সত্যই দুর্লভ। প্রীতির মধ্য দিয়ে আসবার সময়ে সে যেন অনেক-খানি সঙ্গে করে আনে। কেদারবাবু, মানুষের সত্যকার ভালবাসা আমি টের পাই,—এখানে বড় বেশী ভুলচুক হয় না।

আপনার শরীর ভাল নয়, একটু বেশি তাড়াতাড়িই যেন সে জীর্ণ হয়ে এলো। একদিন যদি সে ভার বইতে আর না চায় হায় হায় আমি করব না, কিন্তু ব্যথা পাবো। তখন নূতন লেখার সঙ্গে সঙ্গে কেবলি মনে হবে একজন আর নেই—এ লেখা যাঁর আনন্দ দিয়ে গ্রহণ করবার হৃদয় ছিল, শক্তি ছিল।

আপনার নিজের লেখার সম্বন্ধে কখনো আপনি একটি কথা বলেননি, আমিও কখনো একটি কথা বলিনি। অথচ, যেখানে যা বেরিয়েচে সমস্ত পড়েচি। প্রশংসার বদলে প্রশংসা দিতে আমার অত্যন্ত সংকোচ হোতো। কেবলি মনে হোতো পাছে আপনার বিশ্বাস না হয়, পাছে আপনার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে!

বৎসরও আসবে, বিজয়াও আসবে—একদিন কিন্তু আপনিও আসবেন না, আমিও না। আপনি আমার বয়সে বড়, আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন, সেদিন যেন আমার বেশী দূরে না থাকে। আমি ভারি শ্রান্ত। তুচ্ছ সুখ, তুচ্ছ দুঃখ একবার হাসি একবার কান্না—নিতান্তই আমার পুরণো হয়ে গেছে। আটচল্লিশ বছর বয়স হ'ল—ঢের হয়েছে। আমার বড় ইচ্ছে এর পরে কি আছে দেখতে। নিরর্থক কতকগুলো বিলম্ব হবার কোন প্রয়োজন অনুভব করিনে। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন। সত্যের সুমুখেই যদি এসে পড়ে থাকেন, আপনার সত্য আশীর্ব্বাদ আমার ফলবে।—

আপনার শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী[১]কে লেখা]

বাজে শিবপুর, হাওড়া

২৮. ৩. ২৫

তোমার চিঠি পড়িলাম। এবার কাশীতে গিয়া এত লোকের ভীড়ের মধ্যেও কেবল তোমাকেই শুধু আত্মীয় বলে মনে হইয়াছিল। অথচ কিছুই তোমার জানিতাম না। এই পত্র পড়িতে সময় কিছু নষ্ট হইল বটে কিন্তু সময় কি শুধুই প্রহর দণ্ড পল বিপল? তার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়? সে দিক দিয়া তোমার এই সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে এবং আমার পড়িতে ও চিন্তা করিতে কিছুই নষ্ট হয় নাই, বরঞ্চ কিছু সঞ্চয়ই হল…মেয়েদের ২৩ হইতে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই সঙ্কটজনক সময়, কারণ, ২২।২৩এর পরে যখন সত্যিকার প্রেম জাগ্রত হয়—তখন কেবল আধ্যাত্মিক ভালবাসাতে ইহার সকল ক্ষুধা মেটে না! কিন্তু এ তো গেলো একটা দিক—শারীরিক দিক। কিন্তু আর একটা বড় দিক আছে—সেইটাই চিরদিনের মীমাংসাবিহীন সমস্যা। সংসারে সচরাচর এরূপ ঘটে না, কিন্তু যে দুই-চারি জনের অদৃষ্টে ঘটে, তাহাদের মত ভাগ্যবানও নাই।—দুর্ভাগাও নাই। ইহাদের দুর্ভাগ্যের উপর কাব্যজগতে সকল মাধুর্য্য সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে…অথচ এত বড় সত্যও আর নাই—

সুখ দুখ দুটী ভাই—

সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তার ঠাঁই!

….সমাজের মধ্যে যাকে গৌরব দিতে পারা যায় না, তাকে কেবল মাত্র প্রেমের দ্বারাই সুখী করা যায় না। মর্য্যাদাহীন প্রেমের ভার, আলগা দিলেই দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠে।…তা ছাড়া শুধু নিজেদের কথা নয়, ভাবি সন্তানের কথাটা সবচেয়ে বড় কথা, তাহাদের ঘাড়ে অপরের বোঝা চাপাইয়া দেবার ক্ষমতা অতি বড় প্রেমেরও নাই। …একটা কথা। —যথার্থ ভালবাসিলে মেয়েদের শক্তি ও সাহস পুরুষের অপেক্ষা ঢের বেশি। কোনো কিছুই তাহার গ্রাহ্য করে না। পুরুষেরা যেখানে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, মেয়েরা সেখানে স্পষ্ট কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিতে দ্বিধাই করে না। ….সমাজের অবিচার অত্যাচারের যে কেহ প্রথমে প্রতিবাদ করে, তাহাকেই দুঃখ পাইতে হয়।…ইং ১৯২৫

….সত্যকার ভালোবাসার জন্য জগতে দুঃখভোগ নাকি করিতে হয়। কেহ না করিলে সমাজের অর্থহীন অবিচারের প্রতিবিধান হইবে কিসে? সমাজের বিরুদ্ধে যাওয়া, আর ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যাওয়া যে এক বস্তু নয়—এই কথাটাই লোকে ভুলিয়া যায়।

১। হরিদাসবাবু কাশীতে কবিরাজী করতেন। এইখানেই উভয়ে পরিচিত হন।

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা]

বাজে শিবপুর, হাওড়া

২৮.৪.২৫

...শরীরটা তেমন সুস্থ নয়।

ভেলু, বেঁচে নেই। গত বৃহস্পতিবারের আগের বৃহস্পতিবারে আমি ঢাকা থেকে সকালে এসে পৌঁছাই। তখনি বেলগেছে হাঁসপাতাল থেকে তাকে মোটরে করে বাড়ি আনি। এসেই কিন্তু সে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়ে। ডাক্তারেরা বলেন acute gastritis. সাত দিন সাত রাত খাইনি ঘুমাইনি—তবুও পরের বৃহস্পতিবার ভোর ৬টার সময় তার প্রাণ বার হয়ে গেল। শেষ দিন বড় যন্ত্রণা পেয়েই সে গেছে।

বুধবারে জোর করে কড়া ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করি, চাম্‌চে দিয়ে মুখে গুঁজে দেবার অনেক চেষ্টা করেও ওষুধ তার পেটে গেল না; কিন্তু রাগের উপর আমাকে কামড়ালে। সেদিন সমস্ত রাত আমার গলার কাছে মুখ রেখে কি তার কান্না। ভোরবেলায় সে কান্না তার থামলো।

আমার ২৪ ঘণ্টার সঙ্গী, কেবল এ দুনিয়ায় আমাকেই সে চিনেছিল। যখন কামড়ালে এবং সবাই ভয় পেলে তখন রবিবাবুর এই কথাটাই শুধু মনে হতে লাগলো—তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইক অবহেলা! তার আঘাত ছিল, কিন্তু অবহেলা ছিল না। এর পূর্ব্বে এত ব্যথা আমি আর পাই নি।

—ডাক্তার প্রভৃতি বহু বন্ধু-বান্ধবেই এখন ধরেছেন চিকিৎসা করাতে। অর্থাৎ পাগলা কুকুর কামড়ানোর পরে যা করা উচিত। উচিত যা তাই চলবে। ২৮টা injection এর আজ ১০টা injection হয়ে গেল। আরো ১৮টা বাকী! তাও সম্পূর্ণ হবে। মানুষকে বাঁচাতেই হবে—কারণ, your life is too valuable! দেখাই যাক valuable life এর শেষটা কি দাঁড়ায়। —তোমার শরৎ

[ঔপন্যাসিক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে লেখা]

বাজে শিবপুর, ২১শে এপ্রিল, '২৫

ভাই চারু,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। আজ আমার চিঠিপত্র লেখার মত মনের অবস্থা নয়, তবুও তোমাকে এই কথাটা না জানিয়ে থাকতে পারলাম না। তোমার হয়ত মনে পড়বে, আসবার সময় পথের ধারে—একটা মৃতপ্রায় বাছুর, তারপরেই একটা

১। শরৎচন্দ্রের কুকুরের নাম ছিল ভেলু।

জবাই করা মোরগ আমার চোখে পড়ে। আমি তোমাকে বলি, আজ যাবার সময় এত মৃত্যুর চেহারা দেখি কেন? তুমি বললে, একটা গাধাও ত ছিল। আমি বললাম, কই, আমি ত তা দেখি নি।

তারপর তোমরা স্টেশন থেকে চলে গেলে, গাড়ি ছাড়বার পরেই দেখি রাস্তার ধারে একপাল শকুনি আর একটা মরা কুকুর। আমার নিজের কুকুর ছিল হাসপাতালে, মন যে আমার কি খারাপ হয়েই গেল তা লেখা যায় না। ইংরাজীতে যাকে বলে Superstition সে আমার নেই, কিন্তু তিন তিনটে মৃত্যুর কথা সমস্ত পথ আমাকে একটা মুহূর্ত্তের শান্তি দিল না। বাড়ি এসে শুনলাম ভেলু ভাল আছে এবং হাসপাতালের চিঠি পেলাম।

বাড়িতে নিয়ে এলাম বৃহস্পতিবার। পরের বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় ভেলু মারা গেল। আমার চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী আর নেই। সংসারে এতবড় ব্যথার ব্যাপারও যে আছে এ আমি ঠিক বুঝতাম না। বোধ হয়—তাই এটা আমার প্রয়োজন ছিল। আর একটা জিনিস টের পেলাম চারু, পৃথিবীতে objective কিছুই নয়, Subjectiveটাই সমস্ত। নইলে একটা কুকুর বই ত নয়। রাজা ভরতের উপাখ্যান কিছুতেই মিথ্যে নয়।

—তোমার শরৎ

২৮শে মাঘ, ১৩৪৪

কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

ভাই চারু, ইতিমধ্যে আমি বাড়ি গিয়েছিলাম। পাড়াগাঁয়ের মাটির বাড়ি আর রূপনারায়ণ নদ,—এদের মায়া কাটিয়ে আমি বেশী দিন কোথাও থাকতে পারি নে। তবে এও সত্যি, এদের মায়া কাটিয়ে যাবারও বেশী দিন বাকী নেই। পুরোনো বন্ধুবান্ধব অনেকেই এগিয়ে গেছেন। তাঁদের আমি নিত্যই স্মরণ করি। এইমাত্র এলো অধ্যাপক পরলোকগত বিপিন গুপ্তর শ্রাদ্ধসভায় যাবার আমন্ত্রণপত্র। শিবপুরে কত বিকাল বেলাই না একসঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেছি। তুমি আছো একটি সাবেক কালের বন্ধু, আশা করি অন্ততঃ তোমার আগে যেন যেতে পারি। এ সংসারে আর একটা দিনও মন বসছে না চারু। কেবলই পিছনের কথা ভাবি, সুমুখের দিকে একবারও চোখ যায় না। কিন্তু যাক গে এসব কথা। তোমার মন খারাপ ক'রে দিয়ে লাভ নেই।

তোমার দু'খানা চিঠিই পেলাম। যাঁরা আমাকে উপাধি[1] দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তাঁদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসাই আমার সব চেয়ে বড় উপাধি। এই কথাটি মনে করলেই মন ভরে যায়।

ঢাকায় যদি যাওয়া হয় তোমার বাড়িতে গিয়েই উঠবো, তুমি নিমন্ত্রণ করে না রাখলেও। তোমার গৃহিণীকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে বোলো, তাঁর আহ্বান অবহেলা করবো না।

তোমাদের শরৎ

[শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে লেখা]

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া
১১।১২।২৭

পরম কল্যাণীয়াষু,

রাধু, তোমার চিঠি পেলাম। এর মধ্যে তুমি যে বিন্ধ্যাচলে গিয়েছো তা ভাবিনি। বরঞ্চ আমি ভাবছিলাম সেদিন নরেনের ওখান থেকে ফিরে আসতে হ'ল সে ছিল না বলে—আর একদিন এরই মধ্যে গিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার ওখানে যাবো।

বিন্ধ্যাচলে আমাকে যেতে বলচো এ খবরে মন খুশীতে ভরে উঠলো। কিন্তু এখন আমার কোথাও যাবার একতিল সময় নেই। প্রথমতঃ পল্লীগ্রামে বাস করতে আসার যথাসাধ্য পুরস্কার পাওয়া গেছে। স্থানীয় অতি ক্ষুদ্র জমিদারের উৎপীড়ন থেকে দরিদ্র প্রজাদের বাঁচাতে গিয়ে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলাতেই জড়িয়ে গেছি। ঠিক আসামী হইনি বটে, কিন্তু দিদির[2] এক দেবরকে মূল আসামী করার জন্যে আমার অশান্তিও কম হয়নি। লেখা-পড়া দুই-ই ঘোচবার জো হয়েচে। দ্বিতীয়তঃ আগামী কংগ্রেসের ভারী গোলযোগ[3] বেধেছে। পরন্তু সুভাস

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট. উপাধি।

২। শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবী।

৩। এই সময় বঙ্গীয়-প্রাদেশিক কংগ্রেসে দুই দল হয়েছিল। এক দলের নেতা ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও অপর দলে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস।

(সুভাষচন্দ্র বসু) ধরেছিল যে দিন কতক কলকাতায় থেকে গণ্ডগোলটা যদি সম্ভব হয় মিটিয়ে দিতে। আমি সেটাতে না পারলে মিটবে না বলেই ওদের আশঙ্কা।

শরীরটার সম্বন্ধে ঠিক করেছি আর একটা কথাও বলব না। তুমি কেমন আছ? এইবারে পারো যদি ওটাকে আর একটু মজবুত করে ফিরে এসো।

মাঝে মাঝে ভাবি চোখ কান বুজে যদি একবার কোথাও নিরালায় পালাতে পারি তো বাঁচি। ছিলাম লেখাপড়া নিয়ে—এ আচ্ছা হাঙ্গামায় নিজেকে জড়িয়ে তুলেচি। মনের শান্তি ও দেহের স্বস্তি দুই নষ্ট হতে বসেছে। শুধু একটা বাঁচোয়া যে নিজের কাজের ফর্দ্দ এখনো খবরের কাগজে বার হতে পায় না। এটুকু কোন-মতে সামলে যেতে পারচি এই সৌভাগ্য।

তুমি আমার সেবার ভার নিতে যে চেয়েচো সে কেবল তুমি আমাকে চেন না বলে। এ পৃথিবীতে কেউ পারে না। দিন দুই-তিন এ কাজে নিযুক্ত হও যদি তো বলবে বড়দা গেলে বাঁচি। পরীক্ষা করে নিতে লোভ হয় বটে, কিন্তু যে স্নেহটুকু এখনও আছে, সে খাটুনিতে পড়লে তার লেশটুকুও আর থাকবে না। ৭।৮ বার চা'ই খাই—নিজে এতবার কি তৈরী করে দিতে পারবে? অন্য খাওয়া-দাওয়ার বালাই বেশি নেই; কিন্তু এই বদ অভ্যাসটার জ্বালায় কারো বাড়িতে কখনো থাকতে সাহস করি নে।

তোমরা কতদিন ও দেশে থাকবে? লাহোর[১] থেকে ডিসেম্বরের শেষে ফিরে আসবার সময়ে কি ওখানে একবার তোমাকে দেখে আসবার সুবিধে পাবো?

ছেলেবয়সে একবার একজনের নিমন্ত্রণ পেয়ে কিছুদিন তাঁর অতিথি হয়েছিলাম—তোমার চিঠিটা পড়ার সময়ে বার বার সেই কথাই মনে হচ্ছিল। এক একটা কথা মানুষে কোনকালেই সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারে না—অথচ ভোলা ছাড়া আর কি?

যাক সে কথা। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।

তোমার—বড়দা

১। লাহোরের প্রবাসী বাঙালীগণ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে এক সাহিত্যসভার যোগদান করবার জন্য শরৎচন্দ্র এই সময় তথায় গিয়েছিলেন।

[কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে লেখা]

বাজে শিবপুর,
২৭শে পৌষ, ১৩২৪

শ্রীচরণেষু,—আজ আমরা আপনার কাছে যাইতেছিলাম। কিন্তু, পথে শ্রীযুক্ত প্রথমবাবুর (প্রথম চৌধুরী) কাছে টেলিফোঁ করিয়া শুনিলাম আপনি বোলপুরে। মাঘোৎসবের সময় হয়ত আসিবেন, কিন্তু, তখন দেখা করা শক্ত।

আমাদের পাড়ায় একটি ছোটখাটো সাহিত্যসভা আছে। দু'এক মাস অন্তর কাহারো বাটীতে তাহার অধিবেশন হয়। নিতান্তই নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যাপার। তবুও গতবারে আমরা প্রমথবাবুকে ধরিয়াছিলাম, তিনি দয়া করিয়া সভাপতি হইয়াছিলেন।

কয়েকদিন হইতে আমরা ক্রমাগত তর্কাতর্কি করিয়াও মীমাংসা করিতে পারিতেছি না, এ সভায় আপনার পায়ের ধূলা পড়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা আছে কি না।

এবার যখন বাড়ি আসিবেন, যদি অনুমতি দেন, আমরা গিয়া আপনার কাছে আবেদন করি।

—সেবক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাজে শিবপুর, হাওড়া
২০শে বৈশাখ, ১৩২৭

শ্রীচরণেষু—ছেলেদের মুখে মুখে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে আপনি আমার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। উত্তেজনার সময় রাগের মুখে হয়ত আপনার সম্বন্ধে মিথ্যা কিছু বলিয়া থাকিব, কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার সত্যাসত্য আপনার কাছে যাচাই করিতে গিয়াছিলেন তিনিও অপরাধ কম করেন নাই। ইংলণ্ডের ব্যবহারে আপনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং সমস্তই ওই পাঞ্জাব চিঠিখানার জন্য, ওটা না লিখিলে এ সকল কিছুই হইতে পারে না—, এই কথাগুলা আমি যে ঠিক কি ভাবে তখন বলিয়াছিলাম আমার মনে নাই; বানাইয়া মিথ্যা কথা আমি সচরাচর বলি না, কিন্তু বলা একেবারেই যে অসম্ভব তাহাও নয়। অন্ততঃ, এ সব নিশ্চয়ই বলিয়াছি যে এবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আপনি অনেক বদলাইয়া গিয়াছেন এবং বাঙলা দেশের লোকের প্রতি আপনার পূর্ব্বের সে স্নেহ-মমতা আর নাই। চরকা, নন-কো-অপারেশন প্রভৃতির উপর আপনার কোন আস্থা বা বিশ্বাস নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনার নিকট হইতে একদিন আমি রাগ করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পরেই হয়ত কতকগুলো মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া থাকিব। হয়ত আমার মনের মধ্যে এ ভাব ছিল যে লোকে ভুল বোঝে ত বুঝুক।

আপনার কাছে আমি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু এই প্রথম বলিয়া আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আপনি ছাড়া আর কোন বড়লোকের বাড়িতে আমি ইচ্ছা করিয়া কোনদিন যাই না, আমার সে পথটাও নিজের দোষে বন্ধ হইয়াছে মনে হইলে ভারি দুঃখ হয়।

আপনার অনেক শিষ্যের মধ্যে আমিও একজন; তাহাদের মত এতকাল আমিও কখনো আপনার নিন্দা করিতে যাই নাই, কিন্তু এবার কেন যে আমার এরূপ দুর্বুদ্ধি হইল জানি না।

আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি।—সেবক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাজে শিবপুর, হাওড়া

২রা মাঘ, '৩০

৺সেষু,—সহস্র প্রকার কাজের মধ্যে সম্প্রতি আপনার যে কিছু মাত্র অবকাশ নেই সে আমরা সকলেই জানি। তবুও আমি এই ভেবে লিখেছিলাম যে গান আপনার কাছে কথা কহার মতই সহজ, অথচ, একমাত্র এর জোরেই আমার নাটকের সব ত্রুটি ঢেকে যেতো।

সত্যেন্দ্র বেঁচে থাকলে আপনার এই চিঠিখানি দেখিয়ে আজ তার কাছ থেকে অনায়াসে গান আদায় করে আনতে পারতাম। এ চিঠি তার কাছে প্রায় আদেশের মত হোতো। কিন্তু সে পরলোকে এবং আর কেউ নেই যে গিয়ে বলি।

কলকাতায় এসে আপনার ত নিঃশ্বাস নেবার সময় থাকে না। তখন এই নিয়ে উৎপাত করতে আমি পেরে উঠব না। আমার শত কোটি প্রণাম গ্রহণ করবেন।

ইতি—সেবক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাওড়া
২৭শে আশ্বিন, ১৩৩৯

শ্রীচরণেষু,—

আমার বিজয়ার শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতিমধ্যে আপনি নানা গুরুতর কাজে ব্যাপৃত ছিলেন এবং শান্তিনিকেতনেও থাকিতে পারেন নাই—এই জন্যই প্রণাম নিবেদন করিতে বিলম্ব করিলাম।

কালের যাত্রার সঙ্গে যে আশীর্ব্বাদ আপনার পাইলাম সে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আপনার তুচ্ছতম দানও যে জগতের যে কোন সাহিত্যিকের সম্পদ, আমি এ দান মাথায় করিয়া লইলাম।

আমার ভাগ্য ভালো যে ৩১শে ভাদ্র আপনার কলিকাতায় আসা সম্ভবপর হয় নাই—আসিলে সেদিনের অনাচার দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। আর সবচেয়ে পরিতাপ এই যে আমার প্রায় সমবয়সী সাহিত্যিকরাই এই উপদ্রবের সূত্রপাত করিয়াছিল। শুধু এইটুকু সান্ত্বনা যে হয় ত এটাই ইহারা ভালবাসে,—আমি উপলক্ষ্য মাত্র। কারণ, গত বৎসরের জয়ন্তী উৎসবেও ইহারা কম দুঃখ দিবার চেষ্টা করে নাই।

আমি একদিন নিজে গিয়ে আপনাকে প্রণাম করিয়া আসিতে চাই, শুধু সঙ্কোচে যাইতে পারি না, পাছে কেহ কিছু মনে করে।

আপনার শরীর এখন কেমন আছে? এই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কি করিয়া যে এত বড় শারীরিক পরিশ্রম আপনি করিতে পারেন বিস্ময়ের ব্যাপার। ইতি—

সেবক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৯ সালে টাউন হলে দেশবাসীর পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রের যে জন্ম-জয়ন্তী হয় তাহাতে পৌরোহিত্য করিবার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু বিশেষ কাজের জন্য রবীন্দ্রনাথ আসিতে না পারায় তাঁহার লিখিত আশীর্ব্বাণী যাহা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:

কল্যাণীয়েষু—শরৎচন্দ্র, বিশেষ উদ্বেগজনক সাংসারিক ঘটনায় তোমার জন্মদিনের উৎসবে সম্মাননা সভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হোলো। অগত্যা আমার আন্তরিক শুভ কামনা এই উপলক্ষ্যে পত্র-যোগে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই।

তোমার বয়স অধিক নয়, তোমার সৃষ্টির ক্ষেত্র এখনো সম্মুখে দীর্ঘ প্রসারিত, তোমার জয়যাত্রার বিরাম হয়নি। সেই অসমাপ্ত যাত্রাপথের মাঝখানে অকস্মাৎ তোমাকে দাঁড় করিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া আমার কাছে মনে হয় অসাময়িক। এখনো

স্তব্ধ হবার অবকাশ নেই তোমার, ফলশস্য-বহুল দূর ভবিষৎ এখনো তোমাকে সম্মুখে আহ্বান ক'চে।

সত্তর বছর উত্তীর্ণ করে কর্ম সাধনার অন্তিমপর্বে পৌচেছি। কর্ত্তব্যের চক্ররথ প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করার পরেও এখনো যদি আমাকে চলতে হয় সেটা পুনরাবর্ত্তন মাত্র। এই কারণেই অল্পদিন হোলো আমার দেশ আমার জীবনের শেষ প্রাপ্য সমারোহ করে চুকিয়ে দিয়েছে। সাধারণের কাছে আমার পরিচয় সমাপ্ত হয়ে গেছে বলেই শেষকৃত্য সম্ভবপর হয়েছে। আকাশ থেকে শ্রাবণের মেঘ তার দান যখন নিঃশেষ করে দেয় তখনি ধরাতলে প্রস্তুত হয় শরতের পুষ্পাঞ্জলি। তারপরেও মেঘ যদি সম্পূর্ণ বিশ্রাম না করে সেটা হয় বর্ষার পুনরুক্তি মাত্র, সেটা বাহুল্য।

সেই দাঁড়ি-টানা সময় তোমার নয়, এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা-বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি, তুমি পাবে সমাদর। পথের দুই পাশে যে সব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠবে তারা তোমার; অবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্বজন হস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সেদিন বহুদূরে থাক্। আজ দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবী করবে; তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাকো। পথের চরম প্রান্তবর্ত্তী আমি সেই কামনা করি। জনসাধারণ সম্মানের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তি বাচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয় এ-কথা নিশ্চিত মনে রেখো।

তোমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই—রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহা-কালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি কালের এই-গতি-হীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। সেই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।

কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক এই আশীর্বাদ সহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শুভানুধ্যায়ী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই উপরোক্ত বাণীটি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবেও শরৎচন্দ্রকে ঐদিন আর একটি পত্র দিয়েছিলেন। এখানে তা উদ্ধৃত হোল:

কল্যাণীয়েষু,—সম্প্রতি সাংসারিক বিশেষ দুর্যোগ না থাকলে আমি নিশ্চয়ই তোমার অভিনন্দন সভায় যোগ দিতুম। এমন কি শারীরিক অস্বাস্থ্য ও দুর্বলতাও বাধা ঘটাত না।

প্রাচীনকালে আর্য্যদের ঘরে অগ্নিগৃহ থাকত সেখানে পবিত্র অগ্নিকে যত্ন করে জ্বালিয়ে রাখা হোত, নিবতে দিত না। সাহিত্যে যাঁরা কীর্তিশালী, দেশের চিত্তভবনে সেই পুণ্য অগ্নি অনির্বাণ রাখার কাজ তাঁদেরই। তোমার প্রতিভার দ্বারা দেশের হৃদয়কে তুমি জয় করেচ, দেশের গভীর অন্তরে তোমার প্রবেশাধিকার। তোমার লেখনী বাঙালীর চিত্ততন্ত্রকে হাসি ও অশ্রুর নবতর ও গভীরতর ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত করে তুলেছে? যেখানে তার মনোমন্দিরে চিরন্তনের পুণ্য বেদিকা, সেইখানে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যপ্রদীপ বাংলা সাহিত্যের জ্যোতিঃ শিখায় দীর্ঘ আয়ুঃ সঞ্চার করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এই কথা জেনে আমার কর্মাবসানের পশ্চিমদ্বার থেকে তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি।

ইতি—৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৯

তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা]

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোস্ট,

জেলা হাওড়া

কল্যাণবরেষু,—তোমার চিঠি পাইলাম। আমি শয্যাগত হইয়াই পড়িয়াছিলাম। এখন ভাল হইয়াছি। 'পথের দাবী'র শেষ অধ্যায়টা[১] যদি দেখানো প্রয়োজন জ্ঞান কর ত দেখাইয়ো। এখনো আমার ত-নিমন্ত্রণের আবশ্যকতা নেই—এতদূরে যে কোন প্রিয়জন কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি আসেন সত্যই খুসী হই।

খবরের কাগজ ত পড়ি না, তবে শুনিয়াছি, কলিকাতায় নাকি হিন্দু-মুসলমান ঝগড়া-ঝাঁটি হইতেছে,—সে ত এতদিনে নিশ্চয় থামিয়া গিয়াছে।

সুধীর সরকার[২] আজও বই ছাপানো সম্বন্ধে তাহার অভিমত দিল না। আমার বিশ্বাস যে সে ছাপাইবে না।

রমাপ্রসাদ[৩] কেমন আছেন?

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিয়ো—ইতি ২৮শে চৈত্র, ১৩৩২

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোস্ট,
জেলা হাওড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

বিজু[৪], তোমার চিঠি পেলাম। রক্ত বন্ধ ত হয়ই নি[৫], বরঞ্চ যেন বেশী বেশী পড়চে। যাক্, এ প্রসঙ্গ আর না।

শ্রীযুক্ত রবিবাবুর,[৬] চিঠি পেলাম। তাঁর অভিমত মোটের উপর এই যে, বইখানি পড়লে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। এবং তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে স্বদেশে বিদেশে যত রাজশক্তি আছে, ইংরাজের মত ক্ষমাশীল আর কেউ নয়। মাত্র বইখানি চাপা দিয়ে আমাকে কিছু না বলা আমাকে ক্ষমা করা। অর্থাৎ এটুকু বোঝা গেল এ-বই পড়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।

তোমার গল্প পাতা-খানেক লিখে থেমে আছে। আজ আবার আরম্ভ করব। কিন্তু কোন কিছুতেই যেন আর মনঃসংযোগ করতে পারছি নে।

B. N. Ry. স্ট্রাইক তেমনই চলেছে,—কলকাতায় পৌঁছতে প্রায় ৬।৭ ঘণ্টা লাগে এবং ফেরা সুকঠিন।

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি ৬ই ফাল্গুন, ১৩৩৩ —দাদা

১। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে 'পথের দাবী' প্রকাশিত হয়। এবং ইহা স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী হইতে সম্পাদিত হইত।

২। কলকাতার পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স এর সত্বাধিকারী। প্রথমে এই প্রতিষ্ঠান হইতেই 'পথের দাবী' পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা হইলেও রাজদ্রোহিতার আশঙ্কায় তা পরিত্যক্ত হয়।

৩। স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা।

৪। উমাপ্রসাদবাবুর ডাকনাম।

৫। শরৎচন্দ্র অর্শ রোগে ভুগতেন। এখানে অর্শের রক্তপাতের কথাই বলেছেন।

৬। গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কালীঘাট,
কলিকাতা। ১১ই কার্ত্তিক, ১৩৪৩

কল্যাণীয়েষু,—বিজু[১] কাল বাড়ি থেকে এখানে এসে তোমার চিঠি পেলুম। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হ'লো তার কারণ বড় বৌ[২] নিওমোনিয়ায় শয্যাগত হয়েছেন সেখানে খবর গিয়ে পৌঁছলো। তবে বাড়াবাড়ির ব্যাপার নয়,—আশা হয় শীঘ্রই সেরে উঠবেন। নইলে গরীব মানুষ, কলকাতার চিকিৎসার বিরাট ব্যয়ভার বইতে পারবো না।

আমার একষট্টি বছরের প্রারম্ভকে কবি আশীর্ব্বাদ* করেছেন। অকৃপণ ভাষায়, মন খুলে মঙ্গল কামনা করেছেন। 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় যেটুকু প্রকাশিত হয়েছিল সেটা তোমাকে পাঠালাম। তাঁর নিজের হাতে লেখাটি আমাকে দিয়েছেন, তুমি এলে তাঁর অন্যান্য পত্রের মত এখানিও তোমাকে রাখতে দেবো। তখন কিন্তু এই পত্রাংশটুকু আমাকে ফিরিয়ে দিও। আমি ভাল নই বটে, তবে পূর্ব্বের চেয়ে অনেক সেরে গেছি। জরটা গেছে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ নিও এবং দাদারা যদি কেউ থাকেন আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা দিও।

শুভার্থী—
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

*রবিবাসরের উদ্যোগে 'উদয়ন'-সম্পাদক অনিলকুমার দে সাহিত্যবন্ধুর বেলিয়াঘাটাস্থ 'প্রফুল্লকানন' নামক উদ্যানবাটীতে শরৎচন্দ্রের ৬১তম জন্মতিথি উদযাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত থেকে সেদিন এক লিখিত অভিভাষণে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সুবিধামত ৩১শে ভাদ্র সভা না হয়ে ২৫শে আশ্বিন সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল। কবির এই অভিনন্দন বাণীটি এখানে উদ্ধৃত করা হোল :

কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র,

তুমি জীবনের নির্দ্দিষ্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছো। এই উপলক্ষ্যে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণ সভা।

বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের

১। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ডাকনাম।
২। শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবী।

পরিমাণ কম হয়নি, তোমার সাহিত্যরস-সত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশনপাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।

সাহিত্যের দান যারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্ম্মম। তারা কাল যা পেয়েছে তার মূল্য প্রভূত হলেও আজকের মুঠোয় কিছু কম পড়লেই ভ্রূকুটি করতে কুণ্ঠিত হয় না। পূর্ব্বে যা ভোগ করেছে তার কৃতজ্ঞতার দেয় থেকে দান কেটে নেয়, আজ যেটুকু কম পড়েছে তার হিসাব করে। তাঁরা লোভী, তাই ভুলে যায় রসতৃপ্তির প্রমাণ-ভরা পেট দিয়ে নয়, আনন্দিত রসনা দিয়ে; নতুন মাল বোঝাই দিয়ে নয়, স্বাদে চিরন্তনত্ব দিয়ে; তারা মানতে চায় না রসের ভোজে স্বল্প যা তাও বেশী; এক যা তাও অনেক।

এটা জানা কথা যে, পাঠকদের চোখের সামনে সর্ব্বদা নিজেকে জানান না দিলে পুরানো ফটোগ্রাফের মত জানার রেখা হলদে হয়ে মিলিয়ে আসে। আকাশের ছেদটা একটু লম্বা হলেই লোকে সন্দেহ করে যেটা পেয়েছিল সেটাই ফাঁকি, যেটা পাইনি সেটাই খাটি সত্য। একবার আলো জ্বলেছিল, তারপরে তেল ফুরিয়েছে—অনেক লেখকের পক্ষে এইটেই সব চেয়ে ট্র্যাজেডি। কেননা আলো জ্বালাটাকে মানুষ অশ্রদ্ধা করতে থাকে তেল ফুরোনোর নালিশ নিয়ে।

তাই বলি, মানুষের মাঝ-বয়স তখন পেরিয়ে গেছে তখনো যারা তার অভিনন্দন করে তারা কেবল অতীতের প্রাপ্তি স্বীকার করে না তারা অনাগতের পরেও প্রত্যাশা জানায়। তারা শরতের আউষ ধান ঘরে বোঝাই করেও সেই সঙ্গে হেমন্তের আমনধানের পরেও আগাম দাবী রাখে। খুশী হয়ে বলে, মানুষটা এক-ফসলা নয়।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তায় মেনে নিয়েছে। ইতস্ততঃ যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে ত ভালোই, না থাকলেই ভাবনার কারণ —এই সহজ কথাটা লেখকেরা অনেক সময়ে মনের খেদে ভুলে যায়। ভালো লাগতে স্বভাবতই ভালো লাগে না এমন লোককে সৃষ্টিকর্ত্তা যে সৃজন করেছেন। সেলাম করে তাদেরও তো মেনে নিতে হবে—তাদের সংখ্যাও তো কম নয়। তাদের কাজও আছে নিশ্চয়ই। কোনো রচনার উপরে তাদের খর কটাক্ষ যদি না পড়ে তবে সেটাও ভাগ্যের অনাদর বলেই ধরে নিতে হবে। নিন্দার কুগ্রহ যাকে পাশ কাটিয়ে যায়, জানব প্রশংসার দাম

বেশী নয়। আমাদের দেশে যমের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে বাপ মা ছেলের নাম রাখে এককড়ি দুকড়ি। সাহিত্যেও এককড়ি দুকড়ি যারা তারা নিরাপদ। যে লেখায় প্রাণ আছে প্রতিপক্ষতার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীত-পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষ পথে নানা বেগে আবর্ত্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েচে বাঙালীর হৃদয় রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েচেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুসি হয়েছে এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্ব্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার, কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞান-পত্রের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। আজ তার অভিনন্দন বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে স্বত-উচ্ছ্বসিত। শুধু কথা-সাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে। চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্য্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে-গুণে ভালোয়-মন্দয়,—চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়—মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।

২৫শে আশ্বিন, ১৩৪৩।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রন্থ পরিচয়

গ্রন্থ-পরিচয়

পথের দাবী

প্রথম প্রকাশ—'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংখ্যায় প্রকাশিত হয় :

১৩২৯—ফাল্গুন ও চৈত্র

১৩৩০—বৈশাখ, আষাঢ়—ভাদ্র, অগ্রহায়ণ—ফাল্গুন

১৩৩১—জ্যৈষ্ঠ আশ্বিন, কার্ত্তিক, পৌষ ও মাঘ

১৩৩২—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্ত্তিক- ফাল্গুন

১৩৩৩—বৈশাখ।

পুস্তাকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ৩১শে আগস্ট, ১৯২৬ (ভাদ্র, ১৩৩৩)। ঐ মাসেই ইংরাজ সরকার কর্তৃক রাজদ্রোহাত্মক অপরাধে বাজেয়াপ্ত হয়। রাজরোষ মুক্ত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, বৈশাখ ১৩৪৬।

'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করা হলে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত আঘাত পান। তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'পথের দাবী' দেন এবং তাঁর মতামত চান। শরৎচন্দ্র আশা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ যদি সরকারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান তাহলে হয়ত বইখানি পুনর্ব্বার প্রকাশ সম্ভব হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে লেখেন—

তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্ত্তব্যের হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে—কেন না লেখক যদি ইংরেজরাজকে গ্রহণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজরাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলেম—একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্ণমেণ্ট এতটা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয়, পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনামাত্র—তাতে ইংরেজরাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার

বিরুদ্ধে কর্ত্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াইতে হয়, তাহলে অপরপক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজরাজের কাছে দাবী করি, নিজের কাছে নয়; তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি, নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি —ইংরেজকে গাল দিয়ে কোন শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপ দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না, সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোন দেশেই রাজশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেচে সেখানে এমনিই ঘটবে—রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না এই কথাটা নিঃসন্দেহ জেনেই ঘটেচে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্য্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত তা হলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়। ইতি—
২৭শে মাঘ, ১৩৩৩

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এর উত্তর শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন। কিন্তু বন্ধুদের পরামর্শে তা পাঠান হয়নি। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে চিঠিখানির মূল্য অপরিসীম।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোস্ট
জেলা হাবড়া

শ্রীচরণেষু

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবার কথা। কিন্তু সে কিছুই নয়! আপনি যা কর্ত্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমার অভিমান নেই অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা আছে সে সম্বন্ধে আমার দুই-একটা প্রশ্ন আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন ইংরাজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি অসত্য প্রচারের মধ্য দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম তাহলে লেখক হিসাবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে Politician-দের Propaganda হ'ত, কিন্তু বই হ'ত না। নানা কারণে বাঙ্‌লা ভাষায় এ ধরনের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্ব্বত্রই যখন বিনা বিচারে অবিচারে অথবা বিচারের ভান ক'রে কয়েদ নির্ব্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমিই যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ, রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং, দু'দিন আগেপাছের জন্য কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি, এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ যাক্। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাঙ্‌লা দেশের গ্রন্থকার হিসাবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি, এবং তৎসত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তি ভোগ করতে হয় ত করতেই হবে—তা' মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে, এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এজন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ-বই আবার ছাপা হবে এ সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি-ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয় তার জন্যে হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয় তখন দু'বছর না হয়ে তিন বছর হ'ল কেন এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ ছানা মাখন পায়

না ব'লে কিম্বা মুসলমান কয়েদীরা মোহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্ছে, আমরা দুর্গোৎসবের খরচ পাই না কেন এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জা বোধ করি, কিন্তু মোটা তাতের বদলে যদি Jail authorityরা ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি, কিন্তু ঘাসের জ্বালা কণ্ঠরোধ না করা পর্য্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা' বলা উচিত মনে করি, তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরাজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য সেবাটাই এই ধরণের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। একথা অস্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু ও আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরাজ রাজশক্তির এ বই বাজেয়াপ্ত করবার justification যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে protest করার justificationও তেমনি আছে।

আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে গা—ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোক যদি প্রতিবাদ না করে, আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ-চৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি নিজে বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতাও আপনার অত্যন্ত বেশী, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে এই বই প্রচারে দেশের সত্যকার কল্যাণ নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হোত। মানুষের ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েচে মনে করতাম।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে এ-চিঠি আপনাকে লিখিনি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকতো আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে নির্ব্বাসনে বসে আছি। অর্থে সামর্থ্যে যে কত গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার তারি ইচ্ছে হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতাবশতঃ এ পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে আমাকে মার্জ্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং

কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারিনে।
ইতি—২রা ফাল্গুন, ১৩৩৩।

সেবক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড় থেকে ১০ অক্টোবর ১৯২৯ খ্রীঃ শরৎচন্দ্র রাধারাণী দেবীকে লিখেছিলেন: "...একটা কথা তোমাকে জানাই, কারুকে বোলো না। 'পথের দাবী' যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন ত একটা কাজ হয় যে পৃথিবীর লোকে জানতে পারে যে গভর্ণমেন্ট কি রকম সাহিত্যের প্রতি অবিচার করেছে। অবশ্য বই আমার সঞ্জীবিত হবে না। ইংরাজ সে পাত্রই নয়। তবু সংসারের লোকে খবরটা পাবে। তাঁকে বই দিয়ে আসি। তিনি জবাবে আমাকে লেখেন—"পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম, ইংরাজ রাজশক্তির মত সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নেই। তোমার বই পড়লে পাঠকের মন ইংরাজ গভর্ণমেন্টের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে উঠে, তোমার বই চাপা দিয়ে তোমাকে কিছু না বলা, তোমাকে প্রায় ক্ষমা করা। এই ক্ষমার উপর নির্ভর করে গভর্ণমেন্টকে যা' তা' নিন্দাবাদ করা সাহসের বিড়ম্বনা।"

ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এতবড় কটূক্তি করতে পারে? এ চিঠি তিনি ছাপবার জন্যেই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনে এই জন্যে যে কবির এতবড় সার্টিফিকেট তখুনি স্টেট্‌সম্যান প্রভৃতি ইংরাজি কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেচে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যাবে। ঠিক বলতে পারিনে হয়ত এই কথা আমাদের মনের মধ্যে অজ্ঞাতে ছিল যখন সাহিত্যের রীতি-নীতি লিখি। তাতেই বোধ হয় কোথাও কোন জায়গায় একটু-আধটু তীব্রতার ঝাঁঝ এসে গেছে।

মহেশ

প্রথম প্রকাশ—'বঙ্গবাণী' ১৩২৯ সালের আশ্বিন সংখ্যায়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—'হরিলক্ষ্মী' নামক পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ১৩ই মার্চ, ১৯২৬ (চৈত্র, ১৩৩২)।

বারোয়ারি

'ভারতী'তে প্রকাশিত বারোজন সাহিত্যিকের মিলিত রচনা।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—মে, ১৯২১, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক 'বারোয়ারি' নামে।

ভালমন্দ

সাপ্তাহিক 'বাতায়ন' পত্রিকায় ১৩৪৪ সালের ১৫ই আশ্বিন সংখ্যায় শরৎচন্দ্র ইহার প্রথম পরিচ্ছেদ সূচনা করেন এবং পরে আরো নয়জন সাহিত্যিক সম্মিলিতভাবে সম্পূর্ণ করেন।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৫৯।

দেওঘরের স্মৃতি

প্রথম প্রকাশ—'ভারতবর্ষ' আষাঢ়, ১৩৪৪। ইহা শরৎচন্দ্রের 'ছেলেবেলার গল্প' নামে প্রকাশিত পুস্তকে সন্নিবেশিত গল্প সমূহের অন্যতম।

তরুণের বিদ্রোহ

প্রথম প্রকাশ—১৯২৯ সালের ইস্টারের ছুটিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক, রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণ।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—১৮ই এপ্রিল, ১৯২৯।

২৩শে আগস্ট, ১৯৩২ ইহার পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে 'সত্য ও মিথ্যা' নামে আরও একটি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়। এই প্রবন্ধটি ১৩২৮ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা 'নারায়ণে' প্রকাশিত হয়।

ত্রয়োদশ সম্ভার

সমাপ্ত